বিদ্যাসাগর
ও বাঙালী সমাজ

বিনয় ঘোষ

বিদ্যাসাগর

ও বাঙালী সমাজ

দ্বিতীয় খণ্ড

বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড

প্রথম প্রকাশ : ১৩৬৮ বঙ্গাব্দ

প্রকাশক—শ্রী শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে ষ্ট্রীট
কলিকাতা-১২

মুদ্রক—শ্রী গোপালচন্দ্র রায়
নাভানা প্রিণ্টিং ওআর্কস্ প্রাইভেট লিমিটেড
৪৭, গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ
কলিকাতা-১৩

প্রচ্ছদ
শ্রী সত্যজিৎ রায়

ব্লক ও প্রচ্ছদ মুদ্রণ
ভারত ফোটোটাইপ স্টুডিও

বাঁধাই—বেঙ্গল বাইণ্ডার্স

সাত টাকা

'বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ' দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জীবনালেখ্য। উনিশ শতকের নতুন সমাজজীবনের ও বিদ্যাসাগর-চরিত্রের ঐতিহাসিক ব্যাখ্যান-সহ 'প্রথম খণ্ড' ভূমিকা-রূপে পূর্বে প্রকাশিত হয়েছে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ডের চরিতাংশ এই ব্যাখ্যানের আলোকে পাঠ্য।

জীবনচরিত রচনার বিবিধ রীতি ও ভঙ্গি আছে। তা নিয়ে এখানে তত্ত্বকথার অবতারণা করা অনাবশ্যক। বিদ্যাসাগরের একাধিক জীবনচরিত লেখা হয়েছে। কিন্তু তার অধিকাংশেরই ত্রুটি কোথায়, পূর্বে তা আলোচনা করেছি (প্রথম খণ্ড, পঞ্চম অধ্যায়)। বিদ্যাসাগরের আসল ব্যক্তিত্ব ও চরিত্র, এবং তাঁর যুগ ও সমাজের সঙ্গে তাঁর প্রকৃত ঐতিহাসিক যোগসূত্র কোথায়, কোন চরিতকার তা স্পষ্ট করে ব্যক্ত করতে পারেননি। তার ফলে বিদ্যাসাগরের জীবন ও তাঁর যুগের তাৎপর্য দুইই ম্লান হয়ে গিয়েছে। বর্তমান গ্রন্থে আমি সেই অভাব যথাসাধ্য পূরণ করবার চেষ্টা করেছি।

সমাজ-জীবনের সুবিস্তৃত পটভূমিতে বিদ্যাসাগরের জীবনালেখ্য না আঁকতে পারলে, কেবল বিদ্যাসাগরের ব্যক্তিচরিত্রের নয়, তাঁর সামাজিক আদর্শের ও কাজকর্মের গুরুত্ব বা বিশেষত্ব বোঝা সম্ভব নয়। দ্বিতীয় খণ্ডে তাই বিদ্যাসাগরের জন্মকাল থেকে কর্মজীবনের সূচনাকাল পর্যন্ত (১৮২০-১৮৫০) পর্বে পর্বে তাঁর জীবনের বিকাশের সঙ্গে বাইরের সমাজের পরিবর্তনের ধারা সম্বন্ধে আলোচনা করেছি। প্রধানত এই কালটিকে বিদ্যাসাগর-চরিত্রের গঠনকাল বলা যায়। এই সময় সমাজের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক অনেকটা নিষ্ক্রিয় থাকলেও, সমাজ নিষ্ক্রিয় ছিল না। তাঁর চরিত্র ও জীবনাদর্শ এই সময় সামাজিক খরস্রোতের মধ্যে গড়ে উঠেছে। 'দ্বিতীয় খণ্ড' এইখানেই শেষ হয়েছে। 'তৃতীয় খণ্ডে' বিদ্যাসাগরের সক্রিয় সামাজিক ভূমিকার বর্ণনা ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

ঐতিহাসিক তথ্য অনুসন্ধান ও সংকলন করা যতদূর সম্ভব তা করেছি। সজ্ঞানে কোন তথ্য বিকৃত না করলেও, বিক্ষিপ্ত তথ্যকে, সেকালের সামাজিক পরিবেশের পুনর্বিন্যাসের উদ্দেশ্যে, মধ্যে মধ্যে কল্পনার রঙে রঞ্জিত করেছি। এ বিষয়ে আমি, বিশ্ববিখ্যাত চরিতগ্রন্থ *Life of Jesus*-এর রচয়িতা, **Ernest Renan**-এর অনুগামী। তাই **Renan**-এর ভাষাতেই বলছি :

Let any one endeavour to get at the truth as to the way in which such or such contemporary fact has happened; he will not succeed. Two accounts of the same event given by different eye-witnesses differ essentially. Must we, therefore, reject all the coloring of the narratives, and limit ourselves to the bare facts only? That would be to suppress history.

সমসাময়িক কাহিনী বা গল্প তাই ঐতিহাসিক উপাদান হিসেবে বর্জন না করে, বিচার করে গ্রহণ করেছি এবং উনিশ শতকের বিভিন্ন সামাজিক পর্বে কল্পনাকেও খানিকটা প্রসারিত করতে কুণ্ঠিত হইনি। অবশ্য সর্বদাই বাস্তব তথ্যের লাগাম ধরে কল্পনার বেগ যথাসম্ভব সংযত করে রেখেছি।

প্রজাতন্ত্র দিবস

বিনয় ঘোষ

বিষয়

চিত্র

লেখকের অন্যান্য বই

পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি

বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ, ১ম খণ্ড

জনসভার সাহিত্য

বাদশাহী আমল

কলকাতা কালচার

কালপেঁচার বৈঠকে

কালপেঁচার নকশা

কালপেঁচার দু'কলম

আলোকচিত্রগুলি শ্রীজয়ন্তকুমার দে পুরনো ছবি থেকে তুলেছেন। চার্লস ডয়িলির চিত্র থেকে প্রাচীন কলকাতার দৃশ্য স্কেচ করেছেন শ্রীসুধীর মৈত্র।

১ | পূর্বরঙ্গ

ভাগীরথীর পশ্চিমে সরস্বতী নদীর তীরে সূর্য অস্ত গেল। একটা যুগের সূর্য। তার নাম মধ্যযুগ। ভাগীরথীর পুবে নতুন যুগের সূর্যোদয় হল কলকাতা শহরে। নবযুগের জ্যোতির কনকপদ্ম কলকাতা।

যেমন এক যুগ অস্ত যায়, আর-এক যুগের উদয় হয় ইতিহাসে। উদীয়মান যুগে অস্তমিত যুগের স্মৃতি ও ঐতিহ্য মুছে যায় না। বিগতকালের গর্ভেই আজ ও আগামীকালের জন্ম হয়। বাংলাদেশে আধুনিক কাল বা নবযুগেরও বিকাশ হল সেইভাবে।

নবযুগের সূর্যোদয়কে যাঁরা অভিনন্দন জানালেন, তাঁদের মধ্যে প্রধান হলেন রামমোহন রায় ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। দু'জনের মধ্যে ব্যবধান প্রায় দুই পুরুষের। রামমোহন জন্মেছিলেন ১৭৭৪ সালে, বিদ্যাসাগর ১৮২০ সালে। জন্মকালের ব্যবধান দু'পুরুষের হলেও, দু'জনের জন্মস্থানের ব্যবধান খুব বেশি নয়। হুগলি জেলার আরামবাগ অঞ্চলে দু'জনেই জন্মেছিলেন। পরগণা জাহানাবাদ ও 'সরকার মদারণের' অন্তর্ভুক্ত ছিল আরামবাগ। তারও আগে এ-অঞ্চলের নাম ছিল অপারমন্দার। মেদিনীপুরের ঘাটাল মহকুমা ও হুগলির আরামবাগ মহকুমা একই পরগণার মধ্যে অবস্থিত ছিল। এখন রামমোহনের জন্মস্থান রাধানগর দক্ষিণ আরামবাগে, থানাকুল-কৃষ্ণনগরের অনতিদূরে।

বিদ্যাসাগরের জন্মস্থান বীরসিংহ গ্রাম মেদিনীপুরের ঘাটাল মহকুমায়। বীরসিংহ থেকে রাধানগর বার-চোদ্দ মাইলের বেশি দূর নয়, চার ঘণ্টার হাঁটাপথ। একদিনে বীরসিংহ থেকে কলকাতা যিনি পায়ে হেঁটে যাতায়াত করেছেন, তাঁর কাছে এ পথ সামান্য পথ।

বীরসিংহ থেকে রামমোহনের জন্মস্থান রাধানগরের পথে বিদ্যাসাগর অনেকবার যাতায়াত করেছেন। রাধানগরের কাছে পাতুল গ্রামে ছিল বিদ্যাসাগর-জননীর মাতুলালয়। বাল্যজীবনে তিনি পাতুলে থেকেছেন কয়েক-বার এবং এই পাতুলের পথেই বীরসিংহ থেকে কলকাতায় যাতায়াত করেছেন পরে। জাতীয় জাগরণের দীক্ষাগুরু রামমোহনের পবিত্র জন্মস্থান বালক বিদ্যাসাগর কয়েকবার পর্যটন করেছিলেন। রামমোহন তখন রাধানগর ছেড়ে স্থায়ীভাবে কলকাতায় বসবাস করছেন তাঁর মাণিকতলার বাড়ীতে।

বিদ্যাসাগরের নিজের মাতুলালয় গোঘাটে। আরামবাগ হয়ে এই গোঘাটের পথেই ঐতিহাসিক গড় মান্দারণে যেতে হয়। বঙ্কিমচন্দ্রের 'দুর্গেশনন্দিনী'-তে গড় মান্দারণের বর্ণনা আছে :

> গড় মান্দারণে কয়েকটি প্রাচীন দুর্গ ছিল, এই জন্যই তাহার নাম গড় মান্দারণ হইয়া থাকিবে। নগরমধ্যে আমোদর নদী প্রবাহিত; এক স্থানে নদীর গতি এতাদৃশ বক্রতা প্রাপ্ত হইয়াছিল যে তদ্দ্বারা পার্শ্বস্থ একখণ্ড ত্রিকোণ ভূমির দুই দিক বেষ্টিত হইয়াছিল; তৃতীয় দিকে মানব-হস্তনিখাত এক গড় ছিল; এই ত্রিকোণ ভূমিখণ্ডের অগ্রদেশে যথায় নদীর বক্রগতি আরম্ভ হইয়াছে, তথায় এক বৃহৎ দুর্গ জল হইতে আকাশ-পথে উত্থান করিয়া বিরাজমান ছিল। অট্টালিকা আমূলশিরঃ পর্য্যন্ত কৃষ্ণপ্রস্তরনির্মিত, দুই দিকে প্রবল নদীপ্রবাহ দুর্গমূল প্রহৃত করিত। অদ্যাপি পর্য্যটক গড় মান্দারণ গ্রামে এই আয়াসলভ্য দুর্গের বিশাল স্তূপ দেখিতে পাইবেন।

বঙ্কিমচন্দ্র দেখেছিলেন। তার আগে বিদ্যাসাগরও দেখেছিলেন। ঐতিহাসিক গড় মান্দারণের দুর্গের সামনে দাঁড়িয়ে বালক বিদ্যাসাগর সেদিন ভেবেছিলেন কি—আমাদের বাংলাদেশের এই কূপমণ্ডূক সমাজের এরকম অনেক গোঁড়ামির

দুর্গ অদূর ভবিষ্যতে একদিন তাঁকে ধূলিসাৎ করতে হবে? ভাবেননি। চরিতকারের কল্পনা মাত্র। এতটা রোমান্টিক হওয়া সাধারণ গ্রাম্য পরিবারের বালকের পক্ষে সম্ভব নয়।

গড় মান্দারণের পাশে গোঘাট, বিদ্যাসাগর-জননীর জন্মভূমি। প্রাচীন নাম অপারমন্দার। পালযুগে শূরবংশের রাজারা এখানে রাজত্ব করতেন। বরেন্দ্রভূমির বিদ্রোহ দমনের জন্য রাঢ়দেশের অন্যান্য সামন্তরাজাদের সঙ্গে 'সমস্ত আটবিক সামন্তচক্রের চূড়ামণিস্বরূপ' অপারমন্দারের লক্ষ্মীশূরও রামপালের পক্ষে যোগ দিয়েছিলেন। উৎকল ও দক্ষিণ-ভারতের রাজারা এই পথে একাধিকবার অভিযান করেছেন বাংলাদেশে। এই পথেই শশাঙ্ক থেকে রামপাল পর্যন্ত বাংলার রাজারা দক্ষিণে কলিঙ্গ পর্যন্ত জয় করেছেন। ত্রয়োদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি মালিক ইখ্‌তিয়ারুদ্দিন উজবক প্রথমে এই মান্দারণ অধিকার করেই রাঢ়দেশ জয় করেছিলেন। মুসলমান অভিযানের সময় উৎকল-রাজ বাংলার এই অঞ্চল দখল করে মান্দারণেই রাজধানী স্থাপন করেছিলেন। ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম দিকে হুসেন শাহের সেনাপতি ইসমাইল গাজী এই মান্দারণ থেকেই উৎকল অভিযান করেন। গড় মান্দারণের গড় ও দুর্গ ইসমাইল গাজীই তৈরি করেছিলেন শোনা যায়। শ্রীচৈতন্য যখন সন্ন্যাস নিয়ে নবদ্বীপ থেকে পুরীর পথে বৈষ্ণবধর্ম প্রচারে যাত্রা করেন, সেই সময়ের কথা। পাঠান-মোগল সংঘর্ষের ঐতিহাসিক স্থানও এই মান্দারণ। রাজা তোড়রমল্ল এই পথেই দায়ুদের পশ্চাদ্ধাবন করেছিলেন উড়িষ্যা পর্যন্ত। ইতিহাসের আর এক যুগ-সন্ধিক্ষণের কথা। অনেক উত্থান-পতন, অনেক ভাঙাগড়ার স্মৃতি-বিজড়িত ঐতিহাসিক স্থান এই মান্দারণ। যুগ থেকে যুগান্তরে যাত্রার অনেক পদচিহ্ন আঁকা আছে এই মান্দারণের পথে। মান্দারণের এই ঐতিহাসিক পথে বহুদিন চলতে হয়েছে বিদ্যাসাগরকে। কিন্তু কোনদিন কি মনে হয়েছে তাঁর মান্দারণের ইতিহাসের এই বাঁকের কথা? হলেও পরে মনে হয়েছে। বালক ঈশ্বরচন্দ্রের মনে হয়নি, পণ্ডিত বিদ্যাসাগরের মনে হয়েছে।

ঐতিহাসিক মান্দারণেই রামমোহন ও বিদ্যাসাগরের বাল্যজীবনের অনেক দিন কেটেছে। তাঁদের পৈতৃক বাসস্থান এই মান্দারণে। দ্বিতীয় নাম জাহানাবাদ। জঙ্গল নয় জাহানাবাদ। ঐতিহ্যরিক্ত কোন জনহীন প্রান্তরে রামমোহন ও

বিদ্যাসাগর জন্মাননি। মানুষের প্রথম জীবনের প্রথম পরিবেশ হল তার জন্মস্থানের পরিবেশ। রামমোহন ও বিদ্যাসাগর উভয়েই রাঢ়ীয় কুলীন ব্রাহ্মণ-পরিবারের সন্তান। উভয়েই 'বন্দ্যোপাধ্যায়' বংশজাত। রামকান্ত বন্দ্যো-পাধ্যায়ের পুত্র রামমোহন, ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র বিদ্যাসাগর। 'রায় রায়ান্' নবাব সরকারে চাকুরীগত উপাধি, তাই রামমোহন রায়। 'বিদ্যাসাগর' বিদ্যালয়ের উপাধি, তাই ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। বিদ্যা ও পাণ্ডিত্যের গৌরব তাঁদের বংশগত, গোঁড়ামি তাঁদের মজ্জাগত। বিদ্যার দান উদারতা, গোঁড়ামির দান সঙ্কীর্ণতা। দু'য়ের সংঘাতের মধ্যে ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন বাংলার দুই যুগপুরুষ, রামমোহন ও বিদ্যাসাগর। উদারতা ও গোঁড়ামির ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে শৈশবে তাঁরা প্রতিপালিত হয়েছেন। তাই বোধ হয় তাঁদের চরিত্রে দোষগুণ এক পাল্লায় জমা হয়ে ভারসাম্য হারায়নি। গোঁড়ামি থেকেও দৃঢ়তা ও সংযম চুঁইয়ে এসেছে তাঁদের চরিত্রে। তার সঙ্গে বলিষ্ঠ উদারতাগুণ মিশে বিচিত্র ব্যক্তিত্বের বিকাশ হয়েছে।

ঘটনার সঙ্গে ঘটনার যোগ করা সব সময় কল্পনা নিয়ে খেলা করা নয়। রাঢ়ীয় কুলীন ব্রাহ্মণবংশের দুই সন্তান প্রধানত সামাজিক গোঁড়ামির দুর্গে প্রচণ্ড আঘাত হানেন। পাথরের দুর্গের চেয়ে অনেক মজবুত সেই গোঁড়ামির দুর্গ। মধ্যযুগের বাংলার সমাজের অচল অটল দুর্গ। সমাজের নিস্তরঙ্গ গড্ডলিকাপ্রবাহ সেই আঘাতের ঘূর্ণিবাত্যায় বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। অমিতবিক্রমে সেই বিক্ষোভের মুখোমুখি এসে দাঁড়ান রামমোহন ও বিদ্যাসাগর। এ কেবল আকস্মিক ঘটনার অত্যাশ্চর্য যোগাযোগ নয়। ইতিহাসের এ-ও এক নিয়ম। ধ্বংসের সূত্রপাত হয় যেখানে, সৃষ্টিরও সূচনা হয় সেখান থেকে। তাই হয়ত কুলীন ব্রাহ্মণবংশে রামমোহন ও বিদ্যাসাগর উভয়েরই জন্ম হয়েছিল। ইতিহাসের খেয়াল এবং খেয়ালেরও একটা যুক্তি আছে। যুক্তির অবতারণা করে লাভ নেই। ইয়ংবেঙ্গল দলের মুখপাত্রদের মধ্যেও অনেকে কুলীন ব্রাহ্মণ-বংশের সন্তান ছিলেন। দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁদের অন্যতম। সামান্য হলেও এই বংশকথা একেবারে

উপেক্ষণীয় নয়। খেয়াল হলেও অগ্রগামী ইতিহাস তার বৈজ্ঞানিক ধারাই মেনে চলেছে এখানে। ধ্বংসের স্তূপের ভিতর থেকেই নতুন সৃষ্টির বীজ অঙ্কুরিত হয়ে উঠেছে। যে ঘরে গোঁড়ামির অন্ধকার জমাট বেঁধেছিল এবং সঙ্কীর্ণতার গুমোট জমেছিল সব চেয়ে বেশি, সেই ঘরেই আলোকের অগ্রদূতরা ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন একে-একে।

সামাজিক ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। ভাগীরথীর পশ্চিমে সূর্য যেখানে অস্ত গেছে, নতুন ভোরের আলো সেইখানেই দেখা দিয়েছে আবার। ঐতিহাসিকেরা বলেন, ১৭৫৭ সালের ২৩ জুন, ভারতে মধ্যযুগের অবসান এবং আধুনিক যুগের সূচনা হয়।[১] অবশ্য 'নাটকীয়' অর্থে। কারণ ব্যক্তির মতন যুগের 'মৃত্যু' হয় না। তবু নতুন যুগের যদি দিনক্ষণের কোন নিশানা থাকে, তাহলে পলাশীর যুদ্ধের এই দিনটিই হল সেই নিশানা। অন্তত রাজনৈতিক নিশানা। কিন্তু তার অনেক আগেই ইংরেজরা এদেশে বাণিজ্যের ছাড়পত্র পেয়েছেন, কলিকাতা-গোবিন্দপুর-সুতানুটির জমিদার হয়েছেন (১৬৯৮ সালে)। তার আগে, ১৬৫১ সালে, হুগলিতে তাঁরা বাণিজ্যকুঠি স্থাপন করেছেন। ইংরেজদের অনেক আগে পর্তুগীজরা আনাগোনা শুরু করেছে এদেশে। ষোড়শ শতাব্দীতেই তারা সপ্তগ্রামের বন্দরে বাণিজ্যের জন্য উপনিবেশ স্থাপন করেছে। সপ্তগ্রাম তখন পশ্চিমবাংলার প্রধান বন্দর, বাঙালী বণিকদের বসতিও সেখানে যথেষ্ট। প্রভু নিত্যানন্দ সপ্তগ্রামের এই বণিকদেরই ঘরে ঘরে বৈষ্ণবধর্ম প্রচার করেছিলেন—

> সপ্তগ্রামে প্রতি বণিকের ঘরে ঘরে।
> আপনে শ্রীনিত্যানন্দ কীর্তন বিহারে॥
> বণিক সকল নিত্যানন্দের চরণ।
> সর্বভাবে ভজিলেন লইয়া শরণ॥...
> নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর মহিমা অপার।
> বণিক অধম মূর্খ যে কৈল উদ্ধার॥
> সপ্তগ্রামে মহাপ্রভু নিত্যানন্দ রায়।
> গণসহ সঙ্কীর্তন করেন লীলায়॥
>
> (চৈতন্যভাগবত, অন্ত্য, ৫ম)

পর্তুগীজরা সপ্তগ্রামে আসার খুব বেশি দিন আগেকার কথা নয়। সপ্তগ্রামে নিত্যানন্দের নগর-সঙ্কীর্তনের ধ্বনি না মেলাতেই পর্তুগীজরা এসেছিল বাণিজ্যের লোভে। সরস্বতী নদী মজে গেল যখন, বন্দর সপ্তগ্রামেরও তখন পতন হল। তাম্রলিপ্তের পর সপ্তগ্রাম, সপ্তগ্রামের পর হুগলি, হুগলির পর কলকাতা। বন্দর কেন্দ্র করে নগর গড়ে ওঠে, মধ্যযুগের বন্দর-নগরের মতন। বন্দরের অবনতির সঙ্গে নগরও ধ্বংস হয়ে যায়। আকবর বাদশাহের রাজত্ব-কালেই পর্তুগীজরা হুগলিতে বন্দর ও বাণিজ্যকুঠি স্থাপন করল। হুগলির পর্তুগীজ-নায়ক পেড্রো তাভারেশ উদারচিত্ত আকবরের কাছ থেকে স্বাধীন-ভাবে ধর্মপ্রচারের অনুমতিও নিয়ে এলেন। হুগলির পর্তুগীজ উপনিবেশ গড়ে উঠল প্রায় ১৫৭৯ সালে এবং ব্যাণ্ডেলের গির্জা স্থাপিত হল ১৫৯৯ সালে। শ্রীচৈতন্য ও নিত্যানন্দের তিরোভাবের পর ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যে বাংলাদেশে বৈষ্ণবদের কোন ধর্মমঠ গড়ে উঠেছিল কি না বলা যায় না। ব্যাণ্ডেলে কিন্তু খ্রীস্টানদের গির্জা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এদেশের বৈষ্ণব গোস্বামীরা ও বিদেশের খ্রীস্টান পাদরিরা প্রায় একসঙ্গেই বাংলাদেশে ধর্মপ্রচারে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। মনে হয়, হুগলি অঞ্চলেই বৈষ্ণব গোঁসাই ও খ্রীস্টান পাদরিদের চারচক্ষুর মিলন হয়েছিল প্রথমে।

ইতিহাসের গতি সত্যিই বিচিত্র! ইসলামের প্রথম সংস্পর্শে দক্ষিণ-ভারতে শঙ্করাচার্য এসেছিলেন অদ্বৈতবাদের বাণী নিয়ে। ইসলামের একেশ্বরবাদ ও শঙ্করের অদ্বৈতবাদের মধ্যে সম্পর্ক ঐতিহাসিক। তারপর সেই ইসলামের সংঘাতেই, কয়েক শতাব্দী পরে, বাংলাদেশে শ্রীচৈতন্যের বৈষ্ণবধর্ম প্রবর্তিত হল। ইসলামের গণতান্ত্রিক আহ্বানের পাশে শ্রীচৈতন্যের প্রেম ও ভক্তির আহ্বান বিপন্ন হিন্দুধর্মকে রক্ষা করল। এইসময় খ্রীস্টান পাদরি সাহেবরা আর এক নতুন একেশ্বরবাদ ও ভ্রাতৃত্বের বাণী নিয়ে ধর্মের ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হলেন। বাংলার বৈষ্ণবধর্ম ‘বণিকদের’ উদ্ধার করলেও, লোকচিত্তে খুব গভীর সাড়া জাগাতে পারেনি। সাধারণ লোক যে তিমিরে ছিল, সেই তিমিরেই রইল। লোকাচার ও লোকধর্মের হাজার বন্ধন থেকে মুক্তি পেল না তারা। বৈষ্ণব-ধর্মের এই ব্যর্থতার প্রধান কারণ, শাসকশ্রেণীর পোষকতার অভাব। মধ্যযুগের কোন ধর্মই শাসকশ্রেণীর প্রত্যক্ষ পোষকতা ভিন্ন জনসমাজে প্রসারলাভ করতে

পারেনি। বৌদ্ধধর্মের সম্রাট অশোক ছিলেন, বাংলার পালরাজারা ছিলেন। হিন্দুধর্মেরও রাজকীয় পোষকতার অভাব হয়নি কোন কালে। ইসলামধর্মেরও তাই।[৭] খ্রীস্টানধর্ম ততদিন প্রসারলাভ করতে পারেনি, যতদিন না রোমান সম্রাট কন্‌স্ট্যানটাইন নিজে খ্রীস্টানধর্মে দীক্ষা নিয়েছিলেন। আমাদের দেশে খ্রীস্টধর্ম বিশেষ প্রসারলাভ করতে পারেনি, তার কারণ বৃটিশ শাসকরা এদেশে মধ্যযুগের ধর্মরাষ্ট্রের প্রতিনিধি হয়ে আসেননি। ধর্মনিরপেক্ষ আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের প্রতিনিধি ছিলেন তাঁরা, তাই খ্রীস্টান হয়েও খ্রীস্টধর্মের রাষ্ট্রীয় পোষকতা করা তাঁদের দ্বারা সম্ভব হয়নি। তবু পাদরি সাহেবদের প্রচারের জন্য বাংলার উপেক্ষিত জনসমাজে এবং শিক্ষিত সমাজেও একেশ্বরবাদের আবেদনে বেশ সাড়া পড়েছিল। ধর্মান্তরের সমস্যা না হলেও, বুদ্ধি ও যুক্তির দিক থেকে পাদরি সাহেবরা সেদিন যে বেশ একটি জটিল সমস্যার সৃষ্টি করেছিলেন, তাতেও কোন সন্দেহ নেই। রামমোহন রায় এই প্রশ্ন ও সমস্যার জবাব দিয়েছিলেন। জবাব দেওয়ার প্রয়োজন ছিল তখন। বিদ্যাসাগরের যুগে সে-সমস্যা অনেকটা মিটে গিয়েছিল। জীবনে তাই 'ধর্ম' বা 'ঈশ্বর' নিয়ে বিদ্যাসাগর একদিনের জন্যও চিন্তা করেননি। ব্যক্তিগত চিন্তা নয়, সামাজিক চিন্তা। অন্তত তাঁর বাইরের জীবনে তার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। ঈশ্বরচন্দ্র বাইরের সমাজের মধ্যেই তাঁর অন্তরের ঈশ্বরকে ধ্যান করেছেন। মানুষ ও সমাজ ঈশ্বরচন্দ্রের ঈশ্বর। একথা আত্মবিস্মৃত বাঙালী আজও স্বীকার করতে কুণ্ঠিত হন। তাই উৎসবপ্রবণ বাংলাদেশে বিদ্যাসাগরের কোন উৎসব হয় না। প্রকৃত পুরুষ ও পৌরুষের বন্দনা করতে আমরা ভয় পাই। ঢাকঢোল বাজিয়ে অন্যান্য নমস্য পুরুষদের যখন আমরা পূজা করি তখন নিঃশব্দে বিদ্যাসাগরের মাথায় একটি ফুল আর বেলপাতা দিয়ে বলি, দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর! অসীম আমাদের সৎসাহস! এই আত্মপ্রতারণা ও ভীরুতার মুখোস খুলে দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। ১৩২৯ সনের ১৭ শ্রাবণ বিদ্যাসাগর স্মরণ-সভায় বক্তৃতাপ্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন:[২]

> আমাদের দেশের লোকেরা এক দিক দিয়ে তাঁকে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন না ক'রে থাকতে পারেননি বটে, কিন্তু বিদ্যাসাগর তাঁর চরিত্রের যে মহত্ত্বগুণে দেশাচারের দুর্গ নির্ভয়ে আক্রমণ করতে পেরেছিলেন, সেটাকে

> কেবলমাত্র তাঁর দয়াদাক্ষিণ্যের খ্যাতির দ্বারা তাঁরা ঢেকে রাখতে চান। অর্থাৎ বিদ্যাসাগরের যেটি সকলের চেয়ে বড় পরিচয়, সেইটিই তাঁর দেশবাসীরা তিরস্করণীর দ্বারা লুকিয়ে রাখবার চেষ্টা করেছেন।

রবীন্দ্রনাথের এ-কথার গভীর তাৎপর্য উপলব্ধি করা প্রয়োজন। বিদ্যাসাগরের অজেয় পৌরুষ, অক্ষয় মনুষ্যত্ব এবং সমাজসর্বস্ব চৈতন্যই হল বিদ্যাসাগরের সত্যকার পরিচয়। দয়াও নয়, বিদ্যাও নয়। জীবনে তাই ঈশ্বরচন্দ্র কোনদিন 'সমাজ' ও 'মানুষ' ছাড়া অন্য কোন ঈশ্বরের চিন্তায় মগ্ন হতে পারেননি। এই না-পারাটাই বড় কথা। ঈশ্বরে বিশ্বাস করতেন কি করতেন না, সে কথা তিনি বলেননি কোনদিন, জানতেও পারেননি কেউ।

একেশ্বরবাদ প্রসঙ্গে সপ্তগ্রাম ও হুগলি ছেড়ে অনেক দূর চলে এসেছি। হুগলি-সপ্তগ্রামে যখন শ্রীচৈতন্যের বৈষ্ণবধর্ম এবং পাদরি সাহেবদের খ্রীস্টধর্মের প্রচার হতে থাকে, কলকাতা তখন সাধারণ পল্লীগ্রাম মাত্র। পর্তুগীজ ডাচ ফরাসী ইংরেজ প্রভৃতি বিভিন্ন ইয়োরোপীয় জাতির সঙ্গে বাঙালী সমাজের প্রথম পরিচয় হয় পশ্চিমবাংলার ভাগীরথী ও সরস্বতী নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলে। নবজাগরণের ক্ষেত্রও প্রস্তুত হয়, কিন্তু সে-ক্ষেত্র অবশেষে ঐতিহাসিক কারণে স্থানান্তরিত হয় কলকাতায়।

কলকাতার ভবিষ্যৎ সমৃদ্ধির স্বপ্ন দেখেছিলেন প্রথমে বাঙালী ব্যবসায়ী শেঠ-বসাকরাও, কেবল ইংরেজ বা ইয়োরোপীয় বণিকরা নন। তাঁদের কলকাতায় পদার্পণের আগেই শেঠ-বসাকরা বাণিজ্যের সুবিধার জন্য ভাগীরথীর পূর্বতীরে সুতার হাট প্রতিষ্ঠা করে বসতি স্থাপন করেছিলেন। প্রাচীন ফোর্ট উইলিয়ামের কৌন্সিলের 'ডাইরী ও কন্‌সালটেশন্ বুক' থেকেই তার প্রমাণ পাওয়া যায়। শেঠদের বাগানের খাজনা সম্বন্ধে কৌন্সিল ১৭০৭ সালের ১১ সেপ্টেম্বর যে প্রস্তাব পাশ করেন, তাতে দেখা যায়, তাঁরা বলছেন—'They being possessed of this ground which they made into Gardens before we had possession of the towns, and being the Company's merchants and inhabitants of the place.'[৩]

কৌন্সিলের সাহেব সদস্যরা পরিষ্কার প্রস্তাবের মধ্যে স্বীকার করেছেন যে, তাঁরা 'টাউনে' আসার আগেই শেঠরা জমি দখল করে বাগান তৈরি করেছিলেন। এছাড়া আরও অনেক প্রমাণ আছে। বড়বাজারের প্রাচীন শেঠ-বসাক পরিবারের বংশবৃত্তান্ত থেকে এ-ইতিহাস অনেকটা পুনরুদ্ধার করা যায়। এখানে ইংরেজদের এই স্বীকারোক্তিই যথেষ্ট। অবশ্য একথা ঠিক, কলকাতা কখন মহানগরে পরিণত হত না, যদি ইংরেজ শাসকদের রাজধানী ও প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র না হত। সেদিক দিয়ে বিচার করলে জব চার্ণককেই কলকাতার প্রতিষ্ঠাতা বলতে হয়। কিন্তু চার্ণক হঠাৎ একদিন গাছতলায় বসে তামাক খেতে খেতে কলকাতায় কোম্পানীর কুঠি স্থাপনের সিদ্ধান্ত করেন নি। কিপ্‌লিঙের হঠাৎ-গজিয়ে-ওঠা কলকাতা শহর নিছক কবিকল্পনা ছাড়া কিছু নয়। স্থিরবুদ্ধি দূরদর্শী ইংরেজদের কোনরকম হঠকারিতার নিদর্শন নয় কলকাতা শহর। ১৬৯০ সালের ২৪ অগস্ট জব চার্ণক তৃতীয়বার 'হল্ট' করেন সুতানুটিতে। হুগলি ছেড়ে সুতানুটিতে কুঠি ও বসতি স্থাপনের এই সিদ্ধান্তের পিছনে শেঠ-বসাকদের শ্রীবৃদ্ধির পরোক্ষ প্রেরণা একেবারে ছিল না, এমন কথা বলা যায় না। কেবল কুঠি স্থাপনের জন্যও কলকাতা শহর গড়ে ওঠেনি। কুঠি বাংলাদেশের আরও অনেক জায়গায় ছিল; কিন্তু তার কোনটাই কলকাতা হয়নি। চেতুয়া-বরদার (ঘাটালে) জমিদার শোভা সিংহের বিদ্রোহের ফলে ইংরেজরা ফোর্ট বা দুর্গ নির্মাণের অধিকার না পেলে (১৬৯৬-৯৭ সালে) এবং কলিকাতা-গোবিন্দপুর-সুতানুটির জমিদার না হলে (১৬৯৮ সালে), কলকাতা শহরের ভিত্তি স্থাপিত হত না।

সপ্তগ্রাম বা হুগলি নয়, হিজলি বা উলুবেড়িয়াও নয়, কলকাতাই হল বাংলার নবজাগরণের প্রাণকেন্দ্র। শুধু বাংলার নয়, ভারতেরও। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষেই তার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়ে গেল। পলাশীর যুদ্ধের তখনও অনেক দেরি। ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে হুগলিতে নবযুগের সূর্যোদয়ের যে সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল, তা একেবারে লুপ্ত হয়ে গেল। বিখ্যাত চিত্রকর উইলিয়ম হজেস্ ১৭৮০ থেকে ১৭৮৩ সাল পর্যন্ত এদেশের বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করেছিলেন। হুগলি দেখে তখন তিনি লিখেছিলেন : '...The old town of Hooghly which is now nearly in ruins, but possesses many

vestiges of its former greatness.'[৪] হুগলির ধ্বংসস্তূপের দিকে তাকালেও তখন তার বিগত নাগরিক সমৃদ্ধির কথা মনে পড়ত।

এদিকে অষ্টাদশ শতাব্দীতে ধীরে ধীরে গড়ে উঠতে লাগল কলকাতা শহর। ১৭০০ সালে বাংলাদেশ স্বতন্ত্র প্রেসিডেন্সী হল এবং চার্লস আয়ার হলেন তার প্রথম প্রেসিডেন্ট। তার দু'তিন বছর আগেই কলকাতায় দুর্গ নির্মাণ শুরু হয়েছিল, কিন্তু পাছে মোগল শাসকদের ঈর্ষার উদ্রেক করে, তাই সে-দুর্গের চেহারা ছিল গুদামঘরের মতন—'looking more like a warehouse'. আয়ার সাহেব দুর্গের আয়তন বাড়ান। ১৭০২ সালের ৬ অক্টোবর প্রথম বৃটিশ পতাকা ওড়ে কলকাতার দুর্গে। ১৭০৭ সালে সম্রাট ঔরঙ্গজীবের মৃত্যু হয়। তার ফলে ইংরেজমহলে কিরকম চাঞ্চল্য ও আতঙ্কের সৃষ্টি হয়, ফোর্টের কৌন্সিলের রোজনামচা থেকে তার প্রমাণ পাওয়া যায় :[৫]

> The whole town and factory are thrown into confusion by the news that the Mogul is dead. As these tidings were received from several sources people were found to credit the story, and great was the consternation at the Fort.

এইদিনেরই ডাইরীতে তাঁরা এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করেন—'and as a revolution is expected'—যেহেতু বিপ্লব আসন্ন, টাকাপয়সা যেখানে যা আছে সব গুটিয়ে আনা দরকার। চারদিন পর আবার তাঁরা পরামর্শ করে ঠিক করেন—'Order that sixty black soldiers be taken into the company's service and posted round the towns.' অর্থাৎ কি করবেন না-করবেন ঠিক করতে পারছেন না, দিশাহারা হয়ে গেছেন। অবশেষে ষাটজন কালা-সিপাই কোম্পানীর কাজে নিয়োগ করে টাউনের চারিদিকে মোতায়েন করার সঙ্কল্প করা হল।

বিপ্লবই বলতে হয়। সম্রাট ঔরঙ্গজীব—'the greatest of the Great Mughals save one' মারা গেছেন।[৬] রাষ্ট্রবিপ্লব আসন্ন। বিপ্লব অবশ্য সশব্দে হয়নি, নিঃশব্দে হয়েছে। পঞ্চাশ বছর পরে, ১৭৫৬ সালের ২০ জুন রবিবার, নবাব সিরাজউদ্দৌলা যখন কলকাতা দখল করেন, এবং তার ঠিক

একবছর দু'দিন পরে, ১৭৫৭ সালের ২৩ জুন বৃহস্পতিবার, যখন তিনি দ্রুতগামী উটের পিঠে চড়ে নিঃশব্দে পলাশীর রণাঙ্গন থেকে পলায়ন করেন, তখনও বোধ হয় এরকম চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়নি।

পলাশীর যুদ্ধের পর ১৭৫৮ সালে কলকাতার গোবিন্দপুর অঞ্চলের জঙ্গল হাসিল করে নতুন দুর্গের ভিত্তিস্থাপন করা হল। ১৭৬৫ সালে ক্লাইব দেওয়ানীর সনদ আদায় করলেন। বণিকের মানদণ্ড ক্রমে রাজদণ্ডরূপে দেখা দিতে লাগল। ১৭৭৪ সালে বাংলার গবর্ণর ওয়ারেন হেস্টিংস প্রথম গবর্ণর-জেনারেল হলেন। কলকাতার মর্যাদা বৃদ্ধি পেল। কেবল বাংলার নয়, সারা ভারতের রাজধানী হল কলকাতা। সেই বছরেই রামমোহনের জন্ম হল রাধানগর গ্রামে।

এক নবাবী আমল শেষ হল, আর এক নবাবী আমল আরম্ভ হল। ইংরেজদের নবাবী আমল। গোটা অষ্টাদশ শতাব্দীকেই প্রায় তাই বলা চলে। ইংরেজ নবাব এবং তাঁদের বাঙালী দেওয়ান ও বেনিয়ানদের স্বর্ণযুগ। 'নবাব' কথাটা ইংলণ্ডেও প্রচলিত হল এবং অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান অভিধানে তার অর্থ করা হল এইভাবে :[৭]

> It began to be applied in the eighteenth century, when the transactions of Clive made the epithet familiar in England, to Anglo-Indians who returned with fortunes from the East...

'নবাব' কথার এই আভিধানিক অর্থের ভিতর থেকেই অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ছবি পরিষ্কার ফুটে ওঠে। বাংলার শূন্য সিংহাসনে নকল নবাব বসিয়ে, জমিদারী দেওয়ানী 'ইন্টারলোপারী' করে, উৎকোচ উপঢৌকন নিয়ে, প্রচুর অর্থের মালিক হয়ে, সামান্য রাইটার ফ্যাক্টর, জুনিয়ার ও সিনিয়ার মার্চেন্টরা দেশে ফিরে 'নবাব' উপাধি পেয়েছেন এবং নবাবী করেছেন। নিজেদের দেশের পত্র-পত্রিকায় তাঁরা 'The Plunderers

of the East.' 'Robbers and Murderers' 'Execrable Banditti' ইত্যাদি বিশেষণে বিভূষিত হয়েছেন। লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি টাকা, বস্তা বস্তা হীরে—**'Lacks and Crowes of Rupees, sacks of Diamonds—'** এই ছিল সোনার বাংলা ও ভারতবর্ষ সম্বন্ধে ইংরেজদের ধারণা।

এ-সম্বন্ধে চমৎকার একটি কাহিনী উইলিয়ম হিকি তাঁর স্মৃতিকথায় লিপিবদ্ধ করে গেছেন। হিকি সাহেব যখন ভারতযাত্রা করেন তখন তাঁর এক বন্ধু তাঁকে একখানি তরবারি উপহার দিয়ে বলেছিলেন, 'বন্ধু, এই নাও, তরবারি নিয়ে 'ইণ্ডিয়া'তে যাও, গিয়ে অন্তত আধ ডজন বড়লোকের মুণ্ডচ্ছেদন করে 'নবাব' হয়ে আবার দেশে ফিরে এসো'।[৮] হিকি সাহেব মিথ্যা কথা লেখেননি। সামান্য বেতনের রাইটার বা ফ্যাক্টর হয়ে এসে লক্ষপতি নবাব হয়ে দেশে অনেকে ফিরে গেছেন। তাই রাইটারের চাকরির জন্য বিলেতের পত্রিকায় প্রকাশ্যে বিজ্ঞাপন ছাপা হত উৎকোচের লোভ দেখিয়ে :

> **WRITER'S PLACE TO BENGAL, WANTED A WRITER'S PLACE TO BENGAL, for which One thousand guinea will be given.**

ক্লাইব যখন মাদ্রাজে আসেন (১৭৪৪ সালে) তখন কোম্পানীর রাইটারদের বাৎসরিক বেতন ছিল ৫ পাউণ্ড, বা মাসে প্রায় ৬৲ টাকা। বিজ্ঞাপনটি ছাপা হয় বিলেতের *The Public Advertiser* পত্রিকায়, ১৭৮৫ সালের ১৪-১৫ নভেম্বর, প্রায় চল্লিশ বছর পরে। রাইটারদের বেতন তখন সামান্য বাড়লেও, এমন কিছু বাড়েনি যে তার জন্য এক হাজার গিনি সেলামি দেওয়া যায়। বোঝা যায়, বেতনটা উপলক্ষ মাত্র। আসল হল, মগের মুল্লুকে লুঠের সুযোগ।

এদেশে এই ইংরেজ নবাবদের 'গাইড ও ফিলজফার' ছিলেন বাঙালী দেওয়ান ও বেনিয়ানরা। সেকালের ধনী ও সম্ভ্রান্ত বাঙালী পরিবারের মধ্যে অধিকাংশই এই দেওয়ান বেনিয়ান সরকার মুনশী ও খাজাঞ্চীর বংশ। কয়েকটির কথা উল্লেখ করছি। শোভাবাজারের রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা মহারাজা নবকৃষ্ণ ক্লাইবের দেওয়ান ছিলেন। পাইকপাড়ার রাজবংশের

প্রতিষ্ঠাতা গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ হেস্টিংসের আমলে কৌন্সিল ও বোর্ড অফ্ রেভিনিউর দেওয়ান ছিলেন। এই বংশের বিখ্যাত 'লালাবাবু' (কৃষ্ণচন্দ্র সিংহ) দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দের পৌত্র। আন্দুল রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা রামচরণ রায় গবর্ণর ভ্যান্সিটার্ট ও জেনারেল স্মিথের দেওয়ান ছিলেন। খিদির-পুরের ভূকৈলাস রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা গোকুলচন্দ্র ঘোষাল ভেরেলস্ট সাহেবের দেওয়ান ও বিখ্যাত বেনিয়ান ছিলেন। ঠাকুর-পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা দর্পনারায়ণ ঠাকুর হুইলার সাহেবের দেওয়ান ছিলেন। সিমলের রামদুলাল দে ফেয়ারলী কোম্পানীর দেওয়ানী করতেন। জোড়াসাঁকোর সিংহ-পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা শান্তিরাম সিংহ পাটনার 'চীফ্', মিডলটন সাহেবের ও স্যার টমাস রামবোল্ডের দেওয়ান ছিলেন। পাথুরিয়াঘাটার ঘোষ-পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা রামলোচন ঘোষ হেস্টিংসের সরকার ছিলেন।[৯]

সেকালের (অষ্টাদশ শতাব্দীর) বেনিয়ানদের মধ্যে প্রধান ছিলেন বারাণসী ঘোষ, হৃদয়রাম ব্যানার্জি, অক্রূর দত্ত, মনোহর মুখার্জি প্রভৃতি। মেয়রস কোর্ট (১৭২৬) ও সুপ্রীম কোর্টের (১৭৭৪) দলিল-পত্র (Court Records) থেকে এঁদের বেনিয়ানির কীর্তিকথা কিছু কিছু জানা যায়। কলকাতায় এখনও এঁদের নামে রাস্তা আছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর এই বাঙালী বেনিয়ানরা ছিলেন সাহেবদের 'interpreter, head book-keeper, head secretary, head broker, supplier of cash and cash-keeper, and in general secret-keeper'—অর্থাৎ অসহায় অন্ধ সাহেবদের যষ্টিস্বরূপ। বেনিয়ানি করে এঁরা প্রত্যেকেই প্রচুর ধনসম্পত্তির মালিক হয়েছিলেন। এই সব বাঙালী দেওয়ান ও বেনিয়ানদের বংশধররা সকলেই জমিদারী কিনে নতুন জমিদার হয়েছেন, কেউ 'ক্যাপিটালিস্ট' হননি। হেস্টিংস ও কর্ণওয়ালিস এঁদের নতুন জমিদার হবার সুযোগ করে দিয়েছিলেন, সেকালের বনেদী রাজা ও জমিদারদের উচ্ছেদ করে। সাম্রাজ্যবাদী শোষণের স্বার্থে তাই করার প্রয়োজন হয়েছিল।[১০]

পলাশীর রণাঙ্গনে মধ্যযুগ অস্ত গেলেও, তার বর্ণচ্ছটা আরও প্রায় অর্ধ-শতাব্দী পর্যন্ত অম্লান ছিল। বাঙালী দেওয়ান ও বেনিয়ানরা তাঁদের ইংরেজ প্রভুদের মতন অস্তমিত মধ্যযুগের শেষ প্রতিনিধি ছিলেন। শিক্ষাদীক্ষায়, মনোভাবে, কেউ কারও তুলনায় অগ্রগামী ছিলেন না। পরবর্তীকালের

ইংরেজরা সত্যকার এক নতুন যুগের প্রতিনিধি হয়ে এদেশে আসেন। তাঁদের আমল থেকেই বাংলাদেশে প্রকৃত নবজাগরণের সূচনা হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর বাঙালী দেওয়ান বেনিয়ানদের বংশধরদের মধ্যে অনেকে পরবর্তীকালে এই নবযুগের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের পোষকতা করেন।

প্রথম ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গ প্রতিষ্ঠার প্রায় এক শতাব্দী পরে ১৮০০ সালে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সময় ডেভিড হেয়ার ঘড়ির ব্যবসা করতে এদেশে আসেন। ১৮০১ সালে ডিগবি সাহেবের সঙ্গে রামমোহনের পরিচয় হয় কলকাতায়। তখনও রামমোহন কলকাতাবাসী হননি। ১৮১৪ সালে রামমোহন কলকাতায় এসে স্থায়ীভাবে বাস করতে আরম্ভ করেন। ১৮১৫ সালে 'আত্মীয় সভা' স্থাপিত হয়। ১৮১৭ সালে 'লটারি কমিটি' গঠিত হয় এবং কলকাতা শহরের দ্রুত উন্নতি হতে থাকে। ১৮১৭ সালেই 'হিন্দু কলেজ' প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮১৭-১৮ সালে শিক্ষার প্রসারকল্পে 'কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটি' (১৮১৭) এবং 'কলিকাতা স্কুল সোসাইটি' (১৮১৮) স্থাপিত হয় শহরে।

নবজাগরণের কাকলি শোনা যায় কলকাতায়। ভাগীরথীর পূর্বতীরে নবযুগের সূর্যোদয় হয়। এই সময়, ১৮২০ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার, ভাগীরথীর পশ্চিমতীরে, বাংলাদেশের অখ্যাত বীরসিংহ গ্রামে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ পরিবারে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর জন্মগ্রহণ করেন।

২ | পূর্বপুরুষ

পলাশীর যুদ্ধের সময় বিদ্যাসাগরের প্রপিতামহ ভুবনেশ্বর বিদ্যালঙ্কার বনমালিপুর গ্রামে বাস করছিলেন। জাহানাবাদের ঈশানকোণে, প্রায় তিন ক্রোশ দূরে, বনমালিপুর গ্রাম। আরামবাগের অনতিদূরে এই গ্রাম এখনও আছে। এই বনমালিপুর সম্বন্ধে বিদ্যাসাগর বলেছেন—'উহাই আমার পিতৃপক্ষীয় পূর্ব-পুরুষদিগের বহুকালের বাসস্থান'।[১]

বীরসিংহ গ্রামের সঙ্গে তখনও কোন সূত্রে বিদ্যাসাগর-পরিবারের কোন সম্পর্ক স্থাপিত হয়নি। উমাপতি তর্কসিদ্ধান্ত নামে একজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত বীরসিংহে বাস করতেন। বনমালিপুরের পণ্ডিত বিদ্যালঙ্কার এবং বীরসিংহের পণ্ডিত তর্কসিদ্ধান্ত সমসাময়িক। বিদ্যালঙ্কারের পাঁচ পুত্র—জ্যেষ্ঠ নৃসিংহরাম, মধ্যম গঙ্গাধর, তৃতীয় রামজয়, চতুর্থ পঞ্চানন, পঞ্চম রামচরণ। বিদ্যালঙ্কারের তৃতীয় পুত্র রামজয়ের সঙ্গে তর্কসিদ্ধান্তের তৃতীয়া কন্যা দুর্গা দেবীর যখন বিবাহ হয়, তখন বনমালিপুরের সঙ্গে বীরসিংহের সম্পর্ক স্থাপিত হয়। রামজয় তর্কভূষণ ঈশ্বরচন্দ্রের পিতামহ, দুর্গা দেবী পিতামহী। ঈশ্বরচন্দ্রের পিতা ঠাকুরদাসের মাতুলালয় বীরসিংহ গ্রাম।

ভুবনেশ্বর বিদ্যালঙ্কার ও উমাপতি তর্কসিদ্ধান্তের সমসাময়িক আর একজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত পাতুলগ্রামে বাস করতেন। খানাকুল-কৃষ্ণনগরের কাছে

পাতুলগ্রাম। পাতুলনিবাসী এই পণ্ডিতের নাম পঞ্চানন বিদ্যাবাগীশ। তাঁর চার পুত্র ও দুই কন্যা। জ্যেষ্ঠ পুত্র রাধামোহন বিদ্যাভূষণ, মধ্যম রামধন ন্যায়রত্ন, তৃতীয় গুরুপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, চতুর্থ বিশ্বেশ্বর মুখোপাধ্যায়। জ্যেষ্ঠা কন্যা গঙ্গা দেবী, কনিষ্ঠা তারা দেবী। জ্যেষ্ঠা কন্যা গঙ্গা দেবী বিবাহযোগ্যা হলে বিদ্যাবাগীশ মহাশয় সুপাত্রের সন্ধান পেয়ে গোঘাটে উপস্থিত হলেন। আরামবাগের প্রায় তিন ক্রোশ পশ্চিমে গোঘাট, গড় মান্দারণের কাছে। গোঘাটের সুপাত্রটির নাম রামকান্ত তর্কবাগীশ (চট্টোপাধ্যায়)। মুখটি বিদ্যাবাগীশ মহাশয় বিচার করে দেখলেন, পাত্র কুলীন ব্রাহ্মণ, গ্রামের চতুষ্পাঠীতে অধ্যাপনাও করে। সুতরাং কন্যা গঙ্গা দেবীর সঙ্গে রামকান্তের বিবাহ দেওয়া তিনি স্থির করলেন। এই গঙ্গা দেবী হলেন ঈশ্বরচন্দ্রের মাতামহী এবং রামকান্ত তর্কবাগীশ মাতামহ। গঙ্গা দেবীর গর্ভে কালক্রমে দুই কন্যার জন্ম হয়। জ্যেষ্ঠা লক্ষ্মী দেবী, কনিষ্ঠা ভগবতী দেবী। কনিষ্ঠা ভগবতী দেবী বিদ্যাসাগরের জননী।

বনমালিপুর বীরসিংহ পাতুল ও গোঘাট, এই চারটি গ্রামই বিদ্যাসাগর-পরিবারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। তার সঙ্গে ক্ষীরপাই গ্রামের কথাও উল্লেখ করতে হয়, কারণ ক্ষীরপাই বিদ্যাসাগরের শ্বশুরালয়। ক্ষীরপাই থেকে বীরসিংহ তিন-চার মাইল দূর, একঘণ্টায় হেঁটে যাওয়া যায়। বনমালিপুর বিদ্যাসাগরের পূর্বপুরুষদের বাসস্থান, বীরসিংহ বিদ্যাসাগরের পিতার মাতুলালয়, পাতুল বিদ্যাসাগর-জননীর মাতুলালয়, গোঘাট বিদ্যাসাগরের নিজের মাতুলালয়। পরে বিদ্যাসাগর-পরিবার বনমালিপুর ছেড়ে বীরসিংহে বসতি স্থাপন করেন। বনমালিপুর বীরসিংহ পাতুল গোঘাট, প্রত্যেকটি গ্রামে দেখা যায়, বিদ্যাসাগরের প্রপিতামহ ও পিতামহের কালে, বিখ্যাত পণ্ডিতদের বসবাস ছিল। এই সব বিদ্যাসমাজের ঐতিহ্যই কি উত্তরাধিকারসূত্রে ঈশ্বরচন্দ্র পেয়েছিলেন? সেই ঐতিহ্যের বৈশিষ্ট্য কি? তার ইতিহাসই বা কি?

বিদ্যাসাগরের প্রপিতামহ বনমালিপুরের ভুবনেশ্বর বিদ্যালঙ্কার, বিদ্যাসাগরের পিতার মাতামহ বীরসিংহের উমাপতি তর্কসিদ্ধান্ত, বিদ্যাসাগর-জননীর মাতামহ পাতুলের পঞ্চানন বিদ্যাবাগীশ, বিদ্যাসাগরের নিজের মাতামহ গোঘাটের রামকান্ত তর্কবাগীশ, সকলেই বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন। ভুবনেশ্বর বিদ্যালঙ্কার

সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। স্বরচিত জীবনচরিতে বিদ্যাসাগরও তাঁর সম্বন্ধে উল্লেখযোগ্য কিছু লিখে যাননি। মনে হয়, এই অঞ্চলের অন্যান্য গ্রামের আরও অনেক পণ্ডিতের মতন তিনিও চতুষ্পাঠী স্থাপন করে বনমালিপুরে অধ্যাপনা করতেন। 'অদ্বিতীয় বৈয়াকরণ' বলে বীরসিংহের উমাপতি তর্কসিদ্ধান্তের বিশেষ খ্যাতি ছিল। তাঁর পাণ্ডিত্য সম্বন্ধে কিংবদন্তী আছে, মেদিনীপুরের স্বনামধন্য ধনী চন্দ্রশেখর ঘোষ যখন মহাসমারোহে মাতৃশ্রাদ্ধ করেছিলেন তখন নবদ্বীপের বিখ্যাত নৈয়ায়িক শঙ্কর তর্কবাগীশ শ্রাদ্ধসভায় আমন্ত্রিত হয়ে এসেছিলেন। তাঁর কাছে ব্যাকরণবিদ্যার পরিচয় দিয়ে তর্কসিদ্ধান্ত মহাশয় তাঁকে খুশি করেছিলেন। শঙ্কর তর্কবাগীশ সন্তুষ্ট হয়ে তর্কসিদ্ধান্তকে আলিঙ্গন করে বাহবা দিয়েছিলেন। নৈয়ায়িক শঙ্করের কাছে বাহবা পাবার পর তর্কসিদ্ধান্তের প্রতিপত্তি গ্রাম্যসমাজে যথেষ্ট বেড়ে যায়। বিদ্যাসাগর-জননী ভগবতী দেবীর মাতামহ পাতুলনিবাসী পঞ্চানন বিদ্যাবাগীশও বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন। তাঁর নিজের বাড়ীতেই চতুষ্পাঠী ছিল এবং ছাত্ররা সেই চতুষ্পাঠীতে থেকে শাস্ত্র অধ্যয়ন করত। বিদ্যাবাগীশ স্মৃতিশাস্ত্রের পণ্ডিত ছিলেন এবং স্মৃতিরই অধ্যাপনা করতেন। তাঁর পুত্রদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ রাধামোহন বিদ্যাভূষণ এবং মধ্যম রামধন ন্যায়রত্নও অধ্যাপনা করতেন। বিদ্যাসাগরের নিজের মাতামহ গোঘাটনিবাসী রামকান্ত তর্কবাগীশ বাল্যকাল থেকে অবাধে অধ্যয়ন করে, একুশ-বাইশ বছরের মধ্যে ব্যাকরণে ও স্মৃতিশাস্ত্রে 'বিলক্ষণ ব্যুৎপন্ন' হন এবং তর্কবাগীশ উপাধি পান। গোঘাটে নিজগৃহের চতুষ্পাঠীতে অনেক ছাত্রকে তিনি অন্নদান করতেন এবং ব্যাকরণে ও স্মৃতিশাস্ত্রে শিক্ষাদানও করতেন। তখনকার টোল-চতুষ্পাঠীতে এই অন্নদান ও শিক্ষাদানের রীতিই প্রচলিত ছিল। রামকান্তের এই বিদ্যানুরাগের পরিচয় পেয়েই পাতুলের বিদ্যাবাগীশ মহাশয় তাঁর সঙ্গে জ্যেষ্ঠা কন্যা গঙ্গা দেবীর বিবাহ দেওয়া স্থির করেছিলেন।

হুগলি জেলার আরামবাগ ও মেদিনীপুরের ঘাটাল অঞ্চল প্রধানত খানাকুল-কৃষ্ণনগরের বিদ্যাসমাজের অধীন ছিল। পূর্বাঞ্চলের নবদ্বীপ-সমাজের মতন

দক্ষিণ-রাঢ়ের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে খানাকুল বিদ্যাসমাজের প্রতিপত্তি ছিল বেশি। খানাকুল ও ভাঙ্গামোড়ার বিদ্যাসমাজের তখন খ্যাতি ছিল যথেষ্ট। খানাকুল-সমাজের মতামতই আরামবাগ ও ঘাটাল অঞ্চলে গ্রাহ্য হত বেশি এবং তার একটি স্বতন্ত্র ধারাও ছিল। বিদ্যাসাগরের পিতৃকুল ও মাতৃকুল এই খানাকুল বিদ্যাসমাজের পরিবেশের মধ্যে প্রতিপালিত হয়েছিলেন। বিদ্যাসাগর-জননীর মাতুলালয় পাতুল এবং বিদ্যাসাগরের মাতুলালয় গোঘাট প্রত্যক্ষভাবে খানাকুল-সমাজের অধীন ছিল। মেদিনীপুরের ঘাটাল অঞ্চলেও খানাকুল-সমাজের প্রতিপত্তি ছিল খুব বেশি। খানাকুল-সমাজের কথা তাই বিদ্যাসাগর-প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন। কারণ, বিদ্যাসাগর-পরিবারে বিদ্যানুশীলনের ধারা খানাকুল-সমাজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। পিতৃকুল ও মাতৃকুল, দুই দিক থেকেই এই ধারা এসে বিদ্যাসাগর-প্রতিভায় মিলিত হয়েছে। এই পুরুষানুক্রমিক ধারার মধ্যে বিদ্যাসাগর-প্রতিভা যে কতকটা পরিপুষ্ট হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই।

খানাকুল-সমাজ প্রসঙ্গে প্রথমেই বিখ্যাত পণ্ডিত কণাদ তর্কবাগীশের নাম করতে হয়। শোনা যায়, তিনি বাংলাদেশের বিখ্যাত মহাপণ্ডিত রঘুনাথ শিরোমণির সতীর্থ ছিলেন এবং কিছুদিন নবদ্বীপে বাসুদেব সার্বভৌমের কাছে পাঠারম্ভ করে, চূড়ামণির কাছে পাঠশেষ করেছিলেন। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ থেকে ষোড়শ শতাব্দীর গোড়া পর্যন্ত কণাদের কাল ধরা যায়। শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব-কাল। কণাদের তিন পুত্র, রুদ্র বাচস্পতি, রত্নেশ্বর ন্যায়বাগীশ ও গোপী সার্বভৌম। এই রত্নেশ্বর ন্যায়বাগীশের ধারাই খানাকুল-কৃষ্ণনগরনিবাসী ও শাস্ত্রব্যবসায়ী। এই বংশের বিভিন্ন ধারায় বহু বিখ্যাত পণ্ডিত জন্মগ্রহণ করে খানাকুল বিদ্যাসমাজের মুখ উজ্জ্বল করেছেন। কণাদ ও তাঁর পুত্র রত্নেশ্বরের ধারা ছাড়া আরও একজন বিখ্যাত পণ্ডিতের নামের সঙ্গে খানাকুল-সমাজের প্রতিষ্ঠার ইতিহাস জড়িত। তিনি হলেন বিখ্যাত স্মার্ত পণ্ডিত ও গ্রন্থকার নারায়ণ ঠাকুর [বন্দ্যোপাধ্যায়]। কণাদের সঙ্গে নারায়ণ ঠাকুরের কাল-ব্যবধান প্রায় ১৫০ বছরের।[২] নারায়ণ ঠাকুরের নিজস্ব স্বাধীন মতামত ও শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যার জন্য খানাকুল-সমাজের খ্যাতি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। এ-সম্বন্ধে অনেক কাহিনী প্রচলিত আছে। তার মধ্যে একটি কাহিনীর উল্লেখ করছি এখানে।

শাস্ত্রালোচনার জন্য সেকালের পণ্ডিতেরা মধ্যে মধ্যে কাশীধামে যেতেন। একবার নারায়ণ ঠাকুর যখন কাশীতে ছিলেন তখন একটি ঘটনা ঘটে। একদিন মণিকর্ণিকার ঘাটে বসে ঠাকুর সন্ধ্যাবন্দনাদি করছেন। এমন সময় কয়েকজন প্রৌঢ়া রমণী জল নিতে এসে বলাবলি করছিল নিজেদের মধ্যে : 'কেমন পোড়া শাস্ত্র দেখেছ ? কেমন হতভাগা পণ্ডিত দেখেছ ? আর রাজাই বা কেমন দেখেছ গো ? বারো বছর পরে লোকটা ফিরে এল ঘরে, ঘরের লোকের কত আনন্দ করার কথা, তা না, পণ্ডিতে বলে কি না, ঘরে থাকতে পাবে না !' বোঝা যায়, কোন সংসারী লোক স্ত্রীপুত্র ছেড়ে গৃহত্যাগী হয়েছিল, দ্বাদশ বছর পরে ফিরে এসেছিল ঘরে। শাস্ত্রের বিধান অনুযায়ী সে মৃত, সুতরাং ঘরে তার স্থান হবে না বলে পণ্ডিতেরা রায় দিয়েছিলেন। প্রৌঢ়াদের মধ্যে তাই নিয়ে ঘাটের ধারে, যেমন সব বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়, তেমনি আলোচনা হচ্ছিল। 'বারো বছর পরে লোকটা ফিরে এল ঘরে, বলে কি না ঘরে থাকতে পাবে না !' সন্ধ্যাহ্নিকরত নারায়ণ ঠাকুরের কানে কথাগুলি পৌঁছতেই তিনি বিচলিত হয়ে উঠলেন।

নারায়ণ ঠাকুর বললেন : "হ্যাঁ গো হ্যাঁ, সে বাড়ীতে থাকতে পারে।"

পাশাপাশি ঘাটের পর ঘাট। একঘাট থেকে অন্যঘাটে ঠাকুরের কথা রটে গেল। ঘাট থেকে ঘরে ফেরার পথে কাশীর অলিগলিতে রটল। কে নারায়ণ ঠাকুর ? কেউ জানে না, চেনে না। শুধু এইটুকু জানে, বাংলাদেশের কোন বাঙালী পণ্ডিত। ধীরে ধীরে কাশীরাজের কানে গেল কথাটা। কে এই বাঙালী পণ্ডিত ? এত বড় স্পর্ধা তাঁর ? কাশীর পণ্ডিতদের বিধান ও কাশীরাজের আদেশ কি তা জেনেও তিনি বলেন : 'হ্যাঁ, সে বাড়ীতে থাকতে পারে।' ডাক পড়ল পণ্ডিতের। রাজার হুকুমে দরবারে হাজির হলেন নারায়ণ ঠাকুর। বললেন · 'কি আদেশ, বলুন ?'

রাজা বললেন : "আপনিই কি বলেছিলেন, দ্বাদশ বৎসর অনুদ্দিষ্ট ব্যক্তিকে গৃহে গ্রহণ করা যায় ?"

"হ্যাঁ, আমিই বলেছিলাম।"

"আপনার নিবাস কোথায় ?"

"কৃষ্ণনগরে মদীয় বাসোঽধুনা।"

"কোন্ বিধান অনুসারে আপনি এই ব্যবস্থা দিলেন?"

ঠাকুর বললেন: "বিধান? শ্রীকৃষ্ণ তিন দিন অনুপস্থিত থাকলে নিজেকে মৃতজ্ঞান করতে বলেছিলেন। কিন্তু তিনদিন পরে এসেও তিনি যখন জীবিত বলে গণ্য হন এবং গৃহে গৃহীত হন, তখন দ্বাদশ বৎসর নিরুদ্দিষ্টের ক্ষেত্রে তা হবে না কেন? এই আমার বিধান।"

রাজসভা নিস্তব্ধ। রাজা স্তম্ভিত। সভাপণ্ডিতেরা বিক্ষুব্ধ ও বিভ্রান্ত। তুমুল তর্ক-বিতর্ক হল ঠাকুরের বিধান নিয়ে। অবশেষে নারায়ণ ঠাকুরের মতই গ্রাহ্য হল। কাহিনীটি সত্য কি মিথ্যা তা জানবার উপায় নেই, দরকারও নেই। যা 'রটে', অনেক সময় দেখা যায়, তার কিছুটা 'বটে'। নারায়ণ ঠাকুরের ক্ষেত্রে রটনার সঙ্গে ঘটনার মিল থাকা মোটেই আশ্চর্য নয়। বিখ্যাত স্মার্ত পণ্ডিত ছিলেন তিনি। 'ধাতুরত্নাকর' ও 'স্মৃতিসার' গ্রন্থও তিনি রচনা করেছিলেন। অনেক প্রচলিত তথাকথিত শাস্ত্রমত খণ্ডন করে তিনি নিজের মতামত ও বিধান প্রবর্তন করেছিলেন। তাঁর জন্যই খানাকুল-কৃষ্ণনগর-সমাজের প্রতিষ্ঠা পরবর্তীকালে বেড়েছিল।[৩] বিদ্যাসাগরের পিতৃকুলের ও মাতৃকুলের পণ্ডিতেরা প্রধানত এই খানাকুল-সমাজের ধারাতেই শিক্ষা পান। এই ধারাকে একটা স্বাধীন বিদ্রোহী ধারা বলা যায়। শাস্ত্রের সাহায্যে অনেক প্রচলিত শাস্ত্রমত বিদ্যাসাগরও খণ্ডন করেছিলেন। পিতৃকুল ও মাতৃকুল, দুই কুলের বিদ্যাসমাজের আওতা বা ধারা থেকে একেবারে ছিন্নমূল হয়ে তিনি কিছু করেননি। তাঁর পূর্বপুরুষদের শাস্ত্রচর্চার পরিবেশের মধ্যেই তাঁর প্রতিভার স্বাতন্ত্র্যের ধারার উৎস সন্ধান করা যায়।

প্রতিভার স্বাতন্ত্র্য যেমন, চরিত্রের বলিষ্ঠতা ও মহত্ত্বও তেমনি বিদ্যাসাগর তাঁর পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে কিছুটা উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছিলেন বললে ভুল হয় না। 'ঈশ্বরচন্দ্রের পূর্বপুরুষের মধ্যে মহত্ত্বের উপকরণ প্রচুর পরিমাণে সঞ্চিত ছিল।' এই কথা বলে রবীন্দ্রনাথ বিদ্যাসাগরের পিতামহ রামজয় তর্কভূষণ প্রসঙ্গে উক্তি করেছেন: 'লোকটি অনন্যসাধারণ ছিলেন, তাহাতে সন্দেহমাত্র নেই।'[৪] রামজয় সত্যই অনন্যসাধারণ ছিলেন। যেমন ছিলেন

পিতামহ রামজয়, তেমনি ছিলেন মাতামহ রামকান্ত। উভয়ের সম্বন্ধেই অনেক কাহিনী প্রচলিত আছে। বিদ্যাসাগর নিজে এবং তাঁর সহোদর শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন এরকম কয়েকটি কাহিনী লিপিবদ্ধ করে গেছেন।[৫] চরিত্রবিশ্লেষণে এই কাহিনীগুলির যথার্থ মূল্য দিতে রবীন্দ্রনাথও কুণ্ঠিত হননি।

ছেলেবেলা থেকেই রামজয় বেশ একরোখা লোক ছিলেন। যেমন তাঁর শক্তি ছিল, তেমনি ছিল সাহস। পথচলার সময় সর্বদা তিনি একটি লৌহদণ্ড নিয়ে চলতেন। তখন এ-অঞ্চলে ডাকাতের উপদ্রব ছিল খুব বেশি। আরামবাগ মান্দারণ অঞ্চলে বিখ্যাত ডাকাতদের গল্প আজও শোনা যায়।* এখনও ডাকাতি ও খুনখারাবি হয় যথেষ্ট। আর্বী-ফার্সী অভিধানে 'মদারণ' কথার অর্থ নাকি 'জঙ্গল'। আরামবাগের অনেক স্থান, অনেক মাঠঘাট, আজও ডাকাতের আড্ডা বলে ঐতিহাসিক প্রসিদ্ধি অর্জন করে রয়েছে। ভিকদাসের মাঠ, তেলভেলের মাঠ, ভাতুরের মাঠ, কলু-পুষ্করিণী, সুলতানদীঘি, ময়রাদীঘি, আমোদর খাল, আগুদের খাল, তারাযোলির খাল, পচার খাল, মায়াপুরের সরাই ইত্যাদি ডাকাতদের ঐতিহাসিক আড্ডার স্থান। মাঠে-ঘাটে মৃন্ময়ী কালীমূর্তি স্থাপন করে, মদ্য-মাংসযোগে পূজা করে তারা ডাকাতি করতে বেরুত। শত্রুকে কালীর সামনে নরবলি দিতেও দ্বিধা করত না।[৬] দু'চারজন করে দল বেঁধে লোকে পথ চলাচল করত। রামজয় প্রায় একলাই পথ চলতেন। বড় বড় মাঠ পেরিয়ে সন্ধ্যার অন্ধকারে ঘরে ফিরতেন। সঙ্গে কেউ থাকত না, একমাত্র তাঁর নিত্যসহচর লৌহদণ্ডটি ছাড়া। ডাকাতের হাতে দু'চারবার যে তিনি পড়েননি, তা নয়। কিন্তু সহচর লৌহদণ্ডটির যথেষ্ট পরিমাণে সদ্ব্যবহার করে সর্বদাই রেহাই পেয়েছেন। আক্কেলসেলামি পেয়ে পরে ডাকাতরাও আর তাঁর কাছে ঘেঁষত না। দূর থেকে লৌহদণ্ডটি দেখেই তারা বুঝত, তর্কভূষণ যাচ্ছেন। ডাকাতরা জানত না যে এই দুর্জয় রামজয় তর্কভূষণই বাংলার অদ্বিতীয় অজেয় পুরুষ ঈশ্বরচন্দ্রের ভাবী পিতামহ। রামজয়ও তখন জানতেন না।

শুধু ডাকাতের ভয় নয়, এ-অঞ্চলে বাঘ-ভাল্লুকের ভয়ও ছিল যথেষ্ট।

---

* এই অঞ্চলে ভ্রমণের সময় এরকম ডাকাতির চাঞ্চল্যকর কাহিনী লোকমুখে আমি অনেক শুনেছি।—বি. ঘো.

আরামবাগ থেকে বিষ্ণুপুর, আরামবাগ থেকে মেদিনীপুর তখন লোকে পায়ে হেঁটেই যাতায়াত করত। এখনও স্থানীয় লোকরা অনেকে তাই করেন। পথঘাটের অবস্থা এখনও প্রায় তাই রয়েছে, বিশেষ কিছু বদলায়নি। হালে বদলাচ্ছে, আর দু'পাঁচ বছরের মধ্যে অনেক বদলে যাবে। কিন্তু এখনও আরামবাগ বা ঘাটাল অঞ্চলে হাঁটাপথ ছাড়া আর অন্য কোন পথ নেই। পাল্কি আছে, পঙ্গু ও ধনীদের জন্য, সুস্থ ও সাধারণের জন্য নয়। গরুর গাড়ীরও পথ নেই। পাল্কি চড়ে পুরুষ মানুষ গেলে (এমন কি গরুর গাড়ীতেও) দেখেছি, গ্রামের লোক ভিড় করে দেখতে আসে। জিজ্ঞাসা করে জেনেছি, তারা মনে করে, শহরের হাসপাতালে কোন রুগী যাচ্ছে। মনে মনে ভেবেছি, বিদ্যাসাগরের দেশই বটে! এই দেশের সন্তান বিদ্যাসাগরের পক্ষেই কথায় কথায় হেঁটে কলকাতা থেকে বীরসিংহ গ্রামে যাওয়া সম্ভব! বিদ্যাসাগরের পিতামহ রামজয়ও এইরকম হাঁটতেন। একবার হেঁটে তিনি বনমালিপুর থেকে মেদিনীপুর যাচ্ছিলেন। তখন তাঁর বয়স বছর একুশ হবে। শালবন ও জঙ্গলের ভিতর দিয়ে হেঁটে যেতে হত। তার মধ্যে বাঘ-ভাল্লুকও থাকত যথেষ্ট। চলার পথে এক জায়গায় খাল পার হয়ে তীরে উত্তীর্ণ হয়েছেন, এমন সময় একটি ভাল্লুক তাঁকে আক্রমণ করল। ঘন ঘন নখরাঘাতে ভাল্লুক তাঁর সর্বশরীর ক্ষতবিক্ষত করতে লাগল, আর তিনি তাঁর লৌহদণ্ডটি দিয়ে তাকে বেদম পিটতে লাগলেন। দুর্ধর্ষ বন্য ভাল্লুক যখন নিস্তেজ হয়ে ঝিমিয়ে পড়ল, তখন প্রচণ্ড পদাঘাতে তিনি তাকে ধরাশায়ী করলেন। ভাল্লুকও জানত না, তার প্রতিদ্বন্দ্বী কে? রামজয়ও তখন জানতেন না যে, ভবিষ্যতে একদিন তাঁরই পৌত্র ঈশ্বরচন্দ্র, সমাজের অনেক বাঘ-ভাল্লুকের সঙ্গে লড়াই করে ক্ষতবিক্ষত হলেও, কখনও পরাজয় স্বীকার করবে না।

এ কেবল রামজয়ের দৈহিক শক্তির পরিচয় নয়, মানসিক শক্তিরও পরিচয়। বলিষ্ঠ মন না থাকলে, দুর্ধর্ষ জোয়ানও পঙ্গু ও হীনবীর্য হয়ে যায়। রামজয় নির্ভীকচিত্ত তেজস্বী পুরুষ ছিলেন। পথে-ঘাটে, বনে-জঙ্গলে কেবল যে তিনি ডাকাত আর বাঘ-ভাল্লুকের সঙ্গে লড়াই করেছিলেন, তা নয়। পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের নীচতা ও স্বার্থপরতার বিরুদ্ধে লড়াই করেও তিনি কম ক্ষতবিক্ষত হননি। বাঘ-ভাল্লুক ও ডাকাতদের জন্য মনের বলের সঙ্গে দেহের

শক্তি ও নিত্যসহচর লৌহদণ্ডটি ছিল। সাংসারিক ও সামাজিক জীবনের সংগ্রামে সম্বল ছিল শুধু ভয়শূন্য চিত্ত। লৌহদণ্ডটি তখন কোন কাজেই লাগেনি। পিতা ভুবনেশ্বর বিদ্যালঙ্কারের মৃত্যুর পর পারিবারিক মনোমালিন্যের সূত্রপাত হল। জ্যেষ্ঠ ও মধ্যমপুত্র সংসারে কর্তৃত্ব করতে লাগলেন। তৃতীয় রামজয়ের কোন কর্তৃত্বই খাটত না। রামজয় তখন বিবাহিত এবং দুই পুত্র ও চার কন্যার পিতা। সামান্য বিষয় নিয়ে প্রায় ভাইয়ে-ভাইয়ে কথান্তর হত, একান্নবর্তী মধ্যবিত্ত পরিবারে যা সাধারণত হয়ে থাকে। কথান্তর থেকে ক্রমে 'বিলক্ষণ মনান্তর' ঘটে গেল। রামজয় কাউকে কিছু না বলে হঠাৎ একদিন দেশত্যাগী হলেন। অল্পদিনের মধ্যে দুর্গা দেবীকেও অতিষ্ঠ হয়ে পুত্রকন্যাসহ পিত্রালয় বীরসিংহ গ্রামে চলে যেতে হল। সাত আট বছর পরে তর্কভূষণ আবার ফিরে এসেছিলেন। সংসারী হয়ে, সংসারের দায়িত্ব এড়িয়ে, তিনি সন্ন্যাসীর জীবন যাপন করতে চাননি। আট বৎসরকাল তিনি দ্বারকা, বদরিকাশ্রম পর্যন্ত তীর্থ পর্যটন করেছিলেন। ফিরে প্রথমে তিনি বনমালিপুরে যান। সেখানে কাউকে দেখতে না পেয়ে, শ্বশুরালয় বীরসিংহে এসে সকলের সঙ্গে মিলিত হন। মিলনের কাহিনীটি চমৎকার।[৭] গেরুয়া বসন পরে সন্ন্যাসীর বেশে তিনি বীরসিংহ গ্রামের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন, আত্মপরিচয় দেননি। এমন সময় তাঁর কনিষ্ঠা কন্যা অন্নপূর্ণা দূর থেকে তাঁকে দেখে চিনতে পেরে 'বাবা' বলে চেঁচিয়ে কেঁদে ওঠে। রামজয় আত্মপরিচয় দিতে বাধ্য হন। পরিবারের সঙ্গে মিলিত হয়ে, কয়েকদিন বীরসিংহে থেকে, তিনি সপরিবারে বনমালিপুর যাবার জন্য প্রস্তুত হন। কিন্তু স্ত্রীর মুখে নিজের ভাইদের অসদ্ব্যবহারের বৃত্তান্ত শুনে, বনমালিপুর যাওয়ার সঙ্কল্প ত্যাগ করেন। শ্বশুরালয়ে শ্যালকদের সংস্পর্শে বসবাস করার তাঁর আদৌ ইচ্ছা ছিল না। অনিচ্ছা সত্ত্বেও বীরসিংহে বসবাসের সিদ্ধান্ত করলেন তিনি, কেবল সহোদরদের নীচতার জন্য। পৈতৃক সম্পত্তি ও ভিটের মোহ তিনি এইভাবে ত্যাগ করলেন। কয়েক বছর পরে এই বীরসিংহ গ্রামেই তাঁর জ্যেষ্ঠ পৌত্র ঈশ্বরচন্দ্রের জন্ম হল। বীরসিংহের ভূস্বামী বসবাসের জন্য বাস্তুজমি রামজয়কে নিষ্কর ব্রহ্মোত্তর দিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তিনি তা গ্রহণ করেননি। বাস্তু-জমি ব্রাহ্মণকে দান করেছি, এই অহঙ্কার যাতে

ভূস্বামী ভবিষ্যতে কোনদিন না করতে পারেন, তার জন্য রামজয় খাজনা ধার্য করে নেন।

রামজয়ের শ্যালক রামসুন্দর বিদ্যাভূষণ ছিলেন গ্রামের প্রধান ব্যক্তি। তর্কসিদ্ধান্তের পুত্র, সুতরাং প্রধান হওয়াই স্বাভাবিক। উদ্ধতস্বভাব রামসুন্দর চেয়েছিলেন, ভগিনীপতি রামজয় তাঁর অনুগত হয়ে বীরসিংহে থাকবেন। কিন্তু ভগিনীপতিটি যে কি প্রকৃতির ব্যক্তি তা তিনি বুঝতে পারেননি। নানাভাবে তিনি রামজয়কে জব্দ করবার চেষ্টা করেছেন। গ্রামের লোক দিয়ে তাঁকে শাসিয়েছেন এবং তাঁকে বাধ্য করবার চেষ্টা করেছেন। রামজয় মাথা হেঁট করেননি। গ্রাম্যসমাজের যাবতীয় নীচতা দীনতা ও পরশ্রীকাতরতার মূর্তিমান জীব এই শ্যালকটিকে ও তাঁর অনুচরদের দেখে, গ্রামের লোক সম্বন্ধে ঘৃণায় তাঁর মন ভরে গিয়েছিল। গ্রামের লোকের চক্রান্তকে উপেক্ষা করেই তিনি বীরসিংহ গ্রামে বীর সিংহের মতন বসবাস করতে লাগলেন। কথায় কথায় তিনি মুক্তকণ্ঠে বলতেন, 'এ গ্রামে একটাও মানুষ নেই, সবই গরু।' একদিন তিনি গ্রামের পাশে একটি মাঠের ভিতর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন, এমন সময় গ্রামের একজন লোক তাঁকে বলে : 'ওদিক দিয়ে যাবেন না পণ্ডিত মশাই, ময়লা আছে।' তর্কভূষণ মশাই সমানভাবে চলতে চলতেই জবাব দেন : 'এখানে কি মানুষ আছে যে মল বা ময়লা থাকবে? আমি তো গোবর ছাড়া কিছু দেখতে পাচ্ছি না।' এইভাবে গ্রাম্য নীচতা ও দলাদলিকে তিনি নির্মমভাবে বিদ্রূপ করতেন। অথচ তাঁর মতন অমায়িক ও নিরহঙ্কার ব্যক্তি তখন দুর্লভ ছিল। অন্যায় শঠতা বা কপটতার সঙ্গে রামজয় জীবনে কোনদিন আপস করেননি। স্বার্থের জন্য কখন আত্মসম্মান বিসর্জন দেননি। নিজের সহোদর ও স্ত্রীর সহোদরদের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছেদ করেছেন এক-কথায়। যিনি যত বড় বিদ্বান ধনবান বা ক্ষমতাবান হন না কেন, প্রকৃতিতে অভদ্র হলে, তিনি কদাচ তাঁদের ভদ্রলোক জ্ঞান করতেন না। স্পষ্ট কথা শতগুণ স্পষ্ট করে বলতেন। প্রয়োজন হলে রূঢ়ও হতেন। স্বরচিত জীবন-চরিতে ঈশ্বরচন্দ্র নিজে লিখেছেন :

> তিনি যাঁহাদিগকে আচরণে ভদ্র দেখিতেন, তাঁহাদিগকেই ভদ্রলোক বলিয়া গণ্য করিতেন; আর যাঁহাদিগকে আচরণে অভদ্র দেখিতেন,

বিদ্বান ধনবান ও ক্ষমতাপন্ন হইলেও, তাহাদিগকে ভদ্রলোক বলিয়া জ্ঞান করিতেন না।

এই দরিদ্র ব্রাহ্মণ তাঁর পৌত্রকে আর কোন সম্পত্তি দান করতে পারেননি। কেবল তাঁর অক্ষয় সম্পদ যে চরিত্রমাহাত্ম্য, তাই তিনি তাঁর জ্যেষ্ঠ পৌত্র ঈশ্বরচন্দ্রকে দান করে গিয়েছিলেন। এ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'বিদ্যাসাগরচরিতে' লিখেছেন :

এই হাস্যময় তেজোময় নির্ভীক ঋজুস্বভাব পুরুষের মতো আদর্শ বাংলাদেশে অত্যন্ত বিরল না হইলে বাঙালীর মধ্যে পৌরুষের অভাব হইত না। আমরা তাঁহার চরিত্রবর্ণনা বিস্তারিতরূপে উদ্‌ধৃত করিলাম, তাহার কারণ, এই দরিদ্র ব্রাহ্মণ তাঁহার পৌত্রকে আর কোন সম্পত্তি দান করিতে পারেন নাই; কেবল যে অক্ষয় সম্পদের উত্তরাধিকার বণ্টন একমাত্র ভগবানের হস্তে, সেই চরিত্রমাহাত্ম্য অখণ্ডভাবে তাঁহার জ্যেষ্ঠ-পৌত্রের অংশে রাখিয়া গিয়াছিলেন।

পিতামহ রামজয়ের চারিত্রিক মেরুদণ্ডটি ঈশ্বরচন্দ্র বংশানুক্রমে পেয়েছিলেন। পিতামহের নিত্যসহচর লৌহদণ্ডের মতন সেই মেরুদণ্ড। অমেরুদণ্ডী বাঙালী সমাজে, তাই দেখা যায়, এক শ্রেষ্ঠ ঋজু মেরুদণ্ডী জীবের আবির্ভাব ঘটেছিল ঈশ্বরচন্দ্রের মধ্যে।

পিতামহ রামজয় তর্কভূষণের পর, মাতামহ রামকান্ত তর্কবাগীশের কথা মনে হয়। গোঘাট অঞ্চলে রামকান্তের মতন পণ্ডিত খুব অল্পই ছিলেন। খানাকুল বিদ্যাসমাজের প্রতিপত্তির কথা আগে বলেছি। খানাকুল-সমাজের আর একটি বৈশিষ্ট্য হল, তান্ত্রিক উপাসনার ধারা। রামকান্ত এই ধারারই অনুগামী ছিলেন। ক্রমে তন্ত্রশাস্ত্রের অনুশীলনে তিনি গভীরভাবে মনোনিবেশ করেন। তার ফলে তাঁর অধ্যাপনার কাজে ব্যাঘাত ঘটতে থাকে। চতুষ্পাঠীর ছাত্রদের পড়াশুনার দিকে তিনি আর তেমনভাবে মন দিতে পারেন না। ছাত্ররা একে-একে চতুষ্পাঠী ছেড়ে চলে যেতে লাগল। রামকান্ত বিচলিত হলেন না। একাগ্রচিত্তে তিনি তন্ত্রের অনুশীলন করতে লাগলেন। অবশেষে

তান্ত্রিক সাধনায় আত্মনিয়োগ করলেন এবং কঠোর শবসাধনায় প্রবৃত্ত হলেন। শবের উপর বসে সাধনা করতে করতে একদিন রামকান্ত তুড়ি দিয়ে 'মঞ্জুর, মঞ্জুর' বলে গাত্রোত্থান করলেন। তার পর থেকে কেউ কিছু জিজ্ঞাসা করলে তিনি তুড়ি দিয়ে 'মঞ্জুর, মঞ্জুর' বলে চুপ করে থাকতেন। মধ্যে মধ্যে দেখা যেত, একা বসে বসে কেবল তুড়ি দিচ্ছেন, আর 'মঞ্জুর মঞ্জুর' করছেন। খবর পেয়ে পাতুলের বিদ্যাবাগীশ মশায় জামাই, কন্যা ও দৌহিত্রীদের নিজের গৃহে নিয়ে গেলেন। স্বতন্ত্র চণ্ডীমণ্ডপে জামাই রামকান্তের থাকার ব্যবস্থা হল। দৌহিত্রীরা মাতুলালয়ে মানুষ হতে লাগল। বিদ্যাসাগর-জননী ভগবতী দেবী তাই ছেলেবেলা থেকে পাতুলে মাতুলালয়ে মানুষ হয়েছেন।

মাতামহ রামকান্তের চরিত্র পিতামহ রামজয়ের মতন স্পষ্ট নয়। স্পষ্ট না হলেও, একেবারে ধোঁয়াটে নয়। সেকালের একজন বিচক্ষণ পণ্ডিত, যিনি তন্ত্রশাস্ত্র অনুশীলনে এবং বীরাচারী তান্ত্রিক সাধনায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন, তিনি সাধারণ ব্যক্তি নন। পণ্ডিত রামকান্তের সাধনা আর উন্মার্গ ব্যভিচারীর তথাকথিত তন্ত্রোপাসনা, এক বস্তু নয়। রামকান্তের শক্তিসাধনা শক্তির উৎস-সন্ধানে অভিযানের মতন। এই শক্তিসাধক রামকান্তের কনিষ্ঠা কন্যা ভগবতী দেবী, ঈশ্বরচন্দ্রের গর্ভধারিণী। নামেও ভগবতী দেবী, শক্তির প্রতিমূর্তি। কথাপ্রসঙ্গে রামমোহনের দীক্ষাগুরুর কথা মনে হয়। রামমোহন চোদ্দ বছর বয়সে নন্দকুমার বিদ্যালঙ্কারের সংস্পর্শে আসেন। প্রথমে তিনি অধ্যাপনা করতেন, পরে তান্ত্রিক সাধনায় সিদ্ধিলাভ করে হরিহরানন্দনাথ তীর্থস্বামী কুলাবধূত নামে পরিচিত হন। হরিহরানন্দ কুলাবধূতই রামমোহনের দীক্ষাগুরু। ঈশ্বরচন্দ্রের দীক্ষাগুরু তাঁর জননী ভগবতী দেবী, তান্ত্রিক সাধক-পণ্ডিত রামকান্তের কন্যা। সাক্ষাৎ শক্তির কাছে ঈশ্বরচন্দ্র শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত হয়েছিলেন। রামমোহনের দীক্ষাগুরু তান্ত্রিক সাধক-পণ্ডিত কুলাবধূত হরিহরানন্দ। দু'য়ের মধ্যে কোথায় যেন একটা মিল আছে, ঠিক বুঝিয়ে বলা যায় না।

উমাপতি তর্কসিদ্ধান্তের পুত্রকন্যাদের মধ্যে তৃতীয়া কন্যা দুর্গা দেবী ছিলেন রামজয়ের আদর্শ সহধর্মিণী। স্বামী গৃহত্যাগী হবার পর তিনি সংসারের কঠোর কর্তব্য পালনে কোন ত্রুটি করেননি কোনদিন, অথচ প্রাত্যহিক

জীবনের তুচ্ছতার কাছে আত্মসমর্পণ করে একদিনের জন্যও নিজের সুখ-সুবিধার কথা চিন্তা করেননি। মোটাকথায় যাকে সাংসারিক বুদ্ধি বলে, দুর্গা দেবীর তা ছিল না। সত্যই তর্কসিদ্ধান্তের তেজস্বী কন্যা ছিলেন তিনি, তাই বনমালিপুরে স্বামীর সহোদরদের কাছে যেমন মাথা হেঁট করে থাকেননি, তেমনি বীরসিংহে নিজের সহোদরদের আশ্রয়ে থেকেও অপমান সহ্য করেননি। রামজয় দেশত্যাগী হবার পর দুর্গা দেবীর পক্ষে যখন আত্মসম্মান বজায় রেখে শ্বশুরবাড়ীতে বসবাস করা অসম্ভব হয়ে উঠল, তখন তিনি পুত্রকন্যাদের নিয়ে বীরসিংহ গ্রামে পিত্রালয়ে চলে গেলেন। প্রথম কিছুদিন খুব আদরযত্নে ছিলেন, কিন্তু যখন তাঁর অসহায় অবস্থাটা ভাইদের পরিবারে প্রকট হয়ে উঠল, তখন ভাইবৌরা মধ্যে মধ্যে বাক্যবাণে তাঁকে জর্জরিত করতে লাগলেন। বৃদ্ধ পিতা তর্কসিদ্ধান্ত সব বুঝে-শুনেও চুপ করে থাকতেন, উপযুক্ত পুত্রদের পারিবারিক ব্যাপারে কোন মন্তব্য করতেন না। মধ্যবিত্ত সংসারে যা সাধারণত হয়ে থাকে, ঠিক তাই। দুর্গা দেবী অপমান সহ্য করে ভাইদের পরিবারে বেশিদিন থাকতে পারলেন না। পিতাকে বললেন: 'আমাকে একখানা আলাদা কুঁড়ে ঘর বেঁধে দিন, আমি সেখানে থেকে যা হোক করে ছেলেমেয়েদের মানুষ করব।' পণ্ডিত পিতার বুঝতে দেরি হল না। কন্যার পক্ষে যে আর বিবাহিত পুত্রদের পরিবারে একত্রে ও একান্নে বাস করা সম্ভব নয়, তা তিনি পরিষ্কার বুঝতে পারলেন। গ্রামের লোকদের বলে তিনি একটি পর্ণকুটীর তৈরি করে দিলেন বীরসিংহ গ্রামে। এই পর্ণকুটীরে, নিদারুণ দারিদ্র্যের মধ্যে, ঈশ্বরচন্দ্রের পিতা ঠাকুরদাস, খুড়া কালিদাস, এবং মঙ্গলা, কমলা, গোবিন্দমণি ও অন্নপূর্ণা নামে চার পিসিমা ছেলেবেলায় মানুষ হয়েছেন। তখন টাকু ও চরকায় সুতো কেটে, সেই সুতো বেচে, নিঃসহায় নিরুপায় স্ত্রীলোকেরা কায়ক্লেশে দিন কাটাতেন। সম্পূর্ণ নিরুপায় হয়ে দুর্গা দেবীও সেইভাবে সুতো কেটে, সুতো বেচে, বীরসিংহের কুঁড়ে ঘরটিতে নাবালক ছেলেমেয়েদের নিয়ে দিন কাটাতে লাগলেন। একটি পয়সা দিয়ে সাহায্য করতে পারে এমন কেউ ছিল না তখন। পিতা তর্কসিদ্ধান্ত বৃদ্ধ হয়েছেন। তিনিও অক্ষম। সামান্য বৃত্তি বা বিদায় যা তিনি পেতেন, তা নিশ্চয় গুণধর পুত্রদের সংসারে দিতে হত, তা না হলে বৃদ্ধবয়সে হয়ত তাঁরও অন্নসমস্যা ও

গৃহসঙ্কট দেখা দিত। তবু তার মধ্যে থেকেই সামান্য অর্থসাহায্য, যখন যা সম্ভব হত, তিনি কন্যাকে করতেন। তাতে কিছুই হত না। সুতো বিক্রী করেও ছয়টি ছেলেমেয়ের দু'বেলা অন্ন জোটানো সব সময় সম্ভব হত না। অনেকদিন অনাহারে কাটাতে হত। তবু দুর্গা দেবী নিজের ভাইদের কাছে হাত পাতেন নি, অথবা ভাইয়ের সংসারে অবাঞ্ছিত বোঝার মতন অপমান সহ্য করতে ফিরে যাননি। শ্বশুরবাড়ী বনমালিপুরেও অন্তত আর একবার তিনি ফিরে যেতে পারতেন। পুত্রকন্যার দুঃখকষ্ট সহ্য করতে না পেরে, কত জননীই তো দিনের পর দিন কত অপমান, কত লাঞ্ছনা-গঞ্জনা সহ্য করেন, কত ভাই ও ভাসুরের সংসারে মুখ বুজে থাকেন। দুর্গা দেবীও স্বচ্ছন্দে থাকতে পারতেন। কিন্তু নারী হয়েও, এবং মধ্যবিত্ত পরিবারের সেকালের পরনির্ভর অসহায় বধূ হয়েও, তিনি আত্মসম্মানের বিনিময়ে সামান্য স্বাচ্ছন্দ্য কিনতে চাননি। ঈশ্বরচন্দ্রের পিতামহী তিনি, রামজয় তর্কভূষণের স্ত্রী। ভগবতী দেবী এই দুর্গা দেবীর জ্যেষ্ঠা পুত্রবধূ।

সাধারণ স্বল্পবিত্ত একান্নবর্তী পরিবারে যত রকমের মালিন্য থাকা সম্ভব, ঈশ্বরচন্দ্রের পিতৃ-মাতৃকুলের অধিকাংশ পরিবারেই তা পর্যাপ্ত পরিমাণে ছিল। বনমালিপুরের ভুবনেশ্বর বিদ্যালঙ্কারের পরিবার, বীরসিংহের উমাপতি তর্কসিদ্ধান্তের পরিবার, কোথাও সুস্থ পরিবেশের কোন চিহ্নও ছিল না। বিস্ময়কর হল, পূর্বপুরুষদের এই সঙ্কীর্ণ পারিবারিক পরিবেশের মধ্যেও এমন দু'একজন মানুষের মতন মানুষ জন্মেছিলেন, যাঁদের প্রত্যক্ষ পুরুষানুক্রমিক ধারাতেই ঈশ্বরচন্দ্রের মতন বংশধরের জন্ম হয়েছিল। ভুবনেশ্বরের জ্যেষ্ঠ পুত্র নৃসিংহরাম বা মধ্যম গঙ্গাধরের ধারাতে ঈশ্বরচন্দ্রের জন্ম হয়নি। তৃতীয় পুত্র রামজয়ের ধারাতেই বিদ্যাসাগরের জন্ম হয়েছিল। মানবচরিত্রের রূপায়ণে পূর্বপুরুষদের যদি কোন প্রভাব থাকে, তাহলে জ্যেষ্ঠ পৌত্র ঈশ্বরচন্দ্রের চরিত্রে পিতামহ রামজয় সেই প্রভাব যে সবচেয়ে বেশি বিস্তার করেছিলেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

পরিবারের মধ্যে ভগবতী দেবীর পাতুলের মাতুল পরিবার ঈশ্বরচন্দ্রের জীবনে যেরকম প্রভাব বিস্তার করেছিল, সে-রকম আর কোন পরিবার করেনি। একমাত্র এই একটি পরিবারকে মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করেছেন ঈশ্বরচন্দ্র

নিজে। স্বরচিত জীবনচরিতে জননীর এই মাতুল পরিবার সম্বন্ধে তিনি লিখেছেন :

> অতিথির সেবা ও অভ্যাগতের পরিচর্যা, এই পরিবারে, যেরূপ যত্ন ও শ্রদ্ধা সহকারে সম্পাদিত হইত, অন্যত্র প্রায় সেরূপ দেখিতে পাওয়া যায় না। বস্তুতঃ, ঐ অঞ্চলের কোন পরিবার এ বিষয়ে এই পরিবারের ন্যায় প্রতিপত্তিলাভ করিতে পারেন নাই।

প্রত্যক্ষভাবে খানাকুল বিদ্যাসমাজের অন্তর্গত ছিল পাতুল। ভগবতী দেবীর মাতামহ পঞ্চানন বিদ্যাবাগীশের ধারায় অনেক সুপণ্ডিত জন্মেছেন, এবং শাস্ত্র অধ্যাপনা করে জীবন কাটিয়েছেন। খানাকুল-কৃষ্ণনগর ও তার পাশাপাশি গ্রামগুলির পরিবেশই ছিল অন্যরকম। বিদ্যাচর্চা ও অধ্যয়ন-অধ্যাপনার প্রভাবে গ্রাম্যসমাজের কূপমণ্ডূকতা ও সঙ্কীর্ণতা তেমন দানা বাঁধতে পারেনি এখানে। এরকম পণ্ডিতবহুল সমাজ দক্ষিণ-পশ্চিম রাঢ়ে আর কোথাও ছিল কি না সন্দেহ। রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা অনেক সময় কন্যাদেরও উচ্চশিক্ষা দিতে কুণ্ঠিত হতেন না। মনে হয়, নীতির দিক থেকে না হলেও, কুলীন ব্রাহ্মণকন্যারা অকাল-বৈধব্যের জন্য কোন কোন উদার পণ্ডিত পিতার কাছ থেকে উচ্চশিক্ষা পেতেন। রাঢ়ীয় সমাজের বিখ্যাত মহিলা পণ্ডিত হটী বিদ্যালঙ্কার (বর্ধমান জেলার সোঞাই গ্রামনিবাসী) এইভাবেই শিক্ষা পেয়েছিলেন এবং কাশীতে টোল খুলে অধ্যাপনা করে জীবনধারণ করতেন।[৮] খানাকুল-কৃষ্ণনগরের কাছাকাছি বেড়াবেড়ি গ্রামের দ্রবময়ী দেবীও বালিকা-বয়সে বিধবা হয়ে এইভাবে পিতা চণ্ডীচরণ তর্কালঙ্কারের টোলে শিক্ষালাভ করে বিখ্যাত পণ্ডিত বলে গণ্য হন এবং অধ্যাপনা করে জীবন কাটান।[৯] পাতুলের বিদ্যাবাগীশ পরিবারও উচ্চশিক্ষিত পরিবার। ভগবতী দেবীর মাতুলদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ রাধামোহন বিদ্যাভূষণ ও মধ্যম রামধন ন্যায়রত্ন পিতার মৃত্যুর পরেও শাস্ত্রানুশীলনে বিরত হননি। চার ভাই একান্নবর্তী পরিবারে একত্রে বসবাস করেও সুখে ও শান্তিতে ছিলেন। অগ্রজকে সকলে পিতৃতুল্য মনে করতেন এবং কোন দিন তাঁর ব্যবহারে কেউ অসন্তোষের কোন কারণ খুঁজে পাননি। গ্রাম্যসমাজে ভগবতী দেবীর এই মাতুল পরিবারের অসাধারণ প্রতিপত্তি ছিল।

তাঁদের পারিবারিক জীবনের আদর্শ গ্রাম্যসমাজেরও আদর্শ ছিল। কেবল বিদ্যা ও পাণ্ডিত্যের জন্য নয়, উদারতা, মহানুভবতা, দানশীলতা ও অতিথি-সেবাপরায়ণতার জন্যও বিদ্যাবাগীশ পরিবারের সুনাম ছিল যথেষ্ট। ভগবতী দেবীর বাল্যজীবন এবং তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র ঈশ্বরচন্দ্রের বাল্যজীবনের অনেক দিন, পাতুলের এই পরিবারের সুস্থ পরিবেশের মধ্যে কেটেছে। স্বরচিত জীবনচরিতে তিনি লিখেছেন :

> আমার যখন জ্ঞানোদয় হইয়াছে মাতৃদেবী পুত্রকন্যা লইয়া মাতুলালয়ে যাইতেন এবং এক যাত্রায় ক্রমান্বয়ে পাঁচছয় মাস বাস করিতেন; কিন্তু একদিনের জন্যও স্নেহ যত্ন ও সমাদরের ত্রুটি ঘটিত না।

সামান্য অসুখবিসুখ হলেই ভগবতী দেবীর মাতুল বীরসিংহ গ্রাম থেকে ঈশ্বরচন্দ্রকে পাতুলে নিয়ে যেতেন। পাতুল ছিল ঈশ্বরচন্দ্রের বাল্যজীবনের স্বাস্থ্যনিবাস। দৈহিক স্বাস্থ্যের নয় শুধু, মনে হয় মানসিক স্বাস্থ্যেরও। বীরসিংহ থেকে কলকাতা পায়ে হেঁটে যাতায়াতের পথেও তিনি একদিন করে পাতুলে অবস্থান করতেন। পাতুল ছিল ঈশ্বরচন্দ্রের চলার পথে সবচেয়ে মনোরম সরাইখানা। বীরসিংহ থেকে পাতুল ক্রোশ ছয়সাত দূর হবে। বালক ঈশ্বরচন্দ্রের কাছে কিছুই নয়। তিনি নিজেই লিখেছেন: 'এই ছয় ক্রোশ অবলীলাক্রমে চলিয়া আসিতাম।' জননীর মাতুলালয় পাতুলের প্রতি তাঁর আকর্ষণ ছিল আন্তরিক। সে আকর্ষণ উদার উন্মুক্ত পারিবারিক পরিবেশের আকর্ষণ। জননীর মাতুল পরিবারের এই স্মৃতি ঈশ্বরচন্দ্র কোনদিন ভুলতে পারেননি।

৩ | কলকাতা শহরে ঠাকুরদাস

মা ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্রের জীবনে শক্তির ও প্রেরণার গিরিনির্ঝরিণী। সকলের অগোচরে, সব কাজ ফেলে রেখে, কত দিন তিনি ছুটে গেছেন মা'র কাছে। যার কেউ নেই, তার মা আছেন। মানুষের আঘাতে অপমানে অকৃতজ্ঞতায় যখন তিনি অবসন্ন বোধ করতেন, তখন মা'র কাছে এসে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতেন, পথচলার নতুন প্রেরণা সঞ্চয় করতেন। পরিপার্শ্বের দীনতা ও শূন্যতাকে পরিপূর্ণ করে শ্যামল বনশ্রীর মতন বিরাজ করতেন মা। বীরাচারী তান্ত্রিক সাধক রামকান্ত তর্কবাগীশের কন্যা, বীরসিংহের ভগবতী দেবী। ঈশ্বরচন্দ্রের মা।

কতদিন কত অভাব, কত অভিযোগ নিয়ে এসে মা'র কাছে তিনি দাঁড়িয়েছেন। তাঁর অন্তরের অবরুদ্ধ অভিমানের বিক্ষোভ মা'য়ের অন্তর্দৃষ্টিতে ধরা পড়েছে। মা বলে ডাক দিয়ে তিনি বলেছেন: 'মা! তুই বল্ না মা কি করি?' মা বলতেন: 'ন্যায় ও সত্যের পথে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে যা ভাল মনে করবি, তাই করবি বাবা! তার চেয়ে বড় শাস্ত্র কিছু নেই।' এই হল মাতাপুত্রের কথোপকথনের নমুনা। ছেলেবেলা থেকে এইভাবে 'তুই' বলে মা'র সঙ্গে কথা বলতেন ঈশ্বরচন্দ্র। আচার্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য বলেছেন:[১]

ইংরাজিতে যাহাকে affectation বলে, বিদ্যাসাগরের সেটি আদৌ ছিল না ; যাহাকে যে ভাবে একবার দেখিয়াছেন, বাহ্যিক লোক দেখান বৃত্তির বশবর্তী হইয়া সেটা পরিবর্তন করিতে তাঁহার যেন ভাল লাগিত না। তিনি আপনার মা'কে ছেলেবেলা হইতে যে 'তুই' সম্বোধন করিতেন, মৃত্যুকাল পর্যন্ত তাহার পরিবর্তন করেন নাই। ইহা আমি তাঁহার নিজের মুখে শুনিয়াছি।

মা'র চেয়ে আপনার জন যে আর কেউ নেই, একথা তো সব মা, সব সন্তানই জানেন। তবু ঈশ্বরচন্দ্রের মা ছিলেন অনন্যা মা। কেবল সন্তানের মা নয়, সাধকেরও মা। সাধারণ সংসারের মা, দরিদ্র ব্রাহ্মণ সন্তানের মা। মা'য়ের সামনে দাঁড়ালে আর কোন অভাব তিনি বোধ করতেন না। দৈনন্দিন জীবনের সমস্ত আঘাতের বেদনা তিনি ভুলে যেতেন। মা'য়ের উৎসাহের ঝরণাধারায় অবগাহন করে, নতুন শক্তি প্রেরণা ও প্রতিজ্ঞা নিয়ে, তিনি ফিরে আসতেন কর্মক্ষেত্রে। গ্রাম্যপথের শেষ প্রান্তে খর্বাকৃতি পুত্র অদৃশ্য হয়ে যাওয়া পর্যন্ত, মা ভগবতী দেবী পিছন থেকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতেন।

মা ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্রের জীবনে 'ডাইনামো'। পিতা ঠাকুরদাস ছিলেন তাঁর 'টিচার' ও 'ট্রেনার'। দিগ্বিজয়ী বীর আলেকজাণ্ডারের পিতা ফিলিপ্‌স যেমন তাঁর পুত্রকে ছেলেবেলা থেকে ঘোড়ায় চড়তে, বদমেজাজী ঘোড়ার রাশ টানতে, খেলতে দৌড়তে সাঁতার কাটতে, যুদ্ধ করতে শিক্ষা দিয়েছিলেন, ঠাকুরদাসও তেমনি তাঁর পুত্রকে জীবনসংগ্রামের সমস্ত কলাকৌশল হাতে ধরে শিক্ষা দিয়েছিলেন। মধ্যে মধ্যে সামঞ্জস্যের বিরতি ছাড়া জীবন যে নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম ভিন্ন আর কিছু নয়, এ সত্য ঈশ্বরচন্দ্র তাঁর পিতার কাছ থেকেই শিখেছিলেন। দরিদ্র পিতা তাঁর দরিদ্র সন্তানকে কেবল হাঁটি-হাঁটি-পা-পা করে পর্ণকুটীরের প্রাঙ্গণে হাঁটতে শেখাননি। খানা ডোবা নদী সাঁকো ডিঙিয়ে, বিস্তীর্ণ প্রান্তর অরণ্য পার হয়ে, ক্রোশের পর ক্রোশ পথ কি করে অতিক্রম করে গন্তব্য স্থানে পৌঁছতে হয়, বাল্যকাল থেকে সে-শিক্ষা ঈশ্বরচন্দ্র তাঁর পিতার কাছ থেকেই পেয়েছিলেন। সম্পূর্ণ স্বাবলম্বী হয়ে, নিজের দু'খানা হাত ও দুটি পা সম্বল করে, মেরুদণ্ড না বেঁকিয়ে, জীবনের প্রতিটি ছোটবড়

Rammohun Roy

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

চ্যালেঞ্জের সঙ্গে কি ভাবে মুষ্টিযুদ্ধ করতে হয়, ঠাকুরদাস নিজে তা বিলক্ষণ জানতেন বলে পুত্রকে শিক্ষা দিতে তাঁর কোন অসুবিধা হয়নি। রামমোহন রায়, দ্বারকানাথ ঠাকুর, রাধাকান্ত দেব প্রমুখ সমাজের পূর্বরথীদের মতন, অথবা প্যারীচাঁদ মিত্র, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, মাইকেল মধুসূদন দত্ত প্রমুখ স্বনামধন্য সমসাময়িকদের মতন, ঈশ্বরচন্দ্র রাজার পুত্র বা ধনীর দুলাল ছিলেন না। উনবিংশ শতাব্দীর বাংলার সামাজিক আন্দোলনে পুরোগামী ছিলেন যাঁরা, তাঁরা প্রায় সকলেই সঙ্গতিপন্ন পরিবারের সন্তান ছিলেন। কেবল ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ছিলেন তার ব্যতিক্রম। তিনি দরিদ্র মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান। ব্যতিক্রম হলেও, তাঁর শ্রেণীগত আবির্ভাবের মধ্যে ইতিহাসের কোন অসঙ্গতি নেই। কারণ ধনিকের যুগেও মধ্যবিত্তের সুদিন আসছিল, ইয়োরোপের মতন বাংলাদেশেও।

প্যারীচাঁদ মিত্র ও রামগোপাল ঘোষ বয়সে ঈশ্বরচন্দ্রের চেয়ে প্রায় ছ'বছরের বড় ছিলেন। দু'জনেই কলকাতার বিত্তবান পরিবারের সন্তান। প্যারীচাঁদের পিতা রামনারায়ণ মিত্র কোম্পানীর কাগজ ও হুণ্ডীর ব্যবসা করে প্রচুর অর্থ উপার্জন করেন। প্যারীচাঁদ নিজেও সুদক্ষ ব্যবসায়ী ছিলেন। রামগোপাল ঘোষের পিতামহ জগমোহন কলকাতায় হ্যামিল্টন কোম্পানীতে কাজ করতেন এবং পিতা গোবিন্দচন্দ্র ঘোষ চীনাবাজারের বিখ্যাত ব্যবসায়ী ছিলেন। গোবিন্দচন্দ্র কোচবিহার রাজের এজেন্ট বা মোক্তারের কাজ করেও প্রচুর অর্থ সঞ্চয় করেন। কলকাতা-নিবাসী দেওয়ান রামপ্রসাদ সিংহের কন্যাকে বিবাহ করে তিনি ঠনঠনিয়া পল্লীর বাড়ীটি (৯৮।১ মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীটস্থ) যৌতুক পান। এই বাড়ীতেই রামগোপাল ঘোষ ১৮১৪ সালে জন্মগ্রহণ করেন।[২] দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ঈশ্বরচন্দ্রের চেয়ে বয়সে তিন বছরের বড় ছিলেন। কলকাতার অন্যতম ধনিক ও সম্ভ্রান্ত ঠাকুর-পরিবারের সন্তান তিনি, দ্বারকানাথ ঠাকুরের পুত্র। দ্বারকানাথ চব্বিশ পরগণার কলেক্টর ও নিমক এজেন্টের দেওয়ান ছিলেন। রাণীগঞ্জে তাঁর কয়লার খনি ছিল, রামনগরে চিনির কল ছিল, নীলকুঠিও ছিল। বিখ্যাত 'কার, ট্যাগোর অ্যাণ্ড কোম্পানী' ও 'ইউনিয়ন ব্যাঙ্কে'র প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন তিনি।[৩] রাজেন্দ্রলাল মিত্র শুঁড়ার (বেলেঘাটা) সম্ভ্রান্ত ধনিক মিত্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ঈশ্বরচন্দ্রের চেয়ে তিনি দু'বছরের ছোট ছিলেন।

ঈশ্বরচন্দ্রের অন্যতম বন্ধু, ইংরেজী 'ফার্স্ট বুক' রচয়িতা প্যারীচরণ সরকার কলকাতার চোরবাগানের সঙ্গতিপন্ন সরকার পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ঈশ্বরচন্দ্রের চেয়ে তিনি তিন বছরের ছোট ছিলেন বয়সে। প্যারীচরণের পিতা ভৈরবচন্দ্র সরকার কলকাতার বিখ্যাত পুস্তক ব্যবসায়ী থ্যাকার কোম্পানীতে কাজ করতেন এবং জাহাজের রসদ সরবরাহ করতেন।[৪] মাইকেল মধুসূদন বয়সে ঈশ্বরচন্দ্রের চেয়ে প্রায় চার বছরের ছোট ছিলেন। মধুসূদনের পিতা রাজনারায়ণ দত্ত তখনকার সদর দেওয়ানী আদালতের বিখ্যাত উকিল ছিলেন এবং ওকালতির অর্থে অল্পকালের মধ্যেই তিনি খিদিরপুরে দোতলা বাড়ী কিনে সেখানকার একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরূপে গণ্য হন। ইয়োরোপের রেনেসাঁসের ইতিহাসে দেখা যায়, নতুন বিত্তবানশ্রেণীর মধ্যেই নবযুগের প্রতিভাবানদের বিকাশ হয়েছিল। বিত্ত, বিদ্যা ও প্রতিভার বিচিত্র মিলন হয়েছিল নবজাগরণের যুগে।[৫] আমাদের বাংলাদেশের নবযুগের ইতিহাসেও তার পরিচয় পাওয়া যায়।

ঈশ্বরচন্দ্রের সমকালীন যাঁরা (পাঁচ-ছয় বছর পর্যন্ত ছোট বড়) কেবল তাঁদের কথাই বললাম। প্যারীচাঁদের পিতা রামনারায়ণ যখন কোম্পানীর কাগজ ও হুণ্ডীর ব্যবসা করছেন, রামগোপাল ঘোষের পিতা যখন চীনাবাজারে দোকানদারি ও কোচবিহার-রাজের মোক্তারি করছেন, দেবেন্দ্রনাথের পিতা দ্বারকানাথ ঠাকুর যখন ইংরেজ বণিকদের সমকক্ষ হয়ে বাণিজ্যক্ষেত্রে স্বাধীন প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়েছেন এবং স্বয়ং রামমোহন রায় তেজারতী কারবার করে কলকাতা শহরে ও গ্রামে প্রচুর ধনসম্পত্তি ক্রয় করছেন, তখন ঈশ্বরচন্দ্রের পিতা ঠাকুরদাস সেই কলকাতা শহরেই আত্মীয়-পরিচিতের দরজায় দরজায় ঘুরে বেড়াচ্ছেন, অন্নসংস্থানের জন্য, আশ্রয়ের জন্য। ঠিক একই সময়ে, অর্থাৎ ১৮০৪-৫ সালে। উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার কথা। সেকালের ইতিহাসকে সমগ্রভাবে দেখলে, কলকাতা শহরের পথে পথে ভ্রাম্যমাণ কিশোর বালক ঠাকুরদাসের এই দৃশ্যই নজরে পড়ে। চলচ্চিত্রের চেয়েও ইতিহাসের গতি তখন অনেক বেশি চমকপ্রদ মনে হয়।

ঠাকুরদাস জন্মেছিলেন বনমালিপুর গ্রামে। বনমালিপুরেই তিনি প্রায় দশ বছর বয়স পর্যন্ত ছিলেন এবং গুরুমশায়ের কাছে সংক্ষিপ্তসার ব্যাকরণ

পড়েছিলেন। বনমালিপুর ছেড়ে বীরসিংহে চলে আসার পর, ঠাকুরদাস ও কনিষ্ঠ কালিদাস, উভয় দৌহিত্রের শিক্ষার জন্য তর্কসিদ্ধান্ত মহাশয় বীরসিংহ-নিবাসী গ্রহাচার্য পণ্ডিত কেনারাম বাচস্পতিকে নিযুক্ত করেন। অল্পদিনের মধ্যে পণ্ডিতমশাই দুই ভাইকে বাংলা ভাষা, শুভঙ্করী ও জমিদারী সেরেস্তার কাগজপত্র লেখা শিক্ষা দিয়ে সংক্ষিপ্তসার ব্যাকরণ পড়াতে আরম্ভ করেন। এদিকে দুর্গা দেবীর পক্ষে টাকু ও চরকায় সুতো কেটে, দুই পুত্র চার কন্যাসহ নিজের অন্নসংস্থান করা ক্রমেই অসম্ভব হয়ে ওঠে। ঠাকুরদাস দেখলেন, বীরসিংহে বসে গুরুগৃহে ব্যাকরণ অধ্যয়ন করা আর চলে না। তখন কিশোর বালক তিনি, বয়স চোদ্দ-পনের বছর। পিতা তীর্থযাত্রী, কোন খোঁজখবর নেই তাঁর। মা'র কষ্ট সহ্য করতে না পেরে, ঠাকুরদাস একদিন মা'র কাছে বললেন: 'মা, আমাকে অনুমতি দাও, আমি কলকাতায় যাই।'

নতুন যুগের কলকাতা শহর তখন শিক্ষাকেন্দ্র ও জীবিকাকেন্দ্র হয়ে উঠছে। ভাগ্যের অন্বেষণে গ্রাম থেকে নতুন শহর অভিমুখে উদ্‌যোগীরা যাত্রা করছেন। তাই দেখা যায় কলকাতার কাছাকাছি গ্রাম থেকে, বিশেষ করে এদিকে নদীয়া, চব্বিশ পরগণা এবং ওদিকে ভাগীরথীর পশ্চিমতীরের হাওড়া-হুগলি প্রভৃতি অঞ্চল থেকে, নবযুগের প্রথম পর্বের ভাগ্যবান বিত্তবান ও প্রতিভাবানদের মধ্যে অধিকাংশই এসেছিলেন নতুন শহরে। তাঁদের নিয়েই তখনকার কলকাতার প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী অভিজাত সমাজ গঠিত হয়েছিল। নতুন কলকাতা শহরের আকর্ষণশক্তি তখন কাছাকাছি গ্রাম্যসমাজের উপর সব চেয়ে প্রবল ছিল বলা যায়। যে-সব গ্রাম্যসমাজ ভেঙে বর্ধিষ্ণু কলকাতা শহরের নতুন ধনিক ও মধ্যবিত্ত সমাজ গড়ে উঠেছে, অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ থেকে অন্তত ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত, তা কলকাতাকে কেন্দ্র করে পঞ্চাশ-ষাট মাইল ব্যাসার্ধের মধ্যবর্তী গ্রাম্যসমাজ। বাণিজ্যের ক্ষেত্রে, শিক্ষার ক্ষেত্রে, সামাজিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে বিগত শতাব্দীতে যাঁরা প্রতিষ্ঠা অর্জন ও পথনির্দেশ করেছিলেন, তাঁরা প্রায় সকলেই এই সীমাবদ্ধ অঞ্চলের লোক। কলকাতার ও বাংলার সামাজিক ইতিহাসে এটা একটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা এবং সামাজিক গতিবিজ্ঞানের ধারাসম্মত।

বীরসিংহ গ্রাম এই সীমাবদ্ধ অঞ্চলেরই অন্তর্ভুক্ত ছিল। নতুন শহরের

মাহাত্ম্যের কথা সেখানেও পৌঁছেছিল। ঠাকুরদাস যে সময় কলকাতা অভিমুখে যাত্রা করেছিলেন, সেই সময় থেকে ঘাটাল ও আরামবাগ অঞ্চলের ধীবর ও অন্যান্য ব্যবসায়ীরা কলকাতায় আসতে আরম্ভ করেন। এই অঞ্চলের ধীবর ও মৎস্যব্যবসায়ীরাই প্রধানত কলকাতার ধর্মতলার পাশে খালের ধারে (বর্তমান ক্রীক রো) এসে বসতি স্থাপন করেন। এই খালের সঙ্গে গঙ্গার তখন যোগাযোগ ছিল এবং নৌকা চলাচল করত খালের পথে। খালের নাম ছিল 'ডিঙ্গাভাঙা' খাল। মৎস্যব্যবসায়ী যাঁরা তাঁদের পক্ষে খালে নৌকা রেখে পাশে বসতি স্থাপন করার সুবিধা ছিল বলে, ক্রমে এইখানে কলকাতার বিখ্যাত 'জেলিয়াপাড়া' গড়ে ওঠে।[৬] কলকাতার প্রাচীন বাসন-ব্যবসায়ী ও লৌহ-ব্যবসায়ীদের মধ্যেও অনেকে এই সময় ঘাটাল-আরামবাগ অঞ্চল থেকে নতুন শহরে আসেন। ক্ষীরপাই গ্রামে ইংরেজদের ও ফরাসীদের বাণিজ্যকুঠি অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের গোড়া থেকেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।[৭] ক্ষীরপাই থেকে বীরসিংহ গ্রাম বেশি দূর নয়। ঈশ্বরচন্দ্রের পিতামহী দুর্গা দেবী যখন টাকু-চরকায় সুতো কেটে পুত্রকন্যাদের প্রতিপালন করছিলেন, তখন স্থানীয় বণিকরা ইংরেজ ও ফরাসী কুঠিয়ালদের কাছ থেকে দাদন নিয়ে, তন্তুবায়দের দিয়ে কাপড় বুনিয়ে তাঁদের সরবরাহ করতেন। এ-অঞ্চলে সুতোর চাহিদা ছিল তখন, এবং ঘরে ঘরে দুর্গা দেবীর মতন অনেক দরিদ্র নিরুপায় স্ত্রীলোক সুতো কেটে জীবিকা অর্জন করতেন। ক্ষীরপাইএর কুঠিয়াল সাহেবদের মুখে এবং স্থানীয় তন্তুবায় ও অন্যান্য ব্যবসায়ীদের মুখে মুখে নতুন কলকাতা শহরের বার্তা যে বীরসিংহ পর্যন্তও পৌঁছেছিল, তা পরিষ্কার বোঝা যায়। ক্ষীরপাই প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র, কতকটা টাউনের মতন ছিল তখন। বহু সমৃদ্ধ তন্তুবায়-পরিবারের বাস ছিল ক্ষীরপাইএ। ঠাকুরদাসের পক্ষে মা'য়ের চরকায়-কাটা সুতো বিক্রীর জন্য মধ্যে মধ্যে ক্ষীরপাই আসাও অসম্ভব নয়। অন্যান্য অনেক প্রয়োজনে বীরসিংহ থেকে ক্ষীরপাইএ আসতে হত, এখনও আসতে হয়। কলকাতার কথা ঠাকুরদাসের পক্ষে শোনা তাই আদৌ আশ্চর্য নয়।

অবশেষে কলকাতায় আসা স্থির করলেন ঠাকুরদাস। তখন তাঁর বয়স চৌদ্দ-পনের বছর মাত্র। ঈশ্বরচন্দ্রের প্রথম কলকাতায় আসার বিবরণ আমরা

জানি। কিন্তু কিভাবে, কার সঙ্গে পায়ে হেঁটে ঠাকুরদাস প্রথম কলকাতা শহরে এসেছিলেন, তার কোন বিবরণ কোথাও পাওয়া যায় না। ক্ষীরপাই-ঘাটাল অঞ্চলের তন্তুবায়, বণিক ও ধীবররা তখন কলকাতায় প্রায় নিয়মিত যাতায়াত করতেন। তাঁদের সঙ্গে নৌকাপথে ও হাঁটাপথে হয়ত ঠাকুরদাস প্রথমে কলকাতার গঙ্গার ঘাটে এসে অবতরণ করেছিলেন। ১৮০৪-৫ সালের কথা। তার প্রায় দশ বছর পরে তাঁর বিবাহ হয়, পনের বছর পরে ১৮২০ সালে ঈশ্বরচন্দ্রের জন্ম হয়, এবং পঁচিশ বছর পরে ঈশ্বরচন্দ্র তাঁর পিতার সঙ্গে প্রথম কলকাতা শহরে আসেন। পিতাপুত্রের কালের ব্যবধান বুঝতে হলে ঠাকুরদাসের কালের কলকাতা শহরের কথা জানা দরকার।

গ্রাম থেকে কলকাতা তখন দ্রুত শহর হয়ে উঠছে। উইলিয়াম হজেস্ সাহেব অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে যখন কলকাতায় এসেছিলেন, তখন গার্ডেনরীচ অঞ্চল ছিল সব চেয়ে অভিজাত পল্লী। গার্ডেনরীচের উদ্যান-সংলগ্ন বাড়ীঘর দেখে তিনি বিস্মিত হয়ে গিয়েছিলেন। গঙ্গার ধারে নতুন ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ তখন তৈরি হয়েছে এবং তার পাশে এসপ্লানেডের বিস্তৃত উন্মুক্ত স্থানের প্রান্তে সারবন্দী গৃহশ্রেণী গড়ে উঠেছে। নগরের মধ্যে কোন উন্মুক্ত ভ্রমণোপযোগী স্থানকে 'এসপ্লানেড' বলে। দুর্গ ও নগরের প্রান্তস্থিত গৃহশ্রেণীর মধ্যে ইংরেজদের বেড়াবার জন্য যে খোলা জায়গা ছিল, তার নাম তাই 'এসপ্লানেড' হয়েছে। এসপ্লানেডের প্রান্তে যে-সব বাড়ীঘর তখন তৈরি হয়েছিল, তা ছিল কতকটা এখনকার শহরতলীর বাগানবাড়ীর মতন। অনেকটা জায়গা জুড়ে এক-একটা বাড়ী, সামনে বাগান বা খোলা জায়গা। এক বাড়ী থেকে অন্য বাড়ীর ব্যবধান অনেক। কলকাতার কেন্দ্রস্থলের এই রূপ দেখেছিলেন চিত্রকর উইলিয়াম হজেস্, অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে।[৮] এসপ্লানেডের আশে-পাশে, দক্ষিণে চৌরঙ্গী, উত্তরে চিৎপুর এবং পুবে একেবারে ধাপা পর্যন্ত, কলকাতা শহরের রূপ অনেকটা গ্রামের মতনই ছিল। মাটির ও খড়ের ঘরবাড়ীই ছিল বেশি। মধ্যে মধ্যে সেকালের ইংরেজ আমলের প্রথম বাঙালী বণিক-পরিবারের দু'-চারখানা বড় বড় বাড়ী ছিল। খড় ও মাটির

খড়ের আধিক্যের জন্য কলকাতা শহরে ঘন ঘন ঘরে আগুন লাগত এবং এক-একটা পাড়া আগুনে পুড়ে যেত। কি রকম ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড হত, তা কলকাতার তখনকার দু'-একটি পুলিশ-নোটিশ দেখলে বোঝা যায়। ১৮০০ সালের ১৩ মে'র এক বিজ্ঞপ্তিতে কলকাতা পুলিশের ফার্স্ট ক্লার্ক জানান যে, কলকাতা টাউনের মধ্যে কোন বসতবাড়ী, দোকানঘর, গুদামঘর, আস্তানা বা অন্য কিছু কেউ খড় হোগলা গোলপাতা ইত্যাদি কোন অগ্নিদাহ্য জিনিস দিয়ে তৈরি করতে পারবেন না। শুধু তাই নয়, বিজ্ঞপ্তিতে আরও জানানো হয় যে টাউনের মধ্যে বাঁশ খড় গরাণকাঠ ইত্যাদি বেশি পরিমাণে মজুত করা নিষেধ। যাঁদের বাঁশের বা খড়ের বা কাঠের গোলা আছে, তাঁরা বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পনের দিনের মধ্যে অন্যত্র সব স্থানান্তরিত করবেন।[৯] পুলিশের এই বিজ্ঞপ্তি দেখেই বোঝা যায়, নতুন বর্ধিষ্ণু কলকাতা শহরের কেন্দ্রস্থলে পর্যন্ত মাটির ও খড়ের ঘরবাড়ী ১৮০০ সালেও কি ভয়ানক আতঙ্কের সৃষ্টি করেছিল সাহেবদের মনে। কলকাতা টাউনের সীমানা তখন ছোট ছিল। এই সময় থেকেই কলকাতার নাগরিক উন্নতিসাধন আরম্ভ হয়, ওয়েলেসলির প্রচেষ্টায়। ঠাকুরদাস ঠিক এই সময় কলকাতা শহরে আসেন। কলকাতা টাউন বেষ্টন করে প্রায় ষাট ফুট চওড়া একটি আট মাইল রাস্তা (সার্কুলার রোড) ওয়েলেসলি তৈরি করেন। হিকি সাহেব বলেছেন যে, এই রাস্তা তৈরির ফলে কলকাতার পরিবেশ অনেক স্বাস্থ্যকর হয় এবং সাহেবদেরও সকাল-সন্ধ্যায় ঘোড়ায় চড়ে বেড়াবার সুবিধা হয়। রাস্তাঘাট তৈরির সঙ্গে ওয়েলেসলি নতুন জমকাল 'গবর্ণমেণ্ট হাউস' তৈরির পরিকল্পনা করেন। তার জন্য পুরানো গবর্ণমেণ্ট হাউস, এবং প্রায় ষোলটি বাড়ী (পাঁচ বছরের বেশি তৈরি নয়) ভেঙে ফেলে জায়গা দখল করা হয়। গঙ্গার ধারে বড় বড় গুদামঘর, কাস্টমস্ হাউস ও অন্যান্য অফিস তৈরি করা এবং ঘাট বাঁধানোর পরিকল্পনাও তিনি করেন। বারাকপুরে বাগানবাড়ী, রঙ্গমঞ্চ ইত্যাদিও তিনি তৈরি করতে আরম্ভ করেন। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজেরও প্রতিষ্ঠাতা তিনি এবং কলেজের জন্য গার্ডেনরীচে উইলিয়াম বার্কের বাড়ীসহ পাঁচখানি বাগানবাড়ী কেনেন। লটারী করে টাকা তুলে কলকাতা শহরের দ্রুত উন্নতির পন্থাও তিনি উদ্ভাবন করেন।[১০]

১৮০৯ থেকে ১৮১১ সালের মধ্যে নিকল্‌স সাহেব কলকাতা শহরের একটা

অংশের 'ফিল্ড সার্ভে' করেন। হাতে-লেখা তাঁর এই সার্ভের একটি কপি আছে। তারই শেষে 'পিকচার অফ ক্যালকাটা' বলে তাঁর সংক্ষিপ্ত মন্তব্য আছে। পেন্সিলে লেখা, প্রায় অস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তার মধ্যে তিনি বলেছেন যে, কলকাতার বাগান-সংলগ্ন বাড়ীগুলি দেখলে মনে হয় যেন গৃহস্থ ভদ্রলোকরা তাতে বাস করেন না, রাজা-মহারাজারা বাস করেন। প্রধানত মধ্য-কলকাতা, অর্থাৎ ট্যাঙ্ক স্কয়ার থেকে চৌরঙ্গী পর্যন্ত অঞ্চলের বাড়ীগুলির কথা তিনি বলেছেন। নিকল্‌সের এই বর্ণনা থেকেই ঠাকুরদাসের কালের কলকাতার বাইরের রূপটা অনেকটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। কলকাতার আধুনিক নাগরিক বসতিবহুল ও ঘন-সন্নিবিষ্ট প্রাসাদবহুল রূপের তখনও বিকাশ হয়নি। বাগান-বাড়ী নিয়ে শৌখিন শহরতলীর যে রূপ হয়, কলকাতার বাইরের রূপও তাই ছিল। ছেলেমেয়ে পুরুষ নিয়ে খাঁটি ইয়োরোপীয় বাসিন্দার সংখ্যা তখন তিন হাজারের বেশি ছিল না। ধর্মতলা থেকে পুবে ধাপা পর্যন্ত কলকাতার রূপ ছিল গ্রাম্য। ধাপার পাশে বড় বড় নুনের গোলা ছিল এবং নুন তৈরির ঘাঁটি ছিল। নুন তৈরি করত যারা, সেই মলাঙ্গাদের অনেকে বর্তমান 'মলাঙ্গা লেন' অঞ্চলে বসবাস করত।[১১]

কলকাতার সব পথঘাট ও অলিগলির তখনও নামকরণ হয়নি। গ্রামের মতন কলকাতার পথঘাটও বাড়ীঘর-পুকুর-মসজিদ-মন্দির ইঙ্গিত করে বলত লোকে। যেমন 'বাদামতলা বা দক্ষিণ রাস্তা' (ক্যামাক স্ট্রীট), 'কোম্পানী কেরানী কা বাড়ী কা উত্তর রাস্তা' (লায়ন্স রেঞ্জ), 'পুরান বক্সীখানা কা রাস্তা' (মিড্‌লটন স্ট্রীট), 'বৈঠকখানা গৌখানা কা রাস্তা' (সার্পেন্টাইন লেন), 'নাচঘর কা উত্তর রাস্তা' (থিয়েটার রোড) ইত্যাদি। ১৮০১ সালের ১লা জুন তারিখের একটি জমিবিলির পাট্টায় দেখা যায়, সেকালের প্রসিদ্ধ বেনিয়ান অক্রূর দত্ত* ওয়েলিংটন অঞ্চলে সতের কাঠা জমি ম্যাথু লুইস নামে কোন সাহেবকে বন্দোবস্ত দিচ্ছেন এবং পাট্টার মধ্যে জমির সীমানা নির্দেশ করছেন এইভাবে: 'পুবে মিসেস ম্যাথুর বাড়ী ও জমি, পশ্চিমে সাধারণের চলাচলের রাস্তা, দক্ষিণে মিসেস হাওয়ার্ডের বাড়ী ও জমি এবং উত্তরে মিস্টার

* ওয়েলিংটনের এই দত্ত-পরিবারের রাজেন্দ্র দত্ত এদেশে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার অন্যতম আদিপ্রবর্তক ও বিদ্যাসাগরের বন্ধু ছিলেন।

হিকির সম্পত্তি।' পাট্টায় বলা হয়েছে যে এই জমির মধ্যে আস্তাবল, দোকানঘর, গুদামঘর, কোচহাউস, গাছপালা, পুকুর ইত্যাদি যা আছে, সব ম্যাথ্ সাহেব ভোগ করতে পারবেন।[১২] এই পাট্টার ভিতর থেকে ওয়েলিংটন অঞ্চলের চেহারা দেড়শ বছর আগে, ঠাকুরদাসের কালে কি রকম ছিল, তার অনেকটা আভাস পাওয়া যায়।

ঈশ্বরচন্দ্রের পিতা যখন কলকাতা শহরে আসেন, তখন কলকাতার ইংরেজ-সমাজে বাঙালী বেনিয়ানদের খুব প্রতিপত্তি ছিল। নিমাইচরণ মল্লিক, হিদারাম (হৃদয়রাম) ব্যানার্জি, অক্রূর দত্ত প্রভৃতি বিখ্যাত বাঙালী বেনিয়ানরা তখনও জীবিত ছিলেন। নিমাইচরণ মল্লিক ছিলেন 'ককারেল ট্রেল অ্যাণ্ড কোম্পানী'র বেনিয়ান। বিদেশী কোম্পানীতে এদেশী কেরানী নিয়োগের দায়িত্ব ও ক্ষমতা এই বেনিয়ানদেরই ছিল।[১৩] হিদারাম ব্যানার্জি ও রঘুনাথ ব্যানার্জি দুই ভাইই বেনিয়ান ছিলেন। রঘুনাথ ছিলেন হিকি সাহেবের বেনিয়ান। উভয়ের কাছেই দায়ে পড়লে হিকি সাহেব বণ্ড দিয়ে টাকা ধার করতেন। এইভাবে দুই ভাই মিলে হিকির কাছে একবার এত টাকা পাওনা হিসেবে দাবি করেন যে হিকি হতভম্ব হয়ে যান। তিনি তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন যে, এত টাকা ঋণ কোনদিন তিনি বণ্ড দিয়ে গ্রহণ করেননি এবং এর অনেকটাই হল দুই বেনিয়ান ভাইএর কারসাজি। কঠোর ভাষায় হিকি দুই ভাইকে শঠ প্রবঞ্চক ও স্কাউণ্ড্রেল বলে কটূক্তি করেছেন।[১৪]

হিকি যাই বলুন না কেন, বাণিজ্যের ক্ষেত্রে কেউই তখন সাধুপুরুষ ছিলেন না। হিকি পামার ককারেলরাও নন, হিদারাম, রঘুনাথ, অক্রূর দত্ত, বারাণসী ঘোষ, নিমাই মল্লিকরাও নন। বাঙালী বেনিয়ানদের যে কি প্রবল প্রতাপ ছিল, তা হিকির স্মৃতিকথায় নিমাই মল্লিক, হিদারাম ব্যানার্জির বিবরণ থেকেই বোঝা যায়। অক্রূর দত্ত এঁদেরই সমসাময়িক ছিলেন এবং বেনিয়ানি করে প্রচুর অর্থ উপার্জন করেছিলেন। ঠাকুরদাস যখন কলকাতায় আসেন জীবিকার সন্ধানে, তখন এই বাঙালী বেনিয়ানরা সকলেই কলকাতার অবস্থাপন্ন সমাজে বেশ সুপ্রতিষ্ঠিত। অক্রূর দত্ত ও হিদারাম ব্যানার্জির নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করার কারণ হল, উভয় পরিবারের বংশধরদের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের জীবন বিশেষভাবে জড়িত। অক্রূর দত্তের বংশের রাজেন্দ্র দত্ত

(হোমিওপ্যাথির প্রবর্তক এদেশে) বিদ্যাসাগরের শুভার্থী বন্ধু ছিলেন। বিদ্যাসাগরের অন্যতম অন্তরঙ্গ বন্ধু রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন বিখ্যাত বেনিয়ান হিদারাম বন্দ্যোপাধ্যায়ের পৌত্র। কিছুদিনের জন্য বিদ্যাসাগর বহুবাজারে হিদারাম ব্যানার্জির বাড়ীর বৈঠকখানা ঘর ভাড়া করে বাসও করেছিলেন। বিদ্যাসাগরের আমলে বড় বড় জাঁদরেল বেনিয়ানদের যুগ প্রায় শেষ হয়ে গিয়েছিল। কলকাতার সমাজে প্রাচীন কয়েকটি সম্ভ্রান্ত ধনিক পরিবারের প্রতিষ্ঠা করে তাঁরা বিদায় নিয়েছিলেন।

ঠাকুরদাস কলকাতায় এসে তাঁর এক পরিচিত জ্ঞাতির বাড়ীতে উঠলেন। সভারাম বাচস্পতি নামে তাঁদের এক নিকট জ্ঞাতি আগেই কলকাতায় এসে বসবাস করছিলেন। সভারামের পুত্র জগন্মোহন ন্যায়ালঙ্কার ছিলেন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত চতুর্ভুজ ন্যায়রত্নের প্রিয় ছাত্র। তাঁরই অনুগ্রহে ন্যায়ালঙ্কার মহাশয় কলকাতায় বেশ প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। কলকাতায় এঁদের পেশা কি ছিল সে-কথা চরিতকাররা কেউ, অথবা বিদ্যাসাগর তাঁর স্বরচিত জীবনচরিতে কোথাও উল্লেখ করেননি। মনে হয়, সভারাম বাচস্পতি ও তাঁর পুত্র ন্যায়ালঙ্কার মহাশয় কলকাতায় টোল স্থাপন করে অধ্যাপনা করতেন। ১৭৭৪ সালে সুপ্রীম কোর্টে প্রথম বেতনভুক পণ্ডিত নিযুক্ত হবার পর থেকে, নতুন কলকাতা শহরের মধ্যে ধীরে ধীরে একটি বিদ্যাসমাজ গড়ে উঠতে থাকে। পাশাপাশি অঞ্চলের বিদ্যাকেন্দ্র থেকে অনেক পণ্ডিত কলকাতা শহরে এসে টোল স্থাপন করে অধ্যাপনা আরম্ভ করেন। সামান্য ইংরেজী শিখলে সদাগরী হৌসে চাকরী পাওয়া যেত বটে, কিন্তু সংস্কৃতচর্চায় তখনও একেবারে ভাঁটা পড়েনি। সভারাম বাচস্পতি ও তাঁর পুত্রের মতন অনেক পণ্ডিত গ্রামাঞ্চল থেকে এসে কলকাতা শহরে টোল চতুষ্পাঠী স্থাপন করে অধ্যাপনা করতে আরম্ভ করেন। এইভাবে চতুষ্পাঠী স্থাপন করে কলকাতায় তখন অনেকে যশস্বী হয়েছিলেন।

ঠাকুরদাস কলকাতায় এসে এই জ্ঞাতির গৃহে উপস্থিত হলেন। কি করে চোদ্দ-পনের বছরের একটি পাড়াগেঁয়ে বালক সেদিনকার কলকাতার পথে পথে ঘুরে জ্ঞাতিগৃহে উপস্থিত হয়েছিলেন, সে-কথা এখন ভাবা যায় না। তখনকার কলকাতার অধিকাংশ নামগোত্রহীন পথঘাট কি রকম ছিল, তার

কিছুটা আভাস আগে দিয়েছি। যানবাহনের অবস্থা ছিল আরও শোচনীয়। ঠিকা বেয়ারা ছিল, তাতে চড়া যায় না, চাকরের কাজের জন্য ঠিকা হারে ভাড়া পাওয়া যায়। ঠিকা বেয়ারারা দল বেঁধে এক-এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকত, কোন সাহেব বিবি কখন তাদের ডাক দিয়ে নিয়ে যাবে, সেই ভরসায়। ১৮০০ সালেও এই ঠিকা বেয়ারাদের মজুরীর হার নিয়ে একবার 'ধর্মঘট' হয়েছিল কলকাতায়। পুলিশ ঠিকা বেয়ারাদের মজুরী নিয়ন্ত্রণ করেছিল, তাই বেয়ারারা কয়েকদিন ঘর থেকে বেরোয়নি। অনেক সাহেবের পাল্কি ছিল, কিন্তু বাঁধা মাইনে দিয়ে তাঁরা বেয়ারা রাখতেন না। পাল্কি চড়ার সময় এই ঠিকা বেয়ারা দিয়ে কাজ চালাতেন এবং অন্যান্য কাজও করিয়ে নিতেন। তাঁদের খুব অসুবিধা হয়েছিল ধর্মঘটের ফলে।[১৫] পাল্কি ছিল এবং পাল্কির স্ট্যাণ্ডও ছিল কলকাতায়। পাল্কি ও ঠিকা বেয়ারাদের ভাড়া যখন বেঁধে দেওয়া হয়, তখন সারাদিনের জন্য (১৪ ঘণ্টা) পাল্কির ভাড়া ছিল কলকাতায় চার আনা, আধবেলার জন্য (এক ঘণ্টার বেশি এবং পাঁচ ঘণ্টার কম) দু' আনা। এক ঘণ্টার অল্প সময়ের জন্য এক আনা ভাড়া দিতে হত।[১৬] পাল্কি ও ঠিকা বেয়ারাদের হার একই ছিল। ঠাকুরদাসের পক্ষে পাল্কি চড়ে কলকাতা শহরে ঘুরে বেড়ানো সম্ভব ছিল না। দু' আনা বা চার আনা পয়সার তখন মূল্য ছিল অনেক, যখন কড়ি দিয়ে সাধারণ লোকের কেনা-বেচার কাজ চলে যেত। দু' এক পয়সার অভাবে, অনাহারে যিনি অক্রূর দত্ত ও হিদারাম ব্যানার্জির যুগে কলকাতার পথে ঘুরে বেড়িয়েছেন, নিজের একমাত্র সম্বল একখানি ভাত খাবার থালা ও একটি জল খাবার ঘটি যিনি নতুন বাজারের দোকানে বিক্রী করবেন স্থির করেছেন, তাঁর পক্ষে পাল্কি করে শহরে ঘুরে বেড়ানোর কথা চিন্তা করা, একালের গরীব কেরানীর সন্তানের পক্ষে ব্যুইক্ গাড়ীতে চড়ে ঘুরে বেড়ানোর কল্পনার মতন দুঃস্বপ্ন ছাড়া কিছু নয়। সেকালের পাল্কির বিলাসিতা একালের ব্যুইকের বিলাসিতার চেয়েও অভিজাত ছিল বললে অত্যুক্তি হয় না।

পাল্কি ছাড়া, ঘোড়া ছিল, এক ঘোড়ার ও দুই ঘোড়ার নানারকমের গাড়ী ছিল, এমন কি হাতিও ছিল। কলকাতা শহরে তখন হাতিও চলে বেড়াত। ঠাকুরদাস যখন এসেছিলেন তখনও হাতির যুগ একেবারে শেষ

হয়নি। হাতি নিলামে বিক্রী হত। হাতির পিঠে হাওদায় বসে ধনবানেরা নতুন কলকাতা শহরে ঘুরে বেড়াতেন। ঈশ্বরচন্দ্রের পিতা হয়ত তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতেন তাঁদের, কিন্তু পিঠে ওঠার কথা নিশ্চয় কল্পনা করতে পারতেন না। ঘোড়ার সংখ্যা ছিল অনেক বেশি। হাতি দেখে ভয় পেত ঘোড়ার গাড়ীর ঘোড়া, রাইডার সাহেবদের ঘোড়া। হঠাৎ ভয় পেয়ে তারা যে কি ভয়ঙ্কর কাণ্ড করত কলকাতার পথে তা কল্পনা করা কঠিন নয়। আতঙ্কিত ঘোড়ার এরকম অনেক উৎপাতের ও অ্যাকসিডেণ্টের বিবরণ সেকালের সাময়িক পত্রিকার পৃষ্ঠায় পাওয়া যায়। তখনকার ঘোড়ার ট্র্যাফিকের যুগে অধিকাংশ 'রোড অ্যাকসিডেণ্ট'ই ঘোড়ার উৎপাত-জনিত ছিল। কি রকম দুর্ঘটনা ঘটত, তার দু'টি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।

মধ্য-কলকাতায় ড্রামণ্ড সাহেব ও হাটম্যান সাহেবের দুটি বিখ্যাত ইংরেজী স্কুল ছিল। এই ড্রামণ্ড সাহেবের স্কুলেই ডিরোজিও শিক্ষা পেয়েছিলেন। ১৮০৫-৬ সালের কথা। একদিন মিস্টার ও মিসেস হাটম্যান তাঁদের তিনটি ছেলেমেয়ে নিয়ে ঘোড়ার গাড়ীতে করে বেড়িয়ে বাড়ী ফিরছেন। এমন সময় এসপ্লানেডের কাছে হঠাৎ এক হাতির সামনে পড়ে গাড়ীর ঘোড়া বিগড়ে যায় এবং উন্মাদের মতন লাফালাফি করে পাশের কাঁচা ড্রেনের মধ্যে গাড়ী উল্টিয়ে ফেলে দেয়।[১৭] সাহেব বিবি ও তাঁদের তিন পুত্রকন্যার, ড্রেনের মধ্যে পড়ে, কি অবস্থা হয়েছিল, তা বর্ণনা না করলেও চলে। হাতি দেখে ভয় না পেলেও, এরকম ঘোড়ার উপদ্রব উনবিংশ শতাব্দীর গোড়া থেকে প্রায় শেষ পর্যন্ত ছিল। ১৮৪৩ সালের ২৮ সেপ্টেম্বরের 'সমাচার-চন্দ্রিকা' থেকে আর একটি দুর্ঘটনার বিবরণ দিচ্ছি। চন্দ্রিকার ভাষায় বিবরণটি এই :

> ২১ বৃহস্পতিবার অতি প্রত্যূষে চিতপুর হইতে কৃষক লোকেরা তরিতরকারি ও ফলাদি লইয়া কলিকাতায় বিক্রয়ার্থে আসিতেছিল পথিমধ্যে মৃত রাজা রামচাঁদের বাটীর সমীপে এক সাহেবের পাল্কী গাড়ীর চক্রে একজন কৃষক পতিত হওয়াতে তাহার পদে সাংঘাতিক আঘাত লাগিয়াছে সাহেব তাহা দৃষ্ট করিয়া আপন কৌচমেনকে অতি বেগে গাড়ি চালাইতে আজ্ঞা প্রদান করিলেন গরীব কৃষক আঘাতী হইয়া ভূমে পতিত থাকিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল।

১৮৪৩ সালের কথা। বিদ্যাসাগর তখন ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে চাকরী করছেন। ঠাকুরদাসের কাল নয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়াতে, ঠাকুরদাসের কলকাতা বাসের কালে, এরকম দুর্ঘটনা আরও করুণভাবে ঘটত এবং অনেক অসহায় গ্রাম্য কৃষককে শহরের পথে সাহেবের ছ্যাকরা গাড়ীর আঘাতে মাটিতে পড়ে ক্রন্দন করতে হত। ঠাকুরদাসের মতন অসহায় গ্রাম্য বালক, যারা শিক্ষার বা জীবিকার ধাক্কায় কলকাতায় আসতে বাধ্য হত, তাদেরও যে তখনকার কলকাতার জনবিরল ও ট্র্যাফিক-বিরল পথে কত সাবধানে চলতে হত, তা এই সব দুর্ঘটনা থেকে বোঝা যায়। সেকালের পত্রিকাদিতে, ঘোড়ার গাড়ীর যুগের কলকাতার যে পরিমাণ দুর্ঘটনার বিবরণ প্রকাশিত হত, আজকালকার অটোমোবাইলের যুগের কলকাতাতেও সেরকম হয় না।

সাহেবদের বগি ও পাল্কি গাড়ীর পাশ কাটিয়ে ঠাকুরদাস যে কত সাবধানে, ভয়ে ভয়ে পথ চলে নিকট-জ্ঞাতি ন্যায়ালঙ্কারের গৃহে উপস্থিত হয়েছিলেন, তার ঠিক নেই। গৃহে উপস্থিত হয়ে ন্যায়ালঙ্কার মহাশয়কে তিনি আত্মপরিচয় দিয়ে বললেন: 'বীরসিংহ থেকে আসছি, রামজয় তর্কভূষণ মহাশয়ের ছেলে।' ন্যায়ালঙ্কার মহাশয় নিশ্চয় অবাক হয়ে সেদিন জিজ্ঞাসা করেছিলেন: 'তুমি কি জন্যে একা-একা কলকাতায় এসেছ? কলকাতা তো গ্রাম নয়, শহর। জানোই তো, খুড়ো-জ্যাঠা পিসি-মাসী কেউ এখানে নেই, এখানে কেউ কাউকে চেনে না, পয়সা না দিলে কিছু পাওয়া যায় না! কলকাতায় কি জন্যে এসেছ? কে তোমাকে এখানে পাঠালে? তোমার বাবা কোথায়?' এ-সব প্রশ্ন ন্যায়ালঙ্কারের পক্ষে করা খুবই স্বাভাবিক। প্রশ্নের কি জবাব দিয়েছিলেন ঠাকুরদাস জানি না। একে জ্ঞাতি, তার উপর ন্যায়ালঙ্কার পণ্ডিত, জবাব দেওয়া সহজ নয়। ঠাকুরদাস নিজেদের দুরবস্থার এবং পিতার গৃহ-ত্যাগের সমস্ত কাহিনী বিবৃত করে হয়ত অশ্রুভারাক্রান্ত চোখে কাতরভাবে বলেছিলেন: 'আমাকে আপনি আশ্রয় দিন এবং উপদেশ দিন, আমি কি করব।' ন্যায়ালঙ্কার মহাশয়ের সময় ভাল ছিল, অন্নদানও করতেন। তাছাড়া, কলকাতা শহরে এসে তখন যাঁরা চাকরিবাকরি করে বসবাস করতেন, তাঁদের এরকম জ্ঞাতি-আত্মীয় পোষণ করতে হত। গ্রামসম্পর্কে আত্মীয় যাঁরা তাঁরাও এসে নির্বিবাদে কলকাতায় গ্রাম্য খুড়োজ্যাঠার বাড়ীতে উঠে আশ্রয়

নিতেন। এটা তখনও সামাজিক রীতি বলেই গণ্য হত। অতএব ন্যায়ালঙ্কার মহাশয় 'সাতিশয় দয়া ও সবিশেষ সৌজন্য প্রদর্শনপূর্বক' ঠাকুরদাসকে নিজগৃহে আশ্রয় দিলেন।

কিন্তু কি করবেন ঠাকুরদাস? কোন টোলে ভর্তি হয়ে পণ্ডিতের কাছে সংস্কৃত পড়বেন, না অন্য কিছু করবেন? সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতেরা তখনও দু'চারজন আদালতে বা ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে চাকরী পেতেন, কিন্তু অন্যান্য আফিসের বা হৌসের চাকরীর জন্য সংস্কৃত বিদ্যার প্রয়োজন হত না কিছু। শিক্ষার জন্য ঠাকুরদাস কলকাতায় আসেননি। নিশ্চিন্তে টোলচতুষ্পাঠীতে বা বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করবেন, সে সৌভাগ্য তাঁর হয়নি। তা যদি হত, তাহলে গ্রামের পণ্ডিতমশায়ের টোলে তিনি আরও কিছুদিন পড়াশুনা করতেন। সংস্কৃত শিক্ষার জন্য তাঁর ছেলেবেলা থেকেই খুব আগ্রহ ছিল। কিন্তু সমস্ত আগ্রহ ও বাসনাকে জলাঞ্জলি দিয়ে তাঁকে যেজন্য কলকাতায় ছুটে আসতে হয়েছে, তা টোলে বসে সংস্কৃত অধ্যয়নের জন্য নয়, কিঞ্চিৎ অর্থ উপার্জনের জন্য। তাই অনেক বিবেচনার পর তিনি স্থির করলেন, যে-বিদ্যা আয়ত্ত করলে সহজে এবং অতি শীঘ্র কিছু অর্থ উপার্জন করে মা-ভাই-বোনদের কষ্ট দূর করা যায়, তাই তিনি করবেন। সে বিদ্যা সংস্কৃতবিদ্যা নয়, 'মোটামুটি ইঙ্গরেজী' বিদ্যা। ইংরেজী পড়াই ঠাকুরদাস স্থির করলেন। কিন্তু পড়বেন কোথায়?

ঠাকুরদাস যখন প্রথম কলকাতায় এসেছিলেন, তখন ইংরেজী শিক্ষার বেশি স্কুল ছিল না। ফিরিঙ্গীদের কয়েকটি স্কুল ছিল, যেমন চিৎপুরে শেরবোর্ণ সাহেবের স্কুল, ধর্মতলার ড্রামণ্ড সাহেবের স্কুল, শিয়ালদহ-বৈঠকখানা অঞ্চলের হাটম্যান সাহেবের স্কুল ইত্যাদি। এছাড়া আরও কয়েকটি স্কুল ছিল। পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়ে ফিরিঙ্গী সাহেবরা ইংরেজী শিক্ষার স্কুল খোলার কথা সকলকে জানাতেন। ১৮০৭ সালে এডওয়ার্ড হল্ নামে কোন সাহেব বহুবাজার অঞ্চলে এই রকম এক অ্যাকাডেমী খুলে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন।[১৮] এরকম বিজ্ঞাপন প্রায় সেকালের পত্রিকায় প্রকাশিত হত। সব স্কুল যে ভালভাবে চলত, তা নয়। মেমসাহেবরাও মহিলাদের শিক্ষার জন্য এরকম স্কুল খুলতেন। কিছুদিন চলে ছাত্রাভাবে অধিকাংশ স্কুল উঠে যেত।

সুপ্রতিষ্ঠিত স্কুলের মধ্যে চিৎপুরে শেরবোর্ণ সাহেবের ও ধর্মতলায় ড্রামণ্ড সাহেবের স্কুলের খ্যাতি ছিল খুব। সাধারণত এসব স্কুলে তখনকার ধনিক সম্ভ্রান্ত পরিবারের ছেলেরাই ইংরেজী শিক্ষা করত। দ্বারকানাথ ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর প্রমুখ অনেক বিখ্যাত ব্যক্তি বাল্যকালে শেরবোর্ণের স্কুলে পড়েছেন। ড্রামণ্ডের স্কুলেও অনেক ধনিক বাঙালী বেনিয়ান-নন্দন লেখাপড়া শিখেছেন। ফিরিঙ্গী সাহেব শিক্ষকদের উপর কিছুটা টোলের গুরুমশায়দের প্রভাবও পড়েছিল। কেউ কেউ টোলের পণ্ডিতদের মতন ছাত্রদের কাছ থেকে বার্ষিক বিদায় আদায় করতেন। শেরবোর্ণ সাহেব, শোনা যায়, দুর্গা-পূজার সময় বেশ মোটা টাকা বার্ষিক আদায় করতেন ধনিক বাঙালী ছাত্রদের কাছ থেকে। ঠাকুরদাসের পক্ষে এই সব ফিরিঙ্গী স্কুলে পড়া সম্ভব ছিল না। সুতরাং, কোথায় কার কাছে তিনি ইংরেজী শিখবেন, তাই এক সমস্যা হয়ে দাঁড়াল। ন্যায়ালঙ্কার মহাশয়ের পরিচিত এক ব্যক্তি কাজ চলার মতন ইংরেজী জানতেন। তখনকার অধিকাংশ ইংরেজী-জানা লোক তাই জানত এবং তাতেই যথেষ্ট টাকা রোজগার করা সম্ভব হত। যাই হোক, তিনিই ঠাকুরদাসকে ইংরেজী শেখাবেন, এই স্থির হল। ন্যায়ালঙ্কারের অনুরোধে তিনিও রাজী হলেন। কিন্তু তাঁর শেখাবার সময় কোথায়? যেটুকু ইংরেজী তিনি জানেন, তাই সম্বল করে তিনি নানা উপায়ে অর্থোপার্জনের ধান্ধায় ঘুরে বেড়ান। দিনের বেলা তাঁর পড়াবার অবকাশ ছিল না। তাই সন্ধ্যার সময় ঠাকুরদাসকে তিনি আসতে বললেন। প্রতিবেশী হলেও তখনকার প্রতিবেশীরা পাশাপাশি সংলগ্ন বাড়ীতে বাস করতেন না। সন্ধ্যার সময় ইংরেজী শিখতে যাওয়া, এবং পাঠ শেষ করে রাতে একা-একা আবার ন্যায়ালঙ্কারের গৃহে ফিরে আসা, ঠাকুরদাসের পক্ষে খুব সহজ ছিল না। উপায় নেই, ইংরেজী শিখতেই হবে। বিদ্যার দায় নয়, প্রাণের দায়। ঠাকুরদাস রোজ তাই যেতেন। শেরবোর্ণ সাহেবের কাছে নয়, জনৈক শিপ্‌সরকারের কাছে। ফিরতে তাঁর বেশ রাত হত। সন্ধ্যার পরেই বাড়্‌তি লোকের, অর্থাৎ স্কন্ধারূঢ় পোষ্যদের ও আশ্রিতদের আহারের পালা শেষ হয়ে যেত। কে বাকি রইল না রইল, তার কোন খোঁজ রাখত না কেউ। ন্যায়ালঙ্কারও নিশ্চিন্তে নিদ্রা যেতেন। জ্ঞাতির খবর নিতেন না। শিপ্‌সরকারের বাড়ী থেকে ইংরেজীর পাঠ সাঙ্গ

করে ক্ষুধার্ত ঠাকুরদাস সুপণ্ডিত জ্ঞাতির গৃহে ফিরে রাত্রিতে উপবাসেই কাটাতেন। কাউকে কিছু বলতেন না। বলবার তো কোন অধিকার ছিল না তাঁর! মাথা গোঁজার আশ্রয় পেয়েছেন, এজেণ্ট-দালাল ও বেনিয়ানদের এই কলকাতা শহরে, এই তো যথেষ্ট!

অনাহারে রাত্রি কাটিয়ে ঠাকুরদাস ক্রমেই শীর্ণ ও দুর্বল হতে লাগলেন। ইংরেজীশিক্ষক একদিন তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন: 'তুমি দিন দিন এরকম রোগা হয়ে যাচ্ছ কেন?' কাঁদ-কাঁদ হয়ে ঠাকুরদাস সব কথা তাঁকে বললেন। যখন কথা হচ্ছিল তখন শিপ্‌সরকারের এক আত্মীয় সেখানে উপস্থিত ছিলেন। সব বৃত্তান্ত শুনে তিনি ঠাকুরদাসকে জিজ্ঞাসা করলেন: 'তুমি নিজে রেঁধে খেতে পারবে? যদি পার, তাহলে আমি তোমাকে আমার বাসায় রাখতে পারি।' প্রস্তাব শুনে ঠাকুরদাস আহ্লাদিত হলেন। পরদিনই থালা ও ঘটিটা নিয়ে তিনি তাঁর বাড়ীতে গিয়ে উপস্থিত হলেন। সদাশয় জ্ঞাতি ন্যায়ালঙ্কারের গৃহে তাঁর পক্ষে আর থাকা সম্ভব হল না।

নতুন আশ্রয়দাতার উদারতা যতটা ছিল, সামর্থ্য ততটা ছিল না। দালালি করে সামান্য পয়সা তিনি রোজগার করতেন। কলকাতা শহরে দালালির কাজে তখন বেশ দু' পয়সা ছিল। দালালির অর্থে অনেকেই সে সময় সম্ভ্রান্ত ও ধনিক বলে গণ্য হয়েছেন। কিন্তু সব দালাল সমান ভাগ্যবান ছিলেন না। ঠাকুরদাসের নতুন আশ্রয়দাতার অবস্থা ক্রমেই খারাপ হতে লাগল। প্রতিদিন সকালে বাড়ী থেকে বেরিয়ে কোন দিন দেড় প্রহরে, কোন দিন দুই প্রহরে, কোন দিন আড়াই প্রহরে, কিছু সংগ্রহ করে নিয়ে তিনি বাড়ী ফিরতেন। তাই নিয়ে কোন দিন বেশ সচ্ছলভাবে, কোন দিন টানাটানিতে দু'জনের আহার চলে যেত। কোন দিন দিনের বেলা তাঁর ফেরা হত না। সেদিন ঠাকুরদাস উপবাস করে থাকতেন। আশ্রিত ও আশ্রয়দাতা, উভয়েরই এইভাবে কষ্টের মধ্যে দিন কাটত। তার মধ্যেই ঠাকুরদাসের ইংরেজী পড়া চলতে লাগল।

ঠাকুরদাসের সম্বল ছিল একখানি ভাত খাবার থালা ও একটি ছোট ঘটি। আশ্রয়দাতার অবস্থা দেখে তিনি ভাবলেন, থালাখানা বিক্রী করে কিছু পয়সা হাতে রাখা ভাল। এক পয়সার শালপাতা কিনে রাখলে, তাতে দশ-বারো

দিন ভাত খাওয়া চলবে। থালা না থাকলেও কাজ চলে যাবে, কেবল সকল কাজের সহায় ঘটিটা থাকলেই হল। থালা বিক্রীর পয়সা হাতে থাকলে তাই দিয়ে, দিনের বেলা যেদিন কিছু আহার জুটবে না, সেদিন কিছু কিনে খাওয়া যেতে পারে। এত কথা গভীরভাবে চিন্তা করে ঠাকুরদাস একদিন থালাখানা নিয়ে নতুন বাজারের কাঁসারিদের দোকানে বিক্রীর জন্য উপস্থিত হলেন। কাঁসারিরা বলল, অচেনা লোকের কাছ থেকে পুরান বাসন তারা কিনতে পারবে না। মধ্যে মধ্যে এরকম না জেনে চোরাই মাল কিনে তারা বড় ফ্যাসাদে পড়েছে। ঠাকুরদাস দোকানে দোকানে ঘুরলেন। কোন দোকানদারই থালা কিনতে রাজী হল না। অবশেষে সামান্য মূলধন সঞ্চয়ের সুচিন্তিত পরিকল্পনা ত্যাগ করে তাঁকে বাসায় ফিরতে হল।

কি বিচিত্র কলকাতা শহরে এসেছেন তিনি, ঠাকুরদাস মনে মনে ভাবলেন। কোন দয়া নেই, মায়া-মমতা নেই, বিচার-বিবেচনা নেই! অথচ এখনকার মতন শানবাঁধানো পাথরের কলকাতা শহর তখনও গড়ে ওঠেনি। তবু শহর শহর, গ্রাম নয় শহর। নিষ্ঠুরতাই শহরের ধর্ম, কোমলতা নয়। কলকাতার পথে পথে অনাহারে ঘুরে বেড়িয়েছেন ঠাকুরদাস, কত বড়লোকের বাড়ীর দিকে, কত দোকানের দিকে অবাক হয়ে চেয়ে চেয়ে দেখেছেন। অথচ দেওয়ানির ও বেনিয়ানির অপরিমিত অর্থে বিলাসিতার স্রোত বয়ে গিয়েছে তখন কলকাতার পথে। সাহেবদের বাড়ীতে যেমন, তাঁদের কৃপাশ্রিত বাঙালী রাজা-মহারাজাদের বাড়ীতেও তেমনি ভোজ চলেছে, বাইজী-নাচ চলেছে। কেবল আতসবাজীর উৎসবেই হাজার হাজার টাকা ব্যয় হয়েছে। কলকাতার যে অঞ্চলে ঠাকুরদাস বাস করতেন (বড়বাজার), তার কাছাকাছি অঞ্চলে কেবল দুর্গাপূজার সময় যে-পরিমাণ অর্থব্যয় হত, তাই দিয়ে ঠাকুরদাসের মতন হাজারটি দুস্থ পরিবারকে খাইয়ে-পরিয়ে-পড়িয়ে সুখে-স্বচ্ছন্দে মানুষ করা যেত। শোভাবাজারের রাজবাড়ীতে, জোড়াসাঁকোর সিংহবাড়ীতে, মহারাজা সুখময় রায়ের বাড়ীতে, ঠাকুরবাড়ীতে, বেনিয়ান বারাণসী ঘোষের বাড়ীতে, দুর্গাপূজার সময় নিমন্ত্রিত সাহেবদের নিয়ে যে রকম নাচ গান হল্লা, বাজী পোড়ানোর উৎসব হত, তা গ্রামের ছেলে ঠাকুরদাস নিশ্চয় তখন দু'-একবার দেখেছেন। দেখে তাঁর কি মনে হত তা তিনি পরবর্তীকালে কাউকেই বলে

যাননি, এমন কি তাঁর পুত্র ঈশ্বরচন্দ্রকেও না। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ থেকে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদ পর্যন্ত এই ধরনের উৎসব কলকাতা শহরে পূর্ণোদ্যমে চলেছে। সেকালের অনেক ইংরেজী ও বাংলা পত্রিকায় এই সব উৎসবের বিস্তারিত বিবরণ আছে।[১৯] এই সব উৎসব-প্রাঙ্গণের আশেপাশেই ঠাকুরদাস যে কত দিন ঘুরে বেড়িয়েছেন, তার ঠিক নেই। মধ্যে মধ্যে পথের ধারে খাবারের দোকানের সামনেও যে তিনি ক্লান্ত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতেন, পয়সার অভাবে কিছু কিনে খেতে পারতেন না, তারও প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু কেউ তাঁর ক্ষুধার্ত মুখের দিকে চেয়ে দেখত না, দেখলেও কিছু বলত না। কলকাতা শহর যে!

মানবতার ধর্ম, নতুন শহর কলকাতায়, তখনও অঙ্কুরিত হয়নি। নবযুগের মানবমুখী জীবনাদর্শের বিকাশ হচ্ছিল, মধ্যযুগের মানবপ্রেমের বোধকে দলিত করে। দাসত্বপ্রথার নিষ্ঠুরতার পর্বও তখনও শেষ হয়নি। দাস কেনাবেচা কলকাতা শহরেও চলত এবং দাসদের উপর যে নির্যাতন করা হত, তা অমানুষিক। ঠাকুরদাসের কলকাতায় আসার আট-দশ বছর আগেকার একটি ঘটনা উল্লেখ করছি। ঘটনাটি তখনকার পত্রিকাতে প্রকাশিত হয়েছিল। জনৈকা অল্পবয়স্কা বালিকা দাসীকে, অসুস্থ বলে, কসাইতলার (বেন্টিক স্ট্রীট) একটি বাড়ী থেকে মালিকরা তাড়িয়ে দেন। পাশের স্যাঁতসেঁতে একটি ঘোড়ার আস্তাবলে তাকে থাকতে দেওয়া হয়। বাড়ীর মালিকরা এবং আশপাশের প্রতিবেশীরা মধ্যে মধ্যে আস্তাবলে গিয়ে মেয়েটিকে কিছু খাবার দিয়ে আসতেন। কিছুদিনের মধ্যে অসুস্থ বালিকাটি মারা যায়।[২০] ছোট্ট একটি ঘটনা। ১৭৯২ সালের কলকাতার একটি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। ঐ একই সময়ের বাবুদের বাড়ীর উৎসবের খবর এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে। কলকাতা শহরের অন্তরের খবর পাওয়া যায় এই সব ঘটনা ও সংবাদ থেকে। ঠাকুরদাস যখন কলকাতার পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন, তখনও শহরে এই রকমের ঘটনা ঘটত। যে কলকাতা শহরে ক্রীতদাসী বালিকা অসুস্থতার জন্য গৃহ থেকে বহিষ্কৃত হয়ে ঘোড়ার আস্তাবলে থেকে, প্রতিবেশীদের চোখের সামনে মারা যেতে পারে, সেই কলকাতা শহরে ঈশ্বরচন্দ্রের পিতা ঠাকুরদাস এসেছিলেন, নিজে বাঁচার জন্য এবং মা-ভাই-

দিন ভাত খাওয়া চলবে। থালা না থাকলেও কাজ চলে যাবে, কেবল সকল কাজের সহায় ঘটিটা থাকলেই হল। থালা বিক্রীর পয়সা হাতে থাকলে তাই দিয়ে, দিনের বেলা যেদিন কিছু আহার জুটবে না, সেদিন কিছু কিনে খাওয়া যেতে পারে। এত কথা গভীরভাবে চিন্তা করে ঠাকুরদাস একদিন থালাখানা নিয়ে নতুন বাজারের কাঁসারিদের দোকানে বিক্রীর জন্য উপস্থিত হলেন। কাঁসারিরা বলল, অচেনা লোকের কাছ থেকে পুরান বাসন তারা কিনতে পারবে না। মধ্যে মধ্যে এরকম না জেনে চোরাই মাল কিনে তারা বড় ফ্যাসাদে পড়েছে। ঠাকুরদাস দোকানে দোকানে ঘুরলেন। কোন দোকানদারই থালা কিনতে রাজী হল না। অবশেষে সামান্য মূলধন সঞ্চয়ের সুচিন্তিত পরিকল্পনা ত্যাগ করে তাঁকে বাসায় ফিরতে হল।

কি বিচিত্র কলকাতা শহরে এসেছেন তিনি, ঠাকুরদাস মনে মনে ভাবলেন। কোন দয়া নেই, মায়া-মমতা নেই, বিচার-বিবেচনা নেই! অথচ এখনকার মতন শানবাঁধানো পাথরের কলকাতা শহর তখনও গড়ে ওঠেনি। তবু শহর শহর, গ্রাম নয় শহর। নিষ্ঠুরতাই শহরের ধর্ম, কোমলতা নয়। কলকাতার পথে পথে অনাহারে ঘুরে বেড়িয়েছেন ঠাকুরদাস, কত বড়লোকের বাড়ীর দিকে, কত দোকানের দিকে অবাক হয়ে চেয়ে চেয়ে দেখেছেন। অথচ দেওয়ানির ও বেনিয়ানির অপরিমিত অর্থে বিলাসিতার স্রোত বয়ে গিয়েছে তখন কলকাতার পথে। সাহেবদের বাড়ীতে যেমন, তাঁদের কৃপাশ্রিত বাঙালী রাজা-মহারাজাদের বাড়ীতেও তেমনি ভোজ চলেছে, বাইজী-নাচ চলেছে। কেবল আতসবাজীর উৎসবেই হাজার হাজার টাকা ব্যয় হয়েছে। কলকাতার যে অঞ্চলে ঠাকুরদাস বাস করতেন (বড়বাজার), তার কাছাকাছি অঞ্চলে কেবল দুর্গাপূজার সময় যে-পরিমাণ অর্থব্যয় হত, তাই দিয়ে ঠাকুরদাসের মতন হাজারটি দুস্থ পরিবারকে খাইয়ে-পরিয়ে-পড়িয়ে সুখে-স্বচ্ছন্দে মানুষ করা যেত। শোভাবাজারের রাজবাড়ীতে, জোড়াসাঁকোর সিংহবাড়ীতে, মহারাজা সুখময় রায়ের বাড়ীতে, ঠাকুরবাড়ীতে, বেনিয়ান বারাণসী ঘোষের বাড়ীতে, দুর্গাপূজার সময় নিমন্ত্রিত সাহেবদের নিয়ে যে রকম নাচ গান হল্লা, বাজী পোড়ানোর উৎসব হত, তা গ্রামের ছেলে ঠাকুরদাস নিশ্চয় তখন দু'-একবার দেখেছেন। দেখে তাঁর কি মনে হত তা তিনি পরবর্তীকালে কাউকেই বলে

যাননি, এমন কি তাঁর পুত্র ঈশ্বরচন্দ্রকেও না। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ থেকে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদ পর্যন্ত এই ধরনের উৎসব কলকাতা শহরে পূর্ণোদ্যমে চলেছে। সেকালের অনেক ইংরেজী ও বাংলা পত্রিকায় এই সব উৎসবের বিস্তারিত বিবরণ আছে।[১৯] এই সব উৎসব-প্রাঙ্গণের আশেপাশেই ঠাকুরদাস যে কত দিন ঘুরে বেড়িয়েছেন, তার ঠিক নেই। মধ্যে মধ্যে পথের ধারে খাবারের দোকানের সামনেও যে তিনি ক্লান্ত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতেন, পয়সার অভাবে কিছু কিনে খেতে পারতেন না, তারও প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু কেউ তাঁর ক্ষুধার্ত মুখের দিকে চেয়ে দেখত না, দেখলেও কিছু বলত না। কলকাতা শহর যে!

মানবতার ধর্ম, নতুন শহর কলকাতায়, তখনও অঙ্কুরিত হয়নি। নবযুগের মানবমুখী জীবনাদর্শের বিকাশ হচ্ছিল, মধ্যযুগের মানবপ্রেমের বোধকে দলিত করে। দাসত্বপ্রথার নিষ্ঠুরতার পর্বও তখনও শেষ হয়নি। দাস কেনাবেচা কলকাতা শহরেও চলত এবং দাসদের উপর যে নির্যাতন করা হত, তা অমানুষিক। ঠাকুরদাসের কলকাতায় আসার আট-দশ বছর আগেকার একটি ঘটনা উল্লেখ করছি। ঘটনাটি তখনকার পত্রিকাতে প্রকাশিত হয়েছিল। জনৈকা অল্পবয়স্কা বালিকা দাসীকে, অসুস্থ বলে, কসাইতলার (বেন্টিক স্ট্রীট) একটি বাড়ী থেকে মালিকরা তাড়িয়ে দেন। পাশের স্যাঁতসেঁতে একটি ঘোড়ার আস্তাবলে তাকে থাকতে দেওয়া হয়। বাড়ীর মালিকরা এবং আশপাশের প্রতিবেশীরা মধ্যে মধ্যে আস্তাবলে গিয়ে মেয়েটিকে কিছু খাবার দিয়ে আসতেন। কিছুদিনের মধ্যে অসুস্থ বালিকাটি মারা যায়।[২০] ছোট্ট একটি ঘটনা। ১৭৯২ সালের কলকাতার একটি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। ঐ একই সময়ের বাবুদের বাড়ীর উৎসবের খবর এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে। কলকাতা শহরের অন্তরের খবর পাওয়া যায় এই সব ঘটনা ও সংবাদ থেকে। ঠাকুরদাস যখন কলকাতার পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন, তখনও শহরে এই রকমের ঘটনা ঘটত। যে কলকাতা শহরে ক্রীতদাসী বালিকা অসুস্থতার জন্য গৃহ থেকে বহিষ্কৃত হয়ে ঘোড়ার আস্তাবলে থেকে, প্রতিবেশীদের চোখের সামনে মারা যেতে পারে, সেই কলকাতা শহরে ঈশ্বরচন্দ্রের পিতা ঠাকুরদাস এসেছিলেন, নিজে বাঁচার জন্য এবং মা-ভাই-

বোনদের বাঁচাবার জন্য। প্রায় পঁচিশ বছর পরে এই পিতার সঙ্গেই যে-কলকাতা শহরে ঈশ্বরচন্দ্র প্রথম এসেছিলেন, তার সঙ্গেও এই কলকাতার পার্থক্য অনেক!

একদিন মধ্যাহ্নের ঘটনা। ক্ষুধায় অস্থির হয়ে, দালালবাবুর বাসা থেকে বেরিয়ে ঠাকুরদাস পথে পথে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। যদি শহর দেখতে দেখতে, অন্যমনস্ক হয়ে, খিদের কথা ভোলা যায়। বনেজঙ্গলে খিদের কথা ভোলা যায়, শহরে কখন ভোলা যায় না। বড়বাজার থেকে ঠনঠনে পর্যন্ত ঘুরতে ঘুরতে এসে ঠাকুরদাস ক্ষুধার যন্ত্রণায় ক্লান্ত হয়ে পড়লেন। কিছুক্ষণ পরে একটি দোকানের সামনে এসে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলেন। দেখলেন এক মধ্যবয়স্কা বিধবা স্ত্রীলোক দোকানে মুড়িমুড়কি বিক্রী করছেন। গরীব ব্রাহ্মণের ছেলে, গ্রামের ছেলে, মুড়িমুড়কির দোকানের সঙ্গে খুবই পরিচিত। ঠাকুরদাসকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে স্ত্রীলোকটি জিজ্ঞাসা করলেন, দাঁড়িয়ে আছ কেন বাবা? ঠাকুরদাস তৃষ্ণার কথা বলে জল চাইলেন। দোকানের স্ত্রীলোকটি ঠিক শহুরে নন, তাই শুধু জল না দিয়ে, কিছু মুড়কি ও জল দিলেন। ক্ষুধার্ত ঠাকুরদাস কি রকম ব্যস্ত হয়ে মুড়কিগুলি খেলেন তা ঐ স্ত্রীলোকটির দৃষ্টি এড়াল না। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন: 'আজ বুঝি তুমি কিছু খাওনি বাবা?' 'না, মা, এখনও কিছু খাইনি', ঠাকুরদাস বললেন। 'দাঁড়াও বাবা, একটু দাঁড়াও, জল খেও না' বলে তিনি পাশের এক খাবারের দোকান থেকে কিছু দই কিনে এনে, আরও কিছু মুড়কি দিয়ে, ঠাকুরদাসকে পেট ভরিয়ে ফলার করালেন। পরে ঠাকুরদাসের মুখে সব কথা শুনে তিনি বেশ জোর দিয়েই বলে দিলেন যে, যেদিন আহার হবে না, সেদিন যেন দোকানে এসে নিঃসঙ্কোচে পেট ভরে তিনি ফলার করে যান।

ঘটনাটি পিতার মুখে শুনে ঈশ্বরচন্দ্রের কি মনে হয়েছিল তা তিনি স্বরচিত জীবনচরিতে লিখে গিয়েছেন। তিনি লিখেছেন:

> পিতৃদেবের মুখে এই হৃদয়বিদারণ উপাখ্যান শুনিয়া, আমার অন্তঃকরণে যেমন দুঃসহ দুঃখানল প্রজ্বলিত হইয়াছিল, স্ত্রীজাতির উপর তেমনই প্রগাঢ় ভক্তি জন্মিয়াছিল। এই দোকানের মালিক, পুরুষ হইলে,

ঠাকুরদাসের উপর কখনই এরূপ দয়াপ্রকাশ ও বাৎসল্য প্রদর্শন করিতেন না।

মানবসভ্যতার কলঙ্ক, শৃঙ্খলিত স্ত্রীজাতির বহু বন্ধন ও বেদনা দূর করার জন্য সারাজীবন যিনি আপসহীন সংগ্রাম করেছেন, তাঁর এই উক্তি কেবল ভাবপ্রবণ উক্তি নয়।

ঠাকুরদাস মধ্যে মধ্যে তাঁর আশ্রয়দাতাকে বলতেন, এবারে আমাকে সামান্য মাসিক বেতনে যে কোন একটা কাজ যোগাড় করে দিন। কলকাতা শহরে থেকে সব সময় তাঁর মনে হত বীরসিংহ গ্রামের কথা, মা দুর্গা দেবী ও ছোট ছোট ভাইবোনদের কথা। কিছুদিন পরে মাসিক দু' টাকা বেতনে তিনি এক জায়গায় কাজে নিযুক্ত হলেন। নিজে অর্ধাহারে অনাহারে থেকেও তিনি বেতনের দুটি টাকা মা'কে পাঠিয়ে দিতেন। এইভাবে দু' টাকা মাইনের চাকরী করে দু' তিন বছর কেটে গেল। তার মধ্যে কলকাতা শহরের কত শ্রীবৃদ্ধি হল, কত খানাপিনা ভোজ হল, কত বাইনাচ হল, বাজী পুড়ল, আদালতের মামলা মোকদ্দমায় কত দেওয়ান-বেনিয়ানের উপার্জিত অর্থের অপব্যয় হতে থাকল, কত বাবুদের বংশধররা খেউড় আর হাফ-আখড়াই শুনে, যাত্রায় নোট প্যালা দিয়ে, মদ্যপান করে, বুলবুলির লড়াই দেখে, উচ্ছন্নে যেতে লাগলেন, তার ঠিক নেই! ঠাকুরদাস দু' টাকা মাইনের চাকরী নিষ্ঠার সঙ্গে করতে লাগলেন এবং তাঁর সততায় সন্তুষ্ট হয়ে মালিক বেতন বৃদ্ধি করে দিলেন! দু' টাকা থেকে মাসিক পাঁচ টাকা তাঁর বেতন হল। এমন সময় সংসারত্যাগী রামজয় তর্কভূষণ তীর্থভ্রমণ করে ফিরে এলেন দেশে। এর মধ্যে যে এত ঘটনা ঘটে গিয়েছে, তা কিছুই তিনি জানতেন না। প্রথমে বনমালিপুর গিয়ে দেখলেন, কেউ নেই। বীরসিংহে এসে সব বৃত্তান্ত শুনলেন। জ্যেষ্ঠ পুত্র ঠাকুরদাস কলকাতায় গিয়েছে শুনে, তিনি কলকাতায় তাকে দেখতে এলেন। পিতাপুত্রের মিলন হল কলকাতার বড়বাজারে। পুত্রের মুখে তার কষ্টসহিষ্ণুতার কাহিনী শুনে, তিনি প্রাণভরে আশীর্বাদ করে বললেন, 'বেঁচে থাক বাবা!' ঈশ্বরচন্দ্রের জীবনের কর্ণধার হবার মতন যোগ্যতর ব্যক্তি ঠাকুরদাসের চেয়ে আর কে হতে পারেন? বাংলার সমাজ-রণাঙ্গনে

সব চেয়ে বড় বীর যোদ্ধা যিনি, তাঁর শিক্ষকের নিজস্ব শিক্ষানবীশী কলকাতা শহরেই আরম্ভ হয়েছিল।

বড়বাজারের দয়েহাটা অঞ্চলে ভাগবতচরণ সিংহ নামে একজন 'অবস্থাপন্ন উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ বাস করতেন। তর্কভূষণ মহাশয়ের সঙ্গে তাঁর বিলক্ষণ পরিচয় ছিল। তাঁর সঙ্গে দেখা করে একদিন তিনি ঠাকুরদাস সম্বন্ধে সব কথা তাঁকে বললেন। সিংহ মহাশয় শুনে খুবই দুঃখিত হলেন এবং বললেন যে এখন থেকে ঠাকুরদাস তাঁর বাড়ীতেই থাকবেন। ভাগবতচরণের আশ্রয়ে থেকে ঠাকুরদাসের আহার-নিদ্রার কষ্টের অবসান হল। 'যথাসময়ে আবশ্যকমত, দুই বেলা আহার পাইয়া, তিনি পুনর্জন্ম জ্ঞান করিলেন।' সিংহ মহাশয়ের সহায়তায় মাসিক আট টাকা বেতনে তিনি এক স্থানে কাজে নিযুক্ত হলেন। ঠাকুরদাসের আট টাকা মাইনে হয়েছে শুনে, 'তদীয় জননী দুর্গাদেবীর আহ্লাদের সীমা রহিল না।' ঠাকুরদাসের বয়স তখন তেইশ-চব্বিশ বছর। চোদ্দ-পনের বছর বয়সে তিনি কলকাতায় এসেছিলেন। দীর্ঘ আট নয় বছর কঠোর সংগ্রামের পর মাসিক আট টাকা উপার্জনের যখন ক্ষমতা হল ঠাকুরদাসের, তখন তর্কভূষণ মহাশয় পুত্রের বিবাহ দেওয়া স্থির করলেন।

১৮১৪-১৫ সালের কথা। এই সময় থেকে রামমোহন রায় স্থায়িভাবে কলকাতাবাসী হলেন। অনুবাদ ও ভাষ্যসহ বাংলা ভাষায় প্রথম তাঁর বেদান্তগ্রন্থ প্রকাশিত হল। 'আত্মীয় সভা' স্থাপিত হল। ডেভিড হেয়ার ও অন্যান্য বন্ধুদের সঙ্গে রামমোহন পৌত্তলিকতা ও ধর্মসংস্কার সম্বন্ধে আলাপ-আলোচনা করতে লাগলেন। নতুন শিক্ষা প্রবর্তনের জন্য মহাবিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাব হল। হেয়ার সাহেবই সেই প্রস্তাব করলেন। 'আত্মীয় সভা'র সভ্য বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় সেই প্রস্তাব নিয়ে সুপ্রীমকোর্টের বিচারপতি স্যার এডওয়ার্ড হাইড ঈস্টের গৃহে যাতায়াত করতে লাগলেন। নবযুগের বাংলার মহাপাঠশালা 'হিন্দু কলেজ' প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা হল। বালক ডিরোজিও তখন ড্রামণ্ডের ধর্মতলা অ্যাকাডেমীতে লেখাপড়া শিখছেন। ঠনঠনিয়ার ঘোষ-পরিবারে রামগোপাল ঘোষ তখন জন্মগ্রহণ করেছেন (১৮১৪ সালে)। নিমতলার মিত্র-পরিবারে প্যারীচাঁদ

মিত্রেরও জন্ম হয়েছে (১৮১৪ সালে)। এমন সময়, ঢাকঢোল বাজিয়ে ঠাকুরদাস গোঘাটনিবাসী রামকান্ত তর্কবাগীশের কন্যা ভগবতী দেবীকে বিবাহ করতে গেলেন।

বীরসিংহ গ্রামে, ঈশ্বরচন্দ্রের ভাবী জননী ভগবতী দেবীকে পুত্রবধূরূপে দুর্গা দেবী যখন বরণ করছেন, কলকাতা শহরেও তখন নবজাগরণের আগমনী সুর শোনা যাচ্ছে।

৪ | জন্ম ও বাল্যকাল

'শকাব্দা ১৭৪২, ১২ই আশ্বিন, মঙ্গলবার, দিবা দ্বিপ্রহরের সময়, বীরসিংহ গ্রামে আমার জন্ম হয়। আমি জনকজননীর প্রথম সন্তান।' শকাব্দা ১৭৪২, ১২ আশ্বিন, ইংরেজী ১৮২০ সাল, ২৬ সেপ্টেম্বর। বাংলা ১২২৭ সন।

বেলা দ্বিপ্রহরে জন্ম হয়েছিল ঈশ্বরচন্দ্রের। নবযুগের তখন প্রাতঃকাল। শুধু বাংলায় নয়, সারা বিশ্বে এক বৈপ্লবিক নবযুগের সূর্যোদয় হচ্ছে তখন। ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে। ১৭৮৭ সালে পৃথিবীর প্রথম লৌহপোত তৈরি হয়েছিল। কিন্তু ১৮২১ সালে পৃথিবীর প্রথম বাষ্পীয় লৌহপোত তৈরি হয়।[১] জলপথই তখন মানুষের চলাচলের প্রধান পথ, দেশ থেকে দেশান্তরে চলার অন্যতম পথ। যুগ থেকে যুগান্তরে যাত্রার পথও জলপথ। স্থলপথে তখনও লৌহ রেলপথ স্থাপিত হয়নি, বাষ্পীয় রেলগাড়ীর যুগও আসেনি। প্রথম বাষ্পীয় লৌহপোতের আবির্ভাব পৃথিবীর ইতিহাসে একটা যুগান্তকারী ঘটনা। ১৮২০ সালে ঈশ্বরচন্দ্র জন্মালেন, ১৮২১ সালে এই ঘটনা ঘটল পৃথিবীতে। এক বছরের ঈশ্বরচন্দ্র বীরসিংহ গ্রামে যখন হাঁটি-হাঁটি-পা-পা করে চলতে লাগলেন, বিশ্বের প্রথম বাষ্পীয় লৌহপোত তখন সমুদ্রপথে তার অভিনব অভিযান আরম্ভ করল। এ-অভিযান আগের তুলনায় অনেক বেশি গতিশীল। বাষ্পীয় যুগে নতুন পথ চলার এই হল সূচনা। বাষ্পীয়

লৌহপোত সেই পথের প্রথম পথিক। আমাদের দেশে ঈশ্বরচন্দ্র এই নতুন গতিশীল যুগপথের প্রথম পথিক। এদেশের স্থিতিশীল সমাজে তিনিই প্রথম গতিশীল বাষ্পীয় লৌহপোত। উভয়েরই তাই বোধ হয় একই সময়ে আবির্ভাব।

বাষ্পীয় লৌহপোতের সঙ্গে জন্ম হল 'স্বাধীন বাণিজ্যনীতি'র (Free Trade-এর)। অর্থনীতির ঐতিহাসিকেরা বলেন, ১৮২০ সালই হল স্বাধীন বাণিজ্যনীতির জন্মকাল।[২] ১৮২০ সালে লণ্ডনের ব্যবসায়ীরা অবাধ বাণিজ্যের পথে যাবতীয় বাধাবিপত্তি অপসারণের জন্য পার্লামেণ্টে আবেদন করেন। ঐতিহাসিক আবেদন। নবযুগের অর্থনৈতিক ইতিহাসে অবাধ বাণিজ্যনীতির রাষ্ট্রিক স্বীকৃতিও একটা যুগান্তকারী ঘটনা। তার পর দেশ থেকে দেশান্তরে বাণিজ্যের বাধাবন্ধনহীন জয়যাত্রার শুরু। দেশের ধনদৌলতের আদানপ্রদান ও জাতীয় সম্পদবৃদ্ধির সূচনাও তখন থেকে। ১৮২০ সালের আগে যন্ত্রযুগের যে সব চেয়ে বড় কাজ, উৎপাদনযন্ত্র নির্মাণের কাজ, তার সূত্রপাতই হয়নি বলা চলে। লণ্ডনে বা ল্যাঙ্কাশায়ারে পেশাদার যন্ত্রনির্মাতাদের বা ম্যানুফ্যাক্চারারদের আবির্ভাবই হয়নি ১৮২০ সালের আগে। ১৮২০ সালের পর থেকে তাঁদের আবির্ভাব শুরু হয়েছে।[৩] যন্ত্র দিয়ে উৎপাদনযন্ত্র নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে যেদিন থেকে, সেই দিন থেকে প্রকৃত শিল্পবিপ্লবের (Industrial Revolution) সূচনা হয়েছে।

ঈশ্বরচন্দ্রের জন্মের সঙ্গে এই সব ঘটনাবলীর যোগাযোগ আপাতদৃষ্টিতে আকস্মিক মনে হলেও, ঠিক তা নয়। বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি আবিষ্কারের অথবা সামাজিক নীতি প্রবর্তনের তথাকথিত আকস্মিকতারও একটা ইতিহাস আছে। বাইরে থেকে যা আকস্মিক বলে মনে হয়, আসলে তা আকস্মিক নয়। স্টীমবোট বা বাষ্পীয়পোত আরও এক শতাব্দী আগে অকস্মাৎ আবিষ্কৃত হয়নি, অবাধ বাণিজ্যনীতিও প্রবর্তিত হয়নি। তার জন্য একটা সুদীর্ঘ প্রস্তুতির পর্ব থাকা প্রয়োজন, একটা সামাজিক অভাববোধ ও তাগিদের চাপ থাকা প্রয়োজন। এই প্রস্তুতি, অভাববোধ ও তাগিদ থেকেই মানুষের চিন্তাধারার পরিবর্তন হয় এবং সমাজের প্রতিভাবান ব্যক্তিরা তাই থেকে নতুন আবিষ্কারের ইঙ্গিত ও প্রেরণা পান। শিল্পবিপ্লবের ক্ষেত্র ইংলণ্ডে অনেক আগে

থেকে প্রস্তুত হচ্ছিল, মৌলিক যন্ত্রপাতির আবিষ্কারও হচ্ছিল, কিন্তু তবু যতদিন না শিল্পোদ্‌যোগীরা যন্ত্র দিয়ে উৎপাদনযন্ত্র নির্মাণের কাজে অবতীর্ণ হয়েছিলেন, সামাজিক তাগিদের চাপে, ততদিন প্রকৃত শিল্পবিপ্লব সম্ভব হয়নি। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদের শেষ দিকে এই ঘটনাগুলি কতকটা যেন একসঙ্গে ঘটতে আরম্ভ করল। তার কারণ একটির সঙ্গে অন্যটির যোগসূত্র আছে। বাষ্পীয় লৌহপোতের সমুদ্রযাত্রার সঙ্গে বাণিজ্যের প্রসার প্রয়োজন। অবাধ বাণিজ্যনীতি ভিন্ন সেই প্রসার সম্ভব নয়। আবার অবাধ বাণিজ্যনীতির পূর্ণ সদ্ব্যবহার করতে হলে বাণিজ্যের সামগ্রীর প্রয়োজন। বাণিজ্যের সামগ্রী প্রচুর পরিমাণে উৎপাদন করতে হলে যন্ত্রশিল্পের বিস্তার প্রয়োজন এবং তার জন্য আবার উৎপাদনযন্ত্র নির্মাণ করা দরকার। এইভাবে প্রত্যেকটি ঘটনার মধ্যে পারস্পরিক সম্বন্ধ আছে দেখা যায়। বিশ্বের রঙ্গমঞ্চে যখন এই ঘটনাগুলি ঘটছে, তখন এক নতুন যুগের সূচনা হচ্ছে এবং পুরাতন যুগ অস্ত যাচ্ছে। তার প্রভাব কোন একটি বিশেষ ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকছে না। প্রাকৃতিক প্রাচীর ডিঙ্গিয়ে বাইরের অন্যান্য দেশেও তার প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া দেখা দিচ্ছে। এক নতুন সমাজ ও নতুন জীবন গড়ার চেতনা জাগছে মানুষের মনে। এই পরিবেশে নতুন নতুন মানুষ জন্মগ্রহণ করছে, দেশে দেশে। আমাদের দেশেও এই সময় নবযুগের সব নতুন মানুষ জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তার আগে বিদেশীরা এসে এখানে নতুন জীবনের সঙ্গে, নতুন যুগের সঙ্গে যোগাযোগের সেতু রচনা করেছিলেন। বিশ্বের অগ্রগতির বার্তাবাহক হয়ে এসেছিলেন তাঁরা। হয়ত অগ্রগতিব ক্ষেত্র প্রস্তুতের মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে তাঁরা আসেননি, নিজেদের সঙ্কীর্ণ স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যেই তাঁরা এসেছিলেন। কিন্তু তবু তাঁরা যে কেবল ধ্বংসের প্রতিমূর্তি হয়ে এসেছিলেন তা নয়, পরোক্ষে দৌত্যগিরি করেছিলেন নবযুগের। সেই দিক থেকে বিচার করলে, আমাদের দেশেও, বিশেষ করে বাংলাদেশে যে নবযুগের অভ্যুদয়ের ক্ষেত্র প্রস্তুত হচ্ছিল, তাতে কোন সন্দেহ নেই। নবযুগের 'ভারতপথিক' রামমোহন রায় এইরকম এক প্রস্তুতির পরিবেশের মধ্যেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন। শুধু তিনি নন, আরও অনেকে যাঁরা এই সময় জন্মেছিলেন তাঁরাও নতুন যুগের নতুন মানুষের অগ্রগতির পথ তৈরি করতে

কুন্ঠিত হননি। কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্র জন্মেছিলেন নবযুগের উদ্‌যোগপর্বের সমাপ্তির শুভক্ষণে। শুভক্ষণের ঐতিহাসিক তাৎপর্য অসাধারণ বলেই একথা বলা প্রয়োজন। যদি আরও পঞ্চাশ কি একশ বছর আগে তিনি জন্মগ্রহণ করতেন, তাহলে তিনি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর হতে পারতেন না। অন্য কোন ক্ষেত্রে তাঁর শক্তি ও প্রতিভার বিকাশ হত, ইতিহাসে তিনি স্মরণীয়ও হয়ত হতেন, কিন্তু বাংলার 'বিদ্যাসাগর' তিনি কখনই হতেন না। যদি আরও পঞ্চাশ কি একশ বছর পরে, বিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে, তিনি জন্মগ্রহণ করতেন, তাহলে বিদ্রোহী যুগপুরুষ বিদ্যাসাগর হয়ত পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সমাজবিপ্লবীদের মধ্যে অগ্রগণ্য বলে পরিচিত হতেন। কিন্তু ১৮২০ সালের এক বিশেষ ঐতিহাসিক শুভক্ষণে, বীরসিংহ গ্রামে, যে ঈশ্বরচন্দ্রের জন্ম হয়েছিল, তিনিই বাংলার বিদ্যাসাগর-রূপে ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছেন।

ঈশ্বরচন্দ্র যখন পশ্চিমবাংলার এক অখ্যাত গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন তখন গ্রামে গ্রামে অশিক্ষিত ধাত্রীরা ছিল, কিন্তু আধুনিক বৈজ্ঞানিক ধাত্রীবিদ্যার বিকাশ হয়নি। গর্ভাবস্থায় ভগবতী দেবী খুব যে স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে ছিলেন, তাও নয়। ঠাকুরদাস তখন পুরো দশ টাকাও মাইনে পান না। তখনকার টাকার ক্রয়শক্তি অনেক বেশি থাকলেও, আট টাকায় অতবড় পরিবারের ভরণপোষণ স্বচ্ছন্দে চালানো সম্ভব হত না। পরিবারের সকলের দুবেলা দুমুঠো অন্নসংস্থান সম্ভব হত কি না সন্দেহ। সংসারে চিরদিন সমস্ত দুঃখকষ্টের প্রধান ভারটা মেয়েরাই মুখ বুজে সহ্য করেন। ঈশ্বরচন্দ্রকে গর্ভে ধারণ করে এরকম অনেক কষ্ট ভগবতী দেবীকে হাসিমুখে ও নীরবে সহ্য করতে হয়েছে। শাশুড়ী দুর্গা দেবীর সজাগ দৃষ্টি এড়িয়েও, দরিদ্র পরিবারের অনেক বাঙালী বধূর মতন তিনি অনাহারে ও অল্পাহারে হয়ত আত্মপীড়ন করেছেন গর্ভাবস্থায়। পরিমিত খাদ্যই যাঁর অদৃষ্টে জুটত না, তাঁর পক্ষে পুষ্টিকর খাদ্য যে কত দুর্লভ ছিল তা সহজেই ভাবা যায়। বিশ্রাম বা আরাম কোনটাই তিনি ভোগ করার অবকাশ পাননি। তাই গর্ভাবস্থায় ভগবতী দেবী স্বভাবতঃই খুব অসুস্থ

হয়ে পড়েছিলেন। নানারকম রোগের উপসর্গ দেখা দিয়েছিল এবং তিনি প্রায় উন্মাদের মতন হয়ে গিয়েছিলেন। দরিদ্র সংসারে, সুখাদ্য ও সুচিকিৎসার অভাবে আমাদের দেশে সন্তানসম্ভবা জননীদের আজও এরকম হয়।

গ্রামে তখন হাসপাতালও ছিল না, আধুনিক ধাত্রীবিদ্যাবিশারদ চিকিৎসকরাও ছিলেন না। ভাগ্যবিধাতা জ্যোতিষীরা ছিলেন, অশিক্ষিত ধাত্রী ও কবিরাজরা ছিলেন। গ্রামবৃদ্ধদের মতামতই বিশেষজ্ঞদের মতামতের মতন পালনীয়। বিশেষ করে, প্রসূতির ব্যাপারে গাইনকোলজিস্টের বদলে তখন গ্রামবৃদ্ধারাই ছিলেন ডিক্টেটর। দুর্গা দেবী সাধ্যমতো টোটকা করেছিলেন। তাতে যখন কোন ফল হল না, তখন গ্রামবৃদ্ধারা যথারীতি রায় দিলেন যে, তাঁর পুত্রবধূ ভগবতী দেবীকে হয় ভূতে পেয়েছে, না হয় ডাইনীতে পেয়েছে। বীরসিংহ গ্রামে কেন, তখন কলকাতা শহরেও যথেষ্ট ভূতপ্রেত-ডাইনীর দৌরাত্ম্য ছিল। ধীরে ধীরে গ্যাসের আলোয়, বিদ্যুতের আলোয় ও লোকবসতির চাপে তারা অন্তর্ধান করেছে। তার সঙ্গে পেশাদার ওঝারাও বিদায় নিয়েছেন। ঈশ্বরচন্দ্রের জন্মকালে বাংলাদেশের গ্রামে ভূতপ্রেত-ডাইনীর দৌরাত্ম্য ছিল খুব বেশি এবং গ্রাম্য ওঝাদেরও যথেষ্ট প্রতিপত্তি ছিল। ভগবতী দেবীর ভূত ঝাড়াবার জন্য ওঝাদের ডাকা হল। কিন্তু ভূত কিছুতেই নামল না। বীরসিংহের কাছে উদয়গঞ্জ গ্রামে বিখ্যাত জ্যোতিষী ভবানন্দ শিরোমণি বাস করতেন। রোগনির্ণয়ের জন্য তিনিও এলেন এবং তার জন্য কোষ্ঠীবিচার করে বললেন যে রোগও নেই, ভূতপ্রেতও কিছু নেই, মাতৃগর্ভে এক মহাপুরুষ আছেন, তাঁরই বিভূতির প্রকাশ হচ্ছে।

ভগবতী দেবীর গর্ভে ভূত আছে, কি মহাপুরুষ আছে, তাই নিয়ে বিচার গণনা, ঝাড়ফুঁক, তুক্‌তাকের পালা ক্রমে শেষ হল। অবশেষে ১২২৭ সনের ১২ আশ্বিন, মঙ্গলবার, বেলা দ্বিপ্রহরের সময় ভূমিষ্ঠ হলেন যিনি, তিনি ভূতও নন, মহাপুরুষও নন, অতিদরিদ্র ব্রাহ্মণপরিবারের সন্তান, শীর্ণকায় মানবশিশু।

সমাজে যখন কোন অসাধারণ ব্যক্তির জন্ম হয়, তখন সাধারণ মানুষের মধ্যে তাই নিয়ে, অবশ্যই পরবর্তীকালে, অলৌকিক কাহিনী রচনার প্রবণতা

দেখা দেয়। মধ্যযুগের মানসভূমিতে এই প্রবণতা প্রবল থাকে। ঈশ্বরচন্দ্রের জন্ম নিয়ে তাই বহু অবিশ্বাস্য লোককাহিনী রচিত হয়েছে। কাহিনী হিসেবেই তা গ্রহণ করা উচিত।

পিতামহ রামজয় তর্কভূষণ তীর্থপর্যটনকালে কেদার পাহাড়ে নাকি স্বপ্ন দেখেছিলেন যে, তাঁর বংশে একজন সুপুত্রের জন্ম হবে। ঈশ্বরচন্দ্রের জন্মের পর তিনি সেই কথা স্মরণ করে নাতির নাম রেখেছিলেন 'ঈশ্বর'। কোন মানুষের নাম রেখে তিনি খুশি হননি। তার চেয়েও লক্ষণীয় হল, অসংখ্য দেবতার মধ্যে একজন কোন দেবতার দাস বলেও তিনি তাঁর পৌত্রকে পরিচিত করতে চাননি। একেবারে সোজাসুজি 'ঈশ্বর' নাম রেখেছিলেন। কোন নির্দিষ্ট গুণশক্তিসম্পন্ন দেবতার নাম নয়, অফুরন্ত শক্তির আধার ও উৎস দুর্ধর্ষ রামজয়ের কল্পনারাজ্যের যে 'ঈশ্বর', নবজাত শিশুপৌত্রের নাম হল তাই। রামজয়ের স্বপ্ন সত্য হয়েছিল, কিন্তু সে স্বপ্নের গুণে নয়, ঈশ্বরচন্দ্রের চারিত্রিক গুণে। ঈশ্বরের কল্পনাকে তিনি মানবিক রূপ দিয়েছিলেন। ঈশ্বর নয় শুধু, ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর কল্পনার ঈশ্বরের মতন প্রবল শক্তি নিয়ে, রক্তমাংসে গড়া তাঁর শিশুপৌত্রটি ভবিষ্যতে একদিন মানুষের সমাজে আবির্ভূত হবে, বাস্তব জীবনে, এই হয়ত মনে মনে তাঁর কামনা ছিল। তাই তিনি তাঁর পৌত্রের ডাকনাম রেখেছিলেন 'ঈশ্বর' এবং সামাজিক নাম 'ঈশ্বরচন্দ্র'। তা যদি না হত, তাহলে তিনি পরিহাস করে এই ঈশ্বরকে 'এঁড়ে বাছুর' বলে ডাকতেন না। ঈশ্বর নামের মধ্যে রামজয় যে দুর্বার শক্তি কল্পনা করেছিলেন, পরবর্তীকালে ঈশ্বরচন্দ্রের জীবনে সেই শক্তিরই প্রকাশ হয়েছিল। কেদার পাহাড়ের নিশীথকালের স্বপ্ন বাস্তব সত্য হয়ে উঠেছিল ঈশ্বরচন্দ্রের জীবনে, এবং বাংলার সমাজের প্রখর দিবালোকে।

মাতৃগর্ভ থেকে ঈশ্বরচন্দ্র যখন ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন তখন তাঁর পিতা ঠাকুরদাস গৃহে ছিলেন না, বীরসিংহের আধ ক্রোশ দূরে কোমরগঞ্জ গ্রামের হাটে গিয়েছিলেন। শনি-মঙ্গলবারে কোমরগঞ্জের হাট বসত। রামজয় হাটের দিকে যাচ্ছিলেন ঠাকুরদাসকে ঈশ্বরের জন্মসংবাদ দেবার জন্য। যাবার পথে তাঁর সঙ্গে ঠাকুরদাসের দেখা হতে তিনি বললেন: 'আমাদের একটি এঁড়ে বাছুর হয়েছে।' সেই সময় তাঁদের বাড়ীতে একটি গাই গরু গর্ভিণী ছিল।

তারও প্রসব হবার সম্ভাবনা ছিল। সেইজন্য রামজয়ের কথা শুনে ঠাকুরদাস ভাবলেন, গাই গরুটির বোধ হয় এঁড়ে বাছুর হয়েছে। বাছুর দেখার জন্য ঠাকুরদাস যখন গোয়ালঘরে ঢুকতে যাচ্ছেন, তখন রামজয় একগাল হেসে বললেন: 'ওদিকে নয়, এদিকে এস, আমি তোমাকে এঁড়ে বাছুর দেখিয়ে দিচ্ছি।' এই বলে তিনি আঁতুড়ঘরে নিয়ে গিয়ে নবজাত শিশু ঈশ্বরচন্দ্রকে দেখিয়ে দিলেন।

স্বরচিত জীবনচরিতে এই কাহিনীর উল্লেখ করে ঈশ্বরচন্দ্র লিখেছেন:

> এই অকিঞ্চিৎকর কথার উল্লেখের তাৎপর্য এই যে, আমি বাল্যকালে, মধ্যে মধ্যে অতিশয় অবাধ্য হইতাম। প্রহার ও তিরস্কার দ্বারা পিতৃদেব আমার অবাধ্যতা দূর করিতে পারিতেন না। এই সময় তিনি সন্নিহিত ব্যক্তিদের নিকট, পিতামহদেবের পূর্বোক্ত পরিহাস বাক্যের উল্লেখ করিয়া বলিতেন—'ইনি সেই এঁড়ে বাছুর; বাবা পরিহাস করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তিনি সাক্ষাৎ ঋষি ছিলেন; তাঁহার পরিহাসবাক্যও বিফল হইবার নহে; বাবাজি আমার ক্রমে এঁড়ে গরু অপেক্ষাও একগুঁইয়া হইয়া উঠিতেছেন।' জন্মসময়ে পিতামহদেব পরিহাস করিয়া আমায় এঁড়ে বাছুর বলিয়াছিলেন; জ্যোতিষশাস্ত্রের গণনা অনুসারে বৃষরাশিতে আমার জন্ম হইয়াছিল; আর সময়ে সময়ে, কার্য দ্বারাও এঁড়ে গরুর পূর্বোক্ত লক্ষণ আমার আচরণে বিলক্ষণ আবির্ভূত হইত।

পিতামহের কথা যে বর্ণে বর্ণে সত্য, ঈশ্বরচন্দ্র তাঁর নিজের জীবনে তা প্রমাণ করেছিলেন। এঁড়ে গরুর একগুঁয়েমিই তাঁর চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল। পদে পদে প্রতিটি কাজে যত তিনি বাধা পেতেন, তত তাঁর পদক্ষেপ দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হয়ে উঠত। গোঁড়ামির উদ্ধত ভ্রূ-ভঙ্গির সামনে তাঁর সহজ সরল ধুতি-চাদর-চটি-পরা বাঙালীর মূর্তিটি বজ্রের মতন কঠোর হয়ে উঠত, উন্নত ললাটের তলায় অপ্রশস্ত চিবুকটি নিরাপস নির্মম রূপ ধারণ করত। ক্ষমার অযোগ্য যে তাকে তিনি কখনও ক্ষমা করতেন না। অন্যায় সহ্য করা তিনি সবচেয়ে বড় অপরাধ বলে মনে করতেন। দয়ার পাত্র যে নয়, দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর একবিন্দু বারিও তাকে দান করেননি কোনদিন। তাঁর দয়া

চরমভোগীর বদান্যতার বিলাসিতা ছিল না। তাঁর ঐতিহাসিক উইল তার শ্রেষ্ঠ প্রমাণ। যিনি আজীবন ভোগী তিনি সর্বস্ব ত্যাগ করে স্বনামধন্য হয়েছেন, এরকম দৃষ্টান্ত ইতিহাসে বিরল নয়। কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্রের মতন সত্যকার আদর্শ ত্যাগীর দৃষ্টান্ত মানবসমাজে দুর্লভ।

যুক্তিহীন সনাতন অন্ধ বিশ্বাস ও গোঁড়ামির স্পর্ধিত আস্ফালনের বিরুদ্ধে আজীবন যে দরিদ্র ব্রাহ্মণতনয় নির্ভয়ে সংগ্রাম করেছেন, ছেলেবেলায় তাঁকে পরিহাস করে 'এঁড়ে বাছুর' বলা ভুল হয়নি। ঈশ্বরচন্দ্র নিজেও তা জানতেন বলে মনে হয়। তা না হলে, শেষ জীবনে নিজের জীবনচরিত রচনার সময়, তার অসমাপ্ত কয়েকটি মাত্র পৃষ্ঠার মধ্যে তিনি এই পরিহাসের কাহিনীটুকু উল্লেখ করে এমনভাবে মন্তব্য করা প্রয়োজনবোধ করতেন না।

১৮৫৫ সালে, ৩৫ বছর বয়সে, বিদ্যাসাগর যখন সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন, তখন এদেশের শিশুদের মাতৃভাষা শিক্ষার জন্য তিনি বর্ণপরিচয় প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ রচনা করেন। শিশুদের নীতিশিক্ষা দেবার জন্য তিনি প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগের মধ্যে কয়েকটি ছোট ছোট পাঠ রচনা করে সংযোজন করেন। বর্ণপরিচয় প্রথম ভাগের একটি পাঠে (১৯ পাঠ) গোপালের, আর একটি পাঠে (২০ পাঠ) রাখালের গল্প আছে। বাঙালী মাত্রেই গল্প দু'টি জানেন।

> গোপাল বড় সুবোধ। তার বাপ মা যখন যা বলেন, সে তাই করে। যা পায় তাই খায়, যা পায় তাই পরে, ভাল খাব ভাল পরিব বলিয়া উৎপাত করে না।...গোপাল যখন পড়িতে যায়, পথে খেলা করে না; সকলের আগে পাঠশালায় যায়; পাঠশালায় গিয়া আপনার জায়গায় বসে; আপনার জায়গায় বসিয়া বই খুলিয়া পড়িতে থাকে; যখন গুরু মহাশয় নূতন পড়া দেন, মন দিয়া শুনে।
>
> খেলিবার ছুটি হইলে, যখন সকল বালক খেলিতে থাকে, গোপালও খেলা করে। আর আর বালকেরা খেলিবার সময় ঝগড়া করে, মারামারি করে। গোপাল তেমন নয়। সে একদিনও, কাহারও সহিত, ঝগড়া বা মারামারি করে না।

গোপালের গল্পের পর রাখালের গল্প আছে। গোপাল যেমন সুবোধ, রাখাল তেমন নয়। গোপাল যা করে না, রাখাল ঠিক তাই করে। গোপাল সুবোধ, রাখাল দুষ্টু। তাই, 'রাখালকে কেহ ভালবাসে না। কোন বালকেরই রাখালের মত হওয়া উচিত নয়। যে রাখালের মত হইবে, সে লেখাপড়া শিখিতে পারিবে না।'

বাংলাদেশে গোপালের অভাব নেই। শুধু গোপাল নয়, এদেশ নাড়ু-গোপালের দেশ। এদেশের লোকের ধারণা, বসে বসে হাত ঘুরুলেই নাড়ু পাওয়া যায়, নইলে নাড়ু পাওয়া যায় না। গোপাল ও নাড়ুগোপাল পথে-ঘাটে অনেক দেখা যায়। স্কুল কলেজের গোপাল, বিশ্ববিদ্যালয়ের গোপাল, কর্মক্ষেত্রের গোপাল, সংসারের গোপাল, নানারকমের গোপাল আছে বাংলা-দেশে। রাখালেরও অভাব নেই। কিন্তু বর্তমান সমাজ গোপালদের যতটা নয়, রাখালদের উপযোগী তার চেয়ে অনেক বেশি। তাই বোধ হয় রাখালের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বেশি কথা ঈশ্বরচন্দ্র বলেননি। কেবল এইটুকু বলেছেন: 'যে রাখালের মত হইবে, সে লেখাপড়া শিখিতে পারিবে না।' কিন্তু রাখালেরা আর কিছু 'করিতে পারিবে, কি না পারিবে', সে-সম্বন্ধে তিনি কিছু বলেননি।

এদেশের দুরন্ত রাখালদের প্রতি ঈশ্বরচন্দ্রের মনের গোপন কোণে কোথায় যেন গভীর সহানুভূতি লুকান ছিল, যা বাইরে সহজে প্রকাশ পেত না। গোপালের চেয়ে রাখালের সঙ্গে তাঁর নিজের জীবনেরও সাদৃশ্য ছিল অনেক বেশি। একথা রবীন্দ্রনাথ সুন্দরভাবে বিদ্যাসাগর-প্রসঙ্গে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন :

> বিদ্যাসাগর তাঁহার বর্ণপরিচয় প্রথম ভাগে গোপাল নামক একটি সুবোধ ছেলের দৃষ্টান্ত দিয়াছেন, তাহাকে বাপমায়ে যাহা বলে, সে তাহাই করে। কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্র নিজে যখন সেই গোপালের বয়সী ছিলেন, তখন গোপালের অপেক্ষা কোনো কোনো অংশে রাখালের সঙ্গেই তাঁহার অধিকতর সাদৃশ্য দেখা যাইত। পিতার কথা পালন করা দূরে থাক, পিতা যাহা বলিতেন, তিনি ঠিক তাহার উল্টা করিয়া বসিতেন।

পিতা যদি বলতেন, স্নান করো, তিনি বলতেন, স্নান করব না। যদি বলতেন, খাও, তিনি বলতেন, খাব না। যদি বলতেন, পরিষ্কার কাপড় পর, তিনি

বলতেন, ময়লা কাপড় পরব। প্রচণ্ড গোঁ ছিল তাঁর বাল্যকাল থেকেই। তাই পিতা ঠাকুরদাস তাঁর দুরন্তপনায় অতিষ্ঠ হয়ে মধ্যে মধ্যে অন্যদের কাছে ঈশ্বরচন্দ্রকে দেখিয়ে বলতেন: 'এই যে দেখছেন, ইনিই সেই এঁড়ে বাছুর! আমার পিতা পরিহাসছলে হয়ত নাতিকে এই বলে ডেকেছিলেন, কিন্তু তাঁর পরিহাস ঋষিবাক্যের মতন সত্য হয়েছে।'

গোপালের তুলনায় রাখালের সঙ্গেই ঈশ্বরচন্দ্রের অধিকতর সাদৃশ্যের কথা উল্লেখ করে রবীন্দ্রনাথ স্মরণীয় মন্তব্য করেছেন:

> নিরীহ বাংলাদেশে গোপালের মতো সুবোধ ছেলের অভাব নাই। এই ক্ষীণতেজ দেশে রাখাল এবং তাহার জীবনীলেখক ঈশ্বরচন্দ্রের মতো দুর্দান্ত ছেলের প্রাদুর্ভাব হইলে বাঙালীজাতির শীর্ণচরিত্রের অপবাদ ঘুচিয়া যাইতে পারে। সুবোধ ছেলেগুলি পাস করিয়া ভালো চাকরিবাকরি ও বিবাহকালে প্রচুর পণ লাভ করে, সন্দেহ নাই, কিন্তু দুষ্ট-অবাধ্য-অশান্ত ছেলেগুলির কাছে স্বদেশের জন্য অনেক আশা করা যায়। বহুকাল পূর্বে একদা নবদ্বীপের শচীমাতার এক প্রবল দুরন্ত ছেলে এই আশা পূর্ণ করিয়াছিলেন।

বহুকাল পরে বীরসিংহের ভগবতী দেবীর আর এক প্রবল দুরন্ত ছেলে এই আশা আবার নতুন করে পূর্ণ করেছিলেন। নবদ্বীপের নিমাই, আর বীরসিংহের ঈশ্বর, বাংলার ইতিহাসের দুই স্বতন্ত্র যুগসন্ধিক্ষণের দুই আদর্শ যুগপুরুষ।

গোপালের মতন সুবোধ বালকদের চেয়ে রাখালের মতন দুরন্ত বালকদের প্রতি ঈশ্বরচন্দ্রের মমতা ও আস্থা বেশি ছাড়া যে কম ছিল না, তার প্রমাণ তাঁর নিজের কর্মজীবন থেকেও পাওয়া যায়। তিনি নিজে যখন অধ্যাপনা করতেন এবং সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ হয়েছিলেন তখন ছাত্রদের অপরাধপ্রবণতার দিকে সজাগ দৃষ্টি রেখেও, তাদের দুরন্তপনাকে কোনদিন তিনি সেকালের গুরুমশায়দের মতন কঠোর দণ্ড দিয়ে দমন করতেন না। এ-সম্বন্ধে প্রত্যক্ষদর্শীদের দু'-একটি কাহিনী এখানে উল্লেখ করছি।

বিদ্যাসাগর যখন সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন (১৮৫১-১৮৫৮ সাল) তখন হিন্দু কলেজের ছাত্রদের সঙ্গে সংস্কৃত কলেজের ছাত্রদের প্রায়ই ঝগড়া মারামারি হত। মারামারির সময় ইট-পাটকেলও ছোঁড়া হত। সেকালের

ছাত্রদের সঙ্গে তুলনা করে যাঁরা কথায় কথায় একালের ছাত্রদের অনেক বেশি দুর্বিনীত ও উচ্ছৃঙ্খল বলে অভিযোগ করেন, এই ঐতিহাসিক দৃষ্টান্তটি তাঁদের কৌতূহল জাগাবে। হিন্দু কলেজ ও সংস্কৃত কলেজ তখন একই প্রাঙ্গণে, সংলগ্ন গৃহে ছিল। সংস্কৃত কলেজের ছাত্ররা ছাদের উপর ইটপাটকেল সংগ্রহ করে রাখত এবং মারামারির সময় সেগুলি উপর থেকে হিন্দু স্কুল ও কলেজের ছাত্রদের মাথা লক্ষ্য করে ছুঁড়ত। মারামারির ফলে অনেক ছাত্রের দেহ ক্ষতবিক্ষত হয়ে যেত। এক-এক সময় এত গুরুতর মারামারি হত যে থানা থেকে পুলিশ এসে হাজির হত। কিন্তু সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ বিদ্যাসাগর মহাশয়, যিনি 'সকল বালকেরই গোপালের মত হওয়া উচিত' লিখেছেন, তিনি তখন কি করতেন? বিদ্যাসাগর মহাশয় বারান্দায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতেন, কোন্ পক্ষের জিত্ হয়, কোন্ পক্ষের হার হয়। গোপাল ও রাখালের জীবনীলেখক ঈশ্বরচন্দ্রের এই আচরণ বিস্ময়কর নয় কি? ছাত্রদের ইট-পাটকেল ছোঁড়াছুঁড়িতেও তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে ধৈর্য হারাতেন না। যখন এমন গুরুতর মারামারি পর্যন্ত হত যে গোপালের মতন সুবোধ ছেলেরা, বিকেল চারটায় ছুটির পরেও, বাড়ী যেতে পারত না, ক্লাসে জড়সড় হয়ে বসে থাকত ভয়ে এবং পুলিশ এসে তাদের মাথা আগ্‌লে বাইরে পথে বা'র করে দিত, তখনও অধ্যক্ষ বিদ্যাসাগর মহাশয় এতটুকু বিচলিত হতেন না। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তিনি ইট-পাটকেল সহযোগে ছাত্রদের খণ্ডযুদ্ধ দেখতেন। কাহিনীটি বিদ্যাসাগরের অন্যতম সহযোগী ও অন্তরঙ্গ বন্ধু গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্নের পুত্র হরিশচন্দ্র কবিরত্ন (সংস্কৃত কলেজে বিদ্যাসাগরের অধ্যক্ষতাকালে ছাত্র ছিলেন) তাঁর ছাত্রজীবনের স্মৃতিকথায় লিখে গেছেন।[৪] হরিশচন্দ্র লিখেছেন: 'বিদ্যাসাগর মহাশয় দেখতেন, কোন্ পক্ষের জিত হয় এবং কোন্ পক্ষের হার হয়।' বিজয়ী রাখালদের তিনি পুরস্কার দিতেন কি না, সেকথা তাঁর বন্ধুপুত্র ও প্রিয় ছাত্র হরিশচন্দ্র উল্লেখ করেননি। কিন্তু তিরস্কার যে করতেন না তাতে কোন সন্দেহ নেই।

ক্লাসের দুষ্টু ছেলেদের সকলের সামনে শাস্তি দেওয়ার ঘোরতর বিরোধী ছিলেন বিদ্যাসাগর। যে কোন অপরাধের জন্যই হোক, ক্লাসের অন্যান্য সহপাঠীদের সামনে কোন ছাত্রকে শাস্তি দেওয়া তিনি একেবারে পছন্দ করতেন না। তাতে কিশোর বালকদের আত্মমর্যাদাবোধে আঘাত লাগে এবং ক্রমাগত

আঘাত লাগার ফলে বালকের সেই বোধশক্তিও ধীরে ধীরে নষ্ট হয়ে যায়। তার ফলে সেই বালকের অন্তর্নিহিত মানবচরিত্রের পূর্ণবিকাশ হয় না। আধুনিক মনোবিজ্ঞান ও শিক্ষাবিজ্ঞানের যুগে, একালের শিক্ষাবিদ্‌রা এসব কথা জানেন। কিন্তু আধুনিক শিক্ষার জন্মকালে বিদ্যাসাগরই সর্বপ্রথম এই নীতি আমাদের দেশের শিক্ষাক্ষেত্রে প্রয়োগ করেন। 'যে রাখালের মত হইবে, সে লেখাপড়া শিখিতে পারিবে না'—একথা বর্ণপরিচয়ের পাঠকদের কাছে দৃষ্টান্তস্বরূপে উল্লেখ করলেও, কখনও তিনি রাখালের মতন দুরন্ত বালকদের অবহেলা বা অপমান করতেন না। তাঁর প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের তিনি পরিষ্কার নির্দেশ দিয়ে দিতেন, ছেলেদের যেন কখনও এইভাবে শাস্তি দেওয়া না হয়। তখনকার দিনে শিক্ষকরা ছাত্রদের এই ধরনের শাস্তি দিতে একটুও দ্বিধাবোধ করতেন না। বালকরা যে ভবিষ্যতের সব ছোট ছোট মানুষ, তাদের মধ্যেও যে মানবিক মান-অপমানবোধ আছে, সে সম্বন্ধে কোন কাণ্ডজ্ঞানই ছিল না শিক্ষকদের। তখনকার কথা তো বহু দূরের কথা, কুড়ি পঁচিশ বছর আগে একালে আমাদের ছাত্রজীবনেও দেখেছি, শিক্ষকরা নির্বিচারে ছাত্রদের দণ্ড দিতে অভ্যস্ত ছিলেন। বিদ্যাসাগরই প্রথম এদেশের রাখালদের মানুষ বলে বিবেচনা করেন এবং শিক্ষকদেরও বিবেচনা করতে উপদেশ দেন। কিন্তু তাঁর নির্দেশ ও উপদেশ লঙ্ঘন করে একবার তাঁরই প্রতিষ্ঠিত মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউশনে (শ্যামপুকুর শাখা) একটি ঘটনা ঘটে। মেট্রোপলিটন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক একবার একটি ছেলেকে বেঞ্চের উপর দাঁড় করিয়ে দেন। খবরটি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কানে পৌঁছতে তিনি তৎক্ষণাৎ চটি পায়ে দিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে বাদুড়বাগান থেকে শ্যামপুকুর হেঁটে চলে যান। খবর পেয়ে এতদূর বিচলিত হয়েছিলেন তিনি যে, পাল্কি ডেকে পাল্কিতে চড়ে যাবারও সময় হয়নি তাঁর। স্কুলে পৌঁছে তিনি প্রধান শিক্ষককে ডেকে পাঠান এবং সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হয়ে তাঁকে তখনই পদচ্যুত করেন। স্কুলের অন্যান্য শিক্ষকরা, এমন কি প্রতিবেশীরা পর্যন্ত, তাঁকে বিশেষ অনুনয়-বিনয় করেন, শান্ত হয়ে, সমস্ত বিষয়টি পুনর্বিবেচনা করার জন্য অনুরোধ করেন। তিনি অটল থাকেন। কয়েকজন শিক্ষক পদত্যাগ করবেন বলে ক্ষোভ প্রকাশ করেন। তাতেও তিনি বিচলিত হন না। তাঁদের পদত্যাগ-পত্র গ্রহণ করে তিনি পরদিন নতুন শিক্ষক নিয়োগ করেন।[৫]

সামান্য ঘটনা! কিন্তু এরকম সামান্য ছোট ছোট ঘটনার ভিতর দিয়েই মানবচরিত্রের অসামান্য দিক উজ্জ্বল হয়ে চোখের সামনে ফুটে ওঠে। একজন দুরন্ত রাখালের অপমানের জন্য বিদ্যাসাগর অবিচলিত চিত্তে এতদূর পর্যন্ত করেছিলেন, এবং তাও যৌবনে নয়, শেষজীবনে। মানুষ, তা সে যত ক্ষুদ্র, যত নগণ্য মানুষই হোক, বিদ্যাসাগরের কাছে তার সবচেয়ে বড় পরিচয় ছিল মানুষ। সেই মানুষকে যখন কেউ অপমান ও অবহেলা করত, তখন রাগে তিনি দিশাহারা হয়ে যেতেন। রাখালদের মতন দুরন্ত বালকদেরও যে আত্মসম্মানবোধ আছে এবং তাদের সেই বোধ যে সস্নেহে জাগিয়ে তোলা উচিত, নির্দয়ের মতন দমন করা উচিত নয়, একথা বিদ্যাসাগর বুঝতেন এবং অন্যদের বোঝাতে চেষ্টা করতেন, বিশেষ করে শিক্ষকদের। শিক্ষার ক্ষেত্রে সারাজীবন তিনি এই নীতি প্রয়োগ করার চেষ্টা করেছেন। সুবোধ গোপালদের নয় শুধু, দুরন্ত রাখালদের মানুষ করে তোলাই ছিল তাঁর প্রধান লক্ষ্য। মনে হয়, রবীন্দ্রনাথের মতন, বিদ্যাসাগরও বুঝেছিলেন যে গোপালের মতন সুবোধ ছেলেগুলি পাশ করে ভাল চাকরিবাকরি পায় এবং বিবাহকালে প্রচুর পণলাভ করে, কিন্তু রাখালের মতন দুষ্ট ছেলেগুলির কাছে স্বদেশের জন্য অনেক আশা করা যায়। তাই বোধ হয় রাখালের জীবনীলেখক, তাঁর বর্ণপরিচয় প্রথম ভাগের পাঠের মধ্যে রাখালের নানাবিধ দুষ্টামির বিবরণ দিয়ে, কেবল এইটুকু বলেছেন, 'যে রাখালের মত হইবে সে লেখাপড়া শিখিতে পারিবে না।' তিনি এমন কথা বলেননি, 'যে রাখালের মত হইবে সে মানুষ হইতে পারিবে না।' বর্ণপরিচয়ের পঞ্চমবর্ষীয় পাঠকদের কাছে লেখাপড়া সম্বন্ধেও এর চেয়ে বেশি কিছু বলা যায় না, বলা উচিতও নয়। তা না হলে বিদ্যাসাগর মহাশয় হয়ত লিখতেন: 'যে রাখালের মত হইবে, সে পরীক্ষায় ভাল নম্বর পাইবে না এবং পাশ করিতে পারিবে না।'

ছেলেবেলায় ঈশ্বরচন্দ্র গোপালের মতন সুবোধ ছেলে ছিলেন না, রাখালের মতন দুরন্ত ছিলেন। তা সত্ত্বেও অবশ্য তিনি লেখাপড়া শিখেছিলেন এবং বিদ্যার সাগর উপাধিও পেয়েছিলেন। লেখাপড়ায় তাঁর আগ্রহ ছিল খুব।

এই একটি বিষয়ে ছাড়া, আর কোন বিষয়ে গোপালের সঙ্গে তাঁর চরিত্রের মিল ছিল না। পাঁচ বছর বয়সে তাঁকে পাঠশালায় ভর্তি করা হল। বীরসিংহে সনাতন সরকার নামে এক গুরুমহাশয়ের পাঠশালা ছিল। ঈশ্বরচন্দ্র পাত্‌তাড়ি বগলে করে সনাতনের পাঠশালায় যাতায়াত করতে লাগলেন। সনাতন মাস্টার খুব প্রহারপটু ছিলেন। সেকালের গুরুমশায়রা সকলেই প্রায় তাই ছিলেন। তাঁর প্রহারের দাপটে সন্ত্রস্ত হয়ে ঠাকুরদাস পুত্রের জন্য অন্য একজন গুরুর সন্ধান করতে লাগলেন। কালীকান্ত চট্টোপাধ্যায় নামে এক কুলীন ব্রাহ্মণ বীরসিংহে বাস করতেন। তিনি স্বকৃত ভঙ্গকুলীন ছিলেন এবং কৌলীন্যের কল্যাণে বহুবিবাহ করে পালাক্রমে শ্বশুরালয়ে বাস করতেন, গ্রামে থাকতেন না। গুরুগিরির গুণ ছিল তাঁর, কিন্তু কৌলীন্যের ব্যবসায়ে অন্নচিন্তা দূর করা অনেক বেশি সহজ বলে, তিনি পাঠশালার দিকে মন দেননি। ঠাকুরদাস অনুসন্ধান করে তাঁকে বীরসিংহে নিয়ে আসেন। পাঠশালা স্থাপন করে কালীকান্ত গুরুমশায় হন। ঈশ্বরচন্দ্র কালীকান্তের পাঠশালায় ভর্তি হন।

'গোপাল যখন পড়িতে যায়, পথে খেলা করে না, সকলের আগে পাঠশালায় যায়।' গোপালের মতন গোপালের জীবনীলেখক ঈশ্বরচন্দ্র কিন্তু কখনই তা যেতেন না। পাঠশালায় যাবার পথে তিনি খেলা করতেন এবং গ্রামবাসীদের নানাভাবে উত্যক্ত করে তুলতেন। প্রতিবেশী মথুরামোহন মণ্ডলের মা পার্বতী ও স্ত্রী সুভদ্রাকে বিরক্ত করবার জন্য তিনি রোজ পাঠশালায় যাবার সময় তাঁদের বাড়ীর দরজার সামনে ময়লা ফেলে যেতেন। শুচিবায়ুগ্রস্তদের বিরুদ্ধে ছোটখাট 'লোক্যাল' সংগ্রাম বলা চলে। মণ্ডলের জননী ও গিন্নী উভয়েই খুব বিরক্ত হতেন। মধ্যে মধ্যে তাঁরা ভয় দেখাতেন এই বলে যে দুর্গা দেবী ও কালীকান্তের কাছে ঈশ্বরের এই আচরণের কথা জানাবেন। একগুঁয়ে ঈশ্বরচন্দ্রের জিদ্‌ বাড়ত এবং বিরক্ত করার বাসনা তাতে আরও উদ্দীপিত হত। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন :

> প্রতিবেশী মথুর মণ্ডলের স্ত্রীকে রাগাইয়া দিবার জন্য যে প্রকার সভ্যবিগর্হিত উপদ্রব তিনি করিতেন, বর্ণপরিচয়ের সর্বজননিন্দিত রাখাল বেচারাও বোধ করি এমন কাজ কখনও করে নাই।

বাস্তবিকই তাই। গুরুমশায় বা পিতামহীর কাছে নালিশের ভয়ে তিনি একটুও বিচলিত হতেন না, বরং দ্বিগুণ উৎসাহে আরও বেশি উপদ্রব করতেন। মথুর মণ্ডলের বৃদ্ধ পিতা দুরন্ত ঈশ্বরকে খুবই স্নেহ করতেন এবং বালকের দুরন্তপনার মধ্যে প্রতিভার আভাস পেয়ে মধ্যে মধ্যে তিনি পুত্রবধূকে বলতেন: 'ঈশ্বরকে খবরদার কিছু বলো না, ওর দুষ্টুমি মা'য়ের মতন সহ্য করো। দেখো, ঈশ্বর একদিন মানুষের মতন মানুষ হবে।'

গ্রামের প্রতিবেশীরা নয় শুধু, নিরীহ গাছপালারাও মুখ বুজে বালক ঈশ্বরচন্দ্রের উপদ্রব সহ্য করত। প্রকৃতির সহ্যগুণ অসীম। পিতামহী বা গুরুমশায়ের কাছে নালিশেরও কোন ভয় নেই সেখানে। দুরন্তপনার অবাধ স্বাধীনতা ও সুযোগ সেখানে পাওয়া যায়। পাঠশালার পথে ধানের ক্ষেতে ও যবের ক্ষেতেও ঈশ্বরচন্দ্র বিচরণ করতে যেতেন। পাকা ধানের ছড়া ও যবের ছড়া তুলে তুলে চিবুতেন। একবার ধানের সুঙা আটকে প্রায় মরণাপন্ন হয়েছিলেন। পিতামহী চিৎ করে কোলে ফেলে অনেক কষ্টে সেই সুঙা বার করে দিয়ে প্রাণ বাঁচান। এত দুরন্ত ছিলেন তিনি। রাখাল বেচারার গুরু হবার যোগ্য।

ধানগাছও যাঁর কাছে রেহাই পেত না, আম জাম কাঁঠাল গাছের যে কি অবস্থা হত, তা কল্পনা করা যায় না। বীরসিংহ গ্রামের গাছপালা দেখে আজও সেই কথা বার-বার মনে হয়। গ্রামের মধ্যে ও আশ-পাশে কত সব প্রাচীন গাছপালা যে আছে, তার ঠিকানা নেই। দেখে বয়স বোঝা যায় না, কিন্তু কত বয়স্ক তারা! তালগাছে তাল ফলতেই তো তিনপুরুষ লাগে। পাঁচ-ছয় পুরুষের আম-জাম-কাঁঠাল গাছ, কতই তো আছে গ্রামে। বীরসিংহেও আছে। ঈশ্বরচন্দ্রের বাল্যজীবনের দুরন্তপনার নীরব সাক্ষী তারা। যদি তারা কথা বলতে পারত, তাহলে বালক ঈশ্বরচন্দ্রের দুষ্টুমির সমস্ত বৃত্তান্ত শুনে এখানে আমি লিপিবদ্ধ করতে পারতাম। সেই সব গাছতলায় আমি বহুবার বসেছি, ঘুরে বেড়িয়েছি, বীরসিংহ গ্রামে, কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্রের ছেলেবেলার কোন স্মৃতিকথা শুনিনি। কেবল অনুভব করেছি তাঁর ছেলেবেলার চঞ্চলতা। বীরসিংহের মাটিতে, মাঠে-ঘাটে, গাছের ডালে ডালে, বালক ঈশ্বরচন্দ্রের পায়ের চিহ্ন আঁকা রয়েছে মনে হয়েছে। সমস্ত বীরসিংহ গ্রাম জুড়ে বালক ঈশ্বরচন্দ্রের দৌরাত্ম্যের পদধ্বনি আজও যেন শোনা যায়।

গ্রাম প্রায় সেই গ্রামই আছে, বাংলার অন্যান্য আরও অনেক গ্রামের মতন। পরিবর্তনের ঝড় বয়ে গেছে অনেক, কিন্তু তার প্রাকৃতিক পরিবেশের বিশেষ কোন পরিবর্তন হয়নি। মণ্ডলরা, গুটিরা, সকলেই আছেন। আরও অনেক পরিবার লুপ্ত হয়ে গিয়েছে। দরিদ্র গ্রাম, মেহনতী মানুষের বাস বেশি। ধনিক জমিদারের কোন প্রাসাদের চিহ্ন নেই কোথাও বীরসিংহ গ্রামে। আভিজাত্যের ভগ্নস্তূপ বা অস্তমিত জৌলুস কোথাও কৌতূহলীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে না। 'বাঁকুড়া রায়' ধর্মঠাকুরের আর শীতলানন্দ শিবের প্রাচীন দেবালয় আছে। আর আছে মাটির ঘর, মাটির গৃহ, যে-ঘরে ঈশ্বরচন্দ্র জন্মেছিলেন, যে-গৃহে তিনি মানুষ হয়েছিলেন। বাংলার নিজস্ব ঘর, নিজস্ব গৃহ, বাংলার প্রকৃতির উপাদানে তৈরি। কৃত্রিমতা নেই তার মধ্যে। গ্রামবাসীরা প্রধানত সেই শ্রেণীর মানুষ, মাটির সঙ্গে জীবনের যোগা-যোগ যাঁদের গভীর। তাঁরা কৃষক, তাঁরা জেলে, তাঁরা বাগদী। বীরসিংহে তাঁদের বাসই বেশি। ব্রাহ্মণ বৈদ্য কায়স্থ-প্রধান গ্রাম নয় বীরসিংহ। অধিকাংশ গ্রামবাসী দরিদ্র হলেও, খাঁটি মানুষ তাঁরা। দরিদ্র ব্রাহ্মণসন্তান ঈশ্বরচন্দ্র ছেলেবেলায় এই দরিদ্র খাঁটি মানুষগুলির মধ্যে মানুষ হয়েছিলেন। কৃষক জেলে বাগদীর ছেলেরাই ছিল তাঁর ছেলেবেলার খেলার সঙ্গী, দৌরাত্ম্যের সহচর। কোন ধনীর দুলাল তাঁর বাল্যকালের সঙ্গী ছিল না। মানুষের সঙ্গে মানুষের পার্থক্যবোধে ছেলেবেলা থেকে তাই তাঁর মনে কোন দীন-হীনতার আত্মগ্লানিকর ভাবের উদয় হয়নি। নিজে তিনি যেমন দরিদ্র ছিলেন, তাঁর সঙ্গীরাও তেমনি দরিদ্র ছিল। সাহচর্যের ফলে কোনরকম আত্মগ্লানি বোধ করার সুযোগ ছিল না তাঁর। তাই পরিণত জীবনে তিনি তীব্র আত্ম-মর্যাদাবোধ নিয়ে, সহজ সরল অকৃত্রিম মানুষ হয়ে গড়ে উঠেছিলেন।

এই প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশের কথা না জানলে বা বুঝলে, বিদ্যা-সাগর-চরিত্রের মহত্ত্বের প্রকৃত উৎসের সন্ধান পাওয়া সম্ভব বলে মনে হয় না।

নাগরিক পরিবেশে মানুষের সঙ্গে মানুষের বৈষম্য যেমন বিকটভাবে আত্ম-প্রকাশ করে, গ্রাম্য পরিবেশে তা সাধারণত করে না। তার কারণ, সামাজিক

স্তরে ওঠা-নামার শক্তিগুলি শহরের মধ্যে, গ্রামের তুলনায় অনেক বেশি সক্রিয়। বিজ্ঞানীরা যাকে সামাজিক 'এলিভেটার' (social elevators) বলেন, শহরেই তার প্রাধান্য বেশি। তাই শহরে সমাজে উচ্চ থেকে নিম্ন স্তরে ওঠা-নামার গতি (vertical mobility) অনেক বেশি তীব্র। উত্থানের ও পতনের বেগও বেশি। শহরের বৈশিষ্ট্যই তাই বৈষম্য, আধুনিক শহরের।[৮] এই বৈষম্যের মধ্যে কোন বালকচরিত্রের সুস্থ ও স্বাভাবিক বিকাশ হয় না, হতে পারে না। মনুষ্যত্বের পূর্ণ বিকাশ পদে-পদে ব্যাহত হয়। ঈশ্বরচন্দ্র যে সামাজিক পরিবেশে জন্মেছিলেন ও মানুষ হয়েছিলেন, বৈষম্যের চেয়ে সাম্যই ছিল তার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। কোনরকম বৈষম্যের মধ্যে তাঁর ব্যক্তিত্ববোধ, আত্মমর্যাদাবোধ ও মনুষ্যত্ববোধ ক্ষুণ্ণ হয়নি। বিশেষ করে, বীরসিংহের অনাড়ম্বর পরিবেশ তাঁর ব্যক্তিত্বের বিকাশের পথ পরিষ্কার করে দিয়েছিল। সুস্থ, সবল ও সাধারণ মানুষের সাহচর্যেই তিনি প্রতিপালিত হয়েছিলেন। তাই জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত সুস্থ ও সবল মনই ছিল তাঁর সবচেয়ে বড় সম্বল ও সম্পদ।

কলকাতা শহরের তখনকার কোন স্কুলে, ধনিক রাজা-মহারাজা ও দেওয়ান-বেনিয়ানের পুত্রদের সঙ্গে যদি তিনি বিনা বেতনে লেখাপড়া শিখতেন ছেলেবেলায়, তাহলে তিনি যথেষ্ট শক্তিমান পুরুষ হলেও, এ রকম সুস্থ ও সবল মনের মালিক হতেন কি না সন্দেহ! গুরুমশায় কালীকান্তের পাঠশালায় যাবার পথে যদি তিনি গ্রামের গদাধরদের সঙ্গে হাডু-ডু-ডু না খেলতেন, মথুর মণ্ডলের মতন সরল প্রতিবেশীদের বিরক্ত করার স্বাধীনতা না পেতেন, মাঠে মাঠে আর ধানক্ষেতে দুরন্ত রাখালের মতন যদৃচ্ছা স্বাধীনভাবে ঘুরে না বেড়াতেন, তাহলে তিনি পরিণত জীবনে হয়ত অন্য কোন স্বনামধন্য পুরুষ হতেন, কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর হতে পারতেন না।

৮ | বাল্যকালের সমাজ

বাংলার হাজার হাজার বৈচিত্র্যহীন গ্রামের মতন বীরসিংহও একটি গ্রাম। বার মাসে তের পার্বণের বাঁধাধরা ছকের মধ্যে একটানা জীবনের ধারা বয়ে যায় সেখানে। বৎসরান্তে একবার ধর্মঠাকুরের গাজনের সময় সকল শ্রেণীর গ্রামবাসীদের মধ্যে প্রাণচাঞ্চল্য দেখা দেয়। ধর্মের গাজনই হল এ-অঞ্চলের সব চেয়ে বড় উৎসব। গ্রামের পর গ্রাম উৎসবের জনরবে মুখর হয়ে ওঠে। উৎসব শেষ হয়ে যায়। আবার সেই গতানুগতিকতার বিষণ্নতা ছেয়ে ফেলে গ্রাম।

তুলসীতলায় প্রণাম করে সন্ধ্যা দেন ভগবতী দেবী। মনে মনে হয়ত বলেন: 'আমার ঈশ্বরকে একটু সুবুদ্ধি দিও জগদীশ্বর! একটু ধীর-স্থির করো তাকে।' ঈশ্বরের কথা কি ঈশ্বর শোনেন?

ঈশ্বর তখন মাঠে-মাঠে দাপাদাপি ছুটোপাটি করে ঘরে ফিরেছে হয়ত, গুটিদের আর মণ্ডলদের ছেলেদের সঙ্গে। উপদ্রুত ও নির্যাতিত প্রতিবেশীরা এসেছে তার পিছনে-পিছনে। ঈশ্বরের বিরুদ্ধে তাদের অনেক অভিযোগ, বালক ঈশ্বরের বিরুদ্ধে।

অভিযোগ থাকারই কথা! কার মুর্গীতে ধান খেয়ে গেল, কার বক্রীতে নটেগাছটি মুড়িয়ে দিলে, তাই নিয়ে যে গ্রাম্যসমাজে খণ্ডপ্রলয় বেধে যায়, সেখানে

বালক ঈশ্বরচন্দ্রের উৎপাতে যে ফরিয়াদীরা বাড়ীর সামনে ভিড় করে দাঁড়াবে, অন্তত তর্কভূষণ মহাশয়কে তাদের নালিশটুকু জানাবার জন্য, তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

রামজয় ও দুর্গা দেবী ঈশ্বরের বিরুদ্ধে সমস্ত মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করেন প্রতিদিন। কেউ খুশি হয়, কেউ হয় না। ঈশ্বরের বিরুদ্ধে একটা চাপা অসন্তোষও দেখা দেয় গ্রামের মধ্যে। কারও কারও ধৈর্যচ্যুতি ঘটে। গ্রাম-বৃদ্ধরা ধৈর্য ধরে সহ্য করতে বলেন। অনেক বালকের অনেক চাপল্য দেখেছেন তাঁরা। কিন্তু ঈশ্বরের বালকসুলভ চাপল্যের মধ্যে যে শক্তির প্রাচুর্য উপ্‌চে পড়ে, তা সামান্য শক্তি নয়, এ যেন তাঁরা বহুদর্শীর স্বাভাবিক বোধশক্তি দিয়ে বুঝতে পারেন।

সন্ধ্যা হয়ে যায়। মাটির প্রদীপ জ্বেলে দুর্গা দেবী দুরন্ত নাতিটিকে ডাক দিয়ে বলেন—পড়তে বস। ঈশ্বরচন্দ্র পড়তে বসেন। কি পড়বেন? ছাপা বই কোথায় তখন? বর্ণপরিচয় প্রথম ভাগ, দ্বিতীয় ভাগ, কথামালা, বোধোদয়, এসব তো তখনও লেখা হয়নি। যিনি লিখবেন, তিনিই তো মাটির প্রদীপ জ্বেলে পড়তে বসছেন, পিতামহীর আদেশে। কি পড়বেন তিনি? বালকদের পাঠোপযোগী কোন পাঠ্যপুস্তক তখনও ছাপা হয়নি। ঈশ্বরচন্দ্রের বাল্যকাল, বাংলাদেশের ছাপাখানারও বাল্যকাল বলা চলে।

লেখাপড়ার লেখাটাই ছিল তখন আসল, পড়াটা ছিল নকল। অর্থাৎ আবৃত্তি, পুঁথির পাঠাভ্যাস। অক্ষরের উপর দাগা বুলিয়ে লেখা অভ্যাস করতে হত, আর আবৃত্তি করে মুখস্থ করতে হত পুঁথির পাঠ। প্রথমে তালপাতে লেখা আরম্ভ করতে হত, তার পর লেখার উন্নতি হলে কলাপাতে। ছোট একটি বসবার আসনে বা মাদুরে তালপাতা জড়িয়ে নিয়ে গুরুমশায়ের পাঠশালায় যেতে হত। তাকে পাত্‌তাড়ি বলত। পাঠশালায় যেমন, বাড়ীতেও তেমনি, পাত্‌তাড়ি বগলে করে পড়তে বসতে হত।

তখন ছেলেদের মাথায় বড় বড় চুল রাখবার প্রথা ছিল। কিশোর ও যুবক ছেলেদের মাথায় মেয়েদের মতন দীর্ঘ কেশ শোভা পেত। ছেলেরা অনেক বয়স পর্যন্ত হাতে রূপোর বালা পরত। ঈশ্বরচন্দ্রের ছেলেবেলার কোন ছবি নেই, থাকা সম্ভবও নয়। থাকলে হয়ত দেখা যেত, তখনকার সামাজিক প্রথা

মতন, তাঁর মাথাতেও বড় বড় চুল ছিল এবং পিতামহী দুর্গা দেবী সেই চুল চুড়ো করে ঝুঁটি বেঁধে দিতেন। কোন কোন ছেলের মাথায় ঝুঁটিতে রূপোর বকুল-ফুল বেঁধে দেওয়া হত এবং হাতে থাকত রূপোর বালা। তখনকার প্রায় সকল স্তরের মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলেদের এই ছিল বাল্যকালের বেশ। রামজয় ও দুর্গা দেবী তাঁদের আদরের জ্যেষ্ঠ নাতিটিকে যে এ ছাড়া অন্য কোন আধুনিক বেশে সাজিয়ে রাখতেন তা মনে হয় না। বিশেষ করে, গ্রাম্যসমাজে বালকদের এ বেশ ছাড়া অন্য বেশ তখন দেখা যেত না।

মাথায় ঝুঁটি বেঁধে, পাত্‌তাড়ি বগলে করে, ছোট একখানি ধুতি পরে (হাফপ্যান্টের যুগ তখনও আসেনি), বালক ঈশ্বরচন্দ্র যাতায়াত করতেন কালীকান্তের পাঠশালায়। যাতায়াতের পথে, যত প্রকারে সম্ভব, প্রতিবেশীদের উপদ্রব করতেন। গ্রামের ছেলেদের সঙ্গে কপাটি খেলতেন, ডাণ্ডাগুলি খেলতেন, কুস্তী করতেন। আম জাম পেয়ারা লিচু, গাছ থেকে ইচ্ছা মতন ছিঁড়ে খেতেন। এ সব প্রায় তাঁর দৈনন্দিন কীর্তি ছিল বাল্যকালের। ভয়ডর বলে বিশেষ কিছু ছিল না। জীবন্ত বা মৃত কোন ভূতের ভয়েই তিনি অভিভূত হননি কোনদিন। এদিক থেকে, মল্লযুদ্ধে ভাল্লুকবিজয়ী দুর্জয় রামজয়ের সুযোগ্য পৌত্র ছিলেন তিনি।

প্রতিবেশীদের আপত্তিতে বা হুম্‌কিতে স্বভাবতঃই তিনি বিচলিত হতেন না। তা ছাড়া, যে-কোন আদেশ বা নিষেধ তাঁর উপর আরোপ করা হচ্ছে বুঝতে পারলে, তিনি ছেলেবেলা থেকে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতেন, এবং ঠিক তার বিপরীত কিছু না করে যেন স্বস্তি পেতেন না। অধিকাংশ সময় তাই উল্টো কথা বলে তাঁকে দিয়ে সোজা কাজ করাতে হত। গুরুজনরা এই কৌশলেই তাঁকে মানুষ করতেন।

এ-হেন ঈশ্বর যে প্রতিবেশীদের ওজর-আপত্তিতে কি রকম আচরণ করতেন, তা সহজেই কল্পনা করা যায়। বাধা পেলেই, সেই বাধাকে লঙ্ঘন করার জন্য তাঁর জিদ্‌ বেড়ে যেত। শুধু ছেলেবেলার নয়, এটা ছিল তাঁর সারাজীবনের শ্রেষ্ঠ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। ছেলেবেলায় কেবল তার আভাস পাওয়া যেত তাঁর দুর্বিনীত দুরন্তপনার মধ্যে। মণ্ডলদের গিন্নীকে জ্বালাতন করো না বললে, পরদিন আরও বেশি করে জ্বালাতন করার মতলব করতেন

তিনি। গাছের আম পেড়ে খেও না বললে, হয়ত তাঁর ইচ্ছা করত, আম গাছটাকেই উপ্‌ড়ে ফেলে দিতে। এই ছিল তাঁর প্রকৃতি। স্বাভাবিক ইচ্ছা-পূরণে বাধা দিলে বালকের সমগ্র সত্তা বিদ্রোহ করত। মনে হয় যেন কোন বাধা, কোন শাসন তিনি সুবোধ বালক গোপালের মতন মাথা হেঁট করে নীরবে মেনে নেবার জন্য জন্মগ্রহণ করেননি।

বর্ণপরিচয় প্রথম ভাগের রাখাল বেচারা, যদি তার জীবনীলেখকের এই জীবনকাহিনী জানত, তাহলে লজ্জায় অধোবদন হয়ে থাকত নিশ্চয়!

ইতিহাস কোন একটি স্থানের সীমানার মধ্যে, অথবা কোন একজন ব্যক্তির জীবনের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। ঈশ্বরচন্দ্রের জীবনেতিহাসও নয়। কালের যাত্রাই হল ইতিহাস। একই সময়ে, একই কালে বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন ব্যক্তির জীবনের উপর দিয়ে ইতিহাসের স্রোত বয়ে যায়, কালস্রোত ও ঘটনাস্রোত। ঈশ্বরচন্দ্রের বাল্যকালেও গেছে। সেই স্রোতের তরঙ্গের তারতম্য থাকে, দেশভেদে স্থানভেদে ও পাত্রভেদে সাদৃশ্যও থাকে। সেইসব তারতম্য ও সাদৃশ্য বিচার করে, সব কিছু নিয়ে সমগ্র ইতিহাসের যাত্রাপথ আঁকা-বাঁকা উঁচু-নিচু গতিরেখায় রূপায়িত হয়ে ওঠে।

ইতিহাসের এই সমগ্র গতিশীল রূপটি ধরবার জন্য, ১৮২০ সালে, ঈশ্বরচন্দ্রের জন্মকালে, বীরসিংহ গ্রাম থেকে আমাদের ইংলণ্ডের লণ্ডন শহরে পর্যন্ত দৃষ্টি মেলতে হয়েছিল। কলকাতা শহরে তো হবেই। ঈশ্বরচন্দ্রের বাল্যকাল, ১৮২০ থেকে ১৮২৮ সাল, কেবল বীরসিংহে সীমাবদ্ধ ছিল না। তাঁর সমসাময়িক আরও অনেক ব্যক্তির বাল্যকাল, ১৮২০ থেকে ১৮২৮ সালের মধ্যে আরম্ভ অথবা শেষ হয়েছিল। সকলেই তাঁরা বীরসিংহে জন্মাননি। বীরসিংহ থেকে দূরে অন্যান্য গ্রামে তাঁরা জন্মেছেন, অথবা কলকাতা শহরে। ঘটনাস্রোতও কেবল বীরসিংহে আবদ্ধ হয়ে ছিল না, অন্যান্য স্থানের উপর দিয়েও বয়ে গিয়েছিল। ১৮২০ থেকে ১৮২৮ সাল কেবল বীরসিংহের বালক ঈশ্বরচন্দ্রের জীবনে আসেনি, আরও অনেকের জীবনে এসেছিল। তাঁদের সকলের কথা ঈশ্বরচন্দ্র প্রসঙ্গে জানবার দরকার নেই। কিন্তু যাঁরা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে তাঁর জীবনের

ধারাকে অনেকটা নিয়ন্ত্রিত করেছেন, ঘটনার আবর্তে নবযুগের ঐতিহাসিক কর্মক্ষেত্র কলকাতা শহরে এসে যাঁরা কৈশোরে ও যৌবনে তাঁর সঙ্গে মিলিত হয়েছেন, তাঁদের কথা কার না জানতে ইচ্ছা হয়! না জানলে যেন তাঁকেও সম্পূর্ণ জানা হয় না।

রঙ্গমঞ্চের বিভিন্ন কোণ থেকে আলোকপাত করে অভিনেতার চরিত্রটি যেমন ফুটিয়ে তোলা যায় দর্শকের চোখের সামনে, এও কতকটা তাই। বিভিন্ন জীবন ও ঘটনার আলোয় একটা বিশেষ জীবন তার সমগ্রতা নিয়ে যেমন দৃষ্টিপথে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে, তেমন আর কিছুতে হয় না।

বীরসিংহ গ্রামে ঈশ্বরচন্দ্র যখন প্রতিবেশীদের উপদ্রব করছেন, কালীকান্তের পাঠশালায় পড়ছেন, তখন দ্বারকানাথের পুত্র দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরও প্রায় তাই করছিলেন কলকাতা শহরে। তবে বীরসিংহের সঙ্গে কলকাতা শহরের যেমন পার্থক্য ছিল, ঈশ্বরচন্দ্রের উপদ্রবের সঙ্গে দেবেন্দ্রনাথের উপদ্রবেরও তেমনি পার্থক্য ছিল। দেবেন্দ্রনাথ বয়সে ঈশ্বরচন্দ্রের চেয়ে প্রায় বছর তিনেকের বড় ছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র যখন কালীকান্তের পাঠশালায় ভর্তি হন, দেবেন্দ্রনাথ তখন রামমোহন রায়ের 'অ্যাংলো-হিন্দু' স্কুলে ভর্তি হন। রামমোহনের স্কুলটি ছিল হেদুয়া পুষ্করিণীর ধারে। রামমোহন রায়ের পুত্র রমাপ্রসাদ রায় দেবেন্দ্রনাথের সতীর্থ ছিলেন। প্রতি শনিবার বেলা দু'টোর সময় স্কুলের ছুটি হলে দেবেন্দ্রনাথ রমাপ্রসাদের সঙ্গে যেতেন রামমোহনের মানিকতলার বাগানে। সেখানে গিয়ে তিনি খুব উপদ্রব করতেন। বাগানের গাছ থেকে লিচু ছিঁড়ে, কড়াইশুঁটি ভেঙ্গে, তিনি মনের সুখে খেতেন। বীরসিংহের মণ্ডলদের বাগান নয়, স্বয়ং রামমোহন রায়ের কলকাতার বাড়ীর বাগান। মনের সুখে খেতে বাধা নেই। একদিন রামমোহন বললেন দেবেন্দ্রনাথকে, 'ব্রাদার! রৌদ্রে হুটোপাটি করে বেড়াও কেন, এখানে বসো। যত লিচু খেতে পার, এখানে বসে খাও।' মালিকে ডেকে তিনি লিচু পেড়ে দিতে বললেন। থালা-ভরা লিচু এল, দেবেন্দ্রনাথ মহানন্দে খেলেন।[১] সামনে লোভনীয় লিচুর থাল, পাশে ঋজুচরিত্র রামমোহন রায়। ক'জনের বাল্যজীবনে এরকম দুর্লভ অভিজ্ঞতা লাভের সুযোগ ঘটে? দেবেন্দ্রনাথের জীবনে ঘটেছিল। এই বাল্যস্মৃতি

সারাজীবন তাঁকে অনুপ্রাণিত করেছে। কর্মজীবনে ঈশ্বরচন্দ্রের অনুরাগী ও শুভানুধ্যায়ী সুহৃদদের মধ্যে দেবেন্দ্রনাথও অগ্রগণ্য ছিলেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত 'তত্ত্ববোধিনী সভা' ও 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র সঙ্গে ঈশ্বরচন্দ্র প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। কিন্তু দু'জনের বাল্যজীবনের অভিজ্ঞতা ও পরিবেশের মধ্যে কত পার্থক্যই যে ছিল, কল্পনা করা যায় না। গ্রাম্যসমাজের কূপের মধ্যে, মণ্ডূক-পরিবেষ্টিত হয়ে ঈশ্বরচন্দ্রের বাল্যজীবনের দিনগুলি কেটেছে। দেবেন্দ্রনাথের ছেলেবেলা কেটেছে, রামমোহন ও তাঁর সঙ্গীদের সাহচর্যে, বর্ধিষ্ণু কলকাতা শহরে, উদারতার সমুদ্রতীরে।

বীরসিংহ থেকে দূরে বর্ধমান জেলার পূর্বস্থলী থানার চুপী গ্রামে ১৮২০ সালেই ঈশ্বরচন্দ্রের আর একজন সহকর্মী বন্ধু জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর নাম অক্ষয়কুমার দত্ত। বয়সে দুই বন্ধু কয়েক মাসের ছোটবড় ছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র যখন কালীকান্তের পাঠশালায় পড়তেন, অক্ষয়কুমার তখন গুরুচরণ গুরুমশায়ের কাছে বিদ্যারম্ভ করে, আমিউদ্দীন মুনশীর কাছে ফার্সী শিখছেন এবং গোপীনাথ তর্কালঙ্কারের টোলে সংস্কৃত পড়ছেন। দু'জনের প্রাথমিক শিক্ষার মধ্যে পার্থক্য আছে। সেকালের সঙ্গতিপন্ন মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলেদের ফার্সী শিখতে হত চাকরীর জন্য। অক্ষয়কুমার সঙ্গতিপন্ন পরিবারের সন্তান ছিলেন। তাঁর পিতামহ বর্ধমান রাজবাড়ীতে কর্মচারী ছিলেন এবং পিতা টালির নালার খাজাঞ্চিগিরি ও দারোগাগিরি করতেন। ফার্সী তাঁকে সেইজন্য শিখতে হয়েছিল।[২] ঈশ্বরচন্দ্রের সে সমস্যা ছিল না। তিনি ছিলেন অতি দরিদ্র ব্রাহ্মণ পরিবারের সন্তান। গ্রামে টোল প্রতিষ্ঠা করে, অধ্যাপনা করে জীবন যাপন করাই ছিল তাঁদের পরিবারের আদর্শ। তাই ফার্সী শিক্ষার তাঁর প্রয়োজন হয়নি। অক্ষয়কুমার ও ঈশ্বরচন্দ্র প্রায় এক বয়সে একই সময়ে কলকাতা শহরে এসেছিলেন। তার অনেক পরে দু'জনে কর্মজীবনে মিলিত হয়েছিলেন, কলকাতা শহরেই। বীরসিংহ ও চুপী গ্রামের এই দুই বালকই পরবর্তী জীবনে বাংলা গদ্যভাষাকে আধুনিক সাহিত্যের ভাষারূপে গড়ে তুলেছিলেন।

কলকাতা শহরের দক্ষিণে রাজপুর, হরিনাভি, চাংড়িপোতা ইত্যাদি গ্রামে সেকালে বেশ প্রসিদ্ধ একটি বিদ্যাসমাজ গড়ে উঠেছিল, স্থানীয় জমিদারদের

পোষকতায়। এই বিদ্যাসমাজের পরিবেশে ১৮২০ সালেই ঈশ্বরচন্দ্রের অন্যতম অন্তরঙ্গ বন্ধু ও সহকর্মী, শিবনাথ শাস্ত্রীর মাতুল দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ চাংড়িপোতা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র যখন কালীকান্তের পাঠশালায় পড়ছেন, দ্বারকানাথও তখন গুরুমশায়ের পাঠশালায় ও আত্মীয়ের চতুষ্পাঠীতে পড়ছেন। তাঁর আর একজন সুহৃদ্ গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন পাশে রাজপুর গ্রামে ১৮২২ সালে জন্মেছিলেন। মাথায় ঝুঁটি বেঁধে, পাত্তাড়ি বগলে করে তিনিও পাঠশালায় যেতেন, ঈশ্বরচন্দ্রের মতন। প্রিয় বন্ধু মদনমোহন তর্কালঙ্কার বয়সে ঈশ্বরচন্দ্রের চেয়ে তিন চার বছরের বড় ছিলেন। নদীয়া জেলার বিল্বগ্রামে তাঁরও বাল্যকাল পাঠশালায় ও টোলে পড়ে কেটেছিল। বিদ্যাভূষণ, বিদ্যারত্ন, তর্কালঙ্কার ও ঈশ্বরচন্দ্র সংস্কৃত কলেজে এসে মিলিত হয়েছিলেন, কলকাতা শহরে।[৩]

ঈশ্বরচন্দ্র যখন বছর তিনেকের শিশু, নবযুগমন্ত্রের তরুণ শিক্ষক ডিরোজিও তখন চৌদ্দ-পনের বছরের কিশোর। ড্রামণ্ডের ধর্মতলা অ্যাকাডেমীতে পাঠ শেষ করে তিনি স্কুল ছেড়েছেন চৌদ্দ বছর বয়সে। দু'তিন বছর চাকরি করে, ১৮২৬ সালে হিন্দু কলেজের শিক্ষকরূপে যোগ দিয়েছেন।[৪] পাত্তাড়ি বগলে করে বালক ঈশ্বরচন্দ্র তখন সবেমাত্র বীরসিংহ গ্রামে কালীকান্তের পাঠশালায় যাতায়াত আরম্ভ করেছেন। কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, হরচন্দ্র ঘোষ, রামগোপাল ঘোষ, রাধানাথ শিকদার, রামতনু লাহিড়ী, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, প্যারীচাঁদ মিত্র, সকলেই তখন হিন্দু কলেজের বিভিন্ন শ্রেণীর ছাত্র ছিলেন। ইয়ং বেঙ্গল দল নবজীবনের মন্ত্রে দীক্ষিত হচ্ছেন তখন।

ঈশ্বরচন্দ্র তখন তালপাতা থেকে কলাপাতায় লেখা আরম্ভ করেছেন। সকল রকমের বাংলা অক্ষর লিখতে, নাম লিখতে, চিঠিপত্রাদি লিখতে শিখছেন তিনি। শুভঙ্করের অঙ্ক শিখছেন, নামতা মুখস্থ করছেন। কালীকান্তের সস্নেহ তত্ত্বাবধানে বাংলা অক্ষরে দাগা বুলোচ্ছেন। বীরসিংহ গ্রামে কালীকান্তের পাঠশালায় যখন এই শিক্ষা চলেছে, তখন কলকাতা শহরে হিন্দু কলেজের শিক্ষক ডিরোজিও ইয়ং বেঙ্গল দলের ভাবী নায়কদের শিক্ষা দিচ্ছেন। গুরুমশায় কালীকান্ত তাঁর ছাত্র ঈশ্বরচন্দ্রকে শিক্ষা দিচ্ছেন

শুভঙ্কর, আর নবীন বাংলার তরুণ শিক্ষক ডিরোজিও তাঁর ছাত্রদের শিক্ষা দিচ্ছেন বেকন, হিউম, লক্, টম পেইনের নতুন সমাজদর্শন ও জীবনদর্শন। ইতিহাসে একই সময়ে এইসব ঘটনা ঘটছে। বীরসিংহ গ্রামে ও 'কলকাতা শহরে। ১৮২৬ থেকে ১৮২৮ সালের মধ্যে।

শুভঙ্করের দেশে বেকন, হিউম, লক্, টম পেইনের আবির্ভাব হয়েছে, একথা গুরুমহাশয় কালীকান্ত বা তাঁর ছাত্র ঈশ্বরচন্দ্র কেউই জানতেন না। ডিরোজিও বা তাঁর ছাত্ররাও তখন জানতেন না যে বেকন, হিউম, লক্, টম পেইনের আদর্শের সুযোগ্য ধারক ও বাহক, বাংলার এক অখ্যাত গ্রামে গুরুমশায়ের পাঠশালায় শুভঙ্করের অঙ্ক কষছেন এবং পত্রলেখা শিখছেন। নবযুগের আদর্শের নতুন মহাতীর্থ কলকাতা মহানগরের মহাপাঠশালার* একই প্রাঙ্গণে তখনও তাঁদের মিলন হয়নি।

এদিকে ১৮২০-২১ সালের মধ্যে, 'লটারি কমিটি'র উদ্‌যোগে, ভাগীরথীর পূর্বতীরের কয়েকটি গ্রামসমষ্টি, দীর্ঘকালের গ্রাম্য বেশ ছেড়ে অতিক্রুত আধুনিক শহরের রূপ ধারণ করছিল। কলকাতায় গ্রাম্য পথঘাট, জলা-জঙ্গল, খাল-পুষ্করিণী তখনও পর্যাপ্ত পরিমাণে ছিল। জলা-পুষ্করিণী বুজিয়ে, নতুন নতুন 'ট্যাঙ্ক' কেটে, ড্রেন ও ব্রীজ তৈরি করে, কাঁচা গ্রাম্য পথের বদলে পাকা রাস্তার পরিকল্পনা করে, লটারি কমিটি বাংলার নবযুগের মহানগরের ভিত্‌ পত্তন করছিলেন। কলকাতার অধিকাংশ বাড়ীই ছিল তখন মাটির ঘর, নানা জাতের সব লোকজন নিয়ে ছিল পাড়ায় পাড়ায় গ্রাম্যসমাজ। সেই সব গ্রাম ও গ্রাম্যসমাজ উচ্ছেদ করে, ইট-পাথরের রুক্ষ ও দৃঢ়মূর্তি নিয়ে, কলকাতা শহর গড়ে উঠছিল। যুগের গুণে মাটির গুণও বদলাচ্ছিল। গ্রামের নিঃস্ব মানুষের মতন মাটিও নিঃস্ব, কোন মূল্য নেই তার। কিন্তু শহরের মানুষ আর নিঃস্ব নয়, নিয়তির নিগড়েও বাঁধা নয় তার জীবন। গ্রাম্যসমাজের ছক্‌কাটা বাঁধাধরা বৈষম্য নেই

* 'হিন্দু কলেজ'কে 'অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান কলেজ' ও 'মহাপাঠশালা'ও বলা হত।

সেখানে। শহরে সমাজ পরিবর্তনশীল ও প্রবহমান। তার ধনৈশ্বর্য ও তার নিঃস্বতা দুইই নির্মম। কলকাতা শহরে মাটির মূল্য ও মানুষের মূল্য দুইই একসঙ্গে বদলাতে লাগল। পতিত জমিতে টাকার ফসল ফলতে লাগল। যেসব জমির বিঘা হিসেবেও বাজারদর গণনা করা হত না, কাঠায় কাঠায় তার টাকা-আনা-পাইয়ের হিসেব হতে আরম্ভ হল। লটারি কমিটির অপ্রকাশিত রিপোর্টে দেখা যায়, কলকাতার কেন্দ্রস্থলে, সিমলা অঞ্চল থেকে চৌরঙ্গী পর্যন্ত, ১৮২০ সালে গড়ে ১০০-১৫০৲ টাকা কাঠা-দরে তাঁরা জমি কিনেছেন। জমির মালিকরা প্রচুর উদ্‌বৃত্ত টাকা বিনা মেহনতে পেয়ে নতুন ধনিক হয়েছেন। উন্নত জমি পরে লটারি কমিটি আবার গড়ে ৩০০৲ টাকা কাঠা-দরে পুনরায় বিক্রী করেছেন। একই জমি বারংবার হস্তান্তরিত হয়ে 'বিনা আবাদে' সোনা ফলিয়েছে। শহরের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষেরও ভাগ্যের পরিবর্তন হয়েছে।[৫] নতুন পেশা ও ধান্ধা নিয়ে নবযুগের শ্রেণীসমাজ গড়ে উঠেছে কলকাতা শহরে।

কলকাতা শহরের সমাজ তখন কোন্ পথে চলেছে? বাঙালী সমাজ?

বাংলার সমাজবিন্যাসে একটা বিরাট ওলটপালট হয়ে গেছে এর মধ্যে এবং তার শেষ হয়নি, তখনও হচ্ছে। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮২৩ ও ১৮২৫ সালে 'কলিকাতা কমলালয়' ও 'নববাবু-বিলাস' নামে দু'খানি বই লেখেন। ব্যঙ্গরচনা হলেও, বাঙালী সমাজের নতুন শ্রেণীবিন্যাসের যে পরিষ্কার ইঙ্গিত আছে তাঁর রচনার মধ্যে, তা প্রণিধানযোগ্য।

'কলিকাতা কমলালয়ে'র মধ্যে বিষয়ী ভদ্রলোকদের তিনটি ধারাতে ভাগ করা হয়েছে। প্রথম, যাঁরা বড় বড় কাজ করেন, 'অর্থাৎ দেওয়ানি বা মুচ্ছুদ্দিগিরি কর্ম্ম করিয়া থাকেন,' এবং "অপূর্ব্ব পোষাক জামাজোড়া ইত্যাদি পরিধান করিয়া পাল্‌কী বা অপূর্ব্ব শকটারোহণে কর্ম্মস্থানে গমন করেন।' দ্বিতীয়, মধ্যবিত্ত লোক, 'অর্থাৎ যাঁহারা ধনাঢ্য নহেন কেবল অন্নযোগে আছেন'। রীতিনীতি প্রথম ও দ্বিতীয় ধারার প্রায় একই, 'কেবল দান বৈঠকি আলাপের অল্পতা আর পরিশ্রমের বাহুল্য।' তৃতীয় ধারাকে ভবানী-চরণ 'দরিদ্র অথচ ভদ্রলোক' বলেছেন এবং চারিত্রিক ধারা এদেরও প্রায়

একরকম বলে ব্যাখ্যা করেছেন। 'কেবল আহার ও দানাদি কর্ম্মের লাঘব আছে আর শ্রমবিষয়ে প্রাবল্য বড় কারণ কেহ মুহরি কেহ মেট কেহবা বাজারসরকার ইত্যাদি কর্ম্ম করিয়া থাকেন'। এ ছাড়া, 'অসাধারণ ভাগ্যবান' বলে আর একটি স্বতন্ত্রশ্রেণীর কথা ভবানীচরণ উল্লেখ করেছেন, 'ভগবানের কৃপাতে যাঁহারদিগের প্রচুরতর ধন আছে সেই ধনের বৃদ্ধি অর্থাৎ সুদ হইতে কাহার বা জমিদারির উপস্বত্ব হইতে ন্যায্য ব্যয় হইয়াও উদ্‌বৃত্ত হয়'।[৬]

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে, কলকাতা শহরে, বাঙালী সমাজে নতুন মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকশ্রেণীর বিকাশ হচ্ছিল কিভাবে, তার মোটামুটি আভাস পাওয়া যায়, 'কলিকাতা কমলালয়ে'র এই বিশ্লেষণ থেকে। প্রধানত এখানে বিষয়ী ভদ্রলোকদের কথা বলা হয়েছে, অর্থাৎ যাঁরা চাকরিবাকরি, ব্যবসা-বাণিজ্য করে বিত্তবান ও ভদ্রলোক দুইই হয়েছেন, তাঁদের কথা। এ এক নতুন ধরনের সমাজবিন্যাস। এরকম সামাজিক শ্রেণীবিন্যাস মধ্যযুগে সম্ভব ছিল না। বিষয়কর্মে ধনসঞ্চয় করলে সামাজিক উচ্চশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হবার কোন সম্ভাবনা ছিল না তখন। যেমন আমাদের দেশে সুবর্ণবণিক, গন্ধবণিক, তন্তুবায়, কি অন্যান্য বণিকশ্রেণী কোনদিনই ব্রাহ্মণবৈদ্যের মতন সামাজিক মর্যাদা পাননি। সামাজিক শ্রেণীমর্যাদা মধ্যযুগে ছিল কুলগত বা বংশগত, স্বোপার্জিত বিত্তগত নয়। নবযুগের শ্রেণীমর্যাদা যখন বিত্তগত হল, তখন আমাদের শ্রেণীবিন্যাসের ধারারও পরিবর্তন হল।[৭] পরিহাসছলে হলেও, এই নতুন সমাজবিন্যাসের ধারার ইঙ্গিত করেছেন ভবানীচরণ, তাঁর 'নববাবুবিলাস' গ্রন্থে এইভাবে:[৮]

> ধন্য ধন্য ধার্ম্মিক ধর্ম্মাবতার ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক দুষ্টনিবারক সৎপ্রজাপালক সদ্বিবেচক ইংরাজ কোম্পানি বাহাদুর অধিক ধনী হওনের অনেক পন্থা করিয়াছেন এই কলিকাতা নামক মহানগর আধুনিক কাল্পনিক বাবুদিগের পিতা কিম্বা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আসিয়া স্বর্ণকার বর্ণকার কর্মকার চর্মকার চটকার পটকার মঠকার বেতনোপভুক হইয়া কিম্বা রাজের সাজের কাঠের খাটের মঠের ইটের সরদারি চৌকিদারী জুয়াচুরি পোদ্দারী করিয়া···কিঞ্চিৎ অর্থসঙ্গতি করিয়া কোম্পানির কাগজ কিম্বা জমিদারি ক্রয়াধীন বহুতর দিবসাবসানে অধিকতর ধনাঢ্য হইয়াছেন···

এই ধনাঢ্যদের প্রতিপত্তি সম্বন্ধে ভবানীচরণ মন্তব্য করেছেন, 'ইহারা অখণ্ড দোর্দ্দণ্ড প্রতাপান্বিত অনবরত পণ্ডিতপরিসেবিত।' একশ বছর আগেও অষ্টাদশ শতাব্দীতে, এই শ্রেণীর ধনিকদের সামাজিক প্রতিপত্তির কথা কল্পনা করা যেত না।

অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে বাংলার প্রাচীন সমাজবিন্যাসে ভাঙন ধরেছিল। বড় বড় দেওয়ান ও বেনিয়ানের যুগের আবির্ভাব হয়েছিল। নবাবী আমলের সাংস্কৃতিক উচ্ছিষ্টভোগী ছিলেন তাঁরা। এমনকি, প্রথমযুগের ইংরেজ শাসক ও বণিকরা পর্যন্ত ইতিহাসে 'নবাব' বলে পরিচিত হয়ে আছেন। মুসলমান নবাবদের আমল পলাশীর যুদ্ধের পর শেষ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু নতুন ইংরেজ ও বাঙালী নবাবদের আমল তারপর আরও প্রায় অর্ধশতাব্দী পর্যন্ত ছিল। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বাল্যকালে এই ইংরেজ-বাঙালী হঠাৎ-নবাবদের আমিরীর যুগ অস্তাচলে গেল। বিলীয়মান নবাবদের বংশবৃক্ষে ভদ্রলোক ও বাবুনামে বিভিন্ন স্তরের মধ্যবিত্তশ্রেণী পল্লবিত হয়ে উঠল।

তবু ঈশ্বরচন্দ্রের জন্মকালে ও বাল্যজীবনে, কলকাতার বাঙালী সমাজে, একেবারেই যে সেই অস্তগামী বিকৃত নবাবী কালচারের কোন জের ছিল না তা নয়। তার ভস্মাবশেষ যথেষ্ট ছিল। ১৮২০ সালে, ঈশ্বরচন্দ্র যে বৎসর জন্মগ্রহণ করেন, সেই বৎসর কলকাতা শহরের বিখ্যাত ধনী রামদুলাল দে'র দুই প্রসিদ্ধ পুত্র সাতুবাবু ও লাটুবাবুর বিবাহ হয়। গবর্ণমেণ্ট গেজেটে ইশ্‌তেহার দিয়ে রামদুলাল সকলকে নিমন্ত্রণ করেন। 'ইংলণ্ডীয় সাহেবদের' জন্য দু'দিন নির্ধারিত হয় এবং জানানো হয় যেন 'ঐ দুই দিনে তাঁহার শিমলের বাটীতে গিয়া' সাহেবরা 'নাচ প্রভৃতি দেখেন ও খানা করেন।' চারদিন ঠিক হয় 'আরব ও মোগল ও হিন্দু ভাগ্যবান লোকেরদের' জন্য এবং 'তাঁহারাও উপযুক্ত মত আমোদ প্রমোদ করিবেন,' এ রকম ব্যবস্থা করা হয়।

১৮২০ সালে রামরত্ন মল্লিকও তাঁর পুত্রের বিবাহ দেন। সংবাদপত্রে খবর ছাপা হয়, 'এমন বিবাহ শহর কলিকাতায় কেহ কখনও দেন নাই। বিবাহে যে রকম সমারোহ হয় তাতে অনুমান হয় যে সাত আট লক্ষ টাকার

ব্যয় ব্যতিরেকে এমত মহাঘটা হইতে পারে না।' লোকের মুখে মুখে কেবল বিবাহের কথাই শোনা যেত। 'সকল লোকেই এ বিবাহের প্রশংসা করিতেছে ও কহিতেছে যে এমন বিবাহ আমরা দেখি নাই।'[৯]

হিন্দু উৎসব-পার্বণেরও একটা নতুন ইঙ্গবঙ্গ রূপ তৈরি হয়েছিল। দুর্গোৎসবে সাহেবরা যেতেন, বাইজীর নাচ ও খানাপিনা হত তাঁদের জন্য। নবাবী আমলের বংশানুক্রমিক আভিজাত্য যাঁরা তখনও ছাড়তে পারেননি, এবং নতুন সামাজিক মর্যাদার দিনেও যখন সেই বনেদী আভিজাত্য কিছুটা বজায় রাখার প্রয়োজন ছিল, তখন বাঙালী সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তিরা অনেকেই খানাপিনা ও বাইজী নৃত্যসহ সাহেবদের আপ্যায়িত করতেন। অতিথি-আপ্যায়নের সামাজিক রীতি ছিল তাই, বিশেষ করে উচ্চশ্রেণীর বাঙালী সমাজে। একালের ধনিকরা হোটেলে খানাপিনা নৃত্যসহ আমন্ত্রিতদের আপ্যায়ন করে থাকেন। সেকালে যখন হোটেলের তেমন প্রতিষ্ঠা ও প্রসার হয়নি, তখন ধনিক ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা নিজেদের গৃহে বা বাগানবাড়ীতে ঐ একই প্রথায় অতিথিদের অভ্যর্থনা করতেন।

১৮২৩ সালে দ্বারকানাথ ঠাকুর তাঁর নতুন বাড়ীতে গৃহপ্রবেশ উৎসব করেন। তাতে তিনি অনেক 'ভাগ্যবান সাহেব ও বিবীরদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনাইয়া চতুর্বিধ ভোজনীয় দ্রব্য ভোজন করাইয়া পরিতৃপ্ত' করেছিলেন এবং 'ভোজনাবসানে ঐ ভবনে উত্তম গানে ও ইংগ্লণ্ডীয় বাদ্যশ্রবণে ও নৃত্য দর্শনে' সাহেবরা যথেষ্ট আমোদ করেছিলেন। পরে ভাঁড়েরা নানারকম সং সেজেছিল এবং 'তাহার মধ্যে একজন গো বেশ ধারণপূর্ব্বক ঘাস চর্ব্বণাদি করিল।'[১০]

১৮২২ সালে ফ্যানি পার্কস (Fanny Parkes) নামে একজন মহিলা কলকাতা শহরে এসে কিছুদিন ছিলেন এবং তখনকার ইংরেজ ও বাঙালী অভিজাত মহলে মেলামেশা করেছিলেন। তখনকার কলকাতার পরিবেশ সম্বন্ধে তিনি লিখেছেন—'Calcutta was gay in those days'—গবর্ণমেণ্ট হাউসে প্রচুর পার্টি হত—'Parties numerous at the Government house'—এবং এদেশী ধনিকদের গৃহে ভোজসভা ও বল্‌নাচও হত যথেষ্ট—'Fancy and dinner balls amongst the inhabitants.' ১৮২৩ সালের মে মাসে

রামমোহন রায়ের বাড়ীতে একটি ভোজসভা হয়েছিল। সেই সভার বর্ণনা দিয়েছেন ফ্যানি এইভাবে :

> সেদিন সন্ধ্যাবেলা আমরা একজন ধনী বাঙালী বাবু রামমোহন রায়ের বাড়ীতে ভোজসভায় গিয়েছিলাম। প্রচুর আলো দিয়ে বাড়ী ও বাগান সাজান হয়েছিল, বাজীও যথেষ্ট পোড়ানো হয়েছিল। গৃহের বিভিন্ন কক্ষে নর্তকীদের নাচগান হচ্ছিল। ভোজ শেষ হবার পর ভারতীয় জাদুকররা নানারকম মজার খেলা দেখাল ; কেউ তরবারি গিলে ফেললে, কেউ বা মুখ দিয়ে আগুন ও ধোঁয়া বার করলে। একজন ডানপায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে, বাঁ পা পিছন দিক থেকে ঘুরিয়ে কাঁধে আটকে দিল।

আর একজন ধনী বাঙালী বাবুর বাড়ীর দুর্গোৎসব প্রসঙ্গে ফ্যানি লিখেছেন যে উৎসবে বহু সাহেব আমন্ত্রিত হয়েছিলেন এবং 'গ্যান্টার অ্যাণ্ড হুপার' কোম্পানী তাঁদের খাদ্য পরিবেশনের ভার নিয়েছিলেন। বরফের সঙ্গে ফরাসী মদ্য তাঁদের পান করতে দেওয়া হয়েছিল। দলে দলে নর্তকীরা বিভিন্ন কক্ষে নাচগান করছিল, হিন্দুস্থানী গান।[১১]

কলকাতা শহরের প্রকাশ্য উৎসবেও নর্তকীরা তখন নেচে বেড়াত বলে মনে হয়। ১৮২২ সালে কলকাতা শহরের একটি চড়ক উৎসবের বিবরণ দিয়েছেন ফ্যানি পার্কস। স্বচক্ষে তিনি উৎসবটি দেখে লিখেছেন :[১২]

> সন্ধ্যার দিকে কালীঘাটের পথে বগি গাড়ীতে চড়ে রওয়ানা হলাম। দেখলাম, পথের দু'ধারে হাজার হাজার লোক জমা হয়েছে। বিচিত্র সাজগোজ করে সব চড়ক পার্বণ দেখতে এসেছে। পিঠে হুক বিঁধিয়ে সন্ন্যাসীরা সব পাক খাবে, তার তোড়জোড় চলেছে। বৈরাগী সাধুও ছিল অনেক। সাধারণত নিম্নশ্রেণীর হিন্দুদের মধ্যেই উৎসবটি খুব প্রিয় দেখা যায়। কেরাঞ্চি গাড়ীতে চড়ে দলে দলে নর্তকীরা এসেছে, গহনাগাটি ও ঝলমলে রঙিন সাজপোষাক পরে। তাদের সঙ্গে অনেক ভদ্রলোক বাবুরাও এসেছেন। লোকে লোকারণ্য হয়ে গেছে, চড়কের এই দৃশ্য দেখার জন্য। কলকাতার সৈন্যবিভাগ থেকে চারিদিকে সেন্ট্রি মোতায়েন করা হয়েছে, ভিড় ঠেকাবার জন্য।

১৮২২-২৩ সালের কথা। ঈশ্বরচন্দ্র তখন দু'তিন বছরের শিশু। গ্রামের গুটি ও মণ্ডলদের কোলেপিঠে চড়ে বেড়াচ্ছেন। বীরসিংহে ধর্মঠাকুরের গাজন তিনিও ছেলেবেলায় দেখেছেন, কিন্তু ফ্যানি পার্কস কালীঘাটে যে গাজন দেখেছিলেন, সে রকম গাজন নয়। কলকাতার ধনিক ও সম্ভ্রান্ত বাঙালী সমাজে, উৎসব পার্বণের যে 'ইয়োরোপীয়' রূপান্তর হচ্ছিল, মল্লিকদের বাড়ী রাসলীলায় যে সাহেব-বিবিদের নাচ হত, তা তাঁর কলকাতাবাসী অন্যান্য সহকর্মী ও বন্ধুদের ছেলেবেলায় দেখবার সুযোগ হলেও, তাঁর হয়নি। দরিদ্র ধীবর ও চাষীপ্রধান গ্রামে তাঁর জন্ম হয়েছিল, ছেলেবেলাও কেটেছিল তাদেরই সাহচর্যে। দুর্গোৎসব তিনিও দেখেছিলেন, কিন্তু গামছা ও চিড়েমুড়ির ফলার সহযোগে। 'গ্যাণ্টার অ্যাণ্ড হুপার' কোম্পানীর ফরাসী মদ্য (বরফসহ) পরিবেশন দেখার সৌভাগ্য হয়নি তাঁর। নিকী বা নান্নিজান নর্তকীদের হিন্দুস্থানী রীতির নাচ দেখারও তাঁর সুযোগ হয়নি। হাজার টাকা 'ফি' ছিল তাদের। দরিদ্র গ্রামের সমস্ত সম্পদ সংগ্রহ করেও 'Catalani of the East'-দের নাচানো সম্ভব ছিল না। গ্রামের গরীব ছেলেমেয়েরা ছোট ছোট নতুন আনকোরা ধুতি শাড়ী পরে, উৎসব-প্রাঙ্গণে হাত ধরাধরি করে নাচত এবং পূজান্তে ইক্ষুখণ্ড প্রসাদ পেয়েই প্রচুর আনন্দ পেত। দুষ্টবুদ্ধি ঈশ্বরচন্দ্র তাতেই খুশি হতেন। রামদুলাল দে ও রূপলাল মল্লিকরা তখন গ্রামে বাস করতেন না। গ্রাম ছেড়ে তাঁরা ভাগ্যান্বেষণে নতুন শহরে এসেছেন এবং ধনোপার্জনের সমস্ত অভিনব সুযোগ গ্রহণ করে ধনকুবের হয়েছেন। সাতুবাবু ও লাটুবাবুদের বিবাহ তাই আর গ্রামে হওয়া সম্ভব নয় এবং হলেও তাতে হাতির পিঠে হাওদায় চড়ে শোভাযাত্রা করা সম্ভব, কিন্তু ইংরেজী, আর্বী, মোগলাই ও হিন্দু রীতিতে অভ্যর্থনা করা বা ঐশ্বর্যের খেলা দেখানো সম্ভব নয়। এসব কিছুই দেখেননি ঈশ্বরচন্দ্র ছেলেবেলায়। ঢাক-ঢোল-সানাই বাজিয়ে, পাল্কি চড়ে, বরযাত্রা তিনি দেখেছেন, কিন্তু তার আর্বী-মোগলাই বা ইয়োরোপীয় রূপ কি রকম হতে পারে, তা দেখার সুযোগ তাঁর হয়নি।

বীরসিংহ গ্রাম থেকে কলকাতা শহর বেশি দূর নয়। ১৮২০ থেকে ১৮২৮ সাল, আট বছর ঈশ্বরচন্দ্র গ্রামে কাটিয়েছেন। সম্পূর্ণ ছেলেবেলা। নতুন শহরের গল্প গ্রামের লোকের মুখে, বিশেষ করে পিতা ঠাকুরদাসের মুখে, তিনি

নিশ্চয় বহুবার শুনেছেন। ঠাকুরদাস যখন মধ্যে মধ্যে কলকাতা থেকে গ্রামে ফিরতেন, তখন তাঁর মুখ থেকে তিনি রূপকথার মতন কলকাতার কথা শুনতেন। নতুন যুগের, নতুন শহরের রূপকথা।

গত শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের কলকাতার যে সামাজিক চিত্র এর মধ্যে ফুটে উঠেছে, তা আংশিক চিত্র, সম্পূর্ণ চিত্র নয়। ফ্যানি পার্কস্ বর্ণিত নাচ-গান-পান-মশগুল কলকাতার অন্তরালে আর একটি কলকাতাও সঙ্গে সঙ্গে গড়ে উঠছিল। নবযুগের নতুন শিক্ষা-সংস্কৃতিকেন্দ্র, নতুন জাগৃতিকেন্দ্র কলকাতা।

ঈশ্বরচন্দ্রের বাল্যকালকে পুরোপুরি 'রামমোহনের যুগ' বলা যায়। কলকাতা শহরে রামমোহনের স্থায়ী বসবাসের পর থেকে এই যুগের অভ্যুদয় হয়। ঈশ্বরচন্দ্রের জন্মের কয়েক বছর আগে থেকেই রামমোহন নবযুগের ঐতিহাসিক দিক্‌নির্ণয়ের কাজে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। বাংলা ভাষায় প্রথম 'বেদান্তগ্রন্থ' (১৮১৫) তিনি প্রকাশ করেছেন। বিচার বিতর্কও আরম্ভ করেছেন পূর্ণোদ্যমে, 'উৎসবানন্দ বিদ্যাবাগীশের সহিত বিচার' (১৮১৬-১৭), 'ভট্টাচার্যের সহিত বিচার' (১৮১৭), 'গোস্বামীর সহিত বিচার' (১৮১৮), 'সহমরণ বিষয়ে প্রবর্তক ও নিবর্তকের সম্বাদ' (১৮১৮ ও ১৮১৯), 'কবিতাকারের সহিত বিচার' (১৮২০), 'সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রীর সহিত বিচার' (১৮২০) ইত্যাদি। কেবল ভোজসভা নয়, তার সঙ্গে এই সব বিচার-বিতর্কের সভাও শুরু হয়েছে। যুগপথিক রামমোহন নতুন যুগের পথনির্দেশ করতে আরম্ভ করেছেন।

নতুন মহাবিদ্যালয় 'হিন্দু কলেজ' প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ডিরোজিও ১৮২৬ সাল থেকে তার একজন শিক্ষক নিযুক্ত হয়েছেন। ইয়ং বেঙ্গল দল তাঁর কাছে নবযুগের নতুন জীবনমন্ত্রে দীক্ষা নিচ্ছেন। ভোজসভার নাচ-গান-হল্লা থেকে দূরে, পটলডাঙ্গার কলেজগৃহে, ডিরোজিওর বৈঠকখানায়, বেকন্-লক্-হিউমের জীবনদর্শন ও সমাজদর্শন নিয়ে বিতর্কসভা বসছে।

বাংলার নিস্তরঙ্গ সমাজ-জীবনে প্রচণ্ড তরঙ্গ-বিক্ষোভের আভাস পাওয়া যাচ্ছে। মেঘ জমছে কলকাতার আকাশে। বিদ্রোহের মেঘ।

পাশ্চাত্ত্য ও প্রাচ্য পদ্ধতিতে শিক্ষাদান সম্পর্কে তর্কবিতর্ক হচ্ছে। ১৮২১ সালে কলকাতা শহরে একটি 'সংস্কৃত কলেজ' প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা হয়। ১৮২৪ সালের ১লা জানুয়ারী থেকে বহুবাজারের ভাড়া বাড়ীতে সংস্কৃত কলেজের পাঠারম্ভ হয়। কোম্পানীর ডিরেক্টররা এদেশবাসীর শিক্ষার জন্য সামান্য যে অর্থ মঞ্জুর করেছেন, তা সেকালের সংস্কৃতশাস্ত্র অধ্যয়নে ব্যয় করা হবে এবং যুগোপযোগী নতুন জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষার কোন ব্যবস্থা হবে না, এই আশঙ্কা করে রামমোহন, সংস্কৃত কলেজ স্থাপনের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করে, ১৮২৩ সালের ১১ ডিসেম্বর, বড়লাট লর্ড আমহার্স্টকে একখানি দীর্ঘ পত্র লেখেন।[১৩] ইংরেজরা তাঁদের শাসন ও শোষণের স্বার্থে চেয়েছিলেন, এদেশের লোকের প্রচলিত সংস্কারে আঘাত না দিতে। সেই স্বার্থ থেকেই তাঁরা সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠায় উদ্‌যোগী হয়েছিলেন। রামমোহনের সেরকম কোন স্বার্থ ছিল না। তাঁর একমাত্র স্বার্থ ছিল, পশ্চিমের দ্বার খুলে দেওয়া। নতুন পাশ্চাত্ত্য জ্ঞানবিজ্ঞান সাহিত্যদর্শনের যে সমৃদ্ধ ভাণ্ডার সকলের সহজ-লভ্য হয়েছিল, এদেশের শিক্ষার্থীদের তার মণিরত্ন আহরণের সুযোগ করে দেওয়া। ইংরেজরা চেয়েছিলেন, ঘুমন্ত জাতির ঘুম না ভাঙিয়ে যাতে কার্য উদ্ধার করা যায় তাই করতে। রামমোহন চেয়েছিলেন, প্রথমে ঘুমন্ত জাতির ঘুম ভাঙাতে, নতুন বৈজ্ঞানিক শিক্ষার আলোকস্পর্শে তাদের জাগিয়ে তুলতে। তাই তিনি প্রতিবাদ করেছিলেন।

তা সত্ত্বেও সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ১৮২৬ সালের ১লা মে সংস্কৃত কলেজ গোলদীঘির নবনির্মিত গৃহে প্রবেশ করে, হিন্দু কলেজ ও স্কুল-সহ। ঈশ্বরচন্দ্রের তখন ছ'বছর বয়স। বীরসিংহে কালীকান্তের পাঠশালায় তিনি পড়ছেন। কলকাতার গোলদীঘিতে তখন জাতীয় জাগরণযজ্ঞের আনুষ্ঠানিক প্রস্তুতি চলেছে।

এর মধ্যে অন্তঃপুরবাসিনী অসূর্যম্পশ্যারাও প্রথম সূর্যের আলোক দেখেছেন। স্ত্রীশিক্ষার কথাও আলোচনা হচ্ছে কলকাতা শহরে। কলকাতার ব্যাপটিস্ট মিশনারী সোসাইটি হিন্দু কন্যাদের শিক্ষার জন্য ১৮১৯ সালে 'ফিমেল জুভেনাইল সোসাইটি' নামে একটি মহিলা সমিতি স্থাপন করেন। মিস্ কুক

ইংলণ্ড থেকে এদেশে আসার পর ১৮২১ সালে 'Ladies Society for Native Female Education in Calcutta and its Vicinity', এই নামে একটি সমিতি স্থাপিত হয়। কুমারী কুক প্রথম একজন বাঙালী শিক্ষিকা নিযুক্ত করেন।[১৪] ফিমেল জুভেনাইল সোসাইটির তত্ত্বাবধানে নন্দনবাগান, গৌরীবেড়ে, জানবাজার ও চিৎপুর অঞ্চলে বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সব স্কুলের নাম ছিল, জুভেনাইল স্কুল, লিভারপুল স্কুল, সালেম স্কুল ও বার্মিংহাম স্কুল, 'named after the place in which the Ladies reside'… ।[১৫]

স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বুঝাবার জন্য, জুভেনাইল সোসাইটির উদ্‌যোগে, 'স্ত্রীশিক্ষাবিধায়ক' নামে একখানি পুস্তক প্রকাশিত হয় ১৮২২ সালে। ইতিহাস থেকে অনেক হিন্দু বিদুষী মহিলার দৃষ্টান্ত উদ্ধার করে, স্ত্রীশিক্ষা যে সামাজিক রীতিবিরুদ্ধ নয়, লেখক তা প্রমাণ করবার চেষ্টা করেন। লেখক কোন বিদেশী পুরুষ বা মহিলা নন। ড্রামণ্ড বা শেরবোর্ণের স্কুলে বা হিন্দু কলেজে শিক্ষিতও নন। এদেশেরই একজন বিখ্যাত সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত, গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার। সংস্কৃত কলেজের প্রসিদ্ধ অধ্যাপক জয়গোপাল তর্কালঙ্কারের ভ্রাতুষ্পুত্র।

কলকাতার অন্তঃপুরে তখন স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে স্ত্রীলোকরা আলাপ-আলোচনা করছেন। গৌরমোহন তাঁর পুস্তকের 'দুই স্ত্রীলোকের কথোপকথন' অধ্যায়ে তার চমৎকার নমুনা দিয়েছেন, একেবারে দেশী ভাষায় :[১৬]

> প্র। ওলো। এখন যে অনেক মেয়্যা মানুষ লেখা পড়া করিতে আরম্ভ করিল এ কেমন ধারা। কালে কালে কতই হবে ইহা তোমার মনে কেমন লাগে।
>
> উ। তবে মন দিয়া শুন দিদি। সাহেবেরা এই যে ব্যাপার আরম্ভ করিয়াছেন, ইহাতেই বুঝি এত কালের পর আমারদের কপাল ফিরিয়াছে, এমন জ্ঞান হয়।
>
> প্র। কেন গো। সে সকল পুরুষের কায। তাহাতে আমারদের ভাল মন্দ কি।
>
> উ। শুন লো। ইহাতে আমারদের ভাগ্য বড় ভাল বোধ হইতেছে ; কেন না এদেশের স্ত্রীলোকেরা লেখা পড়া করে না, ইহাতেই তাহারা

প্রায় পশুর মত অজ্ঞান থাকে। কেবল ঘর দ্বারের কায কর্ম্ম করিয়া কাল কাটায়।

প্র। ভাল। লেখা পড়া শিখিলে কি ঘরের কায কর্ম্ম করিতে হয় না। স্ত্রীলোকের ঘর দ্বারের কায রাঁধা বাড়া ছেলেপিলা প্রতিপালন না করিলে চলিবে কেন। তাহা কি পুরুষে করিবে।

উ। না। পুরুষে করিবে কেন, স্ত্রীলোকেরই করিতে হয়, কিন্তু লেখা পড়াতে যদি কিছু জ্ঞান হয় তবে ঘরের কাযকর্ম্ম সারিয়া অবকাশ মতে দুই দণ্ড লেখা পড়া নিয়া থাকিলে মন স্থির থাকে, এবং আপনার গণ্ডাও বুঝিয়া পড়িয়া নিতে পারে।

প্র। ভাল। একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। তোমার কথায় বুঝিলাম যে লেখাপড়া আবশ্যক বটে। কিন্তু সে কালের স্ত্রীলোকেরা কহেন, যে, লেখাপড়া যদি স্ত্রীলোকে করে তবে সে বিধবা হয় এ কি সত্য কথা। যদি এটা সত্য হয় তবে মেনে আমি পড়িব না, কি জানি ভাঙ্গা কপাল যদি ভাঙ্গে।

উ। না বইন, সে কেবল কথার কথা।—ইত্যাদি।

কলকাতার অন্তঃপুরে এই কথাবার্তা হচ্ছে। কলকাতার বিদ্যালয়ে পাশ্চাত্ত্য জ্ঞানবিজ্ঞান ও দর্শনের আলোচনা হচ্ছে। ভোজসভায় নাচগান হচ্ছে, রাসলীলায় সাহেববিবিরাও নৃত্য করছেন। একেশ্বরবাদের পক্ষে এবং পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে রামমোহন পূর্ণোদ্যমে বিচারবিতর্ক আরম্ভ করেছেন। ইয়ং বেঙ্গলের বৈঠকখানায় এবং গোলদীঘিতে বেকন লক্ হিউম পেইনের বিতর্কসভা বসছে।

এদিকেও বীরসিংহ গ্রামে কালীকান্তের পাঠশালার পাঠ সাঙ্গ হয়েছে ঈশ্বরচন্দ্রের। গুরুমহাশয় কালীকান্ত 'সাতিশয় পরিশ্রমী এবং শিক্ষাদান বিষয়ে বিলক্ষণ নিপুণ ও সবিশেষ যত্নবান ছিলেন।' তাঁর পাঠশালায় ছাত্রেরা 'অল্প সময়ে, উত্তমরূপ শিক্ষা করিতে পারিত।' এজন্য তিনি 'উপযুক্ত শিক্ষক বলিয়া বিলক্ষণ প্রতিপত্তিলাভ করিয়াছিলেন।' ঈশ্বরচন্দ্রও অল্প সময়ে উত্তমরূপে শিক্ষা করতে পেরেছিলেন।

পাঠশালার পাঠ শেষ হয়ে গেল। কালীকান্ত একদিন ঠাকুরদাসকে বললেন—'আমার পাঠশালায় যা শিক্ষা করা আবশ্যক, ঈশ্বরের তা হয়েছে। ঈশ্বরের হাতের লেখা অতি সুন্দর। এখন তাকে কলকাতায় নিয়ে গিয়ে ইংরেজী শিক্ষা দিলে ভাল হয়।'

৬ | মহানগর অভিমুখে

কলকাতা!

নবযুগের নতুন মহানগর। মধ্যযুগের তীর্থ-নগর, রাজ-নগর বা কেবল বাণিজ্যসর্বস্ব সেকালের বন্দর-নগর নয়। প্রাচীন তীর্থ আছে, বর্ধিষ্ণু বাণিজ্য আছে, নতুন রাজাও আছে কলকাতা শহরে। মধ্যযুগের নগরে যা ছিল, সবই আছে। পিতার উত্তরাধিকার নিয়ে যেমন পুত্রের জন্ম হয়, মধ্যযুগের সমস্ত নাগরিক উত্তরাধিকার নিয়ে তেমনি কলকাতা শহরেরও প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। তার সঙ্গে যা কোন মধ্যযুগের নগরে ছিল না, তাও ছিল কলকাতা মহানগরে।

নতুন যুগের শিক্ষানগর কলকাতা। নব্যবঙ্গের নতুন সংস্কৃতিনগর। প্রাচীন ও নবীন জীবনাদর্শের ঘাতপ্রতিঘাতে কলরব-মুখর মহানগর। কোন শিক্ষারই শুরু ও শেষ হয় না সেখানে না গেলে। এ যুগের মনুষ্যত্বেরও যেন পূর্ণবিকাশ হয় না, তার গভীর স্পর্শ ছাড়া।

এত সব কথা চিন্তা করে বীরসিংহের গুরুমহাশয় ঈশ্বরচন্দ্রকে কলকাতায় নিয়ে যাবার প্রস্তাব করেননি। তিনি শুধু বলেছিলেন, আমার পাঠশালায় ঈশ্বরের যা শিক্ষা করা আবশ্যক তা হয়েছে। এখন তাকে কলকাতায় নিয়ে গিয়ে ইংরেজী শিক্ষা দিলেই ভাল হয়।

ইংরেজ জব চার্ণকের প্রতিষ্ঠিত কলকাতা শহরে না গেলে যে ইংরেজী শিক্ষা করা সম্ভব নয়, একথা তখন কলকাতার বাইরে বাংলাদেশে প্রায় সকলেই জানতেন। কালীকান্তও জানতেন। কিন্তু ইংরেজী শিক্ষার প্রয়োজন হল কেন? তখন পর্যন্ত ফার্সী শিক্ষারই প্রচলন ছিল না। সম্রান্ত পরিবারের সন্তানেরা রাজকার্যের জন্য ফার্সী শিক্ষা করতেন। যাঁরা সংস্কৃত শিক্ষা করতেন, তাঁরা প্রধানত টোল-চতুষ্পাঠী স্থাপন করে অধ্যাপনা করতেন, অথবা রাজসভায় সভাপণ্ডিতের কাজ করতেন। কলকাতা শহরে ও তার আশেপাশে ইংরেজী শিক্ষার গোড়াপত্তন হলেও, তার প্রচলন তেমন হয়নি। ঈশ্বরচন্দ্রের সমবয়স্ক সুহৃদ্ দেওয়ান কার্তিকেয়চন্দ্র রায় এ-সম্বন্ধে তাঁর 'আত্মজীবনচরিতে' যা লিখে গেছেন, তা তাঁর সমকালীন অবস্থার প্রামাণ্য বর্ণনা হিসেবে উল্লেখযোগ্য :[১]

> তৎকালে কলিকাতা ও তৎসন্নিহিত আট-দশ ক্রোশের বহির্দ্দেশে ইংরেজী শিক্ষার বড় প্রথা ছিল না। সে সময় স্কুলের শিক্ষকের ও কেরানীর পদ ব্যতীত ইংরেজীতে আর কোন কর্ম্ম মফঃস্বলে দৃষ্ট হইত না; এবং এই সকল পদের বেতন বা মান অধিক ছিল না। দেশের সমস্ত জেলার রাজকার্য্য পারস্য ভাষায় নির্ব্বাহ হইত। সে সকল পদের বেতন অধিক না হউক, উৎকোচ যথেষ্ট লাভ হইত এবং পদেরও গৌরব বিলক্ষণ ছিল। এই কারণে মফঃস্বলের প্রধান পরিবারেরা আপন আপন সন্তানদিগকে ইংরেজী বিদ্যা শিক্ষা না দিয়া পারস্য বিদ্যা শিক্ষা দিতেন।

দেওয়ান রামকমল সেন তাঁর ইংরেজী-বাংলা অভিধানের ভূমিকায় ইংরেজী শিক্ষার সূচনাপর্বের ইতিহাস সংক্ষেপে সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন। তার মর্ম এই :[২]

> ১৭৭৪ সালে আমাদের দেশে সুপ্রীম কোর্ট স্থাপিত হয়। এই সময় থেকে ইংরেজী ভাষা শিক্ষার ইচ্ছা জাগে ও আবশ্যকতা দেখা দেয়। এই সূচনাপর্বে শোনা যায়, রামরাম মিশ্র নামে এক ব্রাহ্মণ প্রথম ইংরেজী ভাষা বেশ ভালভাবে আয়ত্ত করেন, কিন্তু তিনি কি ভাবে তা শেখেন তা সঠিক জানা যায় না। তাঁর কাছে বাবুরা অনেকে ইংরেজী ভাষা

শিক্ষা করেন। তাঁদের মধ্যে রামনারায়ণ মিশ্র অন্যতম। রামনারায়ণ মিশ্র সুপ্রীম কোর্টের অ্যাটর্নির মুহুরি ছিলেন। তাঁকে লোকে একজন পণ্ডিত ব্যক্তি বলে মনে করত। শুধু তাই নয়, তিনি নিজেও একজন আইনজ্ঞ ব্যক্তি বলে গণ্য হতেন, কারণ আইনের ঘোরপ্যাঁচ তিনি বিশেষজ্ঞের মতন জানতেন এবং সেই বিষয়ে লোকদের পরামর্শ দিতেন। এই আইন আর আদালতের পাল্লায় পড়ে কলকাতা শহরের অনেক বিখ্যাত পরিবার ধ্বংস হয়ে গেছে। রামনারায়ণ এই কাজ করে প্রচুর বিত্ত অর্জন করেন, কারণ আইনের ব্যাপারে তাঁর সমকক্ষ নাকি কেউ ছিলেন না তখন। পরে তিনি নিজে একটি স্কুলও খোলেন এবং সেই স্কুলে হিন্দু ছেলেদের তিনি ইংরেজী শিক্ষা দিতেন। তার জন্য ছেলেদের কাছ থেকে তিনি ৪ টাকা থেকে ১৬ টাকা পর্যন্ত মাসিক বেতন নিতেন। রামনারায়ণের আগে আনন্দীরাম দাস নামে আর একজন ইংরেজী শিক্ষক ছিলেন, শোনা যায় রামনারায়ণের চেয়ে অনেক বেশি ইংরেজী শব্দ তাঁর জানা ছিল। এই ব্যক্তিটি নাকি এত ইংরেজী শব্দ জানতেন যে লোকে তাঁকে ইংরেজীর অফুরন্ত ভাণ্ডারস্বরূপ মনে করত এবং ছেলেরা তাঁর কাছে যেত ইংরেজী শিখতে। তার জন্য তারা ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করত এবং আনন্দীরাম তাঁর মেজাজ মতন তাদের পাঠ দিতেন। প্রতিদিন ছেলেরা তাঁর কাছ থেকে পাঁচ-ছ'টি করে ইংরেজী শব্দ শিখে আসত। ইংরেজী ও বাংলা শব্দ উদ্ধৃত করে তার নমুনা দিচ্ছি :

লাড — (Lord) — ইস্বর। — (ঈশ্বর।)
গাড — (God) — ইস্বর। — (ঈশ্বর।)
কম — (To Come)— আইশ। — (আইসন।)
গো — (To Go) — জাও। — (যাওন।)
গোইন — (Going) — জাইতেছি। — (যাওয়া।)

রামলোচন দত্ত, কৃষ্ণমোহন বসু এবং আরো কেউ কেউ এই একই পদ্ধতিতে ইংরেজী শিক্ষা দিতেন, আজও ঠিক যেভাবে আপিসের 'রাইটার'রা শিক্ষা দিয়ে থাকেন। এর কিছুদিন পরে, ভবানী দত্ত, শিবু দত্ত এবং অন্যান্য কয়েকজন হিন্দুদের মধ্যে সুবিখ্যাত ইংরেজী শিক্ষক

> বলে পরিচিত হন। ক্র্যাঙ্কো (প্যাঙ্কিকো বলে পরিচিত) নামে একজন এইসময় একটি স্কুল খোলেন এবং তাঁর পরে আরাতুন পিক্রুসও একটি স্কুল খুলে ইংরেজী শিক্ষা দিতে থাকেন। এঁদের ছাত্ররা আজও অনেকে জীবিত আছেন। Thomas Dyche-এর Spelling Book ও School-master ছাড়া তখন পাঠ্যপুস্তকও আর কিছু ছিল না। Arabian Nights ও Tooteenamah তার কয়েক বছর পরে পাঠ্য হয়। এই বইগুলি যাঁরা পড়তে পারতেন তাঁরাই তখন পণ্ডিত ব্যক্তি বলে গণ্য হতেন এবং Spelling Book-এর শেষে ব্যাকরণের সাধারণ কয়েকটি সূত্র যাঁরা মুখস্থ করতে পারতেন তাঁদেরই বলা হত ইংরেজীর মস্তবড় জাঁদরেল পণ্ডিত।

রামকমল সেনের এই বিবরণ থেকে বাংলাদেশে ইংরেজী শিক্ষার গোড়ার কথা জানা যায়। বেশ বোঝা যায়, নতুন জীবিকা ও পেশার তাগিদে ইংরেজী শিক্ষার শুরু হয়েছিল এবং খুব দ্রুত তার অগ্রগতি হয়নি। কলকাতার বাইরে তখন ইংরেজী ভাষাভিজ্ঞ লোকের সংখ্যা নিতান্ত অল্প ছিল। কার্তিকেয়চন্দ্র গণনা করে তাঁদের নাম বলেছেন: 'নবদ্বীপে রামকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়, কৃষ্ণনগরে কেশবচন্দ্র লাহিড়ী, হরিনারায়ণ পাল, প্রতাপচন্দ্র পাল, এই কয়েকজন মাত্র আমাদের জানিত ইংরাজী ভাষাভিজ্ঞ লোক ছিলেন।' নবদ্বীপে ও কৃষ্ণনগরেই যদি এই অবস্থা হয়, তাহলে বীরসিংহ ও তার আশ-পাশের অবস্থা কি হতে পারে তা কল্পনা করা কঠিন নয়। আট বছর বয়সে ঈশ্বরচন্দ্রের পাঠশালার শিক্ষা শেষ হবার পর, যখন তাঁর গুরুমহাশয় তাঁকে ইংরেজী শিক্ষার জন্য কলকাতায় নিয়ে যাবার প্রস্তাব করেছিলেন, তখন কার্তিকেয়চন্দ্র এক হিন্দুস্থানী লালার কাছে ফার্সী শিখতে আরম্ভ করেন। কি ভাবে তাঁর এই ফার্সী শিক্ষা চলতে থাকে, এখানে তার সামান্য একটু আভাস দিচ্ছি:[৩]

> অষ্টম বর্ষে আমার পারস্য বিদ্যারম্ভ হয়। প্রথমতঃ একজন হিন্দুস্থানী লালা নিযুক্ত হন, তিনি তিন টাকা বেতন পাইতেন ও বাটীতে আহারাদি করিতেন। আমি ও আমার পিতৃব্যপুত্র মধুসূদন রায় তাঁহার নিকট

পাঠারম্ভ করি। মধুসূদনকে আমি মধ্যমদাদা বলিয়া ডাকিতাম, এবং এক্ষণেও বলিয়া থাকি। কিয়ৎকালানন্তর শিক্ষকের সুরাসক্তি দোষ প্রকাশ হইল। তৎকালে আমিনবাজার ব্যতীত কৃষ্ণনগরের আর কোন স্থানে মদিরা প্রস্তুত বা বিক্রীত হইত না।

তিনি প্রত্যহই মধ্যাহ্নে ঐ বাজার হইতে মদ্যপান করিয়া যাইতেন এবং কখন সামান্য দোষে আমাকে পীড়ন করিতেন। এ কারণে গুরুজনেরা তাঁহাকে বিদায় করিয়া এক মুসলমানকে তাঁহার স্থানে নিযুক্ত করিলেন।

এ ওস্তাদের পান-দোষ ছিল না বটে, কিন্তু বিষম দোষান্তর প্রকাশ হইল। তিনি আহারীয় সামগ্রী ব্যতীত মাসিক তিন কি চারি টাকা বেতন পাইতেন এবং ভাণ্ডার হইতে কোন কোন খাদ্যদ্রব্য আমাদের দ্বারা চুরি করিয়া লইতেন। তাঁহার সন্তোষ সাধন করিতে পারিলে আমাদের প্রতি সদয় থাকিতেন, এ কারণে তিনি যাহাতে সন্তুষ্ট থাকেন, তাহারই চেষ্টা করিতাম।···

প্রসঙ্গত একথা উল্লেখ করার কারণ হল, একই সময়ে বাংলাদেশের একটি আট বছরের বালককে যখন ইংরেজী শিক্ষা দেবার জন্য গ্রাম থেকে শহরে নিয়ে আসার কথা হচ্ছে, তখন আর একটি আট বছরের বালককে পরিবারের তত্ত্বাবধানে রেখে, হিন্দুস্থানী শিক্ষক ও মুসলমান ওস্তাদের কাছে ফার্সী শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা হচ্ছে। দুই বালকের জন্য দুই পরিবারের এই দু'রকম দৃষ্টিভঙ্গির সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণ আছে। ঈশ্বরচন্দ্র ও কার্তিকেয়চন্দ্র দু'জন সমবয়স্ক ছিলেন এবং পরবর্তীকালে তাঁদের মধ্যে বন্ধুত্বও হয়েছিল বলে, কেবল তাঁদের কথা উল্লেখ করলাম। আসলে দু'জনকে দু'টি সামাজিক দৃষ্টান্ত বলেই ধরা উচিত। ঈশ্বরচন্দ্র বাংলার এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ পরিবারের সন্তান, কার্তিকেয়চন্দ্র নবদ্বীপের (কৃষ্ণনগর) রাজবংশের দেওয়ান পরিবারের সন্তান। দরিদ্র ব্রাহ্মণ পরিবারের সন্তানরা বাল্যকালে তখন সংস্কৃত শিক্ষা করতেন এবং পরিণত বয়সে কুলপুরোহিত বা সভাপণ্ডিতের কাজ করতেন, অথবা অনেকে স্বাধীনভাবে চতুষ্পাঠী খুলে অধ্যাপনা করে কায়ক্লেশে জীবনধারণ করতেন। সেইজন্য তাঁদের রাজভাষা শিক্ষার প্রয়োজন হত না। দেওয়ান পরিবারের

সন্তানদের অথবা রাজসরকারের কর্মচারীদের বংশধরদের তা করলে চলত না। প্রাপ্তবয়সে সরকারী চাকরীর যোগ্যতা যাতে তাঁরা অর্জন করেন, তার জন্য তাঁদের ফার্সী শিক্ষা দেওয়া হত। সম্ভ্রান্ত চাকুরীজীবী হিন্দু মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তানেরাও তাই সকলেই প্রায় তখন আর্বী-ফার্সী শিক্ষা করতেন, বেশি মনোযোগ দিয়ে। সংস্কৃতও তাঁরা শিখতেন না যে তা নয়, কিন্তু তার চেয়ে অনেক বেশি যত্ন ও পরিশ্রম করে ফার্সী শিখতেন। রামমোহন রায়ও তাই শিখেছিলেন। আট বছর বয়সে কলকাতায় পাঠিয়ে ইংরেজী শিক্ষা দেবার কথা তাঁর অভিভাবকরা কেউ চিন্তাই করতে পারেননি। তখন অবশ্য কলকাতা শহরে ইংরেজী শিক্ষার তেমন প্রচলনও হয়নি। রামমোহন ছিলেন অভিজাত রাজকর্মচারীবংশের সন্তান। নবাবী আমলের শিক্ষার প্রথা অনুযায়ী তিনি বাল্যজীবনে ফার্সী ও আর্বী শিখেছেন। কাশীতে থেকে রামমোহন সংস্কৃতও শিক্ষা করেছিলেন। উল্লেখযোগ্য হল, বাইশ-তেইশ বছর বয়সের আগে তিনি ইংরেজী ভাষা শিক্ষা আরম্ভ করেছিলেন কি না সন্দেহ।[৪] সাতাশ-আটাশ বছর বয়সে তিনি ভাল করে ইংরেজী শিক্ষা করেন। বেশ বোঝা যায়, শিক্ষিতদের কাছেও ইংরেজী তখন তার রাজকীয় মর্যাদা লাভ করেনি। রাজার সিংহাসন যত দ্রুত বদলায়, প্রচলিত রীতি বা প্রথা তত দ্রুত বদলায় না। তার মধ্যে আবার শিক্ষার রীতিনীতি যে সময়ের মধ্যে বদলায়, সামাজিক রীতিনীতি বদলাতে তার চেয়ে অনেক বেশি সময় লাগে। কারণ শিক্ষার ধারা ও রীতি সাধারণত সমাজের শাসকশ্রেণী নিজেদের স্বার্থে নির্ধারণ ও নিয়ন্ত্রণ করে থাকেন।

পলাশীর যুদ্ধের পরে অনেক দিন পর্যন্ত ইংরেজরা রাজকার্যাদি নবাবী আমলের রীতি অনুযায়ী চালিয়েছিলেন। আর্বী ফার্সীর সমাদর তাই অনেক দিন পর্যন্ত ছিল। কিন্তু ক্রমে তাঁরা এ-ভাষা বাতিল করে দিলেন। তখন সম্ভ্রান্ত পরিবারের সন্তানেরা যাঁরা আর্বী ফার্সী শিক্ষা করেছিলেন, তাঁদের সব শিক্ষাই প্রায় ব্যর্থ হয়ে গেল। নতুন করে তাঁদের মনোযোগ দিয়ে ইংরেজী শিখতে হল। এই প্রসঙ্গে কার্তিকেয়চন্দ্র লিখেছেন :[৫]

> বহু যত্নের ও পরিশ্রমের ধন অপহৃত হইলে, অথবা উপার্জ্জনক্ষম পুত্র হারাইলে যেরূপ দুঃখ হয়, সেইরূপ দুঃখ এই সংবাদে আমাদের মনে

উপস্থিত হইল। অনেক পরিশ্রমপূর্ব্বক যে কিছু শিখিয়াছিলাম, তাহা মিথ্যা হইল, এবং বিদ্বান বলিয়া যে খ্যাতি লাভের আশা ছিল, তাহা নির্ম্মূল হইয়া গেল। পূর্ব্বে আমার পিসতুত ভ্রাতা শ্রীপ্রসাদকে আমি পারস্য শিখাইতাম, তিনি আমাকে ইংরাজী পড়াইতেন। কিন্তু এ বিদ্যাশিক্ষায় আমার বিশেষ মনোযোগ ছিল না। এক্ষণে পারস্যবিদ্যার আলোচনায় এককালে বিরত হইয়া ইংরেজী বিদ্যা শিক্ষায় মনোনিবেশ করিলাম।

দেওয়ান কার্তিকেয়চন্দ্রের এই উক্তির সামাজিক তাৎপর্য লক্ষণীয়। তিনি বলেছেন যে, বিদ্বান বলে যে খ্যাতি লাভের আশা ছিল তা নির্মূল হয়ে গেল। এটা ঐতিহাসিক উক্তি। পূর্বে লোকসমাজে তাঁরাই বিদ্বান বলে গণ্য হতেন, যাঁরা আর্বী-ফার্সী শিখে নবাব-সরকারে রাজকার্যের যোগ্যতা অর্জন করতেন। সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতেরাও বিদ্বৎসমাজের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। ইংরেজ আমলে সমাজে যে পরিবর্তনের স্বচনা হল, তাতে 'বিদ্বান' কথার সংজ্ঞাও বদলে যেতে লাগল। সামান্য ইংরেজী শিখে যাঁরা ইংরেজী বুলি কপ্‌চাতে শিখলেন, তাঁরাও বিদ্বান বলে গণ্য হতে লাগলেন এবং আর্বী-ফার্সীবিদ্ মৌলবী-মুনশীরা, সংস্কৃতজ্ঞ ও শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতরা ধীরে ধীরে বিদ্বানের খ্যাতি হারাতে আরম্ভ করলেন। শিক্ষার ও বিদ্যার ধারা পরিবর্তনের ফলে, কলকাতা শহরে নতুন যে বিদ্বৎসমাজ গড়ে উঠতে লাগল, তার মধ্যে সেকালের পণ্ডিতেরা নিজেদের খাপ খাওয়াতে না পেরে ক্রমে যেন একঘরে হয়ে গেলেন। বিদ্বৎসমাজের মধ্যেই তাঁরা রইলেন, কিন্তু কতকটা যেন বিচ্ছিন্ন ও একঘরে হয়ে রইলেন।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ থেকে উনবিংশ শতাব্দীর গোড়া পর্যন্ত, নতুন কলকাতা মহানগরে যে বিদ্যাসমাজ গড়ে উঠেছিল, তা প্রধানত সেকালের পণ্ডিত ও মুনশী-মৌলবীদের নিয়ে। এ ছাড়া ইংরেজদের যে বিদ্যাসমাজ ছিল তখন তার সঙ্গে এদেশীয় বিদ্যাসমাজের কোন যোগাযোগ ছিল না। 'এসিয়াটিক সোসাইটি'র প্রথম যুগের ইতিহাসেই তার প্রমাণ রয়েছে।[৬] সংস্কৃত ও ফার্সী বিদ্যার চর্চা তখন কলকাতা শহরে পূর্ণোদ্যমে হত এবং মৌলবী ও পণ্ডিতেরা শিক্ষকতা করে অর্থও উপার্জন করতেন স্বচ্ছন্দে। কলকাতার আশেপাশে, নবদ্বীপ কৃষ্ণনগর কাঞ্চননগর হালিশহর ভাটপাড়া হরিনাভি চাংড়িপোতা

জয়নগর-মজিলপুর হাওড়া হুগলি বর্ধমান প্রভৃতি নানাস্থানে যে সব পণ্ডিতবংশের বাস ছিল, তাঁদের মধ্যে অনেকে টোলচতুষ্পাঠী প্রতিষ্ঠা করে অধ্যাপনার দ্বারা জীবিকা অর্জন করবার জন্য কলকাতা শহরে এসেছিলেন। কলকাতার নতুন ধনিকবংশের কুলপুরোহিত ও সভাপণ্ডিত হয়েও অনেকে এসেছিলেন। পাদ্রি ওয়ার্ড সাহেব তাঁর গ্রন্থের অধ্যাপকদের তালিকায় কলকাতার আটাশজন পণ্ডিতের কথা উল্লেখ করেছেন। তাঁদের টোলে ছাত্রসংখ্যা ছিল ১৭৩ জন।[৭] এই তালিকা অবশ্য সম্পূর্ণ নয়। অনেক বিখ্যাত পণ্ডিত সে-সময় কলকাতাতে চতুষ্পাঠী প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। চিৎপুর-নবাব দেলওয়ার জঙ্গের অনুমতিক্রমে চিৎপুর অঞ্চলে অধ্যাপক রঘুমণি বিদ্যাভূষণ এক চতুষ্পাঠী প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। নারীটের (হাওড়া) ভট্টাচার্য-বংশীয় ঠাকুরদাস চূড়ামণির বিখ্যাত টোল ছিল হাতীবাগানে। স্বনামধন্য মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন ঠাকুরদাসের ভ্রাতুষ্পুত্র। হাতীবাগানে হরচন্দ্র তর্কভূষণের একটি চতুষ্পাঠী ছিল। হরিনাভির (২৪-পরগণা) ভট্টাচার্য-বংশীয় রামগোপাল ন্যায়ালঙ্কারের আড়পুলিতে একটি চতুষ্পাঠী ছিল। হরিনাভি গ্রামের রামদাস তর্করত্নের টোল ছিল 'এতন্নগরের শিমুল্যাগ্রামে' (শিমলেয়)। বহুবাজারবাসী বিশ্বনাথ মতিলালের পোষকতায় পণ্ডিত শ্রীধর শিরোমণি 'মলঙ্গাধামে' (মলাঙ্গা) একটি চতুষ্পাঠী প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সোমপ্রকাশ-সম্পাদক, ঈশ্বরচন্দ্রের সহকর্মী বন্ধু, পণ্ডিত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের পিতা হরচন্দ্র ন্যায়রত্ন (শিবনাথ শাস্ত্রীর মাতামহ) বিখ্যাত সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন, কলকাতার কাঁসারিপাড়াতে তাঁর টোল ছিল। ঈশ্বরচন্দ্রের আর একজন সহকর্মী ও বন্ধু গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্নের পিতা রামধন বিদ্যাবাচস্পতি রাজপুর গ্রাম (হরিনাভি ও রাজপুর পাশাপাশি গ্রাম) ছেড়ে কলকাতায় এসে ঠনঠনিয়ায় একটি চতুষ্পাঠী স্থাপন করেন। গিরিশচন্দ্র লিখেছেন :[৮]

> আমার পিতা রাজপুরের অবস্থা মন্দ হওয়াতে কলিকাতায় আসিয়া ঠন্‌ঠনিয়া সিদ্ধেশ্বরী-গৃহের পশ্চাৎভাগে দেবী ঘোষের ভূমিতে কর্ণওয়ালিস রাস্তার পশ্চিম প্রান্তে পুষ্করিণীর পাড়ের উপর এক টোলঘর বাঁধিয়া, কলিকাতার অধ্যাপক (অর্থাৎ ছাত্রশূন্য অধ্যাপক) হইলেন। মাসিক ॥০ আট আনা করিয়া ঐ জায়গার খাজনা দিতে হইত। তখন কিঞ্চিদ-

ধিক বিদায় পাইতেন, তাহাতেই ঐ বৃহৎ গোষ্ঠীর ভরণপোষণ অতিকষ্টে নির্ব্বাহ হইত।

ঈশ্বরচন্দ্রের নিকট-জ্ঞাতি সভারাম বাচস্পতি ও তাঁর পুত্র জগন্মোহন ন্যায়ালঙ্কারও সম্ভবত কলকাতায় চতুষ্পাঠী খুলে অধ্যাপনা করতেন। ঈশ্বরচন্দ্রের পিতা ঠাকুরদাস এই ন্যায়ালঙ্কারের গৃহে প্রথম কলকাতায় এসে আশ্রয় নিয়েছিলেন।

এরকম আরও অনেক পণ্ডিতের টোল-চতুষ্পাঠী কলকাতার বিভিন্ন অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত ছিল। কলকাতা শহরের নতুন ধনিকবংশেও অনেক পণ্ডিত সভাপণ্ডিতরূপে প্রতিপালিত হতেন। শোভাবাজারের রাজপরিবারে, ঠাকুর-পরিবারে, মল্লিক-পরিবারে, সিংহ-পরিবারে বিখ্যাত সব পণ্ডিতদের সমাবেশ হত। মহারাজা নবকৃষ্ণের সভায় সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন, বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার প্রভৃতি পণ্ডিতেরা উপস্থিত থাকতেন। ১৮১৭ সালের ২০ জানুয়ারী কলকাতায় (চিৎপুরে) যখন হিন্দু কলেজের প্রথম পাঠ আরম্ভ হয়, তখন উদ্বোধন-সভায় শহরের বিশেষ গণ্যমান্য ব্যক্তিরা ছাড়াও কয়েকজন বিখ্যাত পণ্ডিত উপস্থিত ছিলেন। 'ক্যালকাটা মান্থলি জার্নালে' তাঁদের নাম প্রকাশিত হয়েছিল। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন, রঘুমণি বিদ্যাভূষণ, চতুর্ভুজ ন্যায়রত্ন, শোভাশাস্ত্রী, রামদুলাল তর্কচূড়ামণি, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, তারাপ্রসাদ ন্যায়ভূষণ, শোভানন্দ বিদ্যাবাগীশ প্রভৃতি।[১] বোঝা যায়, এঁরা সেকালের কলকাতার বিদ্বৎসমাজে অগ্রগণ্য ব্যক্তি ছিলেন। এই সব সভাপণ্ডিত, কুলপুরোহিত, টোল-চতুষ্পাঠীর অধ্যাপকবৃন্দ ছাড়াও, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিতেরা এবং সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপকরাও তখন কলকাতায় থাকতেন। কলকাতার তদানীন্তন বিদ্বৎসমাজ প্রধানত এই পণ্ডিতদের নিয়েই গঠিত ছিল। ইংরেজ আমলের নতুন বিদ্বৎসমাজ গড়ে উঠতে আরম্ভ করে, দু'চারটি ফিরিঙ্গীদের (শেরবোর্ণ, ড্রামণ্ড প্রভৃতির) ইংরেজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর এবং বিশেষ করে হিন্দু কলেজের উদ্বোধনের পর। অর্থাৎ উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদ থেকে।

চাকরিবাকরির প্রলোভন দেখিয়ে ইংরেজরা ক্রমে ইংরেজী শিক্ষার ব্যবহারিক প্রয়োজনীয়তার কথা বুঝিয়ে দিতে লাগলেন। ইংরেজী না জানলে

ইংরেজদের সান্নিধ্যে আসা যায় না এবং ইংরেজদের সান্নিধ্যে না এলে কলকাতা শহরের নতুন সামাজিক আভিজাত্যের সিঁড়ির উচ্চধাপে ওঠাও সম্ভব নয়। সম্ভ্রান্ত ও ধনিক পরিবারের সন্তানেরা তাই গুরু মুন্‌শী বহাল রেখেও, ইংরেজী শিখতে আরম্ভ করলেন। এই সময়কার প্রথম ইংরেজী শিক্ষার ব্যঙ্গচিত্র ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বাবুর উপাখ্যান' ও 'নববাবুবিলাসে'র মধ্যে পাওয়া যায়। ব্যঙ্গচিত্রে কিছুটা অতিরঞ্জন থাকলেও, সামাজিক সত্যও তার মধ্যে প্রতিফলিত হয়। প্রথমে গুরুমহাশয় নিযুক্ত করে বালকদের শিক্ষা দেওয়া হত। অক্ষর লেখার পর 'কৃষ্ণরাম গোবিন্দনারায়ণ বাসুদেব ইত্যাদি' নামাভ্যাস করানো হত। তারপর অঙ্কশিক্ষা, 'কড়াকে গণ্ডাকে বুড়কে চৌউকে নামতা পর্য্যন্ত।' অঙ্ক শিক্ষা শেষ হলে 'কদলীপত্রে তেরিজ জমাখরচ জমাবন্দি প্রভৃতি' শেখান হত। গুরুমহাশয়ের পর মুন্‌শী নিযুক্ত হতেন। 'অতিসূক্ষ্ম-বুদ্ধিপ্রযুক্ত দুই বৎসর মধ্যেই প্রায় করিয়া সমাপ্তি করিলেন, গোলেস্তাঁ বোস্তাঁ আরম্ভ করিয়া ইংরাজী পড়িবার নিমিত্ত বাবুরা স্বয়ং চেষ্টক হইলেন।' গুরু ও মুন্‌শীর পর সাহেব মাস্টারের পালা। 'ইংরাজী কাহার নিকটে পড়িবেন ইহার চেষ্টায় কখন আরাতুন পিৎরুস, ডিকরুস, কালস ইত্যাদি সাহেবের ইস্কুলে গমনাগমন করেন।' অবশেষে কোন জন্ সাহেবকে শিক্ষক নিযুক্ত করা হয়। সাহেবের কাছে শিক্ষা পেয়ে উদীয়মান বাবু 'গাডামী, রাসকেল, বেরিগুড, হুট, ছোট, নানসেন্স, গোটেহেল এইরূপ কতগুলিন কথা অভ্যাস করিয়া বাঙ্গালা কথায় মিশাইয়া কহিতে লাগিলেন এবং দুই-একখান ইংরাজী চিঠি পাঠ করিতে পারেন।'[১০]

শিক্ষাক্ষেত্রে এ যেন ভারতবর্ষের তিনটি ঐতিহাসিক যুগের মহামিলন বা ত্রিবেণীসঙ্গম, হিন্দুযুগ মুসলমানযুগ ও ইংরেজযুগের। অবশ্য প্রশস্ত সমুদ্রবক্ষে নয়, বদ্ধ কূপের মধ্যে। গুরুমহাশয় প্রাচীন হিন্দুযুগের প্রতীক, মুন্‌শী মুসলমানযুগের এবং আরাতুন পিৎরুস, জন সাহেব ইত্যাদি ইংরেজযুগের। ক্রমে গুরুমহাশয় ও মুনশীরা বিদায় নিতে লাগলেন এবং জন্‌সাহেবদেরই জয় হতে লাগল। যুগ থেকে যুগান্তরে যাত্রার পথে 'বাবুর উপাখ্যান' মূল ঐতিহাসিক নাটকের মধ্যবর্তী 'ইণ্টারল্যুড' ছাড়া কিছু নয়। এই ইণ্টারল্যুডের অভিনয়কালেই ঈশ্বরচন্দ্রের পিতা ঠাকুরদাস কলকাতা শহরে এসেছিলেন

জীবিকার অন্বেষণে। পিতার শিক্ষাসমস্যা সম্বন্ধে ঈশ্বরচন্দ্র তাই স্বরচিত জীবনচরিতে লিখেছেন :

> এই সময়ে মোটামুটি ইঙ্গরেজী জানিলে, সওদাগর সাহেবদিগের হৌসে, অনায়াসে কর্ম্ম হইত। এজন্য সংস্কৃত না পড়িয়া, ইঙ্গরেজী পড়াই, তাঁহার পক্ষে, পরামর্শসিদ্ধ স্থির হইল।

ঈশ্বরচন্দ্রের যখন কলকাতায় আসার কথা হল, তখন ইংরেজী শিক্ষার অবস্থারও অনেক পরিবর্তন হয়েছে। দশ বছরের বেশি হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। শুধু হিন্দু কলেজ নয়, রামমোহন রায় প্রতিষ্ঠিত হেতুয়ায় ইংরেজী স্কুল, ভবানীপুরের জগমোহন বসুর ইউনিয়ন স্কুল প্রভৃতি বিদ্যালয় থেকে, যাঁরা ইংরেজীবিদ্যা শিক্ষা করেছিলেন, তাঁরাই হয়েছিলেন নবযুগের শিক্ষকশ্রেণী। তাঁরা 'গো-টেহেল বেরিগুডে'র যুগের ইংরেজীবিদ্ ছিলেন না, পাশ্চাত্ত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানে পারদর্শী ছিলেন। ভবানীপুর ইউনিয়ন স্কুলের ছাত্রদের পরীক্ষাপ্রসঙ্গে 'সমাচার দর্পণ' পত্রিকায় এই সময় (১৮২৯ সালে) যে মন্তব্য করা হয়েছিল, তাতে শিক্ষার এই ধারাবদলের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত ছিল। তার ভাষা এই :

> গত পাঁচ ছয় বৎসরের মধ্যে এ দেশে ইংগ্লণ্ডীয় ভাষা ও বিদ্যা শিক্ষাকরণার্থে যে উদ্যোগ হইতেছে তাহা অত্যাশ্চর্য্য। ইহার পূর্ব্বে আমরা শুনিতাম যে ইংগ্লণ্ডীয় ভাষার ছাত্রেরা যৎকিঞ্চিৎ পড়াশুনা করিয়া কেরাণিরদের পদপ্রাপণার্থে সেই ভাষা শিক্ষা করিত কিন্তু আমরা এখন অত্যাশ্চর্য্য দেখিতেছি যে এতদ্দেশীয় বালকেরা ইংগ্লণ্ডীয় অতিশয় কঠিন পুস্তক ও গূঢ় বিদ্যা আক্রমণ করিতে করিতে সাহসিক হইয়াছে এবং ভাষার মধ্যে যাহা অতিশয় দুঃশিক্ষণীয় তাহা আপনারদের অধিকারে আনিয়াছে অল্পদিনের মধ্যে হিন্দু কালেজের বিদ্যার্থিরা ও শ্রীযুত রামমোহন রায় ও শ্রীযুত জগমোহন বসুর পাঠশালার ছাত্রেরা ইংগ্লণ্ডীয় সাহেবদের নিকটে ইংগ্লণ্ডীয় ভাষায় উত্তম পরীক্ষা দিয়াছে।…(সমাচার দর্পণ, ৭ মার্চ ১৮২৯)

এই সব বিদ্যালয়ে যাঁরা শিক্ষা পাচ্ছিলেন, তাঁরাই কলকাতা শহরে নবযুগের নতুন বিদ্বৎসমাজ গড়ে তুলছিলেন। ইংরেজী শিক্ষার এক নতুন পর্বের

সূত্রপাত হচ্ছিল তখন। সেই সময় ঈশ্বরচন্দ্রের পাঠশালার পাঠও সাঙ্গ হল। বয়স হল তাঁর আট বছর। গুরুমহাশয় কালীকান্ত কলকাতায় যাবার কথা প্রস্তাব করলেন।

এই সময় ঈশ্বরচন্দ্রের পিতামহ রামজয় তর্কভূষণ অতিসার রোগে কিছুদিন ভুগে, ছিয়াত্তর বছর বয়সে দেহত্যাগ করেন। পুত্র ঠাকুরদাসকে দেখতে রামজয় একবার কলকাতা শহরে এসেছিলেন। নতুন মহানগরের নির্মম পরিবেশে কিশোর পুত্রের জীবনসংগ্রামের করুণ কাহিনী শুনে, তিনি তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে সান্ত্বনা ও উৎসাহ দিয়েছিলেন। বড়বাজারের দয়েহাটা-নিবাসী ভাগবতচরণ সিংহের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল। তাঁর আশ্রয়ে তিনি ঠাকুরদাসকে রেখে বীরসিংহে ফিরে গিয়েছিলেন। বড়বাজারের দয়েহাটার সেই সিংহমহাশয়ের বাড়ীতে পৌত্র ঈশ্বরচন্দ্রের ছাত্রজীবনের ঐতিহাসিক কাহিনী শোনার সৌভাগ্য তাঁর হয়নি। তার আগেই তাঁর মৃত্যু হয়েছিল।

পিতৃকৃত্য সমাপনের জন্য ঠাকুরদাস কলকাতা থেকে বীরসিংহে যান। কলকাতাই ছিল কর্মস্থল, তাই বীরসিংহে থাকা তাঁর পক্ষে সম্ভব হত না। পিতৃকৃত্য শেষ করে তিনি কলকাতায় ফিরে আসবার সময় ঈশ্বরচন্দ্রকে সঙ্গে করে নিয়ে আসবেন স্থির করেন।

ঈশ্বরচন্দ্র লিখেছেন : 'তদনুসারে, ১২৩৫ সালের কার্তিক মাসের শেষভাগে, আমি কলিকাতায় আনীত হইলাম।' ইংরেজী ১৮২৮ সালের নভেম্বর মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে ঈশ্বরচন্দ্র কলকাতা শহরে এসে উপস্থিত হন।

গ্রামের উৎসব-পার্বণ তখন প্রায় একরকম সব শেষ হয়ে গেছে। ঢাকঢোল সব নিস্তব্ধ। গ্রাম্য বালকবন্ধুদের সঙ্গে ঈশ্বরচন্দ্রের কল্পিত কলকাতা শহরের আলাপ-আলোচনাও শেষ হয়ে গেছে। গ্রামবৃদ্ধদের সঙ্গে পরামর্শ করে, পাঁজিপুঁথি দেখে, কলকাতা যাত্রার শুভ দিনক্ষণও স্থির হয়েছে।

বীরসিংহ গ্রাম থেকে কলকাতা যাত্রা করা তখন দূর দেশান্তরে যাত্রা করার মতন ছিল। দুশ্চিন্তায় ভগবতী দেবী ও দুর্গা দেবী কত বিনিদ্র রাত্রি যে কাটিয়েছেন তার ঠিক নেই। তখন রেলপথ হয়নি, বাষ্পীয় যানের শব্দ

শোনা যায়নি বাংলাদেশে। চলার পথ একমাত্র হাঁটাপথ, অথবা নদীপথ। নৌকায় নদীপথে যাওয়া যায়। বীরসিংহ থেকে ঘাটাল এসে, নদীপথে নৌকায় রূপনারায়ণ দিয়ে গঙ্গায় পড়ে কলকাতার ঘাটে এসে ওঠা যায়। কিন্তু নদীপথে তখন বিপদ-আপদের ভয় বেশি। নৌকাডুবির ভয় নয়, ডাকাতের হাতে লুঠপাটের ভয়, প্রাণহানির ভয়। যাত্রীরা তাই সব সময় নদীপথে দল বেঁধে, একাধিক নৌকার বহর নিয়ে, যাত্রা করতেন। যাত্রা বলতে অবশ্য তখন ছিল বাণিজ্যযাত্রা আর তীর্থযাত্রা। তীর্থযাত্রা যাঁরা করতেন তাঁরা ইহলোক থেকে পরলোকে যাত্রা করছেন, এই মনে করেই বাড়ী থেকে বেরুতেন। ঠ্যাঙাড়ে বা ডাকাতের হাতে প্রাণ যাবে কি না-যাবে, সেই চিন্তায় তাঁরা কাতর হতেন না। তীর্থের টানে প্রাণের টান ও সংসারের টান সব ছিন্ন করে দিয়ে, জোয়ারের মুখে নৌকা ভাসিয়ে দিতেন। বাণিজ্যযাত্রা যাঁরা করতেন, সঙ্গে তাঁদের রক্ষীদল থাকত। ঠ্যাঙাড়ে-ডাকাতের আড্ডা-আস্তানা তাঁরা সব জানতেন। তাদের হাতে রাখার কৌশলও তাঁরা জানতেন। হয় ভেট দিতেন, না হয় রাতের অন্ধকারে সেই সব আড্ডামুখো নৌকা ভেড়াতেন না। এইভাবে তাঁদের বাণিজ্যযাত্রা চলত।

ডাকাতির উপদ্রব তখন বাংলাদেশে খুব প্রবল হয়েছিল। ইংরেজরা প্রাচীন গ্রাম্যসমাজের গড়নটিকে ভেঙে দিয়ে যখন নতুন কোন সমাজব্যবস্থার প্রবর্তন করতে পারলেন না এবং সমাজের নির্দিষ্ট বংশানুক্রমিক পেশাগত স্তর থেকে উৎখাত লোকগুলিকে যখন অন্য কোন সামাজিক ও অর্থনৈতিক স্তরের মধ্যে আত্মসাৎ করতে অক্ষম হলেন, তখন সমাজ ও পেশা থেকে বিচ্ছিন্ন এই সব মানুষ কতকটা যাযাবর জীবন যাপন করতে লাগল। কিন্তু কেবল যাযাবর-বৃত্তিতেও জীবনধারণ করা যায় না। তাই তাদের নতুন সামাজিক পেশা হল অসামাজিক দস্যুবৃত্তি। বড় বড় ডাকাতের দল গড়ে উঠল বাংলাদেশের প্রত্যেক জেলায় জেলায়। মেদিনীপুর, হাওড়া, হুগলি, বর্ধমান, নদীয়া, সব জায়গায়। নদীপথে তাদের দৌরাত্ম্য বাড়ল সবচেয়ে বেশি। নদীর তীরবর্তী নানাস্থানে ডাকাতের সব আড্ডা গড়ে উঠল এবং বিখ্যাত সব ডাকাতে কালীর প্রতিষ্ঠা হল। অবাধ্য আসামীদের নরবলি দিয়ে ডাকাতেরা শক্তির উৎসব করত বীভৎসভাবে। দামোদর, রূপনারায়ণ ও ভাগীরথীর তীরবর্তী বহু গ্রামে

আজও এরকম অনেক ডাকাতের আস্তানার কথা ও ডাকাতে কালীর নরবলির রোমাঞ্চকর কাহিনী শোনা যায়।

ঈশ্বরচন্দ্রের বাল্যকালের এই যাত্রাপথ ছিল সবচেয়ে ভয়াবহ। এই পথের সমকালীন একটি বিবরণ পাওয়া যায় সেকালের সংবাদপত্রে। বিবরণটি এই :[১১]

> কলিকাতা এবং তৎ উত্তরোত্তরাঞ্চল হইতে জলপথে তমলুক ক্ষীরপাই ঘাটাল রাধানগর এবং মেদিনীপুর প্রভৃতি স্থান সকলে যাইতে হইলে উলুবেড়িয়ার বাসপাতির খাল অথবা তেমোয়ানি প্রভৃতি দুর্গম স্থান হইয়া যাইতে হইত কিন্তু বাসপাতির খালে বর্ষা ভিন্ন অন্য কএক মাস বারির সমূহ অপ্রতুল হইত সুতরাং অগ্রহায়ণাবধি প্রায় আষাঢ় পর্য্যন্ত দ্বিতীয় পথ হইয়া যাইবার ঘটনা হইত কিন্তু তৎঘটনায় লোক সকলে অত্যন্ত ভীত হইতেন যেহেতুক তাহাতে বিষম সাহসাপেক্ষা করে তদ্ভিন্ন বিলম্বেরও সম্ভাবনা...... (সমাচার দর্পণ, ৪ জুলাই ১৮২৯)

উলুবেড়িয়া থেকে মহেশডাঙ্গা পর্যন্ত খাল-কাটা উপলক্ষে এই পথের বর্ণনা দেওয়া হয়। ঈশ্বরচন্দ্র যখন কলকাতা যাত্রা করেন, উলুবেড়িয়ার এই খাল দিয়ে তখন নৌকা যাতায়াত করত এবং প্রতি নৌকায় একদণ্ডে দু'আনা কর আদায় করা হত। তাতে তেমোহনার ভয়াবহতা হয়ত দূর হয়েছিল, যাত্রীরা নতুন খালপথে যাতায়াত করতে পারতেন। কিন্তু কোম্পানীর কাটা খালের জন্য ডাকাতের উপদ্রব কমেনি। বরং নতুন খালেও পথে আর দু'চারটে ডাকাতে আস্তানা গজিয়ে উঠেছিল। ঈশ্বরচন্দ্রের যাত্রার পূর্বে তাই অনেক ভেবেচিন্তে পথ বেছে নিতে হয়েছিল, নদীপথ ও হাঁটাপথের মধ্যে মহানগর অভিমুখী একটি কোন পথ।

তীর্থযাত্রী বা বাণিজ্যযাত্রী কোনটাই ঈশ্বরচন্দ্র নন। মহানগরও নবযুগের তীর্থ বটে, কিন্তু ধার্মিকদের তীর্থ নয়। নতুন জীবনাদর্শের তীর্থ, নতুন জ্ঞানবিদ্যার তীর্থ কলকাতা। সেদিক দিয়ে বালক ঈশ্বরচন্দ্রও তীর্থযাত্রী। কিন্তু তাঁরা পুণ্য-বা-মুনাফা লোভাতুর নন বলে, ঠাকুরদাস হাঁটা পথই বেছে নিলেন। সাধারণ মানুষ হাঁটা পথেই যাতায়াত করত বেশি। হাঁটা পথও তেমনি দুর্গম পথ। বীরসিংহ থেকে বেরিয়ে, ঘাটাল হয়ে, আরামবাগের

ভিতর দিয়ে, পুরাতন বারাণসী রাস্তা ধরে, চাঁপাডাঙ্গা শিয়াখালার উপর দিয়ে সালিখার ঘাট পর্যন্ত পথ। পথের উপর নদীনালার অন্ত নেই। শিলাই, দ্বারকেশ্বর, কানা দ্বারকেশ্বর, মুণ্ডেশ্বরী, দামোদর সব পার হয়ে, অবশেষে পুণ্যতোয়া ভাগীরথীর বক্ষস্পর্শ করে মহানগরতীর্থ কলকাতায় পৌঁছতে হয়। যাতায়াতের পথে আশ্রয়স্থল হল আত্মীয়স্বজনের বাড়ী অথবা চটি বা সরাইখানা। পথের উপর পাতুলগ্রামে ঠাকুরদাসের মামাশ্বশুর বাড়ী, সন্ধিপুর গ্রামে এক আত্মীয়ের বাড়ী, একটু উত্তরে তারকেশ্বরের কাছে রামনগরে এক ভগিনীর বাড়ী। সুতরাং পথে বিশ্রাম নেবার সুবিধা ছিল। আট বছরের বালককে হাঁটিয়ে নিয়ে যেতে হবে, প্রায় চল্লিশ মাইল পথ, বিশ্রামের ভাল স্থান থাকার দরকারও পথের উপর। সব দিক চিন্তা করে এই হাঁটা পথেই কলকাতা যাত্রা করা হবে স্থির হল।

যাত্রার শুভদিনে সূর্য উঠল। ঈশ্বরচন্দ্র ঘুম থেকে উঠলেন। দুর্গা দেবী ও ভগবতী দেবীর নিশ্চিন্তে ঘুম হবার কথা নয়। শেষ রাত থেকে উঠে তাঁরা পোঁটলাপুঁটলি বেঁধে দিচ্ছিলেন। বাইরে গ্রামের লোক দু'একজন করে এসে অনেকে ভীড় করে দাঁড়িয়েছিলেন। মথুর মণ্ডলের জননী ও স্ত্রীও নিশ্চয় ঈশ্বরচন্দ্রকে দেখতে এসেছিলেন। বালকের দুষ্টুমিতে যত বিরক্তই তাঁরা হন না কেন, আজ আর সেই বিরক্তি দিয়ে ঈশ্বরচন্দ্রের প্রতি তাঁদের স্নেহ-ভালবাসাটুকু তাঁরা ঢেকে রাখতে পারলেন না। কপাটি ও কুস্তী খেলার নিত্য সঙ্গীরা 'কলকাতা কোথায়, কত দূরে' ভেবে, ঈশ্বরের দিকে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইল। জননী ও পিতামহীর চোখের জলে যাত্রাপূর্বের মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানাদি শেষ হল।

মহানগরের পথে যাত্রা শুরু হল।

সহযাত্রী হলেন পিতা ঠাকুরদাস, গুরুমহাশয় কালীকান্ত ও ভৃত্য আনন্দরাম গুটি। দীর্ঘ পথ চলতে যদি আট বছরের বালক ঈশ্বরচন্দ্রের ক্লান্তি আসে, যদি ছোট ছোট পা দু'খানা আর কিছুতেই না চলতে চায়, তাহলে গুটির কাঁধে চড়ে তিনি কলকাতায় যাবেন। আনন্দরামকে তাই সঙ্গে নিলেন ঠাকুরদাস।

গ্রামের পর গ্রাম ছাড়িয়ে ঈশ্বরচন্দ্র এগিয়ে চললেন পথের উপর দিয়ে। মহানগরের পথ। জীবনের চলার পথে প্রথম পদধ্বনি। কত পথ, আরও

কত দুর্গম ভয়াবহ পথ তাঁকে চলতে হবে! তখন সঙ্গী থাকবে না কেউ। পিতা ঠাকুরদাস, গুরুমহাশয় কালীকান্ত, ভৃত্য আনন্দরাম, কেউই সঙ্গী থাকবে না তখন। অনেক পথ একাকীই চলতে হবে।

মহানগর কলকাতার কথা মধ্যে মধ্যে চলার পথে মনে পড়ছে। বীরসিংহ গ্রাম নয়, পাতুলও নয়, কলকাতা শহর।

Stadtluft mach freit !

খুব প্রাচীন একটি জার্মান প্রবাদ। ইয়োরোপের লোকের মুখে মুখে শোনা যায়। অর্থ হল: Town air makes a man free! 'নগরের হাওয়ায় মানুষ মুক্তির স্বাদ পায়।' কথাটা ঠিক। কেবল ঠিক নয়, খুব বড় কথা। ইতিহাসেও তাই দেখা যায়। নাগরিক পরিবেশে মানুষ প্রথম তার ব্যক্তি-জীবনের মুক্তির আস্বাদ পেয়েছে।

কলকাতা যাত্রা গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে যাত্রা নয়। সুতানুটি গোবিন্দপুরের সংলগ্ন একটি নগণ্য গ্রামও নয় কলকাতা। কলকাতা এখন নতুন শহর, নবযুগের বর্ধিষ্ণু মহানগর। তার পরিবেশ ভিন্ন। গ্রাম্য পরিবেশের সঙ্গে তার পার্থক্য অনেক। গ্রামের সীমানা আছে, শহরেরও আছে, কিন্তু সেটা ভৌগোলিক সীমানা। শহরের আর কোন সীমানা নেই। জীবনের সীমানা, মনের সীমানা, কিছুই নেই সেখানে। গ্রাম্যসমাজে স্বাতন্ত্র্য সীমাবদ্ধ, নাগরিক সমাজে স্বাতন্ত্র্য সীমাহীন।

একালের বিজ্ঞাপন দেওয়ার রীতি যদি সেকালে প্রচলিত থাকত, তাহলে বড় বড় বৈদ্যুতিক অক্ষরে ভাগীরথীর পূর্বতীরে কোথাও লেখা থাকত হয়ত:

কলকাতা শহরে এস, স্বাধীন হও!

গ্রাম ছেড়ে মহানগর অভিমুখে ঈশ্বরচন্দ্রের যাত্রা তাই ঐতিহাসিক যাত্রা। পুরাতনকে ছেড়ে নতুনের পথে যাত্রা। সঙ্কীর্ণতা ছেড়ে প্রশস্ত উদারতার পথে যাত্রা।

কিন্তু সেই বহুকালের পুরাতন বারাণসী পথ দিয়ে যাত্রা শুরু। অহল্যাবাই

রোড, পুরাতন বারাণসী তীর্থযাত্রীর পথ! সেই পথ ধরেই ঈশ্বরচন্দ্র এগিয়ে চলেছেন জীবনের নতুন পথে, কলকাতা শহর অভিমুখে। ইতিহাসের ইঙ্গিত খুব স্পষ্ট।

পুরাতনকে একেবারে অস্বীকার করে ইতিহাসে নতুনের বিকাশ হয় না। নতুন যুগেরও নয়, নতুন সত্যেরও নয়। ধারাবাহিকতাই ইতিহাসের ধর্ম। সেই ধারার উত্থানপতন আছে। একটানা একঘেয়ে তার ছন্দ নয়, তরঙ্গ নয়। সবই ঠিক। কিন্তু মূল ধারা থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়ে কোন অভাবনীয় নতুন ধারায় ইতিহাস এগিয়ে চলে না, চলেনি কোনদিন।

বারাণসী তীর্থযাত্রীদের পুরাতন পথের উপর চলতে চলতে বালক ঈশ্বরচন্দ্র এত কথা তখনও চিন্তা করার অবকাশ পাননি। তবু মনে হয়, ইতিহাস যেন তাঁকে শিক্ষা দেবার জন্যই এই ঐতিহাসিক পথের পথিক করেছিল। নবযুগের নতুন পথের অন্যতম পথিকৃৎ প্রাচীন পথের উপর দিয়েই তাঁর নতুনের যাত্রা শুরু করেছিলেন।

পথের উপর খানাকুল-কৃষ্ণনগরের কাছে পাতুল গ্রাম। জননীর মাতুলালয়। ভগবতী দেবীর জ্যেষ্ঠ মাতুল রাধামোহন বিদ্যাভূষণ ঈশ্বরচন্দ্রকে বিশেষ স্নেহ করতেন। অসুখবিসুখ করলে তিনি নিজে বীরসিংহ গিয়ে নাতিটিকে নিয়ে আসতেন পাতুলে। পাতুলের এই বিদ্যাভূষণ-পরিবারের স্নেহ-শুশ্রূষায় ঈশ্বরচন্দ্রের বাল্যজীবনের বহুদিন পরম নিশ্চিন্তে ও আনন্দে কেটেছে। কলকাতা যাত্রার পথে পাতুলে বিশ্রাম না করলে, ঈশ্বরের শান্তি হবে না, ঠাকুরদাস জানতেন। তাছাড়া, রাধামোহনের সঙ্গে সাক্ষাৎ না করে ঈশ্বরের পক্ষে প্রথম কলকাতা যাওয়াও শোভন নয়।

পাতুলে একদিন অবস্থান করে পরদিন সন্ধ্যার সময় ভিন্ন গ্রামে অন্য এক আত্মীয়ের বাড়ী ঠাকুরদাস তাঁর পুত্র ও সঙ্গীদের নিয়ে উঠলেন। সেখান থেকে পরদিন শিয়াখালা-সালিখার বাঁধা রাস্তা দিয়ে কলকাতা অভিমুখে যাত্রা করলেন।

বাঁধা পথে এক মাইল অন্তর পাথরের মাইলস্টোন পোঁতা থাকে। পথের ধারে ধারে মাইলস্টোনের এরকম দৃশ্য ঈশ্বরচন্দ্র গ্রামের মেঠো পথে কোনদিন

দেখেননি। কৌতূহলী মনে তাঁর প্রশ্ন জাগল, পথের ধারে এগুলো কি বস্তু? দেখিনি তো কোনদিন? পিতাপুত্রে প্রশ্নোত্তর চলতে লাগল।

পুত্র। বাবা, রাস্তার ধারে বাটনাবাটা শিল পোঁতা আছে কেন?

পিতা। বাটনাবাটা শিল নয় বাবা, এগুলোকে বলে 'মাইলস্টোন'।

পুত্র। সেটা আবার কি? ঠিক তো শিলের মতন দেখতে। মা তো এই রকম শিলের উপর বাটনা বাটে দেখেছি।

পিতা। 'মাইলস্টোন' ইংরেজী কথা। দু'মাইলে এক ক্রোশ হয়, এক মাইলে আধ ক্রোশ। 'স্টোন' মানে পাথর। এক মাইল বা আধ ক্রোশ পথ অন্তর এরকম এক একটি পাথর পুঁতে দিয়ে দূরত্ব জানানো হয় বলে, এর নাম 'মাইলস্টোন'।

পুত্র। বুঝেছি। তাহলে এর উপর এক, দুই, তিন, সব লেখা আছে নিশ্চয়?

পিতা। সব লেখা আছে। যেমন, সামনের এই পাথরটার গায়ে ইংরেজীতে লেখা আছে 'উনিশ'। অর্থাৎ বাঁধা পথে উনিশ মাইল বা সাড়ে নয় ক্রোশ পথ আর চলতে হবে।

পুত্র। 'উনিশ' লেখা আছে? একের পিঠে নয় তো উনিশ?

পিতা। নামতায় পড়েছ তো, একের পিঠে নয় উনিশ। ঠিক বলেছ।

পুত্র। (অক্ষরের গায়ে হাত বুলিয়ে) তাহলে এই অক্ষরটা তো ইংরেজীর 'এক', আর এর পিঠে এই যে অক্ষরটা, এইটাই তো 'নয়'?

পিতা। হ্যাঁ বাবা, ঠিক বলেছ।

পুত্র। তাহলে এর পর আঠার, সতের, ষোল, এইভাবে এ পর্যন্ত লেখা পাথর দেখতে পাব তো?

পিতা। হ্যাঁ পাবে, তবে যে পাথরটায় 'এক' লেখা আছে, সেখান দিয়ে আমরা আজ যাব না। 'দুই' পর্যন্ত যাব, তার পর বেঁকে গিয়ে অন্য পথ দিয়ে গঙ্গার ঘাটে উঠব। যদি সেটা দেখতে চাও, আর একদিন দেখাব।

পুত্র। দেখার আর দরকার কি? 'এক' তো দেখেছি, চিনে নিয়েছি। নয়ের পর থেকে দুই পর্যন্ত দেখলেই তো সব ইংরেজী অঙ্কের অক্ষর চেনা হয়ে যাবে।

পিতা। তা যাবে, কিন্তু চলতে চলতে ঠিক চিনে নিয়ে মনে রাখতে পারবে?

পুত্র। হ্যাঁ পারব!

গুরুমহাশয় কালীকান্ত উৎকর্ণ হয়ে শুনলেন সব কথা। ঈশ্বরচন্দ্রের ইংরেজী শিক্ষা শুরু হল, বিনা গুরু-সাহায্যে, শিয়াখালা-সালখের বাঁধারাস্তায়।

ঠাকুরদাস বললেন, 'পরীক্ষা করব, কেমন শিখেছ।' গুরুমহাশয়ও প্রস্তুত হলেন পরীক্ষা করবার জন্য। ভৃত্য আনন্দরাম উৎকণ্ঠিত হয়ে প্রতীক্ষা করতে লাগল। যতক্ষণ একের পিঠের উপর অন্য অঙ্কগুলি ছিল, ততক্ষণ আঠারর পর সতের হবে, সতেরর পর ষোল হবে, এইভাবে হিসেব করে যে ঈশ্বরচন্দ্র অক্ষরগুলি না চিনেও আন্দাজে বলতে পারেন, এ কথা ঠাকুরদাসের ও গুরু-মহাশয়ের মনে হল। তাই যখন একের পিঠটি সরে গেল, কেবল অক্ষরগুলি পৃষ্ঠা-শ্রয়হীন হয়ে সামনে দাঁড়াল একে-একে, তখন মধ্যের ষষ্ঠ মাইলের অক্ষরটি ইচ্ছা করে বাদ দিয়ে, পঞ্চম মাইলের অক্ষরটি দেখিয়ে, ঠাকুরদাস জিজ্ঞাসা করলেন: 'এটা কি অক্ষর বল?'

মধ্যের ছয় অক্ষরটি ঈশ্বরচন্দ্র দেখতে পাননি। পিতা তাঁকে ফাঁকি দিয়েছেন। একে তো একের পিঠটি নেই, তার উপর কৌশলে ফাঁকি দেওয়া হয়েছে মধ্যের পাথরটিকে। ডবল পরীক্ষা। ঈশ্বরচন্দ্র বললেন: 'এটা ছয় হবে, কিন্তু ভুল করে পাঁচ লিখেছে কেন?'

পরীক্ষায় পাশ করলেন ঈশ্বরচন্দ্র। চলার পথে চলতে চলতে পরীক্ষা, গ্রাম্য বালকের পক্ষে কঠিন পরীক্ষা। প্রথম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন ঈশ্বরচন্দ্র।

উত্তর শুনে সকলেই খুব খুশি হলেন। ঈশ্বরচন্দ্র নিজে লিখেছেন:

> 'এই কথা শুনিয়া, পিতৃদেব ও তাঁহার সমভিব্যাহারীরা অতিশয় আহ্লাদিত হইয়াছেন, ইহা তাঁহাদের মুখ দেখিয়া স্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম। বীরসিংহের গুরুমহাশয় কালীকান্ত চট্টোপাধ্যায়ও ঐ সমভিব্যাহারে ছিলেন; তিনি আমার চিবুক ধরিয়া, 'বেশ বাবা বেশ' এই কথা বলিয়া, অনেক আশীর্ব্বাদ করিলেন, এবং পিতৃদেবকে সম্বোধিয়া বলিলেন,

দাদামহাশয়, আপনি ঈশ্বরের লেখাপড়া বিষয়ে যত্ন করিবেন। যদি বাঁচিয়া থাকে, মানুষ হইতে পারিবেক।

আনন্দরাম গুটির আনন্দের কথা কেউ বলেননি। পিতাও নয়, গুরুমহাশয়ও নয়, গ্রাম্য-ভৃত্য আনন্দরাম। পিতার মতন স্নেহ যার ঈশ্বরের প্রতি, পথের এই কঠিন পরীক্ষায় পাশ করাতে আনন্দে উৎফুল্ল আনন্দরাম। সব আনন্দ সে প্রকাশ করবে কখন বীরসিংহ গ্রামে ফিরে গিয়ে, তাই ভাবতে লাগল।

প্রথমে সে বীরসিংহ গ্রামে ফিরে ঈশ্বরের মা ঠাকুমার কাছে এই বাটনাবাটা শিলের গল্প বলবে। তারপর ধর্মতলার মণ্ডপটিতে জাঁকিয়ে বসে গ্রামের বারো-জনের কাছে ঈশ্বরের প্রতিভার কথা সগর্বে শোনাবে।

উনিশ মাইল লেখা মাইলস্টোনের সামনে দাঁড়িয়ে ঈশ্বরচন্দ্র প্রথম প্রশ্ন করে-ছিলেন। পঞ্চম মাইলস্টোনের সামনে দাঁড়িয়ে তিনি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন। অর্থাৎ সালখের বাঁধা রাস্তায় চৌদ্দ মাইল পথ হাঁটা হয়েছে। আট বছরের বালকের পক্ষে একটানা চোদ্দ মাইল পথ হাঁটার ক্লান্তি ও কষ্ট যে কতখানি হতে পারে, তা কারও মনে নেই।

পথ চলার ক্লান্তিতে যখন বালক ঈশ্বরের দেহমন আচ্ছন্ন হয়ে আসছিল, তখন পিতা ঠাকুরদাস বা গুরুমহাশয় কালীকান্ত 'ঐতরেয় ব্রাহ্মণে'র রাজপুত্র রোহিতের সেই পথচলার গল্পটি বলেছিলেন কি না জানি না। রাজপুত্র রোহিত যখন দীর্ঘকাল পথ চলে চলে শ্রান্ত হয়ে বিশ্রামের জন্য ঘরমুখো চলেছেন, তখন ব্রাহ্মণবেশী দেবতা ইন্দ্র তাঁকে বলেন :

নানা শ্রান্তায় শ্রীরস্তি ইতি রোহিত শুশ্রুম।
পাপো নৃষদবরো জনঃ ইন্দ্র ইচ্চরতঃ সখা॥
চরৈবেতি, চরৈবেতি।

'হে রোহিত! চলতে চলতে যে শ্রান্ত তার আর শ্রীর অন্ত নেই, এই কথাই চিরদিন শুনেছি। যে চলে, দেবতা ইন্দ্রও সখা হয়ে তার সঙ্গে সঙ্গে চলেন। যে চলতে চায় না, সে শ্রেষ্ঠজন হলেও ক্রমে সে নীচ হতে থাকে। অতএব, এগিয়ে চল, এগিয়ে চল!'

আস্তে ভগ আসীনস্যোর্ধ্বস্তিষ্ঠতি তিষ্ঠতঃ।
শেতে নিপদ্যমানস্য চরাতি চরতো ভগঃ॥
চরৈবেতি, চরৈবেতি।

'যে বসে থাকে তার ভাগ্যও বসে থাকে, যে উঠে দাঁড়ায় তার ভাগ্যও উঠে দাঁড়ায়, যে শুয়ে পড়ে তার ভাগ্যও শুয়ে পড়ে, যে এগিয়ে চলে তার ভাগ্যও এগিয়ে চলে। অতএব এগিয়ে চল, এগিয়ে চল!'

ঈশ্বরচন্দ্র নবযুগের রোহিত। রোহিতের মতন তিনিও যেন শুনেছিলেন, 'নানা শ্রান্তায় শ্রীরস্তি ইতি ঈশ্বর শুশ্রুম।' হে ঈশ্বর! চলতে চলতে যে শ্রান্ত তার শ্রীর অন্ত নেই, এই কথাই চিরদিন শুনেছি! অতএব হে ঈশ্বর, এগিয়ে চল, এগিয়ে চল!

বাঁধাপথের শেষ হল ভাগীরথীর পশ্চিম তীরের ঘাটের ধারে। সামনে ভাগীরথীর পূর্বতীরে, ভোরের সূর্যের মতন কলকাতা মহানগর বালক ঈশ্বরচন্দ্রের দৃষ্টিপথে ভেসে উঠল। পথচলার প্রথম পর্ব শেষ হল।

৭ | বড়বাজারে ঈশ্বরচন্দ্র

অবশেষে ঈশ্বরচন্দ্র কলকাতা শহরে এসে পৌঁছলেন। ১২৩৫ সনের কার্তিক মাসের শেষদিকে। ১৮২৮ সালের নভেম্বর মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে।

চাঁদপাল ও অন্যান্য গঙ্গার ঘাটে তখন পাল্কি-বেহারারা পাল্কি নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকত। নবাগতরা নৌকা করে কলকাতার ঘাটে অবতরণ করলে তারা দল বেঁধে ঘিরে ধরত তাদের। বিদেশী সাহেব ও ধনিক বাবুদের দিকেই তাদের নজর থাকত বেশি। উড়িয়া বেহারাদের কাঁধে চড়ে, নানারকমের ঝালর ও ঘেরাটোপ দিয়ে ঘেরা পাল্কির ভিতরে বসে, নবাগতরা কলকাতা মহানগরের প্রথম মুখদর্শন করতেন। নববিবাহিত বধূর প্রথম শ্বশুরালয় দর্শনের মতন।

পিতা ঠাকুরদাস, গুরুমশাই কালীকান্ত ও ভৃত্য আনন্দরামের সঙ্গে বালক ঈশ্বরচন্দ্র কলকাতার গঙ্গার ঘাটে প্রথম যখন পদার্পণ করেছিলেন, তখন তাঁদের চেহারা পোষাক-পরিচ্ছদ ও হাবভাব দেখে উড়িয়া বেহারারা হয়ত তাঁদের পাল্কিতে চড়বার জন্য অনুরোধ করতেও উৎসাহিত হয়নি। শৌখিন বাবু, অথবা পাড়াগেঁয়ে জমিদার বলে তাঁদের মনে করবার কোন কারণও ছিল না। বেহারারা তাঁদের দেখেই বুঝতে পেরেছিল যে পাল্কি চড়ে গন্তব্য স্থানে যাবার পাত্র তাঁরা নন।

গন্তব্য স্থানও অবশ্য তাঁদের বেশি দূরে নয়, কাছেই বড়বাজারে। সকলে

নবাগতও নন। ঠাকুরদাস এর আগে কলকাতায় এসেছেন ও বাস করেছেন। তাঁর অজানা কিছু নেই। গঙ্গার ঘাটে এসে তিনি একাধিকবার অবতরণ করেছেন। গঙ্গাতীর থেকে গন্তব্য স্থানের দূরত্ব কতটুকু, তাও তিনি বিলক্ষণ জানেন। সুদূর বীরসিংহ গ্রাম থেকে পায়ে হেঁটে যাঁরা এতদূর পথ এসেছেন, তাঁরা কখনও শহুরে বাবুদের মতন, কি পাড়াগেঁয়ে জমিদারদের মতন, অথবা বিদেশী সাহেবদের মতন, পাল্কি চড়ে কলকাতা শহরে শুভাগমন করবেন না।

ঠাকুরদাস প্রথম যখন কলকাতা শহরে এসেছিলেন, তখন কলকাতা সবেমাত্র তার গ্রাম্যবেশ ছেড়ে আধুনিক নাগরিক রূপ ধারণ করছে। ১৮০৪-৫ সালের কথা। তার পর প্রায় পঁচিশ বছর কেটে গেছে। বর্ধিষ্ণু নতুন মহানগরের জীবনে পঁচিশ বছর প্রায় দীর্ঘ এক শতাব্দীর সমান। বড়বাজারের চাকুরী-জীবনে, দৈনন্দিন জীবন-সংগ্রামের ফাঁকে ফাঁকে, ঠাকুরদাস কলকাতা শহরের এই ক্রমবিকাশ অনেকটা স্বচক্ষে দেখবার সুযোগ পেয়েছেন। বালক ঈশ্বরচন্দ্র প্রথম যে কলকাতা শহর দেখলেন, তার সঙ্গে তাঁর পিতা ঠাকুরদাসের কিশোর-জীবনের প্রথম-দেখা কলকাতার পার্থক্য অনেক।

এর মধ্যে কলকাতার গঙ্গাতীরের রূপ একেবারে বদলে গেছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষদিকে বিদেশী নবাগতরা এসে কলকাতা শহরের গঙ্গাতীরের যে দৃশ্য দেখেছিলেন, তার আমূল পরিবর্তন হয়েছে। কলকাতার 'লটারী কমিটি'র চেষ্টায় নতুন পথঘাট তৈরি হয়েছে অনেক, খানাডোবা-খাল-পুকুর অনেক ভরাট করা হয়েছে, জঙ্গল ও বন কেটে পরিষ্কারও করা হয়েছে। গঙ্গার গর্ভ থেকে নতুন তীরভূমির অভ্যুত্থান হয়েছে যেখানে, তারই নাম ছিল সুতানুটি। জব চার্নক একদিন সুতানুটির যে গঙ্গাতীরে এসে আশ্রয় নিয়েছিলেন, সেই তীর থেকে গঙ্গা আরও অনেক দূরে পশ্চিমদিকে সরে গিয়েছে। অপসৃত গঙ্গার তীরে লটারী কমিটি নতুন বাঁধানো রাস্তা তৈরি করেছেন, স্ট্র্যাণ্ড রোড। নতুন নতুন নৌকা-ভেড়ার ঘাট ও পোতাশ্রয় গড়ে উঠেছে তার ধারে ধারে। চাঁদপাল ঘাট থেকে নতুন ফোর্ট উইলিয়ম পর্যন্ত সারবন্দী বৃক্ষশ্রেণী মনোরম সান্ধ্য বিলাসভ্রমণের পথ রচনা করেছে, নাম 'রেসপণ্ডেন্সিয়া ওয়াক্'। সূর্যাস্তের পর থেকে কলকাতা শহরের অভিজাত-সমাজের পুরুষ ও মহিলাদের ভিড়

নবরত্ন মন্দিরসহ স্ট্র্যাণ্ডরোডের দৃশ্য: চার্ল্‌স ডয়িলির *Views of Calcutta* (১৮৪৮) থেকে গৃহীত

ক্লাইভ স্ট্রীটের দৃশ্য ; চার্ল্‌স ডয়িলি থেকে গৃহীত (১৮৪৮)
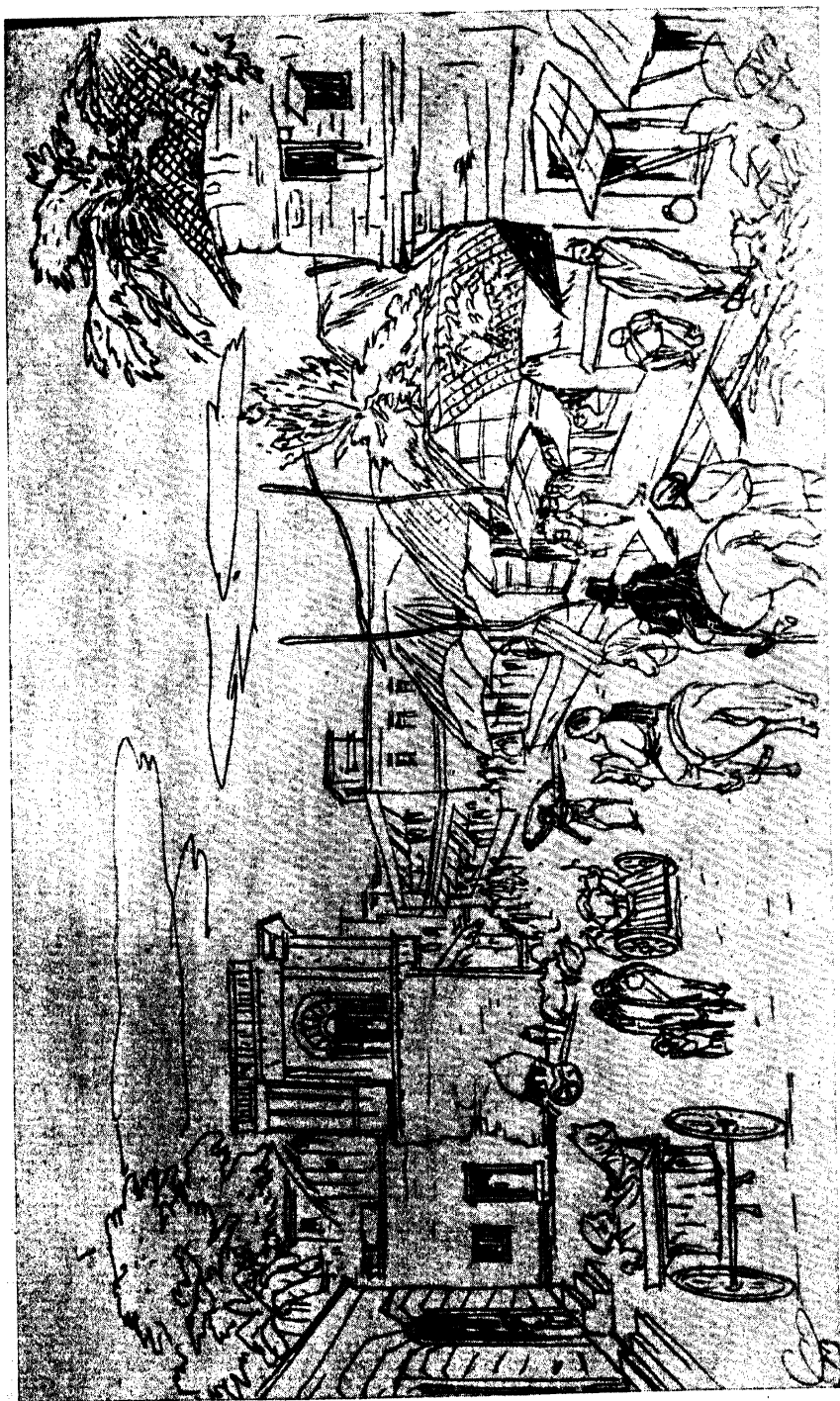
জমতে থাকে সেখানে। নানারকমের ঘোড়ার গাড়ি ও বাহারে পাল্কিতে রেস-পণ্ডেস্মিয়া ওয়াক্ ভরে যায়। সাহেব-বিবিদেরই ভিড় বেশি। তার মধ্যে এদেশী ধনিকরাও এসে যোগ দেন। গঙ্গাতীরের মনোরম পরিবেশে ঐশ্বর্যের রেষারেষি চলে। নতুন মহানগরের ঐতিহাসিক চরিত্রের প্রকাশ হয় গঙ্গাতীরে।[১]

খেয়াঘাটের নৌকা যখন কলকাতার ঘাটে এসে ভিড়ল এবং বালক ঈশ্বরচন্দ্র যখন নতুন মহানগরে প্রথম পদার্পণ করলেন, তখন সকাল কি সন্ধ্যা জানা নেই। সন্ধ্যার প্রাক্কাল হলে, গঙ্গাতীরের স্ট্র্যাণ্ডের উপর দিয়ে তিনি কলকাতা শহরের নতুন রাজপুত্র ও রাজকন্যাদের নিশ্চয় আনাগোনা করতে দেখেছেন। পিতামহীর মুখে শোনা রূপকথার রাজকন্যাদের সঙ্গে হয়ত অনেক মিল ছিল তাদের।

গন্তব্যস্থান বড়বাজারের দয়েহাটা অঞ্চল। ব্যবসায়ীর অমরাবতীর সিংহদ্বার দিয়ে শহরে প্রবেশ। একেবারে দয়েহাটায়, বাজারের কেন্দ্রস্থলে। উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ ভাগবতচরণ সিংহের বাড়ী দয়েহাটায়। মারোয়াড়ী বণিকদের গদিতে তখনও কলকাতার প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র ছেয়ে যায়নি। বড়বাজার ও সুতানুটির আদি প্রতিষ্ঠাতা বাঙালী ব্যবসায়ী শেঠ, বসাক, মল্লিক, শীল, বড়াল প্রভৃতি পরিবারদের আধিপত্য তখনও অক্ষুণ্ণ ছিল এ-অঞ্চলে। তন্তুবণিক, গন্ধবণিক, তাম্বুলিবণিক, সুবর্ণবণিক প্রভৃতি বাঙালী বণিকসম্প্রদায় তখনও কলকাতার বড়বাজার অঞ্চলে বাণিজ্যক্ষেত্রে কর্তৃত্ব করতেন। স্থাপত্যকলার স্পর্শশূন্য স্তূপাকার পোড়া-ইটের বিসদৃশ ইমারৎ-শ্রেণীও তখন বড়বাজারকে কুৎসিত করে তোলেনি। বাঙালী শেঠ, বসাক, মল্লিকদের বিশাল-বিশাল চৌহদ্দি-জোড়া তিনচার-মহলা সব বাড়ী ছিল বড়বাজারে। পূজামণ্ডপ ও দালান ছিল, বাগান-পুকুর পর্যন্ত ছিল। গঙ্গাতীরের ঘাট পর্যন্ত তাঁদের নিজেদের তৈরি সব পথ ছিল, স্নানের ঘাটও ছিল। অন্তঃপুরের মহিলারা ঝালরঢাকা পাল্কিতে চড়ে গঙ্গাস্নান করতে যেতেন। পাল্কি-বেহারারা ঘাটে নেমে, পাল্কিসহ তাঁদের গঙ্গায় চুবিয়ে নিয়ে ফিরে আসত। তখন বড়বাজার অঞ্চলে বাঁশবন ও বাঁশঝাড় ছিল অনেক। বাঁশতলাভিমুখী গলিরও অন্ত ছিল না। ছোট অলিগলির একমুঠো মাটিও আজ যেখানে সোনা এবং একখণ্ড মাটির চিহ্ন নেই আজ যেখানে, সেখানে পায়ে-হাঁটা সব মেঠোপথ ছিল। সেই

সব মেঠোপথ দিয়ে বাঁশবনে পৌঁছে ডোমকানা হয়ে যেতে হত। আজও তাই হতে হয় বড়বাজারের অলিগলিতে, কিন্তু শানবাঁধানো গলিতে এবং ব্যবসায়ীর গদিতে, বাঁশবনে নয়।

ঠাকুরদাসকে নিয়ে রামজয় তর্কভূষণ যখন দয়েহাটায় ভাগবতচরণ সিংহের গৃহে উপস্থিত হয়েছিলেন, তখন বড়বাজার ছিল বাঙালী ব্যবসায়ীদের বাজার। তার প্রায় কুড়ি বছর পরে বিদেশী মহিলা ফ্যানি পার্কস, ১৮২৫ সালে যখন বড়বাজার দেখতে এসেছিলেন, তখনও বড়বাজার কলকাতার সব চেয়ে বড় বাজার ছিল বটে, কিন্তু তার চেহারা এ রকম ছিল না। বড়বাজারকে ফ্যানি পার্কস শাল-আলোয়ান কেনাকাটার বাজার বলেছেন, কিন্তু একবার বেড়িয়ে যাবার মতন জায়গা বলেও উল্লেখ করেছেন—'The Bara Bazar, the great mart where Shawls are bought, is worth visiting'।[২] ঈশ্বরচন্দ্রকে নিয়ে ঠাকুরদাস যখন বড়বাজারে এলেন, তখনও বড়বাজার অবাঙালী বণিকের বড়বাজার হয়নি, বাঙালীরই বড়বাজার ছিল। শেঠ-বসাক-মল্লিকদের সৌভাগ্য-রবি তখন অস্তাচলে যায়নি। তারপর সুপ্রীম কোর্টের মামলা-মোকদ্দমায় ও ব্যক্তিগত বিলাসিতায় বাণিজ্যলব্ধ সমস্ত সঞ্চিত মূলধন তাঁরা খোলামকুচির মতন উড়িয়ে দিয়েছেন। লেনদেনের বাণিজ্যলব্ধ মূলধন উৎপাদনশিল্পে নিয়োগ করে বাঙালীরা বণিকশ্রেণী থেকে শিল্পপতিশ্রেণীতে রূপান্তরিত হতে পারেননি। কেন হতে পারেননি, সে কাহিনী বড়বাজারের শানবাঁধানো গলিতে ও শেঠ-মল্লিক-বসাকদের প্রাচীন অট্টালিকার ইটের গায়ে খোদাই করা রয়েছে। লেনদেনের বাণিজ্য থেকেও প্রতিযোগিতার চাপে ক্রমে পশ্চাদপসরণ করে এখন তাঁরা অনেকে চাকুরীজীবীর নিরাপদ বন্দরে আশ্রয় নিয়েছেন। আর তাঁদেরই সঞ্চিত ধন আইন-আদালতের নালা দিয়ে বন্যার বেগে বয়ে এসে অ্যাটর্নি, অ্যাডভোকেট, উকিল, মোক্তার, দালালদের নিয়ে বাক্য-ব্যবসায়ী এক বাঙালী মধ্যশ্রেণী গড়ে তুলেছে কলকাতা শহরে।

ঈশ্বরচন্দ্র কলকাতায় এসে দয়েহাটায় ভাগবতচরণ সিংহের গৃহেই আশ্রয় নিলেন। ভাগবতচরণ তখন জীবিত ছিলেন না। কিন্তু তাঁর গৃহটি ছিল

বড়বাজারে এবং দয়েহাটার বাড়ীতে তাঁর পরিবারের সকলে তখন বসবাসও করতেন। দয়েহাটা এখনও স্বনামেই বিরাজ করছে বড়বাজারে। দু'-একটি জীর্ণ প্রাচীন অট্টালিকার দিকে চেয়ে উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ সিংহমহাশয়দের গৃহের কথা মনে হয়। তার চেয়েও বেশি মনে হয়, ঈশ্বরচন্দ্রের বাল্যজীবনের ও ছাত্রজীবনের সব চেয়ে কঠোর সংগ্রামের দিনগুলি যে-পাড়ায় ও যে-গৃহে কেটেছে, তার কথা। তার ঐতিহাসিকতার কথা। কিন্তু গৃহটিকে সঠিক-ভাবে নির্দেশ করার কোন প্রমাণ নেই কোথাও আজ। রেকর্ড থেকেও দয়েহাটার গৃহের কায়স্থ মালিকের অস্তিত্ব পর্যন্ত লুপ্ত হয়ে গেছে। ভবিতব্য-বাদী জন্মদার্শনিকের দেশে ঐতিহাসিক স্মৃতি এইভাবেই অবজ্ঞার আড়ালে পথের ধুলোয় মিশে যায়। যেমন সম্প্রতি কলকাতা শহরের সব প্রাচীন ঐতিহাসিক রাস্তাঘাটের নাম 'রাজনৈতিক' কারণে লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে।

ভাগবতচরণ সিংহের গৃহটির আজ কোন হদিশ পাওয়া আর সম্ভব নয়। দয়েহাটার যে দু'-একটি প্রাচীন ভগ্নগৃহ থেকে তার আভাস পাওয়া যায়, তাও অবলুপ্তির পথে। অদূর ভবিষ্যতে তার ভগ্নস্তূপের উপর কুৎসিত কুঁজের মতন কোন ব্যবসায়ীর ইমারৎ ঠেলে উঠবে। তবু দয়েহাটা নামটি যদি কোন ব্যবসায়ীর বা রাজনৈতিক নেতার স্মৃতিরক্ষার্থে লুপ্ত হয়ে না যায়, তাহলে ঐতিহাসিক স্মৃতিসচেতন বাঙালী মাত্রই বড়বাজারের এই পথটিতে ঢুকলে অবশ্যই রোমাঞ্চ বোধ করবেন। দয়েহাটারই এক গৃহের কোণে প্রদীপ জেলে রাত্রে বালক ঈশ্বরচন্দ্র লেখাপড়া করতেন। দয়েহাটা থেকেই হেঁটে গোলদীঘির সংস্কৃত কলেজে তিনি যাতায়াত করতেন। দয়েহাটারই এক গৃহকোণ থেকে রাইমণির স্নেহমধুর কণ্ঠের 'ঈশ্বর' ডাক শোনা যেত। দেনাপাওনার দৈনন্দিন হৃদয়হীন নির্দয়তার মধ্যে, বড়বাজারের এই দয়েহাটা অঞ্চলেই, দয়ামায়ামমতা ও মাতৃস্নেহের নির্ঝরিণী রাইমণি বাস করতেন। ভগবতী দেবীর স্নেহাশ্রয় থেকে দূরে থেকেও, ভাগবতচরণের বিধবা কন্যা রাইমণির এই মাতৃস্নেহের নির্ঝরিণীধারায় অবগাহন করে, বালক ঈশ্বরচন্দ্র বড়বাজারে বাস করেও জনসমাজে মানুষের মতন মানুষ হয়ে গড়ে ওঠার সুযোগ পেয়েছিলেন।

ভাগবতচরণের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র জগদ্দুর্লভ সিংহ সংসারের কর্তা হয়েছেন। তখন তাঁর বয়স বছর পঁচিশ। গৃহিণী, জ্যেষ্ঠা ভগিনী, তাঁর স্বামী

ও দুই পুত্র, এক বিধবা কনিষ্ঠা ভগিনী ও তাঁর এক পুত্র, এই নিয়ে জগদ্দুর্লভ-বাবুর পরিবার। ঠাকুরদাসকে তিনি খুড়ামশায় বলে ডাকতেন। ঈশ্বরচন্দ্র তাই জগদ্দুর্লভবাবুকে দাদা এবং তাঁর বড় বোন ও ছোট বোনকে বড়দিদি ও ছোড়দিদি বলে ডাকতেন। রাইমণি ছিলেন তাঁর ছোড়দিদি।

গ্রাম থেকে প্রথম শহরে এলে, গ্রাম্য বালকের মানসিক অবস্থা কি রকম হয় তা সহজেই বোঝা যায়। গ্রাম্য পরিবেশের সঙ্গে বালকচিত্তের যে নিবিড় আত্মীয়তা হয়, শহরের কৃত্রিম পরিবেশে তা হয় না। মনটা পড়ে থাকে গ্রামের মাঠে-প্রান্তরে। বীরসিংহ গ্রামের একান্ত পরিচিত আনাচে-কানাচে, মথুর মণ্ডলদের বাড়ীঘরের আশেপাশে, খেলার নিত্যসঙ্গীদের পিছনে পিছনে ঈশ্বরচন্দ্রের মনটি ঘুরে বেড়াত। তার উপর মা নেই কাছে, ঠাকুমাও নেই। দয়েহাটার অপরিচিত পরিবেশে প্রথমটা নিশ্চয় তিনি নির্বাসিতের মতন অসহায় বোধ করতেন। কিন্তু সিংহ-পরিবারের আদরযত্নে ক্রমে তিনি বিচ্ছেদ-বেদনা ভুলে যেতে লাগলেন। মনের ভার অনেকটা হালকা হয়ে গেল। সবার উপরে, রাইমণি যেন মাতৃমূর্তিতে তাঁর কাছে এসে দাঁড়ালেন। রাইমণি বিধবা। একমাত্র পুত্র গোপালকে নিয়ে তিনি বিধবা হয়েছেন। গোপালের প্রতি তিনি স্নেহান্ধ ছিলেন। থাকাই স্বাভাবিক। কিন্তু গোপালের সমবয়স্ক ঈশ্বরচন্দ্রের প্রতি রাইমণির স্নেহ ও আদরযত্ন আরও বেশি ছাড়া কম ছিল না। ঈশ্বরের প্রতি তাঁর সস্নেহ দৃষ্টি সজাগ থাকত সব সময়। মা-ঠাকুমার কোল ছেড়ে দূরে এসে বালক ঈশ্বরের মনে কোন কষ্ট না হয় যাতে, এতটুকু অনাদরে ও অবহেলায় বালকের মন অভিমানে যাতে গুম্‌রে না ওঠে, সে-সম্বন্ধে রাইমণি সংসারের আর-সকলের মধ্যে সবচেয়ে বেশি সচেতন থাকতেন। খুঁটিনাটি কোন ব্যাপারে তিনি গোপালের সঙ্গে ঈশ্বরের কোন তফাৎ করতেন না। ঠাকুমার কথা মনে করে ঈশ্বর মধ্যে মধ্যে কান্নাকাটি করতেন, কিন্তু ক্রমে রাইমণির স্নেহে তিনি প্রকৃতিস্থ হলেন। মা-ঠাকুমার স্নেহের অভাব রাইমণি একাই পূর্ণ করে দিলেন। নিজ পরিবারের পরিবেশ ফিরে পেলেন ঈশ্বরচন্দ্র দয়েহাটার সিংহ-পরিবারে।

বাল্যজীবনের সিংহ-পরিবারের এই স্মৃতি ঈশ্বরচন্দ্রের মনে তাঁর জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত খোদাই করা ছিল। বিশেষ করে ছোড়দিদি রাইমণির স্মৃতি।

পরিণত বয়সে যে আত্মস্মৃতি তিনি লিখতে আরম্ভ করেছিলেন, তাতে রাইমণির কথা যে রকম আন্তরিক আবেগ দিয়ে তিনি লিখে গিয়েছেন, তাতে বোঝা যায়, বিধবা রাইমণি তাঁর ভবিষ্যৎ-জীবনে কতখানি প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। তাঁর নিজের ভাষাতেই রাইমণির এই প্রভাবের কথা বলছি :[৩]

> ...কনিষ্ঠা ভগিনী রাইমণির অদ্ভুত স্নেহ ও যত্ন আমি কস্মিনকালেও বিস্মৃত হইতে পারিব না। তাঁহার একমাত্র পুত্র গোপালচন্দ্র ঘোষ আমার প্রায় সমবয়স্ক ছিলেন। পুত্রের উপর জননীর যেরূপ স্নেহ ও যত্ন থাকা উচিত ও আবশ্যক, গোপালচন্দ্রের উপর রাইমণির স্নেহ ও যত্ন তদপেক্ষা অধিকতর ছিল, তাহার সংশয় নাই। কিন্তু আমার আন্তরিক দৃঢ় বিশ্বাস এই, স্নেহ ও যত্ন বিষয়ে, আমায় ও গোপালে রাইমণির অণুমাত্র বিভিন্ন ভাব ছিল না। ফলকথা এই স্নেহ, দয়া, সৌজন্য, অমায়িকতা, সদ্বিবেচনা প্রভৃতি সদ্‌গুণ বিষয়ে, রাইমণির সমকক্ষ স্ত্রীলোক এ-পর্য্যন্ত আমার নয়নগোচর হয় নাই। এই দয়াময়ীর সৌম্যমূর্ত্তি, আমার হৃদয়মন্দিরে, দেবীমূর্ত্তির ন্যায় প্রতিষ্ঠিত হইয়া বিরাজমান রহিয়াছে। প্রসঙ্গক্রমে, তাঁহার কথা উত্থাপিত হইলে, তদীয় অপ্রতিম গুণের কীর্ত্তন করিতে করিতে, অশ্রুপাত না করিয়া থাকিতে পারি না। আমি স্ত্রীজাতির পক্ষপাতী বলিয়া, অনেকে নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। আমার বোধ হয়, সে নির্দ্দেশ অসঙ্গত নহে। যে ব্যক্তি রাইমণির স্নেহ, দয়া, সৌজন্য প্রভৃতি প্রত্যক্ষ করিয়াছে, এবং ঐ সমস্ত সদ্‌গুণের ফলভোগী হইয়াছে, সে যদি স্ত্রীজাতির পক্ষপাতী না হয়, তাহা হইলে, তাহার তুল্য কৃতঘ্ন পামর ভূমণ্ডলে নাই।

বার্ধক্যে পৌঁছেও রাইমণির জন্য যাঁর এতখানি আবেগ সঞ্চিত ছিল, সংসারের ও সমাজের সমস্ত মালিন্যের মধ্যেও যিনি নিজ হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত রাইমণির সৌম্যমূর্তি এতটুকু কলঙ্কিত হতে দেননি, তাঁর জীবনে রাইমণির কোন প্রভাব ছিল না, একথা ভাবা যায় না। প্রভাব যে কত গভীর ছিল, তিনি নিজেই পরিষ্কার স্পষ্ট ভাষায় তার আভাস দিয়েছেন। তাঁর কর্মজীবনে স্ত্রীজাতির প্রতি তাঁর পক্ষপাতিত্বের কথা স্বীকার করে নিয়ে, রাইমণিকেই তিনি তাঁর

প্রেরণার উৎস বলে ইঙ্গিত করতে ভোলেননি। এই ইঙ্গিতের তাৎপর্যও গভীর। বাল্যবয়সের স্মৃতির প্রতি বার্ধক্যে যিনি নিজেই এই ইঙ্গিত করতে দ্বিধাবোধ করেননি, তাঁর কাছেও তার তাৎপর্য সামান্য নয়।

বিদ্যাসাগর বিধবাবিবাহ আন্দোলনের প্রেরণা পেলেন কোথা থেকে, কেমন করে, তাই নিয়ে অনেক কাহিনী প্রচলিত আছে। সজ্জন ব্যক্তিরা বিদ্যাসাগর-চরিত্রে মাতৃভক্তি ও দয়ার চরম বিকাশ দেখে চমৎকৃত হয়েছেন। সাধারণ সরলহৃদয় মানুষের মনেও বিদ্যাসাগরের এই মূর্তি অঙ্কিত হয়েছে। তাই তাঁর প্রত্যেকটি মহৎ কাজের উৎস-সন্ধান করতে গিয়ে তাঁরা নিজেদের মনের মতন সব কাহিনী ও কিংবদন্তী রচনা করেছেন। বিধবাবিবাহ সম্বন্ধেও এরকম অনেক কাহিনী আছে। তার মধ্যে সবচেয়ে প্রচলিত কাহিনী হল, বিদ্যাসাগর তাঁর মা'য়ের কাছ থেকে এই প্রেরণা পেয়েছিলেন। বালবৈধব্যের দুঃখকষ্টে কাতর হয়ে একবার নাকি ভগবতী দেবী ঈশ্বরচন্দ্রকে বলেছিলেন, 'তোদের শাস্ত্রে কি এমন বিধান নেই কোথাও, যাতে এই দুঃসহ জীবনের অবসান ঘটানো যায়?' মা'য়ের কথায় উৎসাহিত হয়ে ঈশ্বরচন্দ্র শাস্ত্র ঘেঁটে বিধবাবিবাহ অশাস্ত্রীয় নয় প্রমাণ করবার জন্য নাকি তৎপর হয়েছিলেন। এরকম আরও অনেক কাহিনী আছে। এগুলিকে কাহিনী ছাড়া আর কিছু বলা যায় না।

ভগবতী দেবী উদারহৃদয় নারী ছিলেন। যে মাতুল পরিবারে তিনি আশৈশব মানুষ হয়েছিলেন, শিক্ষাদীক্ষায় ও বিদ্যাচর্চায় তাঁদের সমতুল্য পরিবার খুব অল্পই ছিল। সাধারণ অশিক্ষিত গ্রাম্য নারীর মতন সংস্কার বা সামাজিক সঙ্কীর্ণতা তাঁর না থাকা আশ্চর্য নয়। কিন্তু তিনি বিধবাবিবাহের শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যার জন্য ছেলেকে অনুরোধ করেছিলেন বলে মনে হয় না। বৈধব্যের দুঃখ যদি ঈশ্বরচন্দ্র কারও ব্যক্তিগত জীবন থেকে বোধ করে থাকেন, তাহলে তা রাইমণির জীবন থেকেই তাঁর পক্ষে করা সম্ভব। কিন্তু তা সম্ভব হলেও, বিধবাবিবাহ আন্দোলনের প্রেরণা কেবল সেই ব্যক্তিগত বোধ বা বেদনা থেকে তিনি পাননি। সামাজিক ইতিহাসে এইজাতীয় আকস্মিকতার বিশেষ কোন স্থান নেই। বিধবাবিবাহ 'আন্দোলনে' পরিণত না হলেও, তাই নিয়ে রীতিমত আলাপ-আলোচনা সমাজে তার আগে থেকেই চলছিল। বিদ্যাসাগর

তাই থেকেই তাঁর সামাজিক কর্তব্যের আসল প্রেরণা পেয়েছিলেন এবং তখনকার প্রগতিশীল সংস্কারপন্থী সমাজের বিশেষ তাগিদকেই তিনি বাস্তব রূপ দেবার চেষ্টা করেছিলেন।*

পণ্ডিত সভারাম বাচস্পতি কিশোর ঠাকুরদাসের আশ্রয়দাতা ছিলেন কলকাতায়। তাঁরও পরিবার ছিল। অর্থ ও প্রতিপত্তি ছিল। সবই ছিল, কিন্তু রাইমণি ছিলেন না। তাই সব থেকেও, কিছুই ছিল না। কিশোর বালককে জ্ঞাতির আশ্রয় ছেড়ে চলে যেতে হয়েছিল। সে-সব কথা ঠাকুরদাস ভুলে যাননি। তিনি জানতেন, জগদ্দুর্লভবাবুর পরিবার না থাকলে এবং সেই পরিবারের মধ্যমণি রাইমণি না থাকলে, তাঁর পক্ষে পুত্রকে নিয়ে কলকাতায় চাকরি করে বাস করা সম্ভব হত না। ঈশ্বরচন্দ্র নিজেও লিখেছেন: 'এ অবস্থায়, অন্যত্র বাসা হইলে, আমার মত পল্লীগ্রামের অষ্টমবর্ষীয় বালকের পক্ষে, কলিকাতায় থাকা কোনও মতে চলিতে পারিত না।'

কলকাতায় আসার পর পাঁচ-সাতদিন সুস্থির হতেই কেটে গেল। তারপর পড়াশুনার প্রশ্ন উঠল। জগদ্দুর্লভবাবুর বাড়ীর কাছে শিবচরণ মল্লিক নামে এক ধনী সুবর্ণবণিক বাস করতেন। সুবর্ণবণিক সমাজের বহু সঙ্গতিপন্ন ব্যক্তি তখন বড়বাজার অঞ্চলে বসবাস ও ব্যবসা করতেন। শিবচরণবাবুর বাড়ীতেই একটি পাঠশালা ছিল। ধনী ব্যক্তিদের অনেকের বাড়ীতেই তখন পাঠশালা ছিল। বাড়ীতে গুরুমহাশয়ের কাছে বিদ্যাশিক্ষার বয়স পর্যন্ত সাধারণত ধনীর দুলালদের বাইরের কোন বিদ্যালয়ে পাঠানো হত না। গুরুমহাশয় ধনিক পরিবারের সন্তানদের বাড়ীতেই পড়াতেন। তাদের সঙ্গে পাড়া-প্রতিবেশীর আরও দু'-চারজন ছেলে এসে যোগ দিত। বৈঠকখানাটাই পাঠশালা হয়ে যেত। শিবচরণ মল্লিকের বাড়ীতে যে পাঠশালা ছিল, তাতে তাঁর নিজের পুত্র, ভাগনে, জগদ্দুর্লভবাবুর ভাগনেরা এবং আরও তিন-চারটি বালক পড়াশুনা করত। কথা হল, জগদ্দুর্লভবাবুর ভাগনেদের সঙ্গে ঈশ্বরচন্দ্র কিছুদিন

* এই বিষয়ে এই গ্রন্থের 'প্রথম খণ্ডে'র ৫ম ও ৬ষ্ঠ অধ্যায় দ্রষ্টব্য। এই গ্রন্থের 'তৃতীয় খণ্ডে' এই বিষয়ে বিস্তারিত ঐতিহাসিক বিবরণ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

ঐ পাঠশালাতেই যাতায়াত করবেন। অগ্রহায়ণ, পৌষ, মাঘ, এই তিন মাস তিনি ঐ পাঠশালাতেই লেখাপড়া করলেন। পাঠশালার শিক্ষক ছিলেন স্বরূপচন্দ্র দাস। মাত্র তিন মাসের জন্য তাঁর পাঠশালাতে পড়লেও, ঈশ্বরচন্দ্র তাঁর কথা শেষ জীবন পর্যন্ত ভোলেননি। স্বরূপচন্দ্রের শিক্ষাপদ্ধতি তাঁকে যে বিশেষভাবে অভিভূত করেছিল, তা তাঁর পরবর্তীকালের উক্তি থেকে বোঝা যায়। বীরসিংহের গুরুমশায় কালীকান্তের তুলনায় স্বরূপচন্দ্রকে তিনি আরও বেশি কৃতী শিক্ষক বলে উল্লেখ করেছেন। 'পাঠশালার শিক্ষক স্বরূপচন্দ্র দাস, বীরসিংহের শিক্ষক কালীকান্ত চট্টোপাধ্যায় অপেক্ষা, শিক্ষাদান বিষয়ে, বোধ হয়, অধিকতর নিপুণ ছিলেন।'

তিন মাস পরে তাঁর কঠিন অসুখ হল। রক্তাতিসার রোগে তিনি ভুগতে লাগলেন। তখন গ্রামাঞ্চল থেকে যাঁরা কলকাতা শহরে আসতেন, তাঁরা প্রায়ই অজীর্ণ ও উদরাময় রোগে ভুগতেন। কলকাতা ছেড়ে গ্রামে ফিরে যেতে-না-যেতেই তাঁদের অসুখ সেরে যেত এবং তাঁরা সুস্থ হয়ে উঠতেন। কলের জল, ড্রেন, পরিচ্ছন্ন রাস্তাঘাট, এসব কিছুই তখন ছিল না। তার মধ্যে প্রতি অঞ্চলে লোকের বসতি ক্রমেই বাড়ছিল। মশা-মাছির উপদ্রবে কলকাতা শহরে টেঁকা যেত না। ঈশ্বরচন্দ্রের ছয়-সাত বছর আগে, কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কাঁচরাপাড়া থেকে কলকাতা শহরে এসে, জোড়াসাঁকোয় তাঁর মাতুলালয়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন। কবিয়ালদের দলে মিশে কবি-গান ও ছড়া রচনা করতে তিনি ভালবাসতেন। দয়েহাটা থেকে জোড়াসাঁকো খুব বেশি দূরে নয়। কলকাতা সম্বন্ধে ঈশ্বর গুপ্ত যে বিখ্যাত ছড়া বেঁধেছিলেন, তা প্রধানত জোড়াসাঁকো ও তার আশপাশের অবস্থা দেখে। ছড়াটি অনেকেই জানেন,

রেতে মশা দিনে মাছি,
এই তাড়য়ে কলকেতায় আছি।

মশার উপদ্রব যে কত প্রবল ছিল তখন কলকাতায়, তা প্রায় তখনকার প্রত্যেক শহরবাসীর তিক্ত অভিজ্ঞতাপ্রসূত বিবরণ থেকে বোঝা যায়। বিদেশী মহিলা ফ্যানি পার্কস কলকাতা শহরে এসে মাসে ৩২৫ টাকা বাড়ী ভাড়া দিয়ে চৌরঙ্গী অঞ্চলে বাস করতেন। ১৮২২-২৪ সালের কথা। অনেক রকম নাগরিক অভাব-অভিযোগের কথা তিনি তাঁর ভ্রমণ-কাহিনীর মধ্যে

লিপিবদ্ধ করে গেছেন। তার মধ্যে মশার কথা অত্যন্ত তিক্ত ভাষায় ব্যক্ত করতে তিনি ভোলেননি। মশা প্রসঙ্গে ফ্যানি বলেছেন :[8] 'The greatest annoyance are the mosquito-bites ; it is almost impossible not to scratch them...' চুলকানোটা অনেক সময় রীতিবিরুদ্ধ ও বিরক্তিকর হলেও, মশা কামড়ালে না চুলকে পারা যায় না বলে ফ্যানি অভিযোগ করেছেন। তাও তো বড়বাজার জোড়াসাঁকোর তুলনায় তখন চৌরঙ্গীতে লোকবসতি খুবই বিরল ছিল। চৌরঙ্গী প্রায় গ্রামই ছিল বলা চলে। বড়বাজারের ঘিন্‌জি বসতির মধ্যে মশামাছির উপদ্রব আরও বেশি ছিল। এ-রকম অধিকাংশ অঞ্চলেরই অবস্থা ছিল কলকাতায়।

১৮২৮-২৯ সালে ঈশ্বরচন্দ্র যখন কলকাতায় আসেন, তখন কলকাতা শহরে ম্যালেরিয়ার দৌরাত্ম্যও খুব ছিল। ম্যালেরিয়ার কারণ সম্বন্ধে এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে 'বেঙ্গল হরকরা' পত্রে মন্তব্য করা হয় এই মর্মে :[৫]

> বদ্ধ ডোবা পুষ্করিণীই হ'ল ম্যালেরিয়া রোগের প্রধান উৎস। কলকাতায় তার অভাব নেই। তার জন্য মারাঠা খাল ছাড়িয়ে ওদিকে যাবার দরকার নেই। কলকাতার মধ্যেই যেখানে এদেশী লোকের বসতি খুব বেশী, সেখানে বদ্ধ ডোবা পুকুরের প্রাচুর্য্য দেখলে যে কেউ বিস্মিত হবেন। ঝোপঝাড়-জঙ্গলেরও অভাব নেই কলকাতায়। লটারী কমিটি পথঘাট তৈরী ক'রে, জলা-জঙ্গল সাফ ক'রে, কলকাতার শোভা ও শ্রীবর্দ্ধনের প্রশংসনীয় চেষ্টা করছেন বটে, কিন্তু এখনও অনেক কাজ করা বাকি আছে। সার্কুলার রোড থেকে গার্ডেন রীচ পর্য্যন্ত অনেক জায়গায় এখনও ঝোপঝাড়-জঙ্গল অনেক দেখা যায়। এ-সব পরিষ্কার না করলে, কলকাতার পরিবেশ স্বাস্থ্যকর হবে ব'লে মনে হয় না।

বেঙ্গল হরকরা পত্রের মন্তব্য থেকে কলকাতার প্রাকৃতিক অবস্থার যে চিত্র পাওয়া যায়, তাতে পরিষ্কার বোঝা যায়, ঈশ্বরচন্দ্রের মতন নবাগত গ্রাম্য বালকের পক্ষে কলকাতায় এসে অসুখে ভোগাই স্বাভাবিক।

দেওয়ান কার্তিকেয়চন্দ্র এর কিছুদিন পরে কৃষ্ণনগর থেকে কলকাতায় এসেছিলেন ঐ একই উদ্দেশ্যে, লেখাপড়া করার জন্য। কলকাতার অস্বাস্থ্যকর

পরিবেষ্টনের মধ্যে, শহরে এসে তাঁর দৈহিক অবস্থা কি রকম হয়েছিল, সে-সম্বন্ধে তিনি তাঁর 'আত্মজীবনচরিতে' যা লিখে গেছেন, তা এক্ষেত্রে উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। কার্তিকেয়চন্দ্র লিখেছেন :[৬]

> এ কালে কলিকাতা যেরূপ স্বাস্থ্যকর হইয়াছে, সে সময় সেরূপ ছিল না। বিশেষতঃ, দেশীয় নগরবাসীদিগের বাসস্থানের অংশ অতীব অস্বাস্থ্যজনক ও অসুখকর ছিল। এই বিভাগের* প্রায় সমস্ত বর্ত্মের পার্শ্বস্থ প্রণালীর মলযুক্ত জল হইতে দুর্গন্ধ বাষ্প সর্ব্বদা উত্থিত হইত। অভ্যাসবশতঃ অধিবাসীদের তাহাতে তত বিশেষ কষ্ট বোধ হইত না, কিন্তু বাহিরের লোকের এ সকল পথে গমনাগমন করিতেও অতিশয় যন্ত্রণা বোধ হইত। এমন কি নাসিকাদ্বার বন্ধ করিয়া চলিতে হইত।... জাহ্নবীতীরস্থ স্থানসমূহ অতিশয় অপবিত্র ছিল। জলের স্থলের বহুলোক তথায় নিরন্তর মলমূত্র ত্যাগ করিত। সেখানে দাঁড়াইলে ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের ও দর্শনেন্দ্রিয়ের যাতনার সীমা থাকিত না। জলও এতাদৃশ মলময় ও অপরিষ্কার ছিল যে তাহাতে গঙ্গার প্রতি বিশেষ ভক্তি থাকিলেও, তাহাতে প্রফুল্ল চিত্তে অবগাহন করা যাইত না। আমি কলিকাতায় যাইয়া অবধি পুষ্করিণীতে স্নান করিতাম। একদা কোন যোগে আত্মীয়গণের সহিত জগন্নাথের ঘাটে স্নান করিতে গিয়াছিলাম; কিন্তু জলের অবস্থা দেখিয়া আমার স্নান করিতে কোনরূপেই প্রবৃত্তি হইল না। সেদিন আমাকে অস্নাত থাকিতে হইল।
>
> তৎকালে মফঃস্বলের যে সকল লোক প্রথমে কলিকাতায় যাইতেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেরই অজীর্ণ রোগ হইত। এ পীড়াকে 'লোণালাগা' কহিত। যাঁহারা তথায় অল্পকাল থাকিয়াই প্রত্যাগমন করিতেন, তাঁহারা বাটী আসিয়া লোণা কাটাইবার নিমিত্ত কাঁচা থোড় খাইতেন, ঘোল ও কল্মির ঝোল পান করিতেন এবং গাত্রে কাঁচা হরিদ্রা মাখিতেন।

---

* 'এই বিভাগের' বলতে লেখক ঠন্ঠনিয়া অঞ্চলের কথা বলছেন, যেখানে তিনি, রামতনু লাহিড়ী, মদনমোহন তর্কালঙ্কার প্রভৃতি আরও অনেকে থাকতেন। কলকাতার অন্যান্য অঞ্চলের ক্ষেত্রেও এ-উক্তি প্রযোজ্য।

অত্যল্প গুরুপাক দ্রব্যেই আমার অসুখ হইত। এ কারণ আমি আহারের বিষয় অত্যন্ত সাবধান থাকিতাম। তথাপি দুই মাসের মধ্যে আমার অরুচি জন্মিল, এবং ক্রমশঃ বল এককালে গেল। মৃৎপাত্রে অধিক দিন লবণ থাকিলে যেমন তাহা জীর্ণ হইয়া যায়, আমার শরীর ঠিক সেইরূপ হইল। অত্যল্প আঘাতেই আমার গাত্রের ত্বক উঠিতে লাগিল। শরীরের বর্ণ শ্বেত হইয়া গেল। ঔষধ সেবনে কোন উপকার না হওয়াতে নৌকাযোগে গৃহাভিমুখে যাত্রা করিলাম। পরদিন হইতেই শরীর সুস্থ হইতে আরম্ভ হইল। চতুর্থ দিবসে বাটী উপনীত হইলাম এবং বিনা ঔষধে এক মাসের মধ্যে সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া কলিকাতায় পুনর্গমন করিলাম।

কলকাতার জলের অবস্থার যে বর্ণনা দিয়েছেন কার্তিকেয়চন্দ্র তা বাস্তবিকই ভয়াবহ। পরবর্তীকালে কলকাতা শহরের সুনাম হয়েছে প্রধানত পরিস্রুত কলের জলের জন্য। কবি ঈশ্বর গুপ্ত বা ঈশ্বরচন্দ্রের বাল্যজীবনে তা হয়নি। ঈশ্বর গুপ্তের মতন আর একজন কবিয়াল (বহুবাজার জেলিয়াপাড়াবাসী) পরে কলকাতাবাসের সুখ প্রসঙ্গে এই কলের জলের কথা দিয়ে ছড়া বেঁধেছেন। ছড়াটি এই :

(শহরে) সুখ বলতে একটি আছে
হাত বাড়ালেই জলটি কাছে।

শহরের এই সুখ তখন ছিল না। হাত বাড়ালে জলটি কাছে পাওয়া যেত না যখন, তখনই অসুখবিসুখের প্রাদুর্ভাব ছিল। কার্তিকেয়চন্দ্র লিখেছেন যে, কলকাতা থেকে গৃহাভিমুখে যাত্রা করার পরদিন থেকেই তাঁর শরীর সুস্থ হতে আরম্ভ করল। ঈশ্বরচন্দ্রেরও প্রায় তাই হয়েছিল। তাঁর অসুখটা আরও একটু কঠিন হয়েছিল বলে প্রথমে দুর্গাদাস নামে স্থানীয় এক কবিরাজ তাঁর চিকিৎসা করতে আরম্ভ করেন। তখনও কলকাতায় কবিরাজদের রাজত্ব ছিল, এবং পাড়ায় পাড়ায় তাঁরাই পসার জমিয়ে ছিলেন। দুর্গাদাস কবিরাজের চিকিৎসায় ঈশ্বরচন্দ্রের ব্যাধির কোন উপশম হল না। ক্রমে ক্রমে অসুখ বাড়তেই লাগল। রাইমণির সেবাযত্নেরও কোন অভাব ছিল না। কিন্তু ঠাকুরদাস বুঝেছিলেন, শহর না ছাড়লে অসুখ সারবে না। তাই তিনি ব্যস্ত হয়ে তাঁর মাকে সংবাদ পাঠালেন। দুর্গা দেবী তাঁর নাতির অসুখের সংবাদ

পাওয়া মাত্রই নিজেই কলকাতায় চলে এলেন। দু'একদিন কলকাতায় থেকে তিনি ঈশ্বরচন্দ্রকে নিয়ে বীরসিংহ গ্রামে ফিরে গেলেন।

ঈশ্বরচন্দ্র লিখেছেন : 'বাটীতে উপস্থিত হইয়া, বিনা চিকিৎসায়, সাঁত আট দিনেই, আমি সম্পূর্ণরূপে রোগমুক্ত হইলাম।' কলকাতা ছেড়ে নৌকা করে যেতে-যেতেই কার্তিকেয়চন্দ্র অনেকটা সুস্থ হয়ে গিয়েছিলেন। বিনা ঔষধে একমাসের মধ্যেই তিনি সুস্থ হয়ে কলকাতায় ফিরে এসেছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্রেরও ঠিক তাই হয়েছিল। সাত আট দিনের মধ্যেই বিনা চিকিৎসায় তিনি সুস্থ হয়েছিলেন। তবে একমাসের মধ্যে তিনি কলকাতায় ফিরে আসেননি। প্রায় মাস দুই-আড়াই গ্রামে থেকে, জ্যৈষ্ঠ মাসের গোড়ার দিকে, তিনি কলকাতায় ফিরে এসেছিলেন। ১৮২৯ সালের মে মাসের তৃতীয় সপ্তাহে।

ঈশ্বরকে নিয়ে ঠাকুরদাস প্রথম কলকাতা যাত্রা করেছিলেন গ্রীষ্ম-বর্ষার শেষে কার্তিক মাসে। পথচলার কষ্ট তখন তেমন ছিল না। দ্বিতীয়বার তিনি পুত্রকে নিয়ে কলকাতা যাত্রা করলেন জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রারম্ভে। প্রচণ্ড গ্রীষ্মের মধ্যে, একটু বেলা বাড়লেই, পথচলা কঠিন। পথ সেই একই পথ। চলতে চলতে মনে হয় যে, পথের কোন শেষ নেই। বাঁধাপথে এক মাইল অন্তর মাইলস্টোন আছে। দেখতে দেখতে চলা যায়, বোঝা যায়, কতটা পথ চলা হয়েছে। কিন্তু বাঁধাপথে পৌঁছবার আগে যে-পথ অতিক্রম করতে হয়, সেখানে মাইলের কোন নিশানা নেই। মনে হয় যেন পথের দূরত্বের কোন মাপজোখ নেই। পথিকের কাজ কেবল পথের উপর দিয়ে অবিরাম চলা আর চলা, পথের দূরত্বের হিসেব করা নয়।

প্রথমবার কলকাতাযাত্রার সময় ভৃত্য আনন্দরাম সঙ্গে ছিল। চলতে চলতে ক্লান্ত হলে মহানন্দে সে ঈশ্বরকে কাঁধে নিয়ে জোরে জোরে পথ চলত। দ্বিতীয়বার যাত্রার সময় ঠাকুরদাস তাই পুত্রকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'হাঁটতে পারবে, না লোক সঙ্গে নেব?' বালক মাত্রেরই এসব ব্যাপারে বাহাদুরি নেবার ইচ্ছা থাকে। পিতার কথায় পুত্র বাহাদুরি করে উত্তর দেয় : 'হাঁ পারব, আমি একলাই পথ চলতে পারব।' বাহাদুরির কথা তিনি নিজেই

স্বীকার করেছেন, 'আমি বাহাদুরি করিয়া বলিলাম, লোক লইতে হইবে না, আমি অনায়াসে চলিয়া যাইতে পারিব।' তার জন্য এবার আর কোন লোক সঙ্গে নেওয়া হল না। পুত্রকে নিয়ে ঠাকুরদাস পথে বেরিয়ে পড়লেন। কলকাতার পথে।

সেই একঘেয়ে পথ। পথের উপর চটি আর সরাইখানা, আর দু'একজন আত্মীয়-স্বজন, জ্ঞাতিকুটুম্বের বাড়ী। দীর্ঘপথযাত্রীদের তাছাড়া আর কোন আশ্রয় নেই, বিশ্রামের স্থান নেই। বীরসিংহ থেকে ঘাটাল হয়ে, আরামবাগের ভিতর দিয়ে পুরাতন অহল্যাবাই রোডে পৌঁছবার পথের উপর সেই পাতুল গ্রাম। ভগবতী দেবীর মাতুলালয়। পাতুলের প্রতি ঈশ্বরচন্দ্রের টান খুব বেশি। বীরসিংহ থেকে পাতুল ছয় ক্রোশ দূর। জননীর মাতুলালয়ের টানে ঈশ্বরচন্দ্র এই ছয় ক্রোশ পথ সহজেই চলে এলেন। সেদিনের মতন পাতুলেই বিশ্রাম করলেন তাঁরা। পরদিন সকালে পাতুল থেকে ঠাকুরদাস রামনগর যাত্রা করলেন। তারকেশ্বরের কাছে রামনগর গ্রাম। ঈশ্বরচন্দ্রের এক পিসিমা, অন্নপূর্ণাদেবীর শ্বশুরবাড়ী সেই গ্রামে। তাঁর অসুস্থতার সংবাদ পেয়ে ঠাকুরদাস আগেই স্থির করলেন, কলকাতায় যাবার পথে রামনগর ঘুরে যাবেন। বীরসিংহ থেকে পাতুল যতদূর, পাতুল থেকে রামনগর ততদূর, প্রায় ছয় ক্রোশ। অর্ধেক পথ, দু'তিন ক্রোশ, ঈশ্বরচন্দ্র অনায়াসে চলে এলেন। আগের দিন ছ'ক্রোশ হেঁটেছেন। আবার তার পরদিন ভোর থেকেই হাঁটা আরম্ভ হয়েছে। দু'তিন ক্রোশ পথ চলার পরে তাঁর ছোট-ছোট পা'দুখানা ক্লান্তিতে টাটিয়ে উঠল। এমন অবস্থা হল, যে আর একপাও তাঁর চলবার শক্তি রইল না। পথচলার এই বিষম সঙ্কট ও তার সমাধানের করুণ কাহিনী ঈশ্বরচন্দ্র নিজেই যেভাবে বর্ণনা করেছেন, তা উল্লেখযোগ্য। তিনি লিখেছেন : [৭]

> ...শেষ তিন ক্রোশে বিষম সঙ্কট উপস্থিত হইল। তিন ক্রোশ চলিয়া, আমার পা এত টাটাইল, যে আর ভূমিতে পা পাতিতে পারা যায় না। ফলকথা এই, আমার চলিবার ক্ষমতা কিছুমাত্র রহিল না। অনেক কষ্টে চারি পাঁচ দণ্ডে আধ ক্রোশের অধিক চলিতে পারিলাম না। বেলা দুই প্রহরের অধিক হইল, এখনও দুই ক্রোশের অধিক পথ বাকী রহিল।

আমার এই অবস্থা দেখিয়া পিতৃদেব বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়া পড়িলেন। আগের মাঠে ভাল তরমুজ পাওয়া যায়, শীঘ্র চলিয়া আইস, ঐখানে তরমুজ কিনিয়া খাওয়াইব। এই বলিয়া তিনি লোভ প্রদর্শন করিলেন; এবং অনেক কষ্টে ঐ স্থানে উপস্থিত হইলে, তরমুজ কিনিয়া খাওয়াইলেন। তরমুজ বড় মিষ্ট লাগিল। কিন্তু পা'র টাটানি কিছুই কমিল না। বরং খানিক বসিয়া থাকাতে, দাঁড়াইবার ক্ষমতা পর্য্যন্ত রহিল না। ফলতঃ আর এক পা চলিতে পারি, আমার সেরূপ ক্ষমতা রহিল না। পিতৃদেব অনেক ধমকাইলেন, এবং তবে তুই এই মাঠে একলা থাক, এই বলিয়া, ভয় দেখাইবার নিমিত্ত, আমায় ফেলিয়া খানিকদূর চলিয়া গেলেন। আমি উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলাম। পিতৃদেব সাতিশয় বিরক্ত হইয়া, কেন তুই লোক আনিতে দিলি না, এই বলিয়া যথোচিত তিরস্কার করিয়া, দুই একটা থাবড়াও দিলেন।

অবশেষে নিতান্ত নিরুপায় ভাবিয়া, পিতৃদেব আমায় কাঁধে করিয়া লইয়া চলিলেন। তিনি স্বভাবতঃ দুর্ব্বল ছিলেন, অষ্টমবর্ষীয় বালককে স্কন্ধে লইয়া অধিক দূর যাওয়া তাঁহার ক্ষমতার বহির্ভূত। সুতরাং খানিক গিয়া আমায় স্কন্ধ হইতে নামাইলেন এবং বলিলেন, বাবা খানিক চলিয়া আইস, আমি পুনরায় কাঁধে করিব। আমি চলিবার চেষ্টা করিলাম, কিন্তু কিছুতেই চলিতে পারিলাম না। অতঃপর, আর আমি চলিতে পারিব, সে প্রত্যাশা নাই দেখিয়া, পিতৃদেব খানিক আমায় স্কন্ধে করিয়া লইতে লাগিলেন, খানিক পরেই ক্লান্ত হইয়া, আমায় নামাইয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। এইরূপে দুই ক্রোশ পথ যাইতে প্রায় দেড় প্রহর লাগিল। সায়ংকালের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে আমরা রামনগরে উপস্থিত হইলাম, এবং তথায় সে রাত্রি বিশ্রাম করিয়া, পরদিন শ্রীরামপুরে থাকিয়া, তৎপর দিন কলিকাতায় উপস্থিত হইলাম।

শম্ভুচন্দ্র লিখেছেন যে রামনগরে যাবার পথে রাজবলহাটে এসে পিতাপুত্র দুজনে একটি দোকানে ফলাহার করেন। আহারান্তে ওঠবার সময় ঈশ্বরচন্দ্র বলেন: 'বাবা, আমি আর চলতে পারব না, আমার পা ফুলে গেছে, পা ফেলতে পারছি না।' পিতা সান্ত্বনা দিয়ে বলেন: 'খানিকটা চল, আর একটু গিয়ে

একটা তরমুজ কিনে দেব, খেও।' কিন্তু তরমুজের প্রলোভনেও ঈশ্বরচন্দ্র চলবার শক্তি পেলেন না। তখন ঠাকুরদাস ক্রুদ্ধ হয়ে, তাঁকে প্রহার করে বললেন: 'চলতে পারবি না তো, বাহাদুরি করে বলেছিলি কেন? আমি লোক সঙ্গে করে আনতাম।' অবশেষে, নিরুপায় হয়ে ঠাকুরদাস পুত্রকে কাঁধে নিয়ে পথ চলতে লাগলেন।[৮]

এইভাবে ঈশ্বরচন্দ্র কলকাতায় দ্বিতীয়বার উপস্থিত হলেন। প্রথমবার আনন্দরাম গুটির কাঁধে, দ্বিতীয়বার পিতা ঠাকুরদাসের কাঁধে চড়ে, অনেকটা পথ তাঁকে আসতে হল। দয়েহাটায় এসে রাইমণির স্নেহাশ্রয়ে তাঁর পথের ক্লান্তি দূর হয়ে গেল।

এইবার তাঁর শিক্ষা সম্বন্ধে সমস্যা দেখা দিল।

গুরুমশায়ের পাঠশালায় যতদূর শিক্ষা হওয়া সম্ভব, কালীকান্ত ও স্বরূপচন্দ্রের কাছে ঈশ্বরচন্দ্র সে-শিক্ষা পেয়েছেন। অতঃপর কি শিক্ষা তাঁকে দেওয়া উচিত এবং কি পদ্ধতিতে দিলে ভাল হয়, তাই নিয়ে হিতার্থীদের মধ্যে আলোচনা আরম্ভ হল। আত্মীয়স্বজনরা শহরে যাঁরা ছিলেন, তাঁরা নানা বিষয়ে নিজেদের মতামত ব্যক্ত করে ঠাকুরদাসকে যথাকর্তব্য নির্ধারণের জন্য পরামর্শ দিলেন।

পরামর্শদাতারা মতামতের দিক থেকে প্রধানত দু'টি দলে ভাগ হয়ে গেলেন। একদল ইংরেজী শিক্ষার পক্ষপাতী, দ্বিতীয় দল সংস্কৃত শিক্ষার পক্ষপাতী। ঘরোয়া পরামর্শ-সভায় ঠাকুরদাস আলোচনা-প্রসঙ্গে প্রথমবার কলকাতা আসার পথে তাঁর পুত্রের মাইলস্টোন দেখে ইংরেজী অঙ্কশিক্ষার কাহিনীটি বলেন। কাহিনীটি শুনে প্রথম দলের পরামর্শদাতারা আরও বেশি উৎসাহিত হয়ে বলেন, 'তবে তো ঈশ্বরকে রীতিমত ভাবে ইংরেজী শিক্ষা দেওয়া উচিত। এ-সম্বন্ধে কোন দ্বিমত করো না ঠাকুরদাস। ছেলেকে ভাল করে ইংরেজী শিক্ষা দাও, হাতে-নাতে ফল পাবে।' ফলাফলের কথাটাও তাঁরা ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিলেন।

কলকাতা শহরের পল্লীতে পল্লীতে তখন সেকালের ধরনের পাঠশালা ছিল অনেক। পল্লীগ্রামের গুরুমশায়ের পাঠশালার মতন। তাছাড়া আরও অনেক

নতুন ধরনের পাঠশালা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন 'ক্যালকাটা স্কুল সোসাইটি'। এই সব পাঠশালার মধ্যে কোন-কোন পাঠশালায় বাংলার সঙ্গে ইংরেজীও শিক্ষা দেওয়া হত। এ ছাড়া, ফিরিঙ্গীদের প্রতিষ্ঠিত কয়েকটি স্কুলও ছিল, ইংরেজী শিক্ষার জন্য সেগুলির খ্যাতিও ছিল খুব। স্কুল সোসাইটির প্রতিষ্ঠিত পাঠশালার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ছিল আরপুলি ও পটলডাঙ্গার পাঠশালা। আরপুলি-পাঠশালাটি ছিল ঠনঠনিয়া কালীবাড়ীর কাছে কর্ণওয়ালিস স্ট্রীটের পুবদিকে। ডেভিড হেয়ার সাহেব নিজেই এই পাঠশালার তত্ত্বাবধান করতেন। পাঠশালাটি ছিল অবৈতনিক, কেবল দরিদ্র সঙ্গতিহীন বালকদেরই এখানে পড়ানো হত। পাঠশালার যে ইংরেজী বিভাগ ছিল, তাতে আটবছর বয়সের কম বালকদের ভর্তি করা হত না। কারণ মাতৃভাষায় ভাল জ্ঞান না হবার আগে, ইংরেজী শিক্ষা দেওয়া হত না। ১৮২৮ সালে দেখা যায়, কেবল এই পাঠশালাটির ছাত্রসংখ্যা ছিল ২১০ জন। কলকাতার লোক এই পাঠশালাটিকে হেয়ার সাহেবের স্কুল বলত। এত সুনাম ছিল এই স্কুলের যে, প্রত্যেক সম্ভ্রান্ত পরিবারের ছেলেদের এই স্কুলে পড়ানোর চেষ্টা করা হত। স্কুলে ভর্তি হবার জন্য ছেলেরা নিজেরাই হেয়ার সাহেবের পাল্কির পিছন পিছন দৌড়ত। স্কুলের ভাল ছাত্রদের পরে উচ্চশিক্ষার জন্য হিন্দু কলেজে পড়বার সুযোগ দেওয়া হত।

পরামর্শদাতারা ঠাকুরদাসকে হেয়ার সাহেবের এই স্কুলের কথা উল্লেখ করে বললেন, ঈশ্বরকে ভর্তি করে দিতে। প্রথমত, তাঁরা বললেন, স্কুলে পড়ার জন্য তাঁকে কোন বেতন দিতে হবে না। দ্বিতীয়ত, যদি ঈশ্বর লেখাপড়ায় কৃতিত্বের পরিচয় দেয় তাহলে বিনা বেতনে হিন্দু কলেজেও পড়তে পারবে। আর হিন্দু কলেজে যদি পড়ে, তাহলে ইংরেজী শিক্ষারও চূড়ান্ত হবে। আর তাও যদি না হয়, তাঁরা বললেন, ঈশ্বর যদি মোটামুটি চলনসই ইংরেজী শিখতে পারে, হাতের লেখাটি ভাল হয়, এবং জমাখরচ রাখার মতন অঙ্ক শেখে, তাহলেও সওদাগর সাহেবদের হৌসে বা বড় বড় দোকানে সহজেই একটা কাজকর্ম জুটে যাবে। ঈশ্বরচন্দ্রের হিতার্থীরা একদল এইভাবে ইংরেজী শিক্ষার স্বর্ণকান্তি ভবিষ্যতের চিত্র এঁকে দিয়ে ঠাকুরদাসকে বললেন, সংস্কৃতের বাতিক মন থেকে মুছে ফেলে দাও ঠাকুরদাস, ওসব শিখে এখন আর কিছু হবে না।

দ্বিতীয় দলের হিতাকাঙ্ক্ষীরা সংস্কৃত শিক্ষার সমর্থক। ইংরেজ ও তাদের ইংরেজী ভাষা সম্বন্ধে তাঁদের ধারণা তখনও ধোঁয়াটে। ভবিষ্যৎও তাঁদের কাছে তেমন পরিষ্কার নয়। স্বজাতির সনাতন পেশা ছাড়া আর কোন পেশা বা চাকরিবাকরির প্রতি তাঁদের তেমন আস্থাও নেই। তাঁরা পুরুষানুক্রমে এই কথাই জেনে এসেছেন যে, ব্রাহ্মণের ঘরের ছেলে, টোলে সংস্কৃত শিক্ষা করবে এবং শিক্ষান্তে নিজে টোলচতুষ্পাঠী খুলে সেই অর্জিত বিদ্যা আরও পাঁচজনকে দান করে, অনাড়ম্বর জীবন যাপন করবে। তাঁরা তাই একবাক্যে বললেন, সংস্কৃত শিক্ষা দিতে। ঠাকুরদাস নিজেও এই সংস্কৃতপন্থীদের দলভুক্ত ছিলেন। ছাত্রজীবনে তাঁর নিজের একান্ত ইচ্ছা ছিল, তিনি সংস্কৃত শিক্ষা করে, নিজে টোলচতুষ্পাঠী খুলে অধ্যাপনা করে জীবন কাটাবেন। কিন্তু দারিদ্র্য ও অসহায় অবস্থার চক্রান্তে, জীবিকার্জনের নিষ্ঠুর তাগিদে, তাঁকে সেই ইচ্ছা ত্যাগ করতে হয়। জনৈক শিপ্-সরকারের কাছে চলনসই ইংরেজী শিখে তিনি কলকাতা শহরে কয়েকটি টাকা উপার্জনের যোগ্যতা অর্জন করেন। এ কথা তিনি ভুলে যাননি। পিতা তাঁর নিজের *জীবনের অতৃপ্ত বাসনা-কামনা* তাঁর পুত্রের জীবনে চরিতার্থ হোক দেখতে চান। ঠাকুরদাস তাই, ইংরেজী-পন্থীদের মতামত সমর্থন করলেন না। তিনি বললেন : 'ঈশ্বর লেখাপড়া শিখে, উপার্জনক্ষম হয়ে, আমার দুঃখ ঘোচাবে, তার জন্য আমি তাকে কলকাতায় আনিনি। আমার ইচ্ছা, ঈশ্বর সংস্কৃতশাস্ত্রে কৃতবিদ্য হয়ে, দেশে গিয়ে চতুষ্পাঠী স্থাপন করে, স্বাধীনভাবে অধ্যাপনা করবে। তাহলেই আমার সব আকাঙ্ক্ষা মিটবে।'

ঠাকুরদাসের এই মনোভাবে সংস্কৃতপন্থীরা খুশি হলেও, ইংরেজীপন্থী পরামর্শদাতারা ক্ষুব্ধই হলেন। সহজে ঈশ্বরচন্দ্রের শিক্ষাসমস্যার মীমাংসা হল না। তাই নিয়ে ঘরোয়া বৈঠকে তর্ক চলতে থাকল।

দরিদ্রের স্বপ্নের মধ্যেও দারিদ্র্য ফুটে ওঠে। স্বপ্নেরও কোন ঐশ্বর্য নেই। ঊর্ধ্বে আকাশপথে সে ডানা মেলতে চায় না। ঠাকুরদাসের স্বপ্নও তা চায়নি। ঈশ্বর সংস্কৃত শিখে গ্রামে চতুষ্পাঠী স্থাপন করে অধ্যাপনা করবে, এই ছিল ঠাকুরদাসের স্বপ্ন। বড়বাজারের একজন অতিক্ষুদ্র ব্রাহ্মণ বিল-কলেক্টরের স্বপ্ন। বড়বাজারের বড়মানুষের স্বপ্ন নয়। বড়মানুষের ছেলেও নন ঈশ্বরচন্দ্র। গরীব ব্রাহ্মণের ছেলের সংস্কৃত শেখাই ভাল।

কি হবে ইংরেজী শিখে? ঠাকুরদাস বললেন। গোঁড়ামি তাঁর ছিল না তেমন, তবু তিনি এক অজানা জ্ঞানসমুদ্রের বুকে বালক ঈশ্বরচন্দ্রকে ভাসিয়ে দিতে সাহস করলেন না। ঝড়ঝাপটা থেকে আত্মরক্ষা করতে যদি না পারে ঈশ্বর! স্বয়ং জগদীশ্বরও তাহলে ঈশ্বরকে রক্ষা করতে পারবেন না। দরিদ্রের সহায় নেই কেউ, ঈশ্বরও না।

শিপ্‌সরকারের কাছে ইংরেজী শিখে, ব্রাহ্মণের ছেলে তিনি, বড়বাজারের বিল-কলেক্টরে পরিণত হয়েছেন। ভাল সাহেব শিক্ষকদের কাছে ইংরেজী শিখে তাঁর ছেলে না হয় কোন সদাগরী হৌসের কেরানী হবে, দশ টাকার বদলে বিশ টাকা উপার্জন করবে মাসে। কেবল টাকার সঙ্গে যদি বিদ্যার সম্পর্ক হয়, তাহলে দরিদ্র হলেও, সে-বিদ্যার প্রতি ঠাকুরদাসের বিশেষ কোন অনুরাগ

নেই। ব্রাহ্মণের ছেলে তিনি, বিদ্যাকে ‘পণ্য’ বলে ভাবতে শেখেননি। তিনি জানেন, বিদ্যা দান করাই বিদ্বানের ব্রত। দারিদ্র্যের জন্য বিদ্যার সেই মহান্ আদর্শ তিনি ত্যাগ করতে রাজী নন। নিজের জীবনে ত্যাগ করেছেন, কিন্তু পুত্রের জীবনে কেন করবেন ?

ঠাকুরদাস জানতেন না, সেযুগের এই আদর্শেরও পরিবর্তন হচ্ছে। এযুগে বিদ্যাও পণ্য, কেনাবেচার সামগ্রী ছাড়া কিছু নয়। তার বাজারদর ও বিনিময়-মূল্যই সর্বাগ্রে বিবেচ্য।

যাঁকে নিয়ে এত আলোচনা, এত চিন্তা-ভাবনা, তিনিই যে ভবিষ্যতে সব বিতর্কের অবসান করে দেবেন এবং নবযুগের বাংলার শ্রেষ্ঠ শিক্ষাব্রতী হবেন, সেকথা বড়বাজারের কেউ তখন জানত না। ইংরেজী না সংস্কৃত, সংস্কৃত না বাংলা, কতটা ইংরেজী বা কতটা সংস্কৃত, এসব সমস্যা নিয়ে যিনি দেশের ও দশের জন্য চিন্তা করবেন এবং অনেক সমস্যার সমাধান করবেন, তিনি তাঁর নিজের শিক্ষার বিতর্কসভায় নিশ্চয় যোগদান করেননি। হয়ত দূর থেকে শুভাকাঙ্ক্ষীদের আলোচনা, ইংরেজী ও সংস্কৃতের পক্ষে ও বিপক্ষে তাঁদের যুক্তি, পিতা ঠাকুরদাসের বক্তব্য, সব তিনি শুনেছেন। সেদিন তিনি কি ভেবেছিলেন জানে না কেউ।

কেবল ঈশ্বরচন্দ্রের শিক্ষা নিয়ে নয়, সকলের শিক্ষা নিয়েই দেশের মধ্যে তখন এই আলোচনাই চলছিল। ঠাকুরদাসের মতন অনেক পিতা বড়বাজারের বাইরেও এই কথা নিয়ে চিন্তা করছিলেন। ইংরেজীপন্থী (Anglicists) ও সংস্কৃতপন্থী (Orientalists) দুই দলে তাঁরাও ভাগ হয়ে গিয়েছিলেন। সাহেবদের মধ্যেও এবিষয়ে মতানৈক্য ছিল। ইংরেজ শাসকরা শিক্ষা সম্বন্ধে তখনও মনস্থির করতে পারেননি। এদেশী ঐতিহ্য, আচার-ব্যবহার, শিক্ষা-দীক্ষা, কোন ক্ষেত্রেই হঠাৎ তাঁরা হস্তক্ষেপ করতে সাহস পাননি। সতীদাহের মতন সামাজিক কুসংস্কারকেও তাঁরা প্রথম প্রশ্রয় দিয়েছেন। ইংরেজী শিক্ষা জোর করে আরোপ করতে চাননি। এমন কি, ইংরেজী শিক্ষার প্রধান বিদ্যালয় ‘হিন্দু কলেজ’ প্রধানত এদেশী লোকের উদ্‌যোগেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ইংরেজরা সংস্কৃত কলেজ, মাদ্রাসা ইত্যাদি স্থাপন করে প্রচলিত

শিক্ষার ধারা অব্যাহত রাখতে চেয়েছিলেন। কলকাতার সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা হয় যখন, তখন বাঙালী রামমোহন রায়ই তার বিরুদ্ধে, পাশ্চাত্ত্যশিক্ষার সমর্থনে, আবেদন করেছিলেন (১৮২৩ সালে)। বেণ্টিঙ্কের শাসনকালে ইংরেজ শাসকদের শিক্ষা ও সমাজসংস্কার নীতি ক্রমে স্পষ্ট ও বলিষ্ঠ হয়ে উঠছিল। শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রাচ্যবিদ্যাপন্থী ও পাশ্চাত্ত্যবিদ্যাপন্থীদের মধ্যে দীর্ঘদিনের বিতর্কেরও অবসান হল এই সময়। মেকলের প্রস্তাব অনুযায়ী উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক ১৮৩৫ সালে তাঁর ঐতিহাসিক ঘোষণায়, এই বিবাদের চূড়ান্ত মীমাংসা করে দিলেন। ইংরেজী ও পাশ্চাত্ত্যবিদ্যাপন্থীদেরই জয় হল।*

বেণ্টিঙ্কের এই ঐতিহাসিক ঘোষণার প্রায় ছ'বছর আগে ঠাকুরদাস সিদ্ধান্ত করেন যে ঈশ্বরচন্দ্রকে সংস্কৃত শিক্ষা দেবেন। দয়েহাটায় বিবাদের মীমাংসা হয়ে যায় বটে, কিন্তু দেশে হয়নি। বড়বাজারের বাইরে, তার পরেও কয়েক বছর ধরে এই বিতর্ক চলতে থাকে।

সেকালের প্রায় প্রত্যেক সম্ভ্রান্ত পরিবারে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতরা বার্ষিক বিদায় আদায় করতে যেতেন। সিংহ-পরিবারেও এই কারণে অনেক পণ্ডিতের যাতায়াত ছিল। সেই সুযোগে ঠাকুরদাসের সঙ্গে সংস্কৃত কলেজের ব্যাকরণের তৃতীয় শ্রেণীর পণ্ডিত গঙ্গাধর তর্কবাগীশের পরিচয় হয়। প্রসঙ্গত তিনি তাঁর সঙ্গেও ঈশ্বরের শিক্ষার ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করেন এবং তাঁর মতামত জানতে চান। তর্কবাগীশ মহাশয় ঈশ্বরকে সংস্কৃত কলেজে ভর্তি করে দিতে বলেন।

* এই বিষয়ের বিস্তারিত ঐতিহাসিক বিবরণ এই গ্রন্থের 'তৃতীয় খণ্ডে' লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

† ঈশ্বরচন্দ্রের সহোদর শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন তাঁর 'বিদ্যাসাগর জীবনচরিত' গ্রন্থের মধ্যে তর্কবাগীশ মহাশয়ের কথা উল্লেখ করেছেন। চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় তর্কবাগীশের নামোল্লেখে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। তাঁর যুক্তি হল, ঈশ্বরচন্দ্র তাঁর স্বরচিত জীবনচরিতের মধ্যে কেবল মধুসূদন বাচস্পতির নাম করেছেন। এ-যুক্তি সঙ্গত বলে মনে হয় না, কারণ ঈশ্বরচন্দ্র তাঁর স্বরচিত জীবনচরিতে অনেক কথাই লিখে যাননি, এবং যেটুকু লিখে গিয়েছেন তাও সামান্য। তার উপর তাঁর পুত্র নারায়ণচন্দ্র

পাতুলগ্রামনিবাসী ঈশ্বরচন্দ্রের জননীর মাতুল রাধামোহন বিদ্যাভূষণ নিজে সুপণ্ডিত ছিলেন। খানাকুল-কৃষ্ণনগরের বিদ্যাসমাজে পাতুলের এই পরিবারের খ্যাতিও ছিল তখন। রাধামোহনের পিতৃব্যপুত্র মধুসূদন বাচস্পতি সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়ন করতেন এবং বৃত্তিও পেতেন।*

ঠাকুরদাস তাঁর সঙ্গেও পরামর্শ করেন। তিনিও ঈশ্বরকে সংস্কৃত কলেজে পড়াবার জন্য অনুরোধ করেন। মধুসূদন বলেন, সংস্কৃত কলেজে পড়ালে তাঁর সব ইচ্ছাই পূর্ণ হবে। ঈশ্বরকে যদি তিনি সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত করতে চান, তাতে কোন বাধা তো নেই-ই, এমন কি চাকরিবাকরি করাও যদি তার অভিপ্রেত হয় কোনদিন, তাতেও কোন অসুবিধা হবে না। সংস্কৃত কলেজে পড়ে যারা 'ল' কমিটির পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়, তারা আদালতের জজ-পণ্ডিত নিযুক্ত হয়। জজ-পণ্ডিতের চাকরির বেতনও ভাল, সম্মানও আছে। সুতরাং সংস্কৃত কলেজে শিক্ষা দিলে ভবিষ্যতের জন্য বিশেষ চিন্তা করতে হবে না। স্বাধীন অধ্যাপনা-বৃত্তি বা চাকরি, যা ইচ্ছা ও প্রয়োজন হবে, ঈশ্বর তাই করতে পারবে।

কেবল আত্মীয় বলে নয়, মধুসূদন বাচস্পতির পরিবারের সকলের প্রতি ঠাকুরদাসের বিশ্বাস ও অনুরাগ ছিল যথেষ্ট। মাতুল পরিবারের বিদ্যা বিনয় উদারতা ও সৌজন্যবোধ ঈশ্বরচন্দ্রকেও বাল্যকালে সবচেয়ে বেশি আকৃষ্ট করেছিল। মধুসূদনের কথার তাই বিশেষ গুরুত্ব ছিল ঠাকুরদাসের কাছে। ঈশ্বরের মনেও যে বাচস্পতির উপদেশের কোন প্রভাব পড়েনি, তা মনে হয় না। তাঁর তত্ত্বাবধানে তিনি সংস্কৃত কলেজে পড়তে পারবেন এও তাঁর পক্ষে কম আকর্ষণীয় ছিল না। অবশেষে অনেক বিচার-বিবেচনার পর তাই বাচস্পতি মহাশয়ের প্রস্তাবই গ্রহণ করা হল। ঠিক হল, ঈশ্বরচন্দ্র সংস্কৃত কলেজেই পড়বেন।

১৮২৯ সালের ১ জুন ঈশ্বরচন্দ্র সংস্কৃত কলেজে ভর্তি হন। তখন তাঁর বয়স নয় বছর। তিনি নিজে লিখেছেন :[১]

কিভাবে তাঁর পাণ্ডুলিপি প্রকাশ করেছেন, তাও কেউ অবগত নন। এক্ষেত্রে ঈশ্বরচন্দ্রের বিশ্বাস-ভাজন, স্নেহের সহোদর শম্ভুচন্দ্রের উক্তি অনেক বেশি বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হয়।

* মধুসূদন বাচস্পতি 'বসন্তসেনা', 'ছন্দোমালা' ও 'মাধবীলতা' নামে তিনখানি গ্রন্থ রচনা করেন। 'বসন্তসেনা' মৃচ্ছকটিকের অনুবাদ। (মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধির 'সন্দর্ভসংগ্রহ' দ্রষ্টব্য)।

> ১৮২৯ খৃষ্টীয় শকে, জুন মাসের প্রথম দিবসে, আমি কলিকাতাস্থ রাজকীয় সংস্কৃত বিদ্যালয়ে বিদ্যার্থিরূপে পরিগৃহীত হই। তৎকালে আমার বয়স নয় বৎসর। ইহার পূর্ব্বে আমার সংস্কৃত শিক্ষার আরম্ভ হয় নাই। ব্যাকরণের তৃতীয় শ্রেণীতে প্রবিষ্ট হইয়া, ঐ শ্রেণীতে তিন বৎসর ছয় মাস অধ্যয়ন করি।

সংস্কৃত কলেজ তার তিন বছর আগে গোলদীঘিতে (কলেজ স্কয়ার) উঠে এসেছে। ১৮২১ সালে, গবর্ণমেণ্টের জুনিয়র সেক্রেটারী হোরেস হেম্যান উইলসন, কলকাতায় একটি সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করেন। তাঁর আগে লর্ড মিণ্টো নবদ্বীপ ও ত্রিহুতে দু'টি সংস্কৃত কলেজ স্থাপনের কথা বলেছিলেন। উইলসন বলেন যে কলকাতা হল প্রধান মহানগর। বাইরে থেকে সকলের পক্ষে এখানে এসে বিদ্যালয়ে পড়াশুনা করার সুযোগ-সুবিধা অনেক বেশি। কর্তৃপক্ষের দিক থেকেও কলেজের কাজকর্ম তত্ত্বাবধান করা অনেক সহজ। সুতরাং নবদ্বীপ ও ত্রিহুত দু'জায়গায় কলেজ স্থাপন না করে, কেন্দ্রীয় মহানগর কলকাতাতে একটি সংস্কৃত বিদ্যালয় স্থাপন করাই সমীচীন। বড়লাট লর্ড হেস্টিংস বা ময়রা, উইলসনের প্রস্তাব অনুসারে, সংস্কৃত কলেজের জন্য বার্ষিক পঁচিশ হাজার টাকা ব্যয়বরাদ্দ করে, তার প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে ঘোষণা করেন (২১ অগস্ট, ১৮২১) যে সংস্কৃত-সাহিত্যের চর্চা কলেজ-প্রতিষ্ঠার আশু উদ্দেশ্য হলেও, ক্রমশ এই শিক্ষায়তনের মাধ্যমেই হিন্দুদের মধ্যে পাশ্চাত্যবিদ্যা ও ইংরেজী শিক্ষার প্রসার হবে বলে তাঁরা মনে করেন।

১৮২১ সালে সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠার ব্যাপার নিয়ে যখন এই সব আলোচনা ও প্রস্তাব পাশ হয়, তখন ঈশ্বরচন্দ্র একবছরের শিশু মাত্র।

তারপর প্রায় দু'বছর প্রস্তাব কাগজের পৃষ্ঠাতেই বন্দী থাকে। ১৮২৩ সালে নবগঠিত 'জেনারল কমিটি অফ্ পাবলিক ইনস্ট্রাকশন' এবং সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠাকল্পে যে কমিটি গঠিত হয় সেই কমিটি সম্মিলিত হয়ে প্রস্তাব কার্যে পরিণত করার সঙ্কল্প করেন। সরকার জানান যে আর বিলম্ব না করে, একটি বাড়ী ভাড়া করে সংস্কৃত কলেজের কাজ আরম্ভ করে দেওয়া উচিত। কলেজের

জন্য গৃহের সন্ধান করা এবং তার জন্য পণ্ডিত নিয়োগ করার ভার পড়ে উইলসন সাহেব ও ক্যাপটেন প্রাইসের উপর। ১৮২৪ সালের ১ জানুয়ারী থেকে, ৬৬নং বহুবাজার স্ট্রীটের একটি ভাড়া বাড়ীতে সংস্কৃত কলেজের পাঠারম্ভ হয়। ঈশ্বরচন্দ্র তখন চার বছরের শিশু, এবং গ্রামের গুরুমশায়ের পাঠশালায় তখনও তিনি পাঠারম্ভ করেননি। কলেজের পাঠারম্ভের কয়েক সপ্তাহ পরে যে রিপোর্ট দেওয়া হয় তাতে ছাত্রসংখ্যা ৪৯ জন বলে উল্লেখ করা হয়।[২]

কলেজগৃহ নির্মাণের জন্য গোলদীঘির উত্তরের অনেকটা জমি (৫ বিঘা ৭ কাঠা) কেনা হয়। তার মধ্যে দু'বিঘা জমি কেনা হয় ডেভিড হেয়ারের কাছ থেকে, কাঠা-পিছু ৫০০৲ হারে। এই সময় হিন্দু কলেজ ও স্কুলও সরকারী তত্ত্বাবধানে আসায়, তার জন্য নতুন গৃহ নির্মাণের প্রয়োজন হয়। এক সঙ্গেই উভয় বিদ্যালয়ের গৃহ নির্মাণ করা হবে স্থির হয়। নতুন গৃহের জন্য প্রায় এক লক্ষ কুড়ি হাজার টাকা মঞ্জুর করা হয়। ১৮২৪ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারী মহাসমারোহে কলেজগৃহের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয়। বার্ন কোম্পানী গৃহ নির্মাণের কন্‌ট্র্যাক্ট পান।

গৃহ নির্মাণ শেষ হতে প্রায় আড়াই বছর সময় লাগে। ১৮২৬ সালের ১ মে, হিন্দু কলেজ ও স্কুল-সহ সংস্কৃত কলেজ নতুন গৃহে প্রবেশ করে।

সংস্কৃত কলেজের জন্য শিক্ষিত ইংরেজরা প্রথম যেসব নিয়মকানুন খসড়া করেন তা অনেকদিক থেকে অভিনব। কোনরকম দৈহিক দণ্ড কলেজের ছাত্রদের দেওয়া হবে না বলে সিদ্ধান্ত করা হয়। কারণ ব্রাহ্মণ-বৈদ্য বংশের ছেলেরা সংস্কৃত কলেজের শিক্ষার্থী এবং তাদের গায়ে বেত বা অন্য কিছু স্পর্শ করলে তাদের ধর্মনাশের সম্ভাবনা থাকতে পারে। অভিভাবকরা সেই কারণে ছাত্রদের হয়ত কলেজ ছাড়িয়ে দিতে পারেন। সুতরাং দৈহিক দণ্ডদান ধর্মের ভয়ে নিষিদ্ধ ছিল। দেশীয় সংস্কার ও প্রথা যে ইংরেজ শিক্ষাবিদ্‌রাও কতখানি ভয়ে-ভয়ে মেনে চলতেন, এটা তার একটা দৃষ্টান্ত মাত্র।

কেবল এই ব্যবস্থা করেই তাঁরা অবশ্য নিশ্চিন্ত থাকেননি। হিন্দু কলেজ-সহ যখন সংস্কৃত কলেজের গৃহ নির্মাণ করা হয়, তখন দুই বিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্যে ব্যবধান রচনার যে পরিকল্পনা করা হয়, তাও বিচিত্র ও অভিনব। সংলগ্ন গৃহ দুটিকে মধ্যে প্রাচীর ও লোহার রেলিং তুলে দিয়ে স্বতন্ত্র করে

দেওয়া হয়। কের সাহেব বলেছেন যে বিদ্যালয়ে প্রবেশের জন্য কেবল একটি 'common entrance' বা সাধারণ ফটক তৈরি করা হয়। ব্রাহ্মণ-বৈদ্যের ছেলেরা এবং অন্যান্য জাতের ছেলেরা একই আকাশের তলায়, একই বায়ু সেবন করে চলাফেরা করতে পারে, কিন্তু তার বেশি ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শের ব্যবস্থা উচ্চসমাজ সহ্য করবে না। 'Out-office' পর্যন্ত স্বতন্ত্র রাখা উচিত। তাই রাখাও হয়েছিল এবং গৃহের মধ্যে প্রাচীরও তুলে দেওয়া হয়েছিল।[৩]

জাতিবৈষম্যের দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত সেকালের বাংলার সামাজিক গড়ন সংস্কৃত কলেজের ও হিন্দু কলেজের গৃহের স্থাপত্যেও প্রতিফলিত হয়েছিল। কেবল বিদ্যার ক্ষেত্রে নয়, সমাজের উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে যে-সব কৃত্রিম প্রাচীর মানুষই গড়ে তুলেছে, তার বিরুদ্ধে এই বিদ্যালয়েরই ছাত্র ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্রোহ করে

বাঙালীর সংস্কৃতি-জীবনে এরকম ঐতিহাসিক গৃহপ্রবেশ আর কখন হয়েছে বলে মনে হয় না। দুই পাশের দুই একতলা বাড়ীতে হিন্দু কলেজ ও স্কুল (অর্থাৎ সিনিয়র ও জুনিয়র ডিপার্টমেণ্ট), মধ্যে সংস্কৃত কলেজ। কত গৃহবিপ্লবেরই না সৃষ্টি করেছে বাংলাদেশে এই দুটি একতলা গৃহ! বাংলার বুদ্ধিবিপ্লব, যুক্তি-বিপ্লব, আদর্শবিপ্লব, সবই গোলদীঘির এই বিদ্যালয়ের গৃহে নিঃশব্দে ঘটে গেছে। গোলদীঘির বাইরে, বাংলার সমাজে, তার সশব্দ প্রতিধ্বনি ও প্রতিক্রিয়া হয়েছে।

বার্ন কোম্পানীর আর্কিটেক্ট বা ইঞ্জিনিয়াররা কলেজগৃহের পরিকল্পনা করেছিলেন যখন, তখন ইতিহাসের ধারার সঙ্গে তার সামঞ্জস্য রক্ষা করার কথা নিশ্চয় তাঁরা ভাবেননি। সরকারী শিক্ষাবিদরাও তখন অত কথা চিন্তা করেননি। হিন্দু কলেজ ও সংস্কৃত কলেজ নিয়ে পরবর্তীকালে যাঁরা অনেক কথা লিখেছেন ও বলেছেন, তাঁরাও কেউ আজ পর্যন্ত গৃহবিন্যাসের এই গভীর তাৎপর্যের কথা ভেবে দেখেননি। অথচ গোলদীঘির এই বিদ্যালয়গৃহের কেবল পরিকল্পনার কথা ভাবলে অবাক হয়ে যেতে হয়। মনে হয়, বাস্তব-রাজ্যের নয়, ভাবরাজ্যের কোন আর্কিটেক্ট যেন কলেজগৃহটির পরিকল্পনা করেছিলেন।

দুই পাশে দুই বাহু বিস্তার করে রয়েছে হিন্দু কলেজের সিনিয়র ও জুনিয়র বিভাগ, মধ্যে সংস্কৃত কলেজের বিপুল দেহ। যা-কিছু নতুন, তাকে সাদর অভিনন্দন জানাচ্ছে দুই পাশের দুই বিস্তৃত বাহু, মধ্যে অচল স্তম্ভের উপর স্থির হয়ে রয়েছে দেহটি, পুরাতন ঐতিহ্যের প্রতীক। নতুন ও পুরাতনের আদর্শ-সংঘাতের এক ঐতিহাসিক স্থাপত্যরূপ। সমন্বয়ের তাগিদেই যেন দেহটি দূরে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়নি। প্রাচ্য ও প্রতীচ্য, নতুন ও পুরাতনের মিলনের জন্যই যেন বিদ্যালয়গৃহের এই রূপ কল্পনা করা হয়েছিল মনে হয়। দু'দিকের দুই একতলা গৃহে 'নূতনে'র টানাটানিতে মধ্যের 'পুরাতনে'র পরিবর্তন হচ্ছিল। সে তার সংস্কার, অকারণ মোহ ও যুক্তিহীন বিশ্বাস ত্যাগ করছিল ধীরে ধীরে। আবার মধ্যের 'পুরাতন', তার শ্রেষ্ঠ উত্তরাধিকার নিয়ে, দু'দিকের 'নূতনে'র বাঁধভাঙা উচ্ছ্বাস ও আবেগ কতকটা যেন সংযত করারও চেষ্টা করছিল। 'নূতনে'র আঘাতে 'পুরাতনে'র আত্মপ্রসারের পথ পরিষ্কার হচ্ছিল যেমন, তেমনি পুরাতনের টানে 'নূতন' শিক্ষা করছিল আত্মসংযম।

গোলদীঘির কলেজগৃহ এই আদর্শের ঘাতপ্রতিঘাতের ইটপাথরের প্রতি-মূর্তি। আর তার শ্রেষ্ঠ মানবিক প্রতিমূর্তি হলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

দু'দিকের নূতন ও মধ্যের পুরাতনের যা-কিছু উদার ও মহান, তারই মিলনমিশ্রণে বিদ্যাসাগর-চরিত্রের সৃষ্টি।

যিনি দু'দিকের সমস্ত দোষ বর্জন করে এবং সমস্ত গুণ আত্মসাৎ করে, মাঝখানে বনস্পতির মতন মাথা তুলে দাঁড়াবেন, দু'দিকের মধ্যের গৃহই তাঁর শিক্ষাশিবির হওয়া প্রয়োজন ছিল। ঈশ্বরচন্দ্রের জীবনে সেই শিক্ষার শিবির হল গোলদীঘির সংস্কৃত কলেজ। নির্জন শিক্ষানিকেতন নয়। পণ্ডিত-মশায়ের টোল নয়। গুরুগৃহের মতন জীবনের কোলাহল থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। সংস্কৃত কলেজ। কলকাতার বক্ষস্থলে, গোলদীঘিতে। দু'পাশে তার হিন্দু কলেজের দুই প্রসারিত গৃহ এবং সেখানে কেবল বিক্ষুব্ধ তরঙ্গের গর্জন।

বড়বাজার থেকে পটলডাঙ্গা, দয়েহাটা থেকে গোলদীঘি। গ্রাম্য বালকের পক্ষে এতটা পথ একা যাতায়াত করা সম্ভব নয়। পথ নিরাপদও নয়।

'ট্র্যাফিক' বলতে এখন যা বোঝায়, কলকাতার পথে তখন তা ছিল না বটে, কিন্তু গরুর গাড়ীর গ্রাম্য পথের মতন একেবারে নির্বিঘ্নও ছিল না। শহরের নতুন ধনিক ও নব্যবাবুদের নানারকমের ঘোড়ার গাড়ী ও পাল্কি ছিল। সাহেবদের তো ছিলই। অনেকে ঘোড়ার পিঠে চড়ে শহরের পথে খোসমেজাজে টহলও দিতেন। কলকাতার রাস্তায় তখন প্রায়ই ঘোড়া ক্ষেপে যেত। সহিসের চাবুকেই হোক, বা পাল্কি-বেহারাদের পথ চলার গান শুনেই হোক, গাড়ীর ঘোড়া যখন ক্ষেপত, তখন চারিদিকে ধুলো উড়িয়ে, দিকবিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে, পথের উপর দিয়ে ছুটতে থাকত। 'সাহেবের ঘোড়া ক্ষেপেছে', 'বাবুদের ঘোড়া ছুটেছে' বলে কলকাতার পথের লোকজন সেই ক্ষিপ্ত ঘোড়ার পিছনে পিছনে ছুটত। তাতে ক্ষিপ্ত ঘোড়া আরও উন্মত্ত হয়ে উঠত। তখন ট্র্যাফিক পুলিশ ছিল না, থাকলেও পাগলা ঘোড়া তার নিষেধের ইঙ্গিত মানত না। গাড়ীর যাত্রীরা পথের পাশে খানাডোবার মধ্যে ছিটকে পড়ত। সবচেয়ে বিপন্ন হত পাল্কি-বেহারারা ও অসহায় পথিকরা। আত্মরক্ষা করার তাদের কোন উপায় থাকত না। ঘোড়ার পদাঘাতে পাল্কি ভাঙত, যাত্রীরা আহত হত, পথিকও মারা যেত অনেক। সেকালের সংবাদপত্রে এরকম অনেক দুর্ঘটনার সংবাদ প্রকাশিত হত। 'গাড়ী চাপায় মৃত্যু', 'গাড়ী চাপায় আঘাতী', 'অশ্ব পদাঘাতে আঘাতী' ইত্যাদি শিরোনামে সংবাদ ছাপা হত। সুতরাং কলকাতার পথের বিপদ ও উপদ্রব তখনও কম ছিল না।

ন'বছরের বালকের পক্ষে এতটা পথ একা হেঁটে যাওয়া নিরাপদ ছিল না। ঠাকুরদাস রোজ সকালে ন'টার মধ্যে ঈশ্বরকে খাইয়ে নিয়ে, সঙ্গে করে কলেজে পৌঁছে দিয়ে আসতেন। একেবারে গোলদীঘি পর্যন্ত গিয়ে, কলেজে ঢুকে ব্যাকরণের তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্রদের ঘরে ছেলেকে বসিয়ে দিয়ে, গঙ্গাধর তর্কবাগীশ মহাশয়ের সঙ্গে একবার দেখা করে, বড়বাজারের বাসায় ফিরে আসতেন। বাসায় ফিরে আহারাদি শেষ করে, মল্লিকদের দোকানে কাজে বেরুতেন। সারাদিন দোকানের কাজকর্ম করে, বিকেলে চারটার সময় একবার কাজের ফাঁকে আবার গোলদীঘিতে আসতেন। কলেজের ছুটি হত তখন। ছুটির পর ঈশ্বরকে সঙ্গে করে তিনি দয়েহাটার বাসায় ফিরে যেতেন। তার

পর আবার তাঁকে কাজে বেরুতে হত। দোকানের কাজ, নির্দিষ্ট কাজের সময় বলে কিছু ছিল না।

যে সময়টুকু ঈশ্বরচন্দ্র কলেজে থাকতেন, প্রথম-প্রথম তাঁর খুব অসুবিধা হত নিশ্চয়। এ তো আর গুরুমহাশয় কালীকান্তের পাঠশালা নয়? বীরসিংহ গ্রামও নয়। মধুসূদন বাচস্পতি তাঁকে দেখাশুনা করতেন। কলকাতা শহর, তার উপর গোলদীঘির সংস্কৃত কলেজ। পরিচিত মুখ কোথাও নেই, পরিবেশও পরিচিত নয়। সংলগ্ন হিন্দু কলেজের ছাত্রদের মধ্যে ধনীর সন্তানদের সংখ্যা বেশি। সংস্কৃত কলেজে কেবল ব্রাহ্মণ ও বৈদ্য-সন্তানদের পড়বার অধিকার ছিল তখন এবং তাদের মধ্যে ধনীর সংখ্যা অল্প। হিন্দু কলেজে জাতিগত অধিকার ছিল না। ধনীর দুলালরা বিচিত্র সাজপোশাক করে, কেউ পাল্কিতে, কেউ ঘোড়ার গাড়ীতে চড়ে কলেজে আসতেন।

সমাজের এ-চিত্র ঈশ্বরচন্দ্র গ্রামে দেখেননি। গুরুমশায়ের পাঠশালার পরিবেশে সমাজের এই ভাঙনের ছবি ফুটে ওঠেনি। গোলদীঘির সংস্কৃত কলেজের সীমানার মধ্যে, তৃতীয় শ্রেণীর ব্যাকরণের ছাত্র ঈশ্বরচন্দ্রের চোখের সামনে, নবযুগের বাংলার সমাজের বৈপ্লবিক পরিবর্তনের প্রথম ছবি ফুটে উঠল। তিনি দেখলেন, সংস্কৃত কলেজে শিক্ষার অধিকার কেবল ব্রাহ্মণ ও বৈদ্য জাতির মধ্যে সীমাবদ্ধ। অন্য জাতির সংস্কৃত শিক্ষার অধিকার নেই। শিক্ষার সঙ্গে কুলগত মর্যাদার সম্পর্ক এবং শিক্ষা তাই বিশেষ জাতির কুক্ষিগত। তার পাশে, এই সনাতন সংস্কার ধূলিসাৎ করে হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সামাজিক মর্যাদার নতুন মানদণ্ড তৈরি হচ্ছে সেখানে। সে-মানদণ্ড বংশগত নয়, ধনগত। বিদ্যার ও বিত্তের নতুন মানদণ্ড। জাতিভেদে শিক্ষার ভেদাভেদ নেই সেখানে। ব্রাহ্মণ বৈদ্য কায়স্থ বণিক, সকল জাতির সন্তানেরা সেখানে শিক্ষা পাচ্ছেন। শিক্ষার সুযোগ পেলে অব্রাহ্মণরাও যে প্রতিভাবান বলে সমাজে স্বীকৃতি পেতে পারেন, হিন্দু কলেজের ছাত্ররা তার ঐতিহাসিক প্রমাণ। বিত্ত ও বিদ্যা মিলিয়ে, তাঁদের নিয়ে সমাজে নতুন প্রতিপত্তিশালী মধ্যশ্রেণীর বিকাশ হচ্ছে। তার নতুন জীবনীশক্তির প্রাচুর্য কর্মক্ষেত্রে প্রকট হয়ে উঠছে। কুলকৌলীন্যের প্রভাব ম্লান হয়ে যাচ্ছে।

এ দৃশ্য ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যালয়ের পরিবেশে, চোখের সামনে স্পষ্টই রোজ

দেখতে লাগলেন। সমাজবিজ্ঞানের বই পড়ে তাঁকে শিখতে হল না। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য তাঁকে দূরেও যেতে হল না, দীর্ঘকাল প্রতীক্ষাও করতে হল না। সংস্কৃত কলেজ ও হিন্দু কলেজের একই উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে তিনি নবযুগের ইতিহাসের এই যুগান্তকারী সামাজিক ভাঙাগড়া দেখতে লাগলেন।

নতুন যুগের সামাজিক পরিবর্তনের কোন বৈশিষ্ট্য যদি তাঁর মনে ছাত্রজীবনে প্রভাব বিস্তার করে থাকে, তাহলে মানবিক অধিকারের এই বৈশিষ্ট্যই সর্বপ্রধান। সংস্কৃত কলেজের পাঠগৃহে ব্রাহ্মণ-বৈদ্যের জাতিগত বিদ্যাচর্চার অধিকারে তাঁর মন সাড়া দিত না। মানবচিত্তের এই সঙ্কীর্ণতার কোন যুক্তি, কোন অর্থ তিনি খুঁজে পেতেন না। পণ্ডিতমশায়দের প্রশ্ন করতেও সাহস হত না। বেশ কল্পনা করা যায়, তিনি কলেজের গৃহের সামনে দাঁড়িয়ে, পাশের হিন্দু কলেজের ব্রাহ্মণ বৈদ্য কায়স্থ বণিক, সকল জাতির সন্তানদের, নবযুগের বিদ্যাতীর্থে অবাধ মেলামেশা দেখতেন। দেখতে দেখতে অনেক কথাই হয়ত তাঁর মনে হত। শিক্ষার অধিকারে জাতিভেদ থাকবে কেন? সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ মানবিক অধিকারকে কেন বিশেষ জাতির বংশগত অধিকারে পরিণত করা হবে? সংস্কৃত কলেজের ছাত্র হিন্দু কলেজের এই উদার আদর্শকে মনে মনে শ্রদ্ধা জানাতেন। দুই বিদ্যালয়ের এই আদর্শের ব্যবধান তিনি তীব্রভাবে অনুভব করতেন।

ব্যাকরণশ্রেণীর ছাত্র ঈশ্বরচন্দ্র পরে যখন সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ হন, তখন এই বংশগত শিক্ষার সঙ্কীর্ণ অধিকার থেকে তিনি ব্রাহ্মণ বৈদ্যদের বঞ্চিত করেন। প্রথমে কায়স্থদের তিনি শিক্ষার অধিকার দেন এবং পরে অন্যান্য জাতির ছেলেদেরও সংস্কৃত কলেজে পড়বার অবাধ অনুমতি দেন। তখন ব্রাহ্মণ-বৈদ্য সমাজের অনেকে, ব্রাহ্মণ অধ্যক্ষের এই হিন্দু-কলেজীয় পাশ্চাত্ত্য মনোভাবে খুশি হননি।

সংস্কৃত কলেজ ঈশ্বরচন্দ্রের ছাত্রজীবনে আদর্শ বিদ্যালয়ের কাজ করেছিল। কেবল বিদ্যার সাগর নয়, শ্রেষ্ঠ মানুষ হবার সুযোগ পেয়েছিলেন তিনি সংস্কৃত কলেজের পরিবেশে। হিন্দু কলেজের পাশে দাঁড়িয়ে তিনি তার উদারতাটুকু গ্রহণ করে, উচ্ছৃঙ্খলতাটুকু বর্জন করতে পেরেছিলেন। নতুন ও পুরাতন

আদর্শের দুই বিদ্যালয়ের সীমানার মধ্যে দ্বাদশ বছর এরকম শিক্ষার সুযোগ না পেলে, ঈশ্বরচন্দ্রের চরিত্রের পরিপূর্ণ বিকাশ হত কি না সন্দেহ!

পিতার সঙ্গে প্রায় ছ'মাস বড়বাজার থেকে গোলদীঘি যাতায়াত করার পর ঈশ্বরচন্দ্র পথঘাট ও পরিপার্শ্বের সঙ্গে পরিচিত হলেন। তার পর একলাই তিনি কলেজে যাতায়াত করতেন। পথঘাটের চেহারা তখন এরকম ছিল না। প্রশস্ত হ্যারিসন রোড তখনও কলেজ স্কয়ারের সঙ্গে বড়বাজারের যোগাযোগ স্থাপন করেনি। রাজপথের দু'পাশে বিস্তৃত ফুটপাথও তখন ছিল না। অনেক অলিগলির ভিতর দিয়ে, এঁকেবেঁকে গোলদীঘির দিকে আসতে হত। ঈশ্বরচন্দ্র দয়েহাটা থেকে বেরিয়ে একাই হেঁটে আসতেন। দেখতে তিনি বাঁটুল ছিলেন। আলালের ঘরের দুলালের মতন লাবণ্যোজ্জ্বল হৃষ্টপুষ্ট চেহারাও তাঁর ছিল না। ছোট্ট একটি ছেলে, ছাতি মাথায় দিয়ে হন্ হন্ করে হেঁটে যেত, পুঁথি পাত্‌তাড়ি বগলে করে। পথের ধারের দোকানদার ও লোকজনদের লক্ষ্য করবার মতন কিছু ছিল না, তাঁর চেহারায় বা পথচলায়। কেবল দূর থেকে মনে হত যেন একটি খোলা ছাতি গোলদীঘির দিকে গড়িয়ে যাচ্ছে। ছোট্ট দেহটিকে দেখা যেত না ছাতির আড়ালে।

ক্ষুদ্র অপরিপুষ্ট দেহের উপর ছিল প্রকাণ্ড একটি বড় মাথা। ক্ষীণ দেহের তুলনায় অনেক বড় বলে একটু বেমানান দেখাত। দুষ্টু বালকেরা, বিদ্যালয়ের ছাত্র ও সহপাঠীরা বিদ্রূপ করে বলত 'যশুরে কই'। বিদ্রূপটিকে বিকৃত করে কেউ কেউ তাঁকে ডাকত 'কশুরে জৈ' বলে। বিদ্রূপ বা অশোভন তামাসা সহ্য করার মতন ধৈর্য ঈশ্বরচন্দ্রের ছিল না। বাল্যকালে তো ছিলই না, পরিণত বয়সে যথেষ্ট হাস্যকৌতুকপ্রিয় হয়েও, কোনদিন তিনি কোন অশোভন ব্যবহার বরদাস্ত করতে পারেননি। সামান্য একটু বেয়াড়া কথাবার্তা শুনলেই তাঁর ধৈর্যচ্যুতি ঘটত, এবং অশোভন ব্যবহারের রূঢ় উত্তর দিতে তিনি একটুও দ্বিধাবোধ করতেন না।

ছেলেবেলা থেকেই তিনি সামান্য একটু তোত্‌লা ছিলেন। স্বাভাবিক কথাবার্তার সময় বিশেষ নজর না করলে তা বোঝা যেত না। কিন্তু আবেগ

ও উত্তেজনার বশে যখনই কথা বলতেন, তখনই তাঁর তোত্‌লামি প্রকাশ পেত বেশি। ছেলেদের অশোভন রসিকতায় তিনি ক্ষুব্ধ ও উত্তেজিত হতেন। উত্তেজনার বশে প্রতিবাদ করে যা বলতেন, তার অধিকাংশই বোঝা যেত না। ছেলেরা তার জন্য বোধ হয় আরও উত্ত্যক্ত করত।

অশিষ্ট বালকেরা জানত না, যে-মাথাটি নিয়ে তাদের এত কৌতূহল ও ঠাট্টা-তামাসা, সে-মাথা সাধারণ মাথা নয়। অপ্রয়োজনে ঈশ্বরচন্দ্রের মাথাটি বড় হয়ে গড়ে ওঠেনি। কেবল নিজের বা দু'চারজনের চিন্তা-ভাবনার জন্য হলে হয়ত সাধারণ একটি ছোট মাথাতেই কাজ হত। কিন্তু যাঁকে সমগ্র দেশ ও দেশবাসীর জন্য চিন্তা করতে হবে, তাঁর মাথা দেহের তুলনায় একটু বড় না হলে চলবে কেন?

বালকেরা এত কথা জানত না। বালসুলভ বিদ্রূপ করতে তাই তারা কুণ্ঠিত হত না। কলেজে যাতায়াতের পথে, কলেজের মধ্যেও তাঁকে মাথার জন্য অনেক কথা শুনতে হত। ন'বছরের বালক ঈশ্বরচন্দ্র ঠিক বুঝতে পারতেন না, তাঁর মাথা নিয়ে অন্যদের এত মাথাব্যথা কেন?

তখন বুঝতে পারেননি। জীবনের অপরাহ্ণকালে, অনেক ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করে, অনেক বেদনা সহ্য করে, হয়ত তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, এ-সমাজের এই-ই নিয়ম!

সেকালের সব পিতার মতন ঠাকুরদাসও কড়া শাসন করতেন পুত্রকে। লেখা-পড়ার ব্যাপারে এতটুকু অবহেলা বা ঔদাসীন্য তিনি সহ্য করতেন না। পঞ্চাশ বছর আগেও কোন পিতা করতেন কি না সন্দেহ! ঈশ্বরের অবশ্য লেখাপড়ায় কোনদিনই অবহেলা প্রকাশ পায়নি। তা সত্ত্বেও, সতর্ক প্রহরীর মতন ঠাকুরদাস তাঁর পুত্রের উপর দৃষ্টি রাখতেন। কি পড়ছে, কি শিখছে ক্লাসে, প্রতিদিন তার খোঁজ করতেন। সাধারণত তাঁর বাইরের সব কাজকর্ম শেষ করে বাসায় ফিরতে রাত্রি একপ্রহর হয়ে যেত। বাসায় ফিরে তিনি স্বহস্তে পাক করে নিজে খেতেন, ও পুত্রকে খাওয়াতেন। সুতরাং রাত্রি একপ্রহরের আগে ঈশ্বরের চোখের পাতা বুজবার কোন উপায়ই ছিল না। প্রদীপ জেলে নির্জন ঘরে তিনি ব্যাকরণ পড়তেন।

বড়বাজারের ব্যবসায়ী ও ক্রেতাবিক্রেতাদের কোলাহল তার অনেক আগেই নিস্তব্ধ হয়ে যেত। দয়েহাটার গলিতে সকলেই প্রায় ঘুমিয়ে পড়ত তখন। জগদ্দুর্লভ সিংহের গৃহের নির্জন একটি কক্ষে, যোগাসনে বসে, তেলের প্রদীপের সামনে, ঈশ্বরচন্দ্র ব্যাকরণ মুখস্থ করতেন। ভাষার ভিত্তি ব্যাকরণ, বিশাল সংস্কৃত-সৌধের কঠোর বনিয়াদ। সাধারণ সহজ ব্যাকরণ নয়, 'মুগ্ধবোধ' ব্যাকরণ। নাম 'মুগ্ধবোধ', কিন্তু পড়ে কেউ মুগ্ধ তো হতই না, কারও বিশেষ কিছু বোধগম্যও হত না। কেবল অনর্গল, গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত মুখস্থ করতে হত। বোপদেবের এই সংস্কৃত অক্ষরে লেখা নীরেট ব্যাকরণ সামনে নিয়ে, ঈশ্বরচন্দ্রকে জেগে বসে থাকতে হত। পিতা ক্লান্ত হয়ে বাসায় ফিরবেন, তাঁর কাছে ব্যাকরণের পাঠ বুঝিয়ে দিতে হবে, রান্নাবান্না হবে, খাওয়া হবে, তারপর তিনি নিদ্রা যাবেন। তার আগে, যত রাতই হোক, কেবল ব্যাকরণ পড়া, আর দয়েহাটার নির্জন গলিতে পিতার পায়ের শব্দ শোনার জন্য উৎকর্ণ হয়ে থাকা। আর কোন কাজ নেই।

মল্লিকদের দোকানের বিল-কলেকশন্ ও হিসেবপত্তরের কাজ শেষ করে, ঠাকুরদাস বাসায় ফিরে, স্বপাকের ব্যবস্থা করতে করতে, পুত্রের মুখে ব্যাকরণের পাঠ শুনতেন। সংস্কৃত শিক্ষার তাঁর সুযোগ হয়নি। শিপ্-সরকারের কাছে তাড়াতাড়ি চলনসই ইংরেজী শিখেছিলেন চাকরীর আশায়। পুত্রের কল্যাণে তাঁর সংস্কৃত শিক্ষা আরম্ভ হল। ব্যাকরণের পাঠ শুনতে শুনতে তিনি বৈয়াকরণ না হলেও, ব্যাকরণে বেশ জ্ঞানলাভ করলেন। 'মুগ্ধবোধ' ব্যাকরণ বোধগম্য হত না বলে, প্রাণপণে মুখস্থ করার পরেও ছাত্রদের স্মৃতিশক্তির সাহায্যে তা দীর্ঘদিন ধারণ করে রাখা সম্ভব হত না। কয়েকদিন পরেই ঈশ্বরচন্দ্র প্রায়ই পুরাতন পাঠ ভুলে যেতেন। তার জন্য ঠাকুরদাস প্রহার করতেন এবং নিজের স্মৃতি থেকে পাঠগুলি তাঁকে বলে দিতেন। দোকানের হিসেবের চাপেও তিনি পুত্রের মুখে শোনা ব্যাকরণের নীরস পাঠ সরস কবিতার মতন মনে রাখতেন। বোঝা যায়, সুযোগ পেলে ঠাকুরদাসও একজন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত হতে পারতেন স্বচ্ছন্দে।

কোনদিন রাতে বাসায় ফিরে যদি তিনি দেখতেন যে মুগ্ধবোধের পুঁথি খোলা রয়েছে, সামনে প্রদীপ জ্বলছে এবং ঈশ্বরচন্দ্র ঘুমিয়ে পড়েছেন, তাহলে

আর রাগ সামলাতে পারতেন না। সারাদিনের খাটুনির পর, রাগের বশে, প্রচণ্ড প্রহার করতেন পুত্রকে। নির্জন রাতে দয়েহাটার প্রতিবেশীরা সন্ত্রস্ত হয়ে উঠতেন। জগদ্দুর্লভবাবুর স্ত্রী ও ভগিনী রাইমণি মধ্যে মধ্যে ঠাকুরদাসকে বলতে বাধ্য হতেন: 'ছোট ছেলেকে এরকম মারধোর করলে মরে যাবে যে! এরকম যদি করেন, তাহলে ওকে নিয়ে অন্য কোথাও না হয় চলে যান, চোখের সামনে এসব আমি দেখতে পারব না।'

ঠাকুরদাস লজ্জিত হয়ে, কিছুদিনের জন্য ক্রোধ সংবরণ করে চলতেন। কিন্তু কয়েকদিন মাত্র। মুগ্ধবোধের সঙ্গে প্রাণপণ লড়াই করে, ক্লান্ত সৈনিকের মতন ঈশ্বরচন্দ্র আবার হয়ত একদিন ঘুমিয়ে পড়তেন। জ্বলন্ত প্রদীপশিখার সামনে, প্রাণান্তকর মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের পাশে, ঘুমন্ত পুত্রকে দেখে, রাইমণির সব কথা ভুলে গিয়ে, ঠাকুরদাস তেলেবেগুনে জ্বলে উঠতেন এবং উত্তম-মধ্যম প্রহার করতেন।

মধ্যে মধ্যে প্রাণের দায়ে চোখে সরষের তেল দিয়ে, ঈশ্বরচন্দ্র চেষ্টা করতেন জেগে থাকতে। চোখ জ্বালা করত, ঝর-ঝর করে জল পড়ত চোখ দিয়ে। জলভরা চোখ মেলে তিনি মুগ্ধনেত্রে চেয়ে থাকতেন মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের দিকে।

পরে ঈশ্বরচন্দ্র যখন সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ হন তখন এই 'মুগ্ধবোধ' ব্যাকরণ পড়ান বন্ধ করে দেন। তার বদলে তিনি নিজে সহজবোধ্য ব্যাকরণ লেখেন, 'উপক্রমণিকা' ও 'ব্যাকরণ কৌমুদী'। ছাত্রজীবনে 'মুগ্ধবোধ' আয়ত্ত করার তিক্ত অভিজ্ঞতার কথা বোধ হয় তিনি কোনদিন ভুলতে পারেননি।

ব্যাকরণশ্রেণীতে ভর্তি হবার দেড় বছর পরে, ১৮৩০-৩১ সালের বার্ষিক পরীক্ষায়, ঈশ্বরচন্দ্র মাসিক পাঁচ টাকা করে বৃত্তি পান (১৮৩১ সালের মার্চ মাস থেকে)। কলকাতায় বাসাখরচ চালাবার জন্য কৃতী ছাত্রদের এই বৃত্তি দেওয়া হত। যারা বৃত্তি পেত, তাদের বলা হত 'পে-স্টুডেন্ট' (**Pay Student**), এবং যারা বৃত্তি পেত না, তাদের বলা হত 'আউট-স্টুডেন্ট' (**Out Student**)। ব্যাকরণের তৃতীয় শ্রেণীতে সাড়ে তিন বছর তিনি পড়েছিলেন।

সংস্কৃত কলেজ, ১৮৪৭
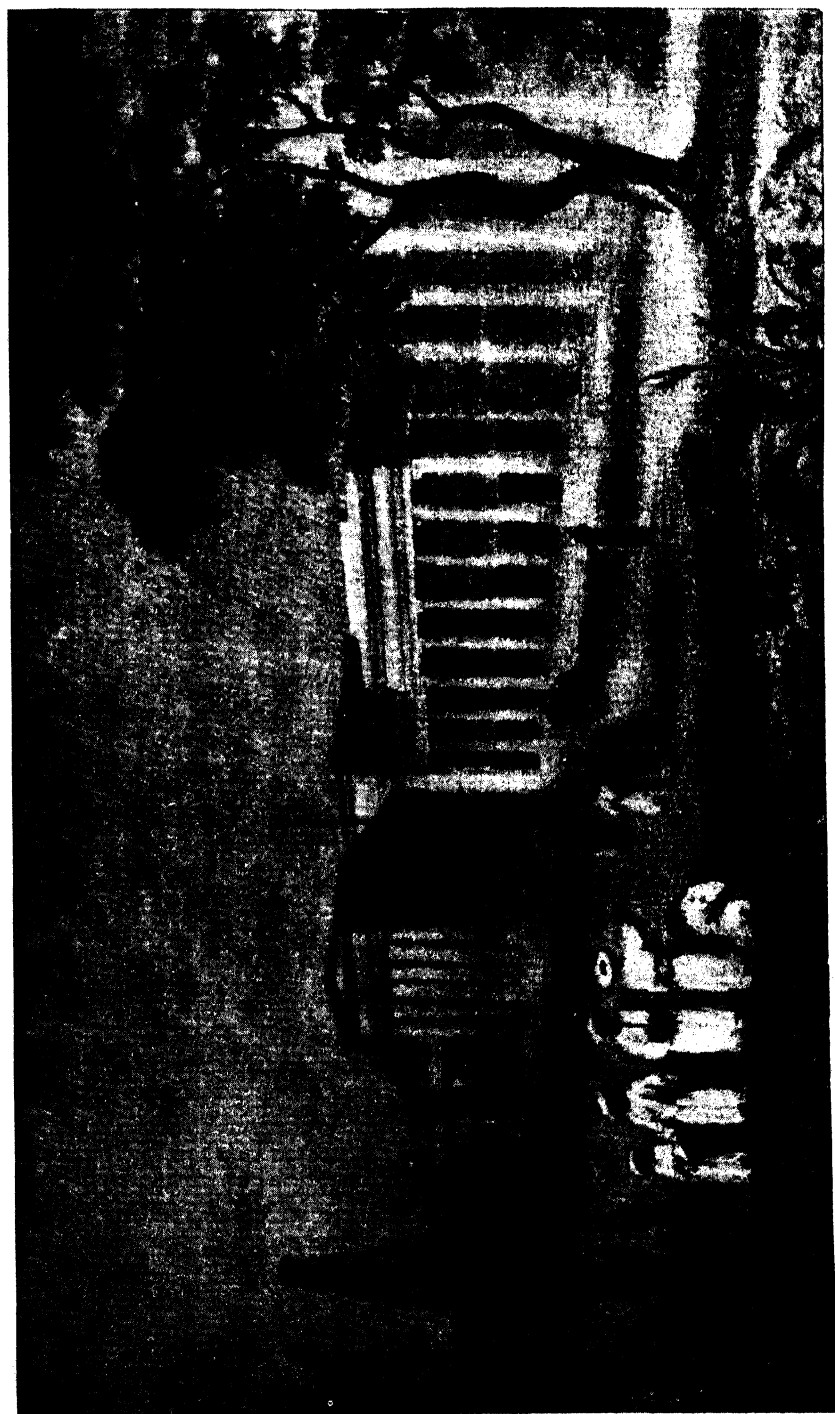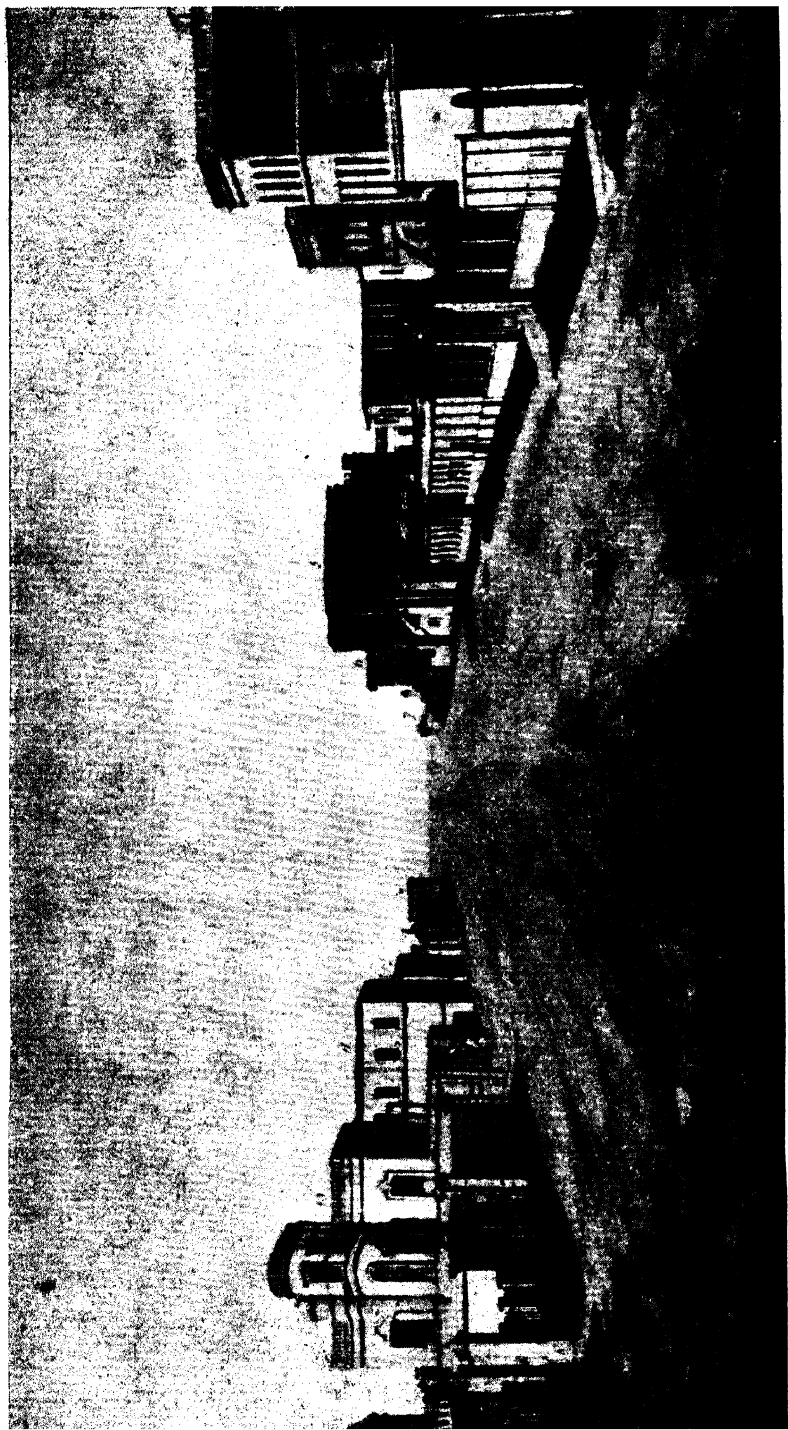
ওল্ড কোর্ট হাউস স্ট্রীট, ১৭৮৯ : ড্যানিয়েলের *Twelve Views of Calcutta* থেকে গৃহীত

'প্রথম তিন বৎসরে মুগ্ধবোধ পাঠ সমাপ্ত করিয়া, শেষ ছয় মাসে অমরকোষের মনুষ্যবর্গ ও ভট্টিকাব্যের পঞ্চম সর্গ পর্য্যন্ত পাঠ করিয়াছিলাম।'[৪]

তিন বছরই বার্ষিক পরীক্ষায় বিশেষ স্থান অধিকার করে তিনবার তিনি পারিতোষিক পেয়েছিলেন। ১৮৩০-৩১ সালের বার্ষিক পরীক্ষায় 'আউট-স্টুডেণ্ট'-রূপে একখানি ব্যাকরণ ও নগদ আটটি টাকা পান। ১৮৩১-৩২ সালের বার্ষিক পরীক্ষায় পান অমরকোষ, উত্তররামচরিত ও মুদ্রারাক্ষস। ১৮৩২-৩৩ সালে 'পে-স্টুডেণ্ট'-রূপে নগদ দু' টাকা পান।[৫] মধ্যে একবছর ভাল পারিতোষিক পাননি বলে তিনি মনে মনে খুবই ক্ষুণ্ন হন। ঠিক করেন যে সংস্কৃত কলেজে আর তিনি পড়বেন না। দেশে ফিরে যাবেন এবং সেখানে বিশ্বনাথ সার্বভৌম পিসামশায়ের টোলে পড়াশুনা করবেন।

মনে-মনে কিছু ঠিক করে ফেললে তাঁকে টলানো মুশ্‌কিল হত। সিদ্ধান্তের ব্যাপারে চিরজীবনই তিনি অটল ছিলেন। বাল্যকালে তার সঙ্গে ছিল রাগ ও গোঁয়াতুর্মি। আরও একটি তাঁর প্রধান চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ছেলেবেলা থেকেই পূর্ণমাত্রায় ফুটে উঠেছিল। কারও কাছে কোন ব্যাপারে তিনি পরাজয় স্বীকার করতে পারতেন না। বেদনায় ও গ্লানিতে তিনি অভিভূত হয়ে পড়তেন এবং তার মানসিক প্রতিক্রিয়া দ্রুত তাঁর নতুন সিদ্ধান্তের মধ্যে প্রকাশ পেত। জীবনের কর্মক্ষেত্রে কোনদিনই তিনি পরাজয় স্বীকার করেননি এবং জোড়াতালি-দেওয়া আপস-রফার নির্ঝঞ্ঝাট পথ বেছে নেননি। যা ভেবেছেন তা করেছেন এবং যা করেছেন তা শেষ পর্যন্ত করেছেন। স্টীম-রোলারের মতন পথের সব বাধা ঠেলে এগিয়ে গেছেন। মণ্ডূকদের গ্যাঙোর-গ্যাঙ কলরবে অথবা স্বশ্রেণী মধ্যবিত্তের হিংসা-নিন্দার গুঞ্জনে কর্ণপাত করেননি।

জয়-পরাজয়ের সমস্যা নিয়ে, পিতা ঠাকুরদাসের সঙ্গেও সামান্য খুঁটিনাটি ব্যাপারে তাঁর সংঘাত হত। এমনিতে ঠাকুরদাস পুত্রের একগুঁয়েমি সম্বন্ধে খুবই সচেতন ছিলেন, এবং 'ঘাড়কেঁদো' বলে ডাকতেন। যা তাঁকে করতে বলা হত, ঠিক তার উল্টোটি তিনি করতেন। কলেজে যাবার সময় হলে, টাঁকশালের ঘাটে, ঠাকুরদাস তাঁকে গঙ্গাস্নান করাতে নিয়ে যেতেন। হঠাৎ যদি তিনি আগে বলে ফেলতেন, ডুব দিয়ে স্নান করো, তাহলে সেদিন স্নান করানো কঠিন হয়ে উঠত। ঘাটের সিঁড়ির উপর ঘাড় বেঁকিয়ে ঈশ্বরচন্দ্র

দাঁড়িয়ে থাকতেন এবং রাগে তোত্‌লার মতন কথা বলতেন। কার সাধ্য তাঁকে স্নান করায় সেদিন। ঠাকুরদাস চড়চাপড় দিতে কার্পণ্য করতেন না। তাতে যে সব সময় সমস্যার সমাধান হত, তাও নয়। ঘাটের স্নানার্থীরা অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখতেন, বাঁটুল বালকের ভয়ঙ্কর জিদ।

ঠাকুরদাস বলতেন, আজ ফর্সা কাপড় পরে কলেজে যাও। ঈশ্বরচন্দ্র বলতেন, যাব না, ময়লা কাপড় পরে যাব।

বিস্ময়কর 'problem' এই বালক!

বিস্ময় হলেও, দুর্বোধ্য রহস্য নয়। কেবল অন্য ধাতু দিয়ে গড়া।

বালকের সমস্যাও খুব সহজ। সমস্যা হল, কারও হুকুম মানব না। নিজের বুদ্ধি ও বিবেচনায় যা ভাল মনে হবে তাই করব, যা অন্যায় মনে হবে, তা করব না। 'স্নান করো' বলাও তো হুকুম করা। কেউ না বললেও, নিজের ইচ্ছায় ও বিবেচনায় তো স্নান করা যায়। তাহলে কেন বলবেন বাবা? আমার নিজের বুদ্ধির উপর তাঁর বিশ্বাস নেই। মানব না হুকুম। এই তাঁর যুক্তি। অন্ধ একগুঁয়ে ও জেদী যারা, তাদেরও একটা যুক্তি থাকে। হুকুমের দাস হব না, কারও কাছে না, এই তাদের যুক্তি।

স্বাতন্ত্র্যবোধ ও মর্যাদাবোধের তারটি জন্ম থেকেই যাঁদের খুব উচ্চগ্রামে বাঁধা থাকে, সামান্য একটু টোকা দিলেই তাতে ঝঙ্কার ওঠে। সে-তার যাদের মরচে ধরে শিথিল হয়ে যায়, তারা এই ঝঙ্কারের মর্ম বোঝে না, বোঝার শক্তিও নেই। চল্‌তি ভাষায় তারা বলে 'একগুঁয়ে', সাধুভাষায় 'অভিমানী'।

অসাড় অচৈতন্য সমাজের কুণ্ডলিনী ধরে নাড়া দেবার জন্য এরকম একগুঁয়ে বালকের প্রয়োজন ছিল তখন। যুগের প্রয়োজনে তাই বোধ হয় ঈশ্বরচন্দ্র একগুঁয়ে হয়ে জন্মেছিলেন।

সংস্কৃত কলেজ ছাড়ার সঙ্কল্প অবশ্য তাঁকে ত্যাগ করতে হল শেষ পর্যন্ত। ব্যাকরণশ্রেণীর শিক্ষক গঙ্গাধর তর্কবাগীশ মহাশয় নিজে এবং মধুসূদন বাচস্পতি তাঁকে সান্ত্বনা ও উৎসাহ দিলেন। একবছর ভাল পারিতোষিক পাননি বলে, পরীক্ষায় অন্য বালকের কাছে পরাজয় হয়েছে বলে এত বিচলিত হবার কিছু নেই।

বিচলিত তিনি হলেন না। হবার কথাও নয়। জিদ্‌ ও গোঁ বাড়বার কথা। তাই বাড়ল। মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের তরঙ্গসঙ্কুল অকূল সমুদ্রে দ্বীপের সন্ধানে বালক ঈশ্বরচন্দ্র পাড়ি দিলেন। পিতাকে বললেন, 'রাত দশটায় খেয়ে দেয়ে আমি ঘুমিয়ে পড়ব। আপনি বারোটায় আমাকে ঘুম থেকে ডেকে দেবেন, আমি পড়ব।' তাই করতেন ঠাকুরদাস। আহারের পর দু'ঘণ্টা তিনি জেগে বসে থাকতেন, ঈশ্বরচন্দ্র ঘুমুতেন। গির্জার ঘড়িতে ঢং ঢং করে সশব্দে যখন বারোটা বাজত, তখন তিনি পুত্রকে ডেকে দিয়ে নিজে ঘুমুতেন।

দ্বিপ্রহর রাত থেকে, বড়বাজারের দয়েহাটার ঘুমন্ত পল্লীতে, একা-একা জেগে বসে, বালক ঈশ্বরচন্দ্র মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের সূত্র মুখস্থ করতেন। রাত জেগে পড়ার জন্য মধ্যে মধ্যে কঠিন পীড়ায় তাঁকে ভুগতে হত। তাতেও তাঁর উৎসাহ দমেনি।

শেষরাতে মধ্যে মধ্যে মুগ্ধবোধের সূত্রের আবৃত্তির শব্দে, ঠাকুরদাসের ঘুম ভেঙ্গে যেত। উঠে বসে তিনি ছেলেকে কবিতা শেখাতেন। আধুনিক কবিতা নয়, সংস্কৃত উদ্ভট-কবিতা। পণ্ডিতবংশের সন্তান তিনি, সংস্কৃত-শিক্ষার সুযোগ না পেলেও, দু'চার-শ উদ্ভটশ্লোক জানতেন। সেই সব উদ্ভটশ্লোক শেখাতেন ছেলেকে।

ঈশ্বরের উদ্ভটশ্লোক আবৃত্তিতে রাত ভোর হত বড়বাজারে।

৯ গুরু-শিষ্য সংবাদ

বড়বাজারে বসে মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ আয়ত্ত করা হিমালয়শৃঙ্গ লঙ্ঘন করার মতন দুরূহ ব্যাপার। যাঁকে করতে হয়েছে তিনিই একমাত্র তা বুঝতে পেরেছিলেন। তবু গুরুগৃহে প্রাচীন ভারতের বিদ্যার্থীদের যে-ভাবে কষ্ট করে বিদ্যাশিক্ষা করতে হত, এ কষ্ট তার তুলনায় কিছু নয়। সমিধ কুশ কাষ্ঠ আহরণ করা, গুরু গুরুপত্নী ও গুরুকন্যার আদেশ পালন করা, কৃষিকর্ম ও গোপালন করা, এই ছিল গুরুগৃহে বিদ্যার্থীর নিত্যকর্ম। শিষ্যের কর্তব্যপালনে ও সেবাযত্নে সন্তুষ্ট হয়ে গুরু যখন বর দিতেন, তখন বিদ্যালাভ হত। গুরুগৃহের যুগে যা হত, গোলদীঘির যুগে তা হত না।

আচার্য ধৌম্য একবার তাঁর শিষ্য আরুণিকে ক্ষেতের আল বাঁধবার জন্য পাঠালেন। আরুণি যখন কোন উপায়েই আল বাঁধতে পারলেন না, তখন নিজেই আলের মধ্যে শুয়ে পড়ে জলরোধ করলেন। দিনান্তে আরুণি ফিরে এলেন না দেখে গুরু অন্যান্য শিষ্যসহ ক্ষেতে উপস্থিত হয়ে ডাকতে লাগলেন। আরুণি ভূমিশয্যা ছেড়ে উঠে এসে, গুরুপদে প্রণাম করে, সব বৃত্তান্ত নিবেদন করলেন। আচার্য খুশি হয়ে আশীর্বাদ করলেন—'তোমার অসাধারণ গুরু-ভক্তিতে খুশি হয়েছি। সমস্ত বেদ ও ধর্মশাস্ত্র তোমার অধিগত হবে।'

উপমন্যু, উতঙ্ক, কচ, এমন কি দ্রোণাচার্য ও অর্জুনকে পর্যন্ত দীর্ঘকাল এই

নিদারুণ গুরুনিগ্রহ সহ্য করে বিদ্যাশিক্ষা করতে হয়েছে। গুরুকে সন্তুষ্ট করে বিদ্যালাভ করা যে যুগের রীতি ছিল, সে-যুগের শিষ্যদের এ রকম নিষ্ঠুর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া ছাড়া উপায় ছিল না। ঈশ্বরচন্দ্রের যুগে এ-রীতির পরিবর্তন হয়েছিল। গুরুসেবা আজও করতে হয় নানাভাবে এবং করলে যে পরীক্ষায় কোন ফল পাওয়া যায় না, তাও নয়। তবু দুই যুগের গুরুসেবা দু'রকমের।

গুরুভক্তি ও গুরুসেবা যুগে যুগে বদলায়। কারণ গুরু ও শিষ্য উভয়েরই পরিবর্তন হয়। গুরুগৃহের গুরুশিষ্য আর গোলদীঘির গুরুশিষ্যের মধ্যে ব্যবধান বিরাট। গুরুগৃহের আচার্য ধৌম্য বা দৈত্যগুরু শুক্রাচার্যের সঙ্গে গোলদীঘির সংস্কৃত বিদ্যালয়ের গঙ্গাধর তর্কবাগীশ, জয়গোপাল তর্কালঙ্কার, প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ প্রমুখ আচার্যদের তুলনা হয় না।

আরুণি ও উপমন্যুর মতন গুরুভক্তি প্রদর্শনের প্রয়োজন হয়নি ঈশ্বরচন্দ্রের। সে-রকম উৎকট গুরুভক্তি তাঁর ছিলও না। তবু ঈশ্বরচন্দ্রের জীবনে তাঁর শিক্ষাগুরুদের চরিত্রের প্রভাব অস্বীকার করা যায় না। বোধ হয় কারও জীবনেই তা যায় না। শিক্ষকরা ছাত্রদের কেবল বিদ্যাশিক্ষা দেন না, তাদের চরিত্রও গড়ে তোলেন! ঈশ্বরচন্দ্রের চরিত্রও তাঁর গুরুরা যে অনেকখানি গড়ে তুলেছিলেন, তাতে সন্দেহ নেই। সেই গুরুদের কথা না বললে তাই শিষ্যের কথাও বলা হয় না। শিষ্যকে বুঝতে হলে, গুরুকে জানা দরকার।

ব্যাকরণের তৃতীয় শ্রেণীর অধ্যাপক গঙ্গাধর তর্কবাগীশ কুমারহট্ট নিবাসী ছিলেন। কুমারহট্ট-হালিশহরে সেকালে বহু পণ্ডিতের বাস ছিল এবং স্থানীয় জমিদারদের পোষকতায় (সাবর্ণ-চৌধুরী, নদীয়া রাজবংশ প্রভৃতি) সেখানে একটি বিখ্যাত বিদ্যাসমাজও গড়ে উঠেছিল। কলকাতা শহরের চারিদিকে, পুবে পশ্চিমে, উত্তরে ও দক্ষিণে, এরকম আরও অনেক বিদ্যাসমাজের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। ভাগীরথীর পশ্চিম তীরবর্তী অঞ্চলে, বর্ধমানে হুগলিতে, পুবে নদীয়ায়, কুমারহট্ট-হালিশহরে, দক্ষিণে হরিনাভি-রাজপুর-চাংড়িপোতা-মজিলপুরে, যে সব বিদ্যাসমাজ গড়ে উঠেছিল, নতুন কলকাতা শহরের চাকুরীর

আকর্ষণে ক্রমে তার ভাঙন আরম্ভ হয়। এই সব অঞ্চলের বিখ্যাত পণ্ডিতদের মধ্যে অনেকে কলকাতায় এসে টোল-চতুষ্পাঠী স্থাপন করে জীবিকা অর্জনের চেষ্টা করেন। অনেকে নতুন বিদ্যালয়ে অধ্যাপনার কাজেও যোগ দেন। সংস্কৃত কলেজের অধিকাংশ পণ্ডিত এই সব অঞ্চল থেকে শহরে এসে অধ্যাপনার কাজে যোগদান করেছিলেন। গঙ্গাধর তর্কবাগীশ এসেছিলেন কুমারহট্ট-হালিশহর থেকে।

শহরে এসে তর্কবাগীশ মহাশয় কিছুদিন এম. এন্‌সলি ও অন্যান্য সিবিলিয়ান সাহেবদের পণ্ডিত ছিলেন। ১৮২৫ সালের নভেম্বর মাসে সংস্কৃত কলেজে মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের তৃতীয় শ্রেণীর প্রতিষ্ঠা হয় এবং গঙ্গাধর তর্কবাগীশ এই শ্রেণীর অধ্যাপক নিযুক্ত হন, মাসিক ৩০৲ বেতনে। তাঁর ছাত্রদের মধ্যে পরবর্তীকালে যাঁরা যশস্বী হন, তাঁদের মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মদনমোহন তর্কালঙ্কার, মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ প্রভৃতি অন্যতম। ব্যাকরণের তৃতীয় শ্রেণীতে ঈশ্বরচন্দ্রের সহপাঠী ছিলেন মদনমোহন ও মুক্তারাম।

সংস্কৃত কলেজে ঈশ্বরচন্দ্রের প্রথম গুরু হলেন গঙ্গাধর তর্কবাগীশ। অধ্যাপনায় তাঁর অসাধারণ নৈপুণ্য ছিল। মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের পাঠও ছাত্ররা তাঁর কাছে মন্ত্রমুগ্ধের মতন শুনত। ছাত্রদের গ্রহণক্ষমতার দিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখে তিনি শিক্ষা দিতেন। তার ফলে তাঁর শ্রেণীর ছাত্ররা যে-ভাবে শিক্ষা পেত, অন্যান্য দুই শ্রেণীর ছাত্ররা তা পেত না। আদর্শ শিক্ষক বলে তাঁর সুনাম ছিল খুব।

ব্যাকরণের তৃতীয় শ্রেণীতে ঈশ্বরচন্দ্র তিন বছর ছ'মাস পড়েছিলেন। প্রথম তিন বছরে মুগ্ধবোধ পাঠ সমাপ্ত করে, শেষ ছ'মাসে তিনি অমরকোষের মনুষ্যবর্গ ও ভট্টিকাব্যের পঞ্চম সর্গ পর্যন্ত পাঠ করেছিলেন। এই সময় তর্কবাগীশ মহাশয় দৈনন্দিন অধ্যাপনার কাজ শেষ করে, প্রত্যেকদিন ছাত্রদের দিয়ে এক-একটি উদ্ভটশ্লোক লিখিয়ে, তার ব্যাখ্যা করে দিতেন। সেই শ্লোকটি কণ্ঠস্থ করে ছাত্রদের তার পরদিন তাঁর সামনে আবৃত্তি ও ব্যাখ্যা করতে হত। যদি আবৃত্তি বা ব্যাখ্যায় কোন ভুল হত, তিনি আবার সেটি সংশোধন করে বুঝিয়ে দিতেন। এইভাবে ছ'মাস ধরে প্রতিদিন ছাত্ররা একটি করে উদ্ভটশ্লোক শিখেছিল। ঈশ্বরচন্দ্রও শিখেছিলেন।

উদ্ভটশ্লোক শিক্ষার দিকে ঈশ্বরচন্দ্রের বিশেষ আগ্রহ ছিল। সেইজন্য তর্কবাগীশ মহাশয়ের খুব প্রিয় ছাত্রও ছিলেন তিনি। ব্যাকরণশ্রেণী ছেড়ে সাহিত্যশ্রেণীতে প্রবেশ করার পরেও গঙ্গাধর তাঁর ছাত্রটিকে রেহাই দেননি। তিনি বলেছিলেন—'ঈশ্বর, তুমি প্রত্যহ না পার, মধ্যে মধ্যে আমার কাছে এসে উদ্ভটশ্লোক লিখে নিয়ে যাবে।' ঈশ্বরচন্দ্র তাই করতেন। সাহিত্যশ্রেণীতে পড়বার সময় তিনি তর্কবাগীশের কাছে মধ্যে মধ্যে উদ্ভটশ্লোক শিখতে যেতেন। এইভাবে প্রায় দুই শতাধিক শ্লোক তিনি সংগ্রহ করেছিলেন। ঠাকুরদাসও শেষরাতে উঠে প্রায় পুত্রকে উদ্ভটশ্লোক শিক্ষা দিতেন। উদ্ভটশ্লোক আবৃত্তি করতে করতে দয়েহাটায় রাত কাটত। পরে অন্যান্য ব্যক্তিদের কাছ থেকেও তিনি অনেক উদ্ভটশ্লোক শিখেছিলেন। এই শ্লোকগুলি ঈশ্বরচন্দ্র তাঁর 'শ্লোকমঞ্জরী' গ্রন্থে সংকলিত করে গেছেন। সংকলনের প্রয়োজন প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন :

> আমাদের পঠদ্দশায়, উদ্ভটশ্লোকের যেরূপ আদর ও আলোচনা লক্ষিত হইয়াছিল, এক্ষণে আর সেরূপ দেখিতে ও শুনিতে পাওয়া যায় না। বস্তুতঃ উদ্ভটশ্লোকের আলোচনা এককালে লয়প্রাপ্ত হইয়াছে। সুতরাং আমরা অবিদ্যমান হইলে, আমাদের কণ্ঠস্থ উদ্ভটশ্লোকগুলি অবিদ্যমান হইবার সম্ভাবনা। কিন্তু, ঐ শ্লোকগুলি, চিরদিনের নিমিত্ত, অদর্শন প্রাপ্ত হওয়া উচিত নহে। এজন্য, শ্লোকগুলি মুদ্রিত করিলাম।

শ্লোকমঞ্জরীর 'বিজ্ঞাপনে' ঈশ্বরচন্দ্র তাঁর পূজনীয় শিক্ষাগুরু গঙ্গাধর তর্কবাগীশ সম্বন্ধে লিখেছেন :

> শিক্ষাদান বিষয়ে পূজ্যপাদ তর্কবাগীশ মহাশয়ের অসাধারণ নৈপুণ্য ছিল। তৎকালে সকলে স্পষ্ট বাক্যে স্বীকার করিতেন, ব্যাকরণের তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্রেরা শিক্ষা বিষয়ে যেরূপ কৃতকার্য্য হয়, অপর দুই শ্রেণীর ছাত্রেরা কোনও ক্রমে সেরূপ হয় না। বস্তুতঃ, পূজ্যপাদ তর্কবাগীশ মহাশয় শিক্ষাদান কার্য্যে বিলক্ষণ দক্ষ, সাতিশয় যত্নবান, ও সবিশেষ পরিশ্রমশালী বলিয়া, অসাধারণ প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিলেন।

ছাত্রদের উদ্ভটশ্লোক শিক্ষা দিতেই হবে অধ্যাপকদের, এমন কোন নিয়ম ছিল না। গঙ্গাধর এই শ্লোক শিক্ষার রীতি প্রবর্তন করেন। ঈশ্বরচন্দ্র লিখেছেন :[১]

> প্রাত্যহিক পাঠ সমাপ্তির পর উদ্ভট শ্লোকের আলোচনা বিদ্যালয়ের নিয়মাবলীর অনুযায়িনী না হওয়াতে, ব্যাকরণের প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে, উদ্ভটশ্লোক শিক্ষার প্রথা ছিল না। পূজ্যপাদ তর্কবাগীশ মহাশয়, ছাত্রগণের হিতার্থে, স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া, তৃতীয় শ্রেণীতে উদ্ভট শ্লোকশিক্ষা-প্রণালী প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন। এই উদ্ভটশ্লোক শিক্ষা দ্বারা, আমরা সবিশেষ উপকারলাভ করিয়াছিলাম, তাহার সন্দেহ নাই।

গঙ্গাধরের যে-চরিত্রটি তাঁর ছাত্র ঈশ্বরচন্দ্রের এই স্বীকারোক্তির মধ্যে পরিষ্কার ফুটে উঠেছে, সেটি হল আদর্শ শিক্ষকের চরিত্র। মাসিক বেতনের পরিবর্তে বিদ্যালয়ের যথাকর্তব্য পালন করেই ছাত্রদের প্রতি তাঁর সব কর্তব্যপালন শেষ হয়ে গেল বলে তিনি মনে করতেন না। কিভাবে শিক্ষা দিলে ছাত্রদের ভাল হয়, সেদিকে তাঁর সজাগ দৃষ্টি ছিল। গুরুশিষ্যের, শিক্ষক-ছাত্রের ব্যক্তিগত সম্পর্কও ছিল মধুর। ঈশ্বরচন্দ্রের আগ্রহ দেখে তিনি অবসর সময়ে তাঁকে উদ্ভটশ্লোক শিক্ষা দিতে কুণ্ঠিত হতেন না। উদারতা ও অমায়িকতার প্রতিমূর্তি ছিলেন তর্কবাগীশ।

গঙ্গাধরের চারিত্রিক উদারতার একটি দৃষ্টান্ত এখানে উল্লেখ করছি। দৃষ্টান্তটি তাঁর অন্য একজন ছাত্রের স্মৃতিকথা থেকে গৃহীত। তাঁর নাম গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন। কলকাতার দক্ষিণে রাজপুর হরিনাভির যে বিদ্যাসমাজের কথা বলেছি, গিরিশচন্দ্র সেখানকার এক বিখ্যাত পণ্ডিতবংশের সন্তান। ঈশ্বরচন্দ্রের চেয়ে বয়সে প্রায় তিনি দু'বছরের ছোট ছিলেন। আট বছর বয়সে তিনি কলকাতার সংস্কৃত কলেজে ভর্তি হন, ঈশ্বরচন্দ্রের একবছর পরে। রাজপুর গ্রামে তাঁর পিতার টোল ছিল। টোলের অবস্থা খারাপ হওয়ায় তিনি কলকাতায় এসে ঠনঠনিয়ার সিদ্ধেশ্বরী মন্দিরের পিছনে কর্ণওয়ালিস স্ট্রীটের পশ্চিম দিকে এক পুকুরপাড়ে টোলঘর বেঁধে অধ্যাপনা করতেন। টোলঘরের দীনহীন অবস্থার যে বর্ণনা দিয়েছেন গিরিশচন্দ্র তা উল্লেখযোগ্য। তিনি লিখেছেন :[২]

> টোলঘরের অবস্থা নিতান্ত হীন ছিল। প্রথমতঃ একটি বাহিরের কুটীর, তাহাতে ভগ্ন তক্তপোষ পাতা, তদুপরি মৌল দরমা ১ খানি; উহার উপরি দিনরাত্রি অবস্থিতি হইত। আর একখানি অতি মলিন বহুকালীন ছিন্নমশারি ছিল, ঐ ছিন্ন স্থান সংস্কার জন্য ঝেঁটার কাটি বিদ্ধ করিতাম; ক্রমে ১ গাছি ঝেঁটা ঐ কর্ম্মে লাগিয়াছিল। আর মশারির চাল এত নীচে যে শয়নকালে বুকে ঠেকে; এজন্য চালের মধ্যস্থানে দড়ি বাঁধিয়া উপরি আড়াতে বন্ধন করিতাম।

এই ঘরের মধ্যে আর একটি কুটীর ছিল, তার মধ্যে রান্নার চুল্লী ও হাঁড়িকলসী থাকত। গৃহস্থরা ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে যেসব হাঁড়িকুঁড়ি উৎসর্গ করতেন, তাতেই চাল ডাল থাকত। পরিধানের বস্ত্রও থাকত কলসীর ভিতর। ঘরে তালা দিয়ে যাবার উপায় ছিল না। তালা দিলেই চোরে তালা ভেঙে ঘটি-বাটি কাপড়-চোপড় যা পেত, তাই নিয়ে যেত। খুব চোরের উপদ্রব ছিল তখন ঠনঠনিয়ায়। ১৮৩০-৩১ সালের কথা। গিরিশচন্দ্র তাই কাপড়ের পুঁটলিটি ও ঘটিটি সামনের এক মুদির দোকানে জমা রেখে কলেজে যেতেন। ঘরের দরজায় চাবির বদলে দড়ি বাঁধা থাকত।

আশপাশের গ্রাম থেকে কলকাতা শহরে এসে যেসব ব্রাহ্মণ পণ্ডিত টোল স্থাপন করে অধ্যাপনা করতেন, তাঁদের অধিকাংশের অবস্থা এইরকমই ছিল। নিদারুণ দারিদ্র্যের মধ্যে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতরা তখন কায়ক্লেশে জীবনধারণ করেছেন এবং নিজেদের সন্তানদের বিদ্যাশিক্ষা দিয়েছেন। গিরিশচন্দ্র যখন সংস্কৃত কলেজে পড়বার জন্য কলকাতায় এলেন, তখন তাঁর আহারের চিন্তায় তাঁর পিতা বিব্রত হয়ে পড়লেন। গঙ্গাধর তর্কবাগীশ থাকতেন সিমলেতে, শিবচন্দ্র দাসের গলির ভিতর একখানি ছোট বাড়ী কিনে। তাঁর সঙ্গে তাঁর পুত্র গোবিন্দও বাস করতেন। গোবিন্দ সংস্কৃত কলেজের পাঠ শেষ করে, বার বছর পরে শিরোমণি উপাধি পেয়ে হুগলি কলেজের পণ্ডিত নিযুক্ত হন। তর্কবাগীশ মশায় কলেজের ছুটির পরে বাড়ী ফিরে, জামা-কাপড় ছেড়ে, কিঞ্চিৎ জলযোগ করে, প্রায়ই গিরিশচন্দ্রের পিতার কাছে বেড়াতে আসতেন এবং তাঁর টোলঘরের দাওয়ায় বসে রাস্তার লোক দেখতেন, আর নানারকম গল্প করতেন। একদিন তিনিই গিরিশচন্দ্রকে সংস্কৃত কলেজে ভর্তি করে দেবার

কথা বলেন। উত্তরে তাঁর পিতা বলেন—'বেলা দশটার মধ্যে গিরিশকে খাইয়ে দেব কি করে? টোল চালাব, না রান্না করব?' তাতে তর্কবাগীশ মশায় বলেন: 'আপনার কিছু করতে হবে না। গিরিশ দশটার মধ্যে আমার বাড়ীতে খেয়ে কলেজে যাবে।' গিরিশচন্দ্র লিখেছেন:[৩]

> তদবধি আমি ২ বৎসর কাল তাঁহার বাটীতে সকালে খাইয়া পড়িতে যাইতাম; তার পর মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ প্রায় শেষ হইলে কালেজের নিয়মানুসারে পরীক্ষা দিয়া মাসিক ৫৲ পাঁচটি টাকা বেতন পাইতে লাগিলাম। এবং কিঞ্চিৎ বয়োঽধিক হওয়াতে কোনরূপে স্বয়ং পাক করিয়া খাইতে শিখিলাম। তখন তর্কবাগীশ মশায় বললেন, 'এখন তুমি নিজে পাক ক'রে খেও এবং ১০টার মধ্যে কলেজে যেও।'

গঙ্গাধর তর্কবাগীশের গভীর স্নেহস্পর্শ থেকে দরিদ্র ও অসহায় ছাত্ররা কখনও বঞ্চিত হতেন না। সংস্কৃত কলেজের ছাত্রজীবনের প্রথম থেকেই ঈশ্বরচন্দ্র এই মহানুভব পিতৃতুল্য অধ্যাপকের সান্নিধ্য লাভ করেছিলেন। কেবল মহানুভবতা নয়, শিক্ষক-ছাত্রের সম্পর্ক যে কত নিবিড় নির্মল হতে পারে, ঈশ্বরচন্দ্র ছাত্রজীবনের গোড়াতেই তাঁর সংস্কৃত কলেজের প্রথম গুরু গঙ্গাধর তর্কবাগীশের কাছ থেকে তা শিক্ষা করেছিলেন। তর্কবাগীশ মশায়ের কথা তাই তিনি শেষজীবন পর্যন্ত ভুলতে পারেননি।

সংস্কৃত কলেজে কেবল যে সংস্কৃতই পড়ানো হত তা নয়। কলেজের ছাত্রদের ইংরেজী শিক্ষার সুবিধার জন্য ১৮২৭ সালের ১ মে ওলাস্টন নামে (M. W. Wollaston) একজন সাহেবকে মাসিক ২০০৲ টাকা বেতনে নিযুক্ত করা হয়। ইংরেজী অবশ্যপাঠ্য বিষয় ছিল না। ব্যাকরণশ্রেণী থেকেই প্রথমে ইংরেজীশ্রেণীতে প্রবেশ করতে হত। ঈশ্বরচন্দ্রও গঙ্গাধরের কাছে মুগ্ধবোধ পড়তে পড়তে ইংরেজীশ্রেণীতে যোগ দিয়েছিলেন। ১৮৩৩-৩৪ সালের বার্ষিক পরীক্ষায়, ইংরেজী ৬ষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্ররূপে তিনি ৫৷৷০ মূল্যের পুস্তক পারিতোষিক পান—History of Greece এবং Reader etc. ১৮৩৪-৩৫ সালের বার্ষিক পরীক্ষায় ৫ম শ্রেণীর ছাত্ররূপে তিনি Poetical Reader No. 3 এবং English

Reader No. 2 পারিতোষিক পান। ১৮৩৫ সালের নভেম্বর মাসে সংস্কৃত কলেজ থেকে ইংরেজীশ্রেণী উঠিয়ে দেওয়া হয়। এই প্রসঙ্গে শিক্ষা বিভাগের সেক্রেটারী সাদারল্যাণ্ড, ১৮৩৫ সালের ২৩ নভেম্বর সংস্কৃত কলেজের সেক্রেটারী রামকমল সেনকে লেখেন :

> Satisfied of the inutility of the English department of the Sanscrit College it will recommend to Government its immediate abolition. No time should be lost therefore by you in giving the masters warning that their salaries will cease on the 31st December.

'মাস্টার' বলতে ওলাস্টন সাহেব ছাড়া ইংরেজীশ্রেণীর ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য আরও দু'জন বাঙালী শিক্ষক নিযুক্ত হয়েছিলেন। ১৮৩৫ সালে ইংরেজীশ্রেণী এইভাবে তুলে দেবার ফলে ঈশ্বরচন্দ্রের ইংরেজীশিক্ষা অসম্পূর্ণ থেকে যায়।

১৮৩৯ সালে ঈশ্বরচন্দ্র যখন ন্যায়শ্রেণীর ছাত্র ছিলেন, তখন সংস্কৃত কলেজের বহু ছাত্র মিলে নামসই করে ইংরেজী বিভাগ পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য সেক্রেটারী মার্শালের কাছে একখানি আবেদনপত্র পাঠান। তাঁরা লেখেন :[8]

> ন্যায়শাস্ত্রাধ্যায়িনাং ছাত্রাণাং
>
> আমারদিগের দুর্ভাগ্যবশতঃ কেবল সংস্কৃত পাঠশালাতেই ইংরাজি-ভাষাধ্যয়নের রীতি উঠিয়া গিয়াছে কিন্তু মাদর্শাতে উক্ত ভাষাধ্যয়ন ক্রমে বৃদ্ধি হইতেছে ইহাতে কেবল আমারদিগেরই দুর্ভাগ্য বলিতে হইবেক নতুবা যে রাজা এতদ্দেশে ইংরাজি বিদ্যাবৃদ্ধ্যর্থে যত্নপূর্ব্বক বহুতর ধন ব্যয় করিয়া বিদ্যালয় সংস্থাপন করিতেছেন তাঁহার যে কেবল এতন্মহানগরস্থ প্রধান বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের উক্ত ভাষাভ্যাসবিষয়ে অমনোযোগ হইয়াছে ইহা কোনরূপেই সম্ভব নহে অতএব এইক্ষণে প্রার্থনা যে অনুগ্রহপূর্ব্বক রীত্যনুসারে আমারদিগের ইংরাজি ভাষাভ্যাসের অনুমতি প্রকাশ হয় তাহা হইলে ক্রমে রাজকীয় কার্য্য ও শিল্পাদি বিদ্যা জানিয়া লৌকিক কার্য্যনির্ব্বাহে সমর্থ হইতে পারি—লিপিরিয়ং জ্যৈষ্ঠস্যাষ্টদিবসীয়া—

এই আবেদনপত্রে ঈশ্বরচন্দ্রেরও স্বাক্ষর ছিল। ছাত্রদের আবেদন কর্তৃপক্ষ মঞ্জুর করেননি। ঈশ্বরচন্দ্রের ইংরেজীশিক্ষাও আর সংস্কৃত কলেজে সম্ভব হয়নি। ১৮৪১ সালে তাঁর কলেজের শিক্ষা শেষ হবার পর, ১৮৪২ সাল থেকে আবার ইংরেজীশ্রেণী খোলা হয় সংস্কৃত কলেজে।

ব্যাকরণশ্রেণীতে ঈশ্বরচন্দ্র ১৮৩৩ সালের জানুয়ারী পর্যন্ত গঙ্গাধর তর্কবাগীশের কাছে মুগ্ধবোধ পাঠ করেন। ১৮৩৩ সালের ফেব্রুয়ারী থেকে ১৮৩৫ সালের জানুয়ারী মাস পর্যন্ত দু'বছর তিনি সাহিত্যশ্রেণীতে অধ্যয়ন করেন। সাহিত্যশ্রেণীর অধ্যাপক তখন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত জয়গোপাল তর্কালঙ্কার। ঈশ্বরচন্দ্রের জীবনে জয়গোপালের ব্যক্তিত্ব ও সাহিত্য-প্রতিভার প্রভাব গভীর।

জয়গোপালের নিবাস ছিল নদীয়া জেলার বজরাপুর গ্রামে। তাঁর পিতার নাম কেবলরাম তর্কপঞ্চানন। জাতিতে তিনি বারেন্দ্রশ্রেণীর ব্রাহ্মণ ছিলেন। জয়গোপাল নিজে তাঁর পরিচয় প্রসঙ্গে লিখেছেন :[৪]

> চারি সমাজের পতি কৃষ্ণচন্দ্র মহামতি ভূমিপতি ভূমিসুরপতি।
> তার রাজ্যে শ্রেষ্ঠ ধাম, সমাজপূজিত গ্রাম বজরাপুরেতে নিবসতি॥
> শ্রীজয়গোপালনাম হরিভক্তিলাভকাম উপনাম শ্রীতর্কালঙ্কার।
> ভক্তবৃন্দমধ্যরবি শ্রীবিল্বমঙ্গল কবি কবিতার প্রকাশে পয়ার॥

বিখ্যাত পণ্ডিত গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার জয়গোপালের ভ্রাতুষ্পুত্র। জয়গোপালের পুত্র তারক বিদ্যানিধি। তারকের তিন পুত্র এক কন্যা। জয়গোপালের সহোদরদের মধ্যে রঘূত্তম বাণীকণ্ঠ, সদাশিব তর্করত্ন, বলভদ্র বিদ্যাবাচস্পতি প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। সংস্কৃত কলেজে ও কলকাতার পণ্ডিতসমাজে জয়গোপাল নিজের প্রতিভাবলে বিশেষ প্রতিপত্তি অর্জন করেছিলেন।

প্রথমে প্রায় তিন বছর তিনি কোলব্রুক সাহেবের পণ্ডিত ছিলেন। ১৮০৫ থেকে ১৮২৩ সাল পর্যন্ত, প্রায় ১৮ বছর তিনি পাদরি কেরীর অধীনে শ্রীরামপুরে চাকরী করেন। শ্রীরামপুর মিশন স্কুলে এই সময় কিছুদিন তিনি শিক্ষকতাও করেন। ১৮১৮ সালে যখন মার্শম্যানের সম্পাদকত্বে বাংলা

সংবাদপত্র 'সমাচার দর্পণ' প্রকাশিত হয়, তখন জয়গোপাল তর্কালঙ্কার গোড়া থেকেই তার সম্পাদকীয় বিভাগের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। 'সমাচার দর্পণ' সম্পাদক লেখেন, 'শ্রীযুক্ত জয়গোপাল তর্কালঙ্কার···অনেক কালাবধি দর্পণ সম্পাদনানুকূল্যে নিযুক্ত ছিলেন···'। (সমাচার দর্পণ, ২ জুলাই ১৮৩৬)।

১৮২৪ সালের জানুয়ারী মাসে কলকাতায় সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠিত হলে জয়গোপাল মাসিক ৬০৲ বেতনে সাহিত্যশাস্ত্রের অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হন। দীর্ঘ বাইশ বছর তিনি সংস্কৃত কলেজের সাহিত্যশ্রেণীর অধ্যাপনা করেন।

জয়গোপালের মতন সুরসিক সুলেখক, ভাবগ্রাহী ও সহৃদয় ব্যক্তি সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপকদের মধ্যে তখন আর কেউ ছিলেন কি না সন্দেহ। আচার্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য তাঁর স্মৃতিকথায় জয়গোপালের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে অনেক উপভোগ্য কথা বলেছেন।[৫] তিনি বলেছেন যে যদিও জয়গোপাল সাহিত্যের অধ্যাপক ছিলেন, তাহলেও তাঁর ক্লাসে পড়াশুনা বড় একটা হত না। কোন কাব্য পড়াবার সময় হয়ত তিনি একটি শ্লোক আবৃত্তি করতেন। আবৃত্তি করে যথারীতি ছাত্রদের কাছে তার ব্যাখ্যাও আরম্ভ করতেন। কিন্তু ব্যাখ্যা করবেন কি? শ্লোকের অন্তর্নিহিত ভাবের ক্রিয়া আরম্ভ হত তাঁর মনে। তিনি ভাবাচ্ছন্ন হয়ে পড়তেন। ব্যাখ্যা মধ্য-পথেই শেষ হয়ে যেত। অর্থাৎ শ্লোকের সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা করা আর হত না। চক্ষু দু'টি তাঁর বাষ্পাকুল হয়ে আসত, গলার স্বর গদ-গদ হয়ে উঠত আর কেবলই তিনি ছাত্রদের দিকে চেয়ে বলতেন—'আহা-হা দেখ দেখি কেমন লিখেছে, আহা-হা!' কয়েকবার তাঁর প্রায়রুদ্ধ কণ্ঠে কেবল 'আহা-হা, আহা-হা' শব্দ শোনা যেত। তারপর দেখা যেত, নির্বাক নিস্পন্দ হয়ে তর্কালঙ্কার মশায় বসে আছেন, কণ্ঠস্বর তাঁর একেবারে রুদ্ধ হয়ে গেছে, গণ্ডস্থল বেয়ে অনর্গল অশ্রুধারা ঝরে পড়ছে।[৬]

সেদিনকার মতন পড়াও ঐখানে শেষ হয়ে যেত। সাহিত্যের অধ্যাপক ভাব-বিহ্বল হয়ে বসে থাকতেন, ছাত্ররা তাঁর মুখের দিকে অবাক হয়ে চেয়ে থাকত।

এইভাবে সংস্কৃত কলেজে তর্কালঙ্কার মশায় সাহিত্যের অধ্যাপনা করতেন। দু'বছর ধরে ঈশ্বরচন্দ্র তাঁর কাছে রঘুবংশ, কুমারসম্ভব, মেঘদূত, কিরাতার্জুনীয়, শিশুপালবধ, নৈষধচরিত, শকুন্তলা, বিক্রমোর্বশী, বেণীসংহার, রত্নাবলী, মুদ্রা-

রাক্ষস, উত্তররামচরিত, দশকুমারচরিত ও কাদম্বরী পাঠ করেছিলেন। এই রকম একজন গুরুর কাছে সাহিত্যের রসোপলব্ধিতে দীক্ষা পেয়েছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র। তাই বাংলা ভাষা ও বাংলা সাহিত্যের আদিশিল্পীদের মধ্যে, পরবর্তীকালে তিনি তাঁর গুরুর যোগ্য শিষ্যরূপে সহজেই প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছিলেন।

তর্কালঙ্কার মশায়ের অসাধারণ কাব্যশক্তি ছিল। মুখে মুখে স্বচ্ছন্দে অনর্গল তিনি ছন্দমধুর শ্লোক রচনা করতে পারতেন। যে-কোন ব্যক্তি ও বিষয় নিয়ে রচিত, এরকম উপভোগ্য অনেক শ্লোক তাঁর একেবারে লুপ্ত হয়ে গেছে। দু'টি শ্লোকের কথা তাঁর ছাত্র কৃষ্ণকমল স্মৃতিকথায় উল্লেখ করেছেন। বর্ধমানের মহারাজা কীর্তিচন্দ্রকে সম্বোধন করে তর্কালঙ্কার মশায় একবার লিখেছিলেন :

ত্বৎকীৰ্ত্তিচন্দ্রমুদিতং গগনে নিশাম্য
রোহিণ্যপি স্বপতিসংশয়জাতশঙ্কা।
শ্রীকীৰ্ত্তিচন্দ্র নৃপ কজ্জললাঞ্ছনেন
প্রেয়াং সমঙ্কয়দসৌ ন বিধৌ কলঙ্কঃ ॥

'হে কীৰ্ত্তিচন্দ্র মহারাজ! তোমার কীর্তি চন্দ্রের ন্যায় আকাশে উদিত হয়েছে। তাই দেখে চন্দ্রের পতিব্রতা পত্নী রোহিণীরও মনে শঙ্কা হল যে, পাছে তাঁর স্বামীকে তিনি চিনতে না পারেন। এই ভেবে তিনি আপনার স্বামীর গায়ে একটি দাগ দিলেন, তাকেই আমরা চাঁদের কলঙ্ক বলে থাকি।'

আর-একটি শ্লোক তিনি সংস্কৃত কলেজ প্রসঙ্গে লিখেছিলেন। একবার যখন সংস্কৃত কলেজ উঠিয়ে দেবার কথা হয়, তখন কলেজের অন্যতম কর্তা হোরেস হেম্যান উইলসনকে তিনি ইংলণ্ডে একটি কবিতা রচনা করে পাঠিয়েছিলেন। কবিতাটি এই :

অস্মিন্ সংস্কৃতপাঠসদ্মসরসি ত্বৎস্থাপিতা যে সুধী
হংসাঃ কালবশেন পক্ষরহিতা দূরং গতে তে ত্বয়ি।
তত্তীরে নিবসন্তি সংহিতশরা ব্যাধাস্তদুচ্ছিত্তয়ে
তেভ্যস্ত্বং যদি পাসি পালক তদা কীৰ্ত্তিশ্চিরং স্থাস্যতি ॥

'এই সংস্কৃত পাঠশালাটি একটি সরোবরতুল্য। এর মধ্যে যে সব বিদ্বান ব্যক্তিদের আপনি অধ্যাপক নিযুক্ত করে আশ্রয় দিয়ে গিয়েছেন, তাঁরা হংসতুল্য। এখন সেই বিদ্যার সরোবরের কাছে কয়েকজন ব্যাধ এসে সেই

হংসবংশ ধ্বংস করতে উদ্যত হয়েছে। সেই ব্যাধের কবল থেকে আপনি যদি তাঁদের পরিত্রাণ করেন, তবেই আপনার কীর্তি চিরস্থায়ী হবে।' এই শ্লোকটির একটি কাব্যানুবাদও করা হয়েছে :[৭]

হে সাহেব উইলসন ! করি নিবেদন,
কৃপা করি তুমি ইহা করহ শ্রবণ,—
সংস্কৃত পাঠশালা রম্য জলাশয়,
নির্ম্মাণ করিয়া তাহা ওহে মহাশয় !
সুপণ্ডিত হংসগণে রেখেছ পুষিয়া,
তাদের দুর্গতি আজ দেখহ আসিয়া।
বহুদূরে গিয়া তুমি করিছ বিরাজ,
কালবশে পক্ষহীন তারা সবে আজ।
হায়রে কয়েকজন দুষ্ট ব্যাধ আসি
লইয়া শাণিত শর তীরে আছে বসি।
সেই সুধী হংসগণে বধিবার তরে
তাহাদের অভিলাষ হয়েছে অন্তরে।
সেই হংসগণে রক্ষা করিয়া এখন
রেখে দাও নিজকীর্ত্তি, ওহে উইলসন !

উইলসন সাহেব এর উত্তরে ইংলণ্ড থেকে তর্কালঙ্কার মশায়কে কয়েকটি শ্লোক লিখে পাঠান। শ্লোকগুলি এই :

বিধাতা বিশ্বনির্ম্মাতা হংসাস্তং প্রিয়বাহনং
অতঃ প্রিয়তরত্বেন রক্ষিষ্যতি স এব তান্ ॥

যাহা কিছু নিরীক্ষণ কর এই ভবে
ব্রহ্মার সৃষ্টির মধ্যে জেগে সেই সবে।
হংসও হইল তবে ব্রহ্মার বচন
পুনশ্চ ব্রহ্মার তাহা হইল বাহন।
তাইত ব্রহ্মার হংস দেখি প্রিয়তর
ব্রহ্মা রক্ষা করিবেন তারে নিরন্তর।

অমৃতং মধুরং সম্যক সংস্কৃতং হি ততোঽধিকম্।
দেবভোগ্যমিদং যস্মাৎ দেবভাষেতি কথ্যতে ॥

অমৃত মধুর বস্তু জানিও সতত,
তা হ'তে মধুরতর ভাষা সংস্কৃত।
তাইত দেবতাগণ পরম আদরে
সংস্কৃত ভাষারস পিয়ে প্রাণ ভ'রে।
এই কথা মনে তুমি রেখো অবিরাম
সংস্কৃত পাইয়াছে দেবভাষা নাম।

ন জানে বিদ্যতে কিং তন্মাধুর্য্যমত্র সংস্কৃতে।
সর্ব্বদৈব সমুন্মত্তা যেন বৈদেশিকা বয়ম্।

না জানি বা সংস্কৃত ভাষার কি রস
এ রস করিলে পান সবাই অবশ।
আমরা বিদেশী লোক বিদেশে থাকিয়া
এই রস পান করি উন্মত্ত হইয়া!

যাবদ্ ভারতবর্ষং স্যাদ্ যাবদ্ বিন্ধ্যহিমাচলৌ।
যাবদ্ গঙ্গা চ গোদা চ তাবদেব হি সংস্কৃতম্ ॥

থাকিবে ভারতবর্ষ যতকাল ধরি,
থাকিবেক যতকাল বিন্ধ্যহিমগিরি,
গঙ্গা গোদাবরী নদী যতকাল রবে
ততকাল সংস্কৃত জীবিত রহিবে।

এই ধরনের শ্লোক রচনা করা ছাড়াও, তর্কালঙ্কার মশায় গল্প করতে, 'সমস্যা' দিতে এবং ছাত্রদের দিয়ে সেই সব সমস্যা পূরণ করাতে ভালবাসতেন। তিনি মুখে মুখে যে সব গল্প বলতেন, তাও সাহিত্যরসোত্তীর্ণ হত। গল্পের সময় বা সমস্যা পূরণের সময় যদি প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ (অলঙ্কারশ্রেণীর অধ্যাপক) উপস্থিত থাকতেন, তাহলে মণিকাঞ্চন যোগ হত। সমস্যাপূরণে

প্রেমচন্দ্রের খুবই আগ্রহ ছিল। তিনি তর্কালঙ্কারের সমস্যা পূরণের জন্য কবিতা রচনা করতেন। কবিতাগুলি পুস্তকাকারে লেখা থাকত এবং তার নাম দেওয়া হয়েছিল 'সমস্যাকল্পলতা'। পরে এই পুস্তক ছাপিয়ে প্রকাশ করা হয়। 'সমস্যাকল্পলতা'র মঙ্গলাচরণে প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ জয়গোপালের মহিমা বর্ণনা করে লেখেন :

গোবর্দ্ধনোদ্ধরণ বিশ্বজনীন কর্ম্ম-
বিস্মাপিতৈর্বিবুধবন্দিভিরুচ্চগীতং।
মায়াগুণৈরনভিভূতমনন্তশক্তিং
গোপালমেকমনঘং শরণং ব্রজামঃ ॥
কবিতা ভবিতা কস্মাদস্মাকমিতি ভাবিতঃ।
গুরুঃ সমস্যামেকৈকামারেভে দাতুমুৎসুকঃ ॥
নিত্যং তৎপূরণাদেষা জায়তে শ্লোকবিস্তৃতিঃ।
সা সমস্যাকল্পলতা নাম্না খ্যাতা স্তু ভূতলে ॥

তর্কালঙ্কার মশায় মধ্যে মধ্যে উচ্চশ্রেণীর ছাত্রদের কবিতা রচনা করতে দিতেন। ছাত্ররা তাঁর সামনে বসে কাব্য রচনা করত। ঈশ্বরচন্দ্র গদ্য-পদ্য উভয় রচনায় সহজে প্রবৃত্ত হতে চাইতেন না, বোধ হয় সঙ্কোচবোধ করতেন। সাহিত্যের বার্ষিক পরীক্ষায় রচনার জন্য পারিতোষিক পাবার পর জয়গোপাল একদিন ঈশ্বরচন্দ্রকে বললেন : 'আর আমি তোমার কোন ওজর-আপত্তি শুনব না, আজ তোমায় পদ্য রচনা করতেই হবে।' ঈশ্বরচন্দ্র মহা সঙ্কটে পড়লেন। এ সম্বন্ধে তিনি লিখেছেন :[৮]

তিনি পীড়াপীড়ি করাতে, নিতান্ত অনিচ্ছাপূর্ব্বক, আমায় পদ্য রচনায় প্রবৃত্ত হইতে হইল। গোপালায় নমোঽস্তু মে, এই চতুর্থ চরণ নির্দ্দিষ্ট করিয়া, এক ঘণ্টা সময় দিয়া, সকলকে শ্লোকরচনায় নিযুক্ত করিলেন। আমি, পরিহাস করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, মহাশয়, আমরা কোন্ গোপালের বর্ণনা করিব। এক গোপাল আমাদের সম্মুখে বিদ্যমান রহিয়াছেন; আর এক গোপাল, বহুকাল পূর্ব্বে, বৃন্দাবনে লীলা করিয়া, অন্তর্হিত হইয়াছেন। এই উভয়ের মধ্যে, কোন গোপালের বর্ণনা

আপনার অভিপ্রেত, স্পষ্ট করিয়া বলুন। পূজ্যপাদ তর্কালঙ্কার মহাশয়, আমার এই কৌতুককর জিজ্ঞাসাবাক্য শ্রবণগোচর করিয়া, হাস্যমুখে বদনে বলিলেন, বৃন্দাবনের গোপালের বর্ণনা কর। তিনি এক ঘণ্টা সময় নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন ; ঐ এক ঘণ্টায়, আমি পাঁচটির অধিক শ্লোক লিখিতে পারিলাম না। তিনি শ্লোক পাঁচটি দৃষ্টিগোচর করিয়া, সাতিশয় সন্তোষপ্রকাশ করিলেন। তদ্দর্শনে, আমার যার পর নাই, আহ্লাদ ও উৎসাহবৃদ্ধি হইল। সেই পাঁচটি শ্লোক এই :

যশোদানন্দকন্দায় নীলোৎপলদলশ্রিয়ে।
নন্দগোপালবালায় গোপালায় নমোঽস্তু মে ॥

ধেনুরক্ষণদক্ষায় কালিন্দীকূলচারিণে।
বেণুবাদনশীলায় গোপালায় নমোঽস্তু মে ॥

ধৃতপীতদুকূলায় বনমালাবিলাসিনে।
গোপস্ত্রীপ্রেমলোলায় গোপালায় নমোঽস্তু মে ॥

বৃষ্ণিবংশবতংসায় কংসধ্বংসবিধায়িনে।
দৈতেয়কুলকালায় গোপালায় নমোঽস্তু মে ॥

নবনীনৈকচৌরায় চতুর্ব্বর্গৈকদায়িনে।
জগদ্ভাণ্ডকুলালায় গোপালায় নমোঽস্তু মে ॥

ছাত্রের রচিত এরকম সুললিত ছন্দের সুন্দর সংস্কৃত শ্লোক শুনলে কোন্ শিক্ষক না খুশি হবেন! জয়গোপালের মতন সাহিত্যরসিক ভাবুক ব্যক্তি যে এই রচনা দেখে 'সাতিশয় সন্তোষপ্রকাশ' করবেন, তাতে বিস্মিত হবার কিছু নেই। গুরু তাঁর উপযুক্ত শিষ্যের কৃতিত্ব দেখে চমৎকৃত হয়েছিলেন।

তর্কালঙ্কার মশায় প্রত্যেক বছর মহা জাঁকজমক করে সরস্বতীপূজা করতেন। যাঁরা তাঁর কাছে একদা অধ্যয়ন করেছেন, অথবা এখনও করছেন, এরকম সকল শ্রেণীর সব ছাত্রকে তিনি তাঁর বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করতেন। সাহিত্য অলঙ্কার স্মৃতি ন্যায় বেদান্ত, এই পাঁচশ্রেণীর ছাত্ররা কেউ বাদ যেত না। পূজার

দিন ছাত্ররা বাড়ীতে দু'বেলা পেটভরে আহার করত এবং বিকেলে ও রাতে গান শুনত। সরস্বতী পূজার দিনটা তাঁর বাড়ীতে ছাত্ররা, সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত, বেশ আমোদ আহ্লাদ করে কাটাত।

আমোদ-আহ্লাদে তর্কালঙ্কার মশায় নিজে প্রাণ খুলে যোগ দিলেও, ছাত্রদের দিয়ে তারই মধ্যে কাব্যরচনা করিয়ে নেবার কথা তিনি ভুলতেন না। পূজার আগের দিন ছাত্রদের তিনি বলতেন, পদ্যে সরস্বতীর বর্ণনা লিখে আনতে। ঈশ্বরচন্দ্র কিছুতেই সম্মত হতেন না। তাঁর পীড়াপীড়িতে একবার মাত্র একটি শ্লোকে তিনি সরস্বতীর বর্ণনা করেছিলেন। শ্লোকটি এই—

লুচী কচুরী মতিচুর শোভিতং
জিলেপি সন্দেশ গজা বিরাজিতম্।
যস্যাঃ প্রসাদেন ফলারমাপ্নুমঃ
সরস্বতী সা জয়তান্নিরন্তরম্।

বিদ্যার দেবী সরস্বতী সম্বন্ধে যে-ছাত্র এরকম সরস কবিতা রচনা করেছিলেন, তিনিই পরে নীরস 'বিদ্যাসাগর' হয়েছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র লিখেছেন : 'শ্লোকটি দেখিয়া পূজ্যপাদ তর্কালঙ্কার মহাশয় আহ্লাদে পুলকিত হইয়াছিলেন, এবং অনেককে ডাকাইয়া আনিয়া, স্বয়ং পাঠ করিয়া শ্লোকটি শুনাইয়াছিলেন।'

পুলকিত হবারই কথা। গুরু যখন দেখেন, শিষ্য তাঁরই প্রতিভার সুযোগ্য উত্তরাধিকারী হয়ে উঠছে, তখন তাঁর আর আনন্দের সীমা থাকে না। ছাত্র-জীবন থেকেই ঈশ্বরচন্দ্রের সাহিত্যবোধ ও রসবোধ যে কত তীব্র ছিল, গুরু-শিষ্যের এই সব সংবাদ থেকে তা পরিষ্কার বোঝা যায়।

সাহিত্যগুরু জয়গোপাল তর্কালঙ্কার কেবল সংস্কৃত সাহিত্যের চর্চা করতেন না। বাংলা ভাষার প্রতি তাঁর আন্তরিক দরদ ছিল। আগেই বলেছি, জয়গোপাল বাংলা 'সমাচার দর্পণ' সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় বিভাগে দীর্ঘকাল নিযুক্ত ছিলেন। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে, বাংলা সাহিত্য ও সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে 'সমাচার দর্পণ' পত্রিকার বিশেষ দান ছিল। এই দানের কৃতিত্ব কেবল মার্শম্যান প্রমুখ ব্যাপটিস্ট মিশনারী সাহেবদেরই প্রাপ্য নয়, বাঙালী পণ্ডিতদেরও প্রাপ্য, এবং এই বাঙালী পণ্ডিতদের মধ্যে জয়গোপাল তর্কালঙ্কারের নাম

সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। সংবাদপত্রের মধ্য দিয়ে তিনি সেকালের অনড় অচল বাংলা লেখ্যভাষাকে প্রাত্যহিক ব্যবহারের উপযোগী সহজ সরল ভাষা করে তুলতে সাহায্য করেছিলেন। জয়গোপালের এ কীর্তি অবিস্মরণীয়।

জয়গোপালের দ্বিতীয় অসামান্য কীর্তি হল, কৃত্তিবাসের রামায়ণ ও কাশীরাম দাসের মহাভারতের সংস্কারসাধন। কৃত্তিবাস ও কাশীরাম দাসের নামে বাংলাদেশের ঘরে ঘরে যে দু'টি মহাকাব্য পঠিত ও গীত হচ্ছে, শতবর্ষেরও উধ্বকাল ধরে, তার সহজ ও সুললিত ভাষা যে অনেকটা পণ্ডিত জয়গোপাল তর্কালঙ্কারের, এ কথা আজ আমরা প্রায় ভুলে গেছি বলা চলে। সংস্কৃত ভাষায় মহাপণ্ডিত হয়েও মাতৃভাষা বাংলার প্রতি এই গভীর মমত্ববোধ, জয়গোপালের সমসাময়িক আর কোন পণ্ডিতের ছিল কিনা সন্দেহ।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর তাঁর এই মহাপণ্ডিত সাহিত্যগুরুর কাছ থেকে কেবল যে সাহিত্যের রসাস্বাদন করতে শিখেছিলেন তা নয়, নিজের মাতৃভাষাকে ভালবাসবার এবং সেই মাতৃভাষাকে সাহিত্যের যোগ্য বাহন করে তুলবার প্রেরণাও পেয়েছিলেন।

পণ্ডিত জয়গোপাল তর্কালঙ্কারের কাছে সাহিত্যপাঠ শেষ করে, ১৮৩৫ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ঈশ্বরচন্দ্র অলঙ্কারশ্রেণীতে প্রবেশ করেন। অলঙ্কার-শ্রেণীর অধ্যাপক প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ সাহিত্যগুরু জয়গোপালেরই ছাত্র ছিলেন। বিদ্যাসাগর হলেন জয়গোপালের ছাত্রের ছাত্র।

সাহিত্যের রসবোধ উদ্‌বুদ্ধ হবার পর, অলঙ্কারশাস্ত্রে জ্ঞানসঞ্চয় করা প্রয়োজন। অলঙ্কার সাহিত্যের অঙ্গশ্রী বৃদ্ধি করে, তার মাধুর্যকে আরও মনোহারী করে তোলে। প্রাকৃত সৌন্দর্যকে অপ্রাকৃত করে। অলঙ্কারের সম্যক জ্ঞান না থাকলে সাহিত্যবোধও তাই সম্পূর্ণ সজাগ হয় না। সাহিত্যের পর ঈশ্বরচন্দ্রের অলঙ্কারশাস্ত্রে শিক্ষা আরম্ভ হল।

শিক্ষক প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশও তাঁর গুরু জয়গোপাল তর্কালঙ্কারের মতন সাহিত্য-রসিক ছিলেন। সাহিত্যগুরু জয়গোপালের অন্যতম শিষ্য প্রেমচন্দ্র এবার ঈশ্বরচন্দ্রকে অলঙ্কারশাস্ত্রে দীক্ষা দেবার ভার গ্রহণ করলেন।

বর্ধমান জেলায় রায়না থানার অন্তর্গত শাকরাঢ়া (শাকনাড়া) গ্রাম প্রেমচন্দ্রের জন্মভূমি। রাঘবপাণ্ডবীয় কাব্যের নিজকৃত টীকার শেষে আত্মপরিচয় প্রসঙ্গে প্রেমচন্দ্র লিখেছেন :

যস্যাভবজ্জননভূঃ কিল শাকরাঢ়া
রাঢ়াসু গাঢ়গরিমা গুণিনাং নিবাসাৎ।
গ্রামো নিকামসুখবর্দ্ধনবর্দ্ধমান
রাষ্ট্রান্তরালমিলিতঃ সরিতঃ প্রতীচ্যাম্ ॥

"সুখবর্ধন বর্ধমানরাজ্যের মধ্যে দামোদর নদের পশ্চিমে শাকরাঢ়া গ্রাম যাঁর জন্মভূমি। অনেক গুণী লোকের বাস থাকায় এই গ্রাম রাঢ়দেশের মধ্যে বিশেষ গৌরবের স্থান।"

প্রেমচন্দ্রের সাহিত্যপ্রীতি ছেলেবেলা থেকেই পরিস্ফুট হয়ে উঠেছিল। ছাত্র-জীবনে তিনি গ্রামের কবি ও তর্জাগানের দলে গান বেঁধে দিতেন। একবার গ্রামের চাষীদের কবির দলের সঙ্গে অন্য দলের কবি-লড়াই হয়। সেই দলের কবিরা বিদ্রূপ করে বলে যে চাষীরা হালচাষ করে, ক্ষেতে-মাঠে মজুর খেটে খায়, হরিনামের মাহাত্ম্য তারা কি বুঝবে? প্রেমচন্দ্র তখন বালক। অনুরুদ্ধ হয়ে, চাষীর দলের পক্ষে তিনি এই গানটি বেঁধে দিয়ে তাদের সম্মান রক্ষা করেন :

চাষা অতি খাসা জাতি, নিন্দা কি তাহার
কত দিব্য গুণাধার।
প্রেমভরে হরিরে ডাকতে চাষার পূর্ণ অধিকার ॥
থাকে সত্য মাঠে ঘাটে, বেড়ায় সে স্বভাবের হাটে
চতুরালি নাহি তাহার।
কুটিল সমাজ যত্নে করে পরিহার ॥
স্বার্থে পরার্থে কাজ, নিজ কাজে নাহি লাজ
ভাবে ধর্ম এই তাহার।
প্রাণপণে যোগায় চাষা জগতের আহার ॥

কিবা গৃহী উদাসীন, চাষার অধীন চিরদিন
বিনা চাষে তুনিয়া আঁধার।
পেটে ভাত বিহনে ঘুরিয়ে ঘানি, ফল কি ভাব একটি বার॥

বাল্যকাল থেকে প্রেমচন্দ্র এইভাবে কবির দলে গান বেঁধে দিতেন এবং গ্রাম্য কবিগান ও তর্জাগানের প্রতি তাঁর গভীর উৎসাহ ছিল। শোনা যায়, তাঁর কাব্যরচনার শক্তি দেখে মুগ্ধ হয়ে, উইলসন সাহেব তাঁকে সংস্কৃত কলেজে সরাসরি সাহিত্যশ্রেণীতে ভর্তি হবার অনুমতি দিয়েছিলেন। গ্রামের টোলের পাঠ শেষ করে তিনি যখন কলকাতায় সংস্কৃত কলেজে পড়তে আসেন, তখন ভর্তি করবার আগে উইলসন সাহেব তাঁর সংস্কৃতজ্ঞান পরীক্ষা করবার জন্য শ্লোক রচনা করতে বলেন। প্রেমচন্দ্র তৎক্ষণাৎ উইলসন সাহেবকে নিয়েই শ্লোক রচনা করেন :

ভবান ধন্যঃ শ্রীহোরেস উইলসন সরস্বতি।
লক্ষ্মীবাণী চিরদ্বন্দ্বং ভবতৈব নিরাকৃতং॥

"ধন্য তুমি হোরেস উইলসন, সাক্ষাৎ সরস্বতী তুমি। লক্ষ্মী-সরস্বতী তু'য়ে বার মাস শক্রতা বলে জানি, কিন্তু তোমার গুণে তাঁরা একত্রে বসবাস করছেন।"

শ্রীসংস্কৃত কলেজস্য ভিত্তিস্তং শ্রীউইলসন
শ্রীগোপাল নিমাই শম্ভুনাথ শম্ভু চতুষ্টয়ম্॥
গঙ্গাধর যোগধ্যান হরনাথা ইমেঃ ত্রয়ঃ
ছাদাঃ সুনির্ম্মিতা নিত্যং চতুঃ স্তম্ভোপরি স্থিতাঃ॥

"সংস্কৃত কলেজের ভিত্তি উইলসন, তার উপর সর্বক্ষণ চারটি স্তম্ভ বিরাজমান—শ্রীজয়গোপাল (তর্কালঙ্কার), নিমাইচন্দ্র (শিরোমণি), নাথুরাম (শাস্ত্রী) ও শম্ভুচন্দ্র (বাচস্পতি)। এই চার স্তম্ভের উপর তিনটি ছাদের মতন আছেন যোগধ্যান (মিশ্র), হরনাথ (তর্কভূষণ) ও গঙ্গাধর (তর্কবাগীশ)।"

কোম্পানেরখিলক্ষমাতলভূতঃ সম্মানিতো বিশ্রুতঃ
শ্রীযুক্তো জগতীতলে বিজয়তামুইলসনঃ সাহেবঃ।
যস্যানন্তগুণাবলীবিলসিতং প্রেক্ষাবতাং প্রীতিদম্
মন্যে মন্থরতাং ব্রজন্তি ভণিতুং বাচোহপি বাচস্পতেঃ॥

"দৃশ্যমান নিখিল ধরণী যার অধিপতি, সেই ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী সর্বদা উইলসন সাহেবকে সম্মান করেন। তাঁর গুণ অনন্ত, স্বয়ং বৃহস্পতিও বর্ণনা করতে থতমত খেয়ে যান। আমি আর কি বলব!"

উইলসন সাহেব এই শ্লোক রচনায় মুগ্ধ হয়ে প্রেমচন্দ্রকে সাহিত্যশ্রেণীতে অধ্যয়ন করতে বলেন। সেই সময় পণ্ডিত জয়গোপাল তর্কালঙ্কার কাছেই উপস্থিত ছিলেন। 'আগে কোথায় কোন্ অধ্যাপকের কাছে পড়েছ'—জিজ্ঞাসা করাতে প্রেমচন্দ্র চমৎকার উত্তর দেন। গ্রাম্য টোলে তিনি যে অধ্যাপকের কাছে পড়েছিলেন, তাঁর নামও ছিল জয়গোপাল। দুই গোপালের বিষয় বর্ণনা করে তিনি একটি শ্লোক রচনা করেন :

গোপালৌ দ্বৌ জয়ৌ দ্বৌ চ দ্বাবেব তর্কমণ্ডনৌ।
মথুরাধিপ একোহি বৃন্দাবনাধিপোঽপরঃ ॥

"দু'জনেই গোপাল এবং দু'জনেই 'জয়'-যুক্ত। দু'জনকেই 'তর্কমণ্ডন' বলে জানি। একজন গোপাল আমার মথুরায়, অন্য জন বৃন্দাবনে।"

তর্কালঙ্কার মশায় শ্লোক পাঠ করে খুশি হন। পরে একবার ঈশ্বরচন্দ্রকেও তিনি 'গোপালায় নমোঽস্তু মে' এই চতুর্থ চরণ নির্দিষ্ট করে যখন শ্লোক রচনা করতে বলেছিলেন, তখন তিনিও তাঁকে কতকটা এইভাবে দুই গোপালের কথা বলেছিলেন।

১৮৩৫-৩৬ সালে মেকলের প্রস্তাব অনুযায়ী যখন সংস্কৃত কলেজ উঠিয়ে দেবার প্রশ্ন ওঠে, তখন জয়গোপাল তর্কালঙ্কারের মতন প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশও শ্লোক রচনা করে উইলসন সাহেবকে পাঠিয়েছিলেন। জয়গোপালের রচিত শ্লোকের কথা আগে বলেছি। প্রেমচন্দ্রের রচিত শ্লোকটিরও উত্তর পাঠিয়েছিলেন উইলসন সাহেব। তাঁর শ্লোকটি এই—

গোলশ্রীদীর্ঘিকায়া বহুবিটপিতটে কলিকাতানগর্য্যাম্
নিঃসঙ্গো বর্ত্ততে সংস্কৃতপঠনগৃহাখ্যঃ কুরঙ্গঃ কৃশাঙ্গঃ।
হন্তুং তং ভীতচিত্তং বিধৃতখরশরো মেকলে-ব্যাধরাজঃ
সাশ্রু ব্রুতে স ভো ভো উইলসন-মহাভাগ মাং রক্ষ রক্ষ ॥

"কলিকাতা নগরীতে গোলদীঘির বহুবিটপি-শোভিত তটে সংস্কৃতপঠন গৃহ নামে একটি কৃশাঙ্গ কুরঙ্গ নিঃসঙ্গভাবে বর্তমান রয়েছে। সম্প্রতি মেকলে নামে ব্যাধরাজ তীক্ষ্ণশর ধারণ করে, ভীতচিত্ত সেই কুরঙ্গকে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছেন। তাই দেখে সেই কুরঙ্গ সাশ্রু নয়নে বলছে—ভো ভো মহাভাগ উইলসন, আমাকে রক্ষা করুন, রক্ষা করুন।"

এর উত্তরে উইলসন সাহেব একটি শ্লোক লিখে পাঠিয়েছিলেন। তিনি লিখেছিলেন :

নিষ্পিষ্টাপি পরং পদাহতিশতৈঃ শশ্বদ্‌বহুপ্রাণিনাম্
সন্তপ্তাপিকরৈঃ সহস্রকিরণে নাগ্নিস্ফুলিঙ্গোপমৈঃ।
ছাগাদ্যৈশ্চ বিচর্ব্বিতাপি সততং মৃষ্টাপি কুদ্দালকৈ
দূর্ব্বা ন ম্রিয়তে কৃশাপি নিতরাং ধাতুর্দ্দয়া দুর্ব্বলে ॥

"নিরন্তর বহু প্রাণীর পদাঘাতে নিষ্পিষ্ট হয়, সূর্যের অগ্নিস্ফুলিঙ্গসদৃশ কিরণে সন্তপ্ত হয়, সতত ছাগাদি পশু দ্বারা চর্বিত হয়, কোদাল দ্বারা উচ্ছেদিত হয়, তবু কৃশকায় দূর্বা মরে না। কারণ দুর্বলের প্রতি বিধাতার কৃপাদৃষ্টি থাকে।"[৯]

পণ্ডিত জয়গোপাল তর্কালঙ্কার ঈশ্বরচন্দ্রকে সাহিত্যের রসোপলব্ধিতে দীক্ষা দিয়েছিলেন। তাঁর রচনাশক্তির বিকাশেও তিনি কম সাহায্য করেননি। কিন্তু প্রেমচন্দ্রের কাছে ঈশ্বরচন্দ্রকে রীতিমত কঠোর শৃঙ্খলার সঙ্গে রচনাশিক্ষা করতে হয়েছিল। নিজে একজন সুদক্ষ রচয়িতা বলে, তিনি তাঁর যোগ্য ছাত্রদেরও রচনাকুশলী করতে চাইতেন। ছাত্রজীবনে ঈশ্বরচন্দ্র কিছুতেই সংস্কৃত রচনা লিখতে চাইতেন না। তিনি লিখেছেন : 'সংস্কৃত রচনায় প্রবৃত্ত হইতে আমার, কোনও মতে, সাহস হইত না ; এজন্য, ঐ রচনার সময় উপস্থিত হইলে, আমি পলায়ন করিতাম।'[১০]

তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, সংস্কৃত ভাষায় কিছু রচনা করা অত্যন্ত কঠিন, এবং তাঁদের মতন ছাত্রদের সে-ক্ষমতা একেবারে নেই। যাঁরা সংস্কৃত ভাষায় কিছু লিখতেন, তাঁদের সংস্কৃত প্রকৃত সংস্কৃত নয় বলে তাঁর ধারণা ছিল। তাই তিনি কখন সংস্কৃত ভাষায় কিছু রচনা করতে সম্মত হতেন না। অধ্যাপক প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশের আগ্রহের জন্যই তাঁর এই জড়তা ও সঙ্কোচ কেটে যায়। ছাত্রজীবনেই সংস্কৃত রচনার ক্ষেত্রে তিনি আশ্চর্য রচনাশক্তির পরিচয় দেন।

১৮৩৮ সাল থেকে নিয়ম হয় যে, সংস্কৃত কলেজের স্মৃতি, ন্যায় ও বেদান্ত, এই তিন উচ্চশ্রেণীর ছাত্রদের বার্ষিক পরীক্ষার সময়, গদ্যে ও পদ্যে, সংস্কৃত রচনা করতে হবে। যার রচনা সবচেয়ে উৎকৃষ্ট হবে, সে গদ্যরচনার জন্য একশ টাকা এবং পদ্যরচনার জন্য একশ টাকা পুরস্কার পাবে। একদিনেই দু'রকম রচনার পরীক্ষা হবে, বেলা দশটা থেকে একটা পর্যন্ত গদ্যরচনা, একটা থেকে চারটা পর্যন্ত পদ্যরচনা। প্রথম পরীক্ষার দিন, বেলা দশটার সময় ছাত্ররা সকলে পরীক্ষাস্থলে উপস্থিত হয়ে লিখতে আরম্ভ করেন। কেবল ঈশ্বরচন্দ্র আসেননি, তিনি কলেজের অন্য ঘরে চুপ করে বসেছিলেন। প্রেমচন্দ্র জানতেন, ঈশ্বর এরকম করতে পারে। তিনি পরীক্ষার ঘরে তাঁকে খুঁজে না পেয়ে বুঝতে পারলেন, তাঁর ছাত্রটির অনুপস্থিতির কারণ কি। ঈশ্বরচন্দ্র তখন কিন্তু স্মৃতিশ্রেণীর ছাত্র, অলঙ্কারশ্রেণীর ছাত্র ন'ন। প্রেমচন্দ্র তাঁকে এত স্নেহ করতেন যে, তাঁর প্রত্যক্ষ ছাত্র না হওয়া সত্ত্বেও, তিনি ঈশ্বরচন্দ্রকে অনুপস্থিত দেখে তাঁকে খুঁজে বার করেন। ঈশ্বরচন্দ্র কিছুতেই পরীক্ষার ঘরে যেতে চান না। প্রেমচন্দ্রের প্রতিজ্ঞাও টলবার নয়। তিনি কলেজের অধ্যক্ষ মার্শাল সাহেবকে সমস্ত বৃত্তান্ত বলে চ্যাংদোলা করে ঈশ্বরকে নিয়ে গিয়ে পরীক্ষার ঘরে বসিয়ে দেন। রচনা তাঁকে লিখতেই হবে, তর্কবাগীশ মহাশয় নাছোড়বান্দা।

ঈশ্বরচন্দ্র কিঞ্চিৎ বিরক্ত হয়েই বললেন: 'আপনি তো জানেন, সংস্কৃত ভাষায় কিছু রচনা করতে আমার সাহস হয় না, আমি ইচ্ছুকও নই। অতএব, কি জন্যে অনর্থক আপনি আমাকে এখানে এনে বসিয়ে দিলেন ?'

তর্কবাগীশ বললেন: 'যা পার, তাই লেখ। তা না হলে সাহেব খুব অসন্তুষ্ট হবেন।'

সাহেব ন'ন, আসলে অসন্তুষ্ট হবেন তিনি নিজে। ঈশ্বরচন্দ্রের প্রতিভার কথা তিনি জানতেন। তাঁর প্রাণের ইচ্ছা ছিল, ঈশ্বর রচনা লেখে, এবং তাঁর বিশ্বাস ছিল, লিখলেই তার রচনা উৎকৃষ্ট হবে। তাই সাহেবের নাম করে তিনি নিজের ইচ্ছাই ব্যক্ত করলেন।

ঈশ্বরচন্দ্র বললেন: 'সকলে দশটার সময় লিখতে আরম্ভ করেছে। এখন এগারটা বেজেছে। এত অল্প সময়ের মধ্যে কি লিখব বলুন ?'

'তোমার যা ইচ্ছে তাই কর, আমি জানি না কিছু'—বলে ঈশ্বরের তর্কাতর্কিতে বিরক্ত হয়ে প্রেমচন্দ্র ঘর ছেড়ে চলে গেলেন।

গদ্যরচনার বিষয় ছিল, সত্যকথনের মহিমা।

তর্কবাগীশ মহাশয় চলে যাবার পর ঈশ্বরচন্দ্র এক ঘণ্টা চুপ করে বসে রইলেন। বেলা বারোটা বেজে গেল। তিনি কিছুই লিখতে পারলেন না, লেখবার চেষ্টাও করলেন না। কিছুক্ষণ পরে তর্কবাগীশ মহাশয় দেখতে এলেন, তিনি কি করছেন। চুপ করে বিষণ্ণ মুখে তিনি বসে আছেন দেখে, তাঁর রাগ হল। ঈশ্বরচন্দ্র অজুহাত দিয়ে বললেন, কি লিখব কিছুই স্থির করতে পারছি না। প্রেমচন্দ্র বললেন, 'সত্যং হি নাম' এই বলে আরম্ভ কর। ঈশ্বরচন্দ্র তাই দিয়ে আরম্ভ করলেন এবং লিখলেন : *

> সত্যং হি নাম মানবানাং সার্ব্বজনীয়ায়া বিশ্বসনীয়তায়া হেতুঃ। তথাবিধায়াশ্চ বিশ্বসনীয়তায়ারঃ ফলমিহ বহুলমুপলভ্যতে। তথাহি যদি নাম কশ্চিৎ সত্যবাদিতয়া বিনিশ্চিতো ভবতি সর্ব্ব এব নিয়তং তদ্‌বচসি সম্যগ্‌ বিশ্বসন্তি। সত্যবাদী হি সততং সজ্জনসংসদি সাতিশয়ং মাননীয়ঃ সবিশেষং প্রশংসনীয়শ্চ ভবতি।
>
> যো হি মিথ্যাবাদী ভবতি ন কোঽপি কদাচিদপি তস্মিন্‌ বিশ্বসিতি। স খলু নিঃসংশয়ং নিরতিশয়ং নিন্দনীয়ো ভবতি ভবতি চ সর্ব্বত্র সর্ব্বথা সর্ব্বেষাং জনানামবজ্ঞভাজনম্‌।—ইত্যাদি।

মাত্র এক ঘণ্টা সময়ের মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্র রচনাটি লিখেছিলেন। তিনি ভেবেছিলেন, পরীক্ষকরা তাঁর রচনা দেখে নিঃসন্দেহে উপহাস করবেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হল, গদ্যরচনায় তিনিই পুরস্কার পেয়েছিলেন।

পারিতোষিক বিতরণের পর, তর্কবাগীশ মশায় তাঁকে ডেকে বললেন : 'দেখ, তুমি তো কিছুতেই রচনার পরীক্ষা দিতে রাজী হচ্ছিলে না। আমিই তোমাকে পীড়াপীড়ি করে পরীক্ষা দিতে বসিয়েছিলাম। তাতেই তুমি একশ

* সংস্কৃত কলেজের পুরাতন দপ্তরে এই রচনাটির যে পাঠ আছে, তার সঙ্গে 'সংস্কৃত রচনা' পুস্তকে মুদ্রিত এই পাঠের পার্থক্য দেখা যায় [ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় : ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, সাহিত্যসাধক চরিতমালা, ১৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য]।

টাকা পুরস্কার পেলে। তোমার রচনা পড়ে সকলেই খুব খুশি হয়েছেন। এবার থেকে রচনার বিষয়ে আর কোন জড়তা প্রকাশ করো না।'

এই সব কথা শুনে এবং এই ঘটনার পর থেকে, রচনার ব্যাপারে ঈশ্বরচন্দ্রের সব জড়তা কেটে যায়। তিনি খুবই উৎসাহিত হন। দ্বিতীয় বছরে 'বিদ্যার প্রশংসা' ছিল পদ্যরচনার বিষয়। তিনি আটটি শ্লোক 'বিদ্যা' সম্বন্ধে রচনা করে পুরস্কার পেয়েছিলেন। তার দু'টি মাত্র উদ্ধৃত করছি :[১১]

বিদ্যা দদাতি বিনয়ং বিপুলঞ্চ বিত্তং
বিত্তং প্রসাদয়তি জাড্যমপাকরোতি।
সত্যামৃতং বচসি সিঞ্চতি কিঞ্চ বিদ্যা
বিদ্যা নৃণাং সুরতরুর্দ্ধরণীতলস্থঃ ॥

বিদ্যা বিকাশয়তি বুদ্ধিবিবেকবীর্য্যং
বিদ্যা বিদেশগমনে সুহৃদদ্বিতীয়ঃ।
বিদ্যা হি রূপমতুলং প্রথিতং পৃথিব্যাং
বিদ্যা ধনং ন নিধনং ন চ তস্য ভাগঃ ॥

অলঙ্কারশ্রেণীতে ঈশ্বরচন্দ্র মাত্র এক বছর পড়েছিলেন। এক বছরের মধ্যেই গুরুশিষ্যের সম্পর্ক এত মধুর ও গভীর হয়েছিল যে পরবর্তী জীবনে ঈশ্বরচন্দ্রের অধ্যক্ষতাকালেও তা অটুট ছিল। এক বছরের মধ্যে অলঙ্কারশ্রেণীতে ঈশ্বরচন্দ্রকে 'সাহিত্যদর্পণ' 'কাব্যপ্রকাশ' ও 'রসগঙ্গাধর' পড়তে হয়েছিল। 'সাহিত্যদর্পণ' গ্রন্থের রামচরণকৃত টীকা তখনও মুদ্রিত হয়নি। তর্কবাগীশের নিজের একখানি হাতেলেখা পুঁথি ছিল, তাই দেখে তিনি পড়াতেন এবং ছাত্রদের ব্যবহারের জন্য কলেজেই রেখে দিতেন। অধ্যাপনার সময় মধ্যে মধ্যে দেখতেন। ছাত্ররা প্রয়োজন মতন পুঁথির এক-একটি পাতা খুলে বাড়ী নিয়ে যেত। একদিন অধ্যাপনার সময় পুঁথির পাতা মেলাতে গিয়ে তিনি দেখেন যে পাতা মিলছে না। পুঁথির অনেক পাতা নেই। ছাত্ররা যে যার দরকার মতন খুলে নিয়ে গিয়েছে, ঠিক করে আর রেখে দেয়নি। তখন তিনি পুঁথির পাতা কেউ বাড়ী নিয়ে যেতে পারবে না বলে সকলকে নিষেধ করে দেন।

নিষেধাজ্ঞার কয়েকদিন পরে চমৎকার একটি ঘটনা ঘটে। একদিন অপরাহ্ণে

নিয়মিত সময়ের কিছু আগে তর্কবাগীশ কলেজ থেকে কোন কাজে বাইরে চলে যান। সেই সময় ঈশ্বরচন্দ্র সাহিত্যদর্পণের টীকার পুঁথির কয়েকটি পাতা নিয়ে বাসায় যাচ্ছিলেন। তার আগে বেশ এক পশলা বৃষ্টি হয়ে যাওয়ায় পথে কাদা হয়েছিল। ঈশ্বরচন্দ্র পথ চলতে পা পিছলে পড়ে যান এবং তাঁর নিজের কাপড়-চোপড়সহ পুঁথির পাতাগুলিও জলে ভিজে যায়। তাড়াতাড়ি ব্যস্ত হয়ে তিনি এক ভুজোওয়ালার দোকানে উত্তপ্ত চুলার পাশে নিজের ভিজে চাদরখানা বিছিয়ে, তার উপর পুঁথির পাতাগুলো শুকোতে দেন। এমন সময় তর্কবাগীশ মশায় সেই পথ দিয়ে বাড়ী ফিরছিলেন। ঈশ্বরকে এই অবস্থায় দেখতে পেয়ে তিনি কাছে এসে জিজ্ঞাসা করেন :

'এ কি ঈশ্বর ? কি হয়েছে তোমার ?'

ঈশ্বরচন্দ্র তটস্থ। এমন কিছুই হয়নি, কিন্তু তবু তিনি যেন এর জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। অপ্রস্তুত হয়ে তিনি কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে, সমস্ত বৃত্তান্ত বললেন। অনুতাপ প্রকাশ করলেন এই বলে :

'গুরুর আজ্ঞা পালন করিনি বলে এই দুর্ভোগ ভুগতে হল।'

তর্কবাগীশ মশায় নিজের গায়ের চাদরখানি ঈশ্বরকে দিয়ে বললেন : 'ভিজে কাপড়ে রয়েছ। আগে কাপড় বদলাও, তার পর দুঃখ প্রকাশ করো।'

ঈশ্বরচন্দ্র ইতস্তত করছেন দেখে, তিনি একখানি ঘোড়ার গাড়ী ডেকে, তাঁকে সঙ্গে করে নিজের বাসায় নিয়ে গেলেন।

পুঁথির পাতা ঈশ্বরচন্দ্র চুরি করেননি। তিনি ভেবেছিলেন, পাতাগুলি বাড়ী নিয়ে গিয়ে, তাঁর কাজ শেষ করে, আবার ঠিকভাবে যথাস্থানে তিনি পরদিন রেখে দিতে পারবেন, তর্কবাগীশ মশায় টের পাবেন না। কিন্তু হাতে-নাতে যে এইভাবে ধরা পড়বেন, তা তিনি কল্পনাও করতে পারেননি।[১২]

প্রেমচন্দ্রের এই ব্যবহারে ঈশ্বরচন্দ্র তাঁর যে উদার সরল চরিত্রের পরিচয় পেয়েছিলেন, তা জীবনে কোন দিন তিনি ভুলতে পারেননি।

ঈশ্বরচন্দ্র বাল্যকাল থেকে কোনদিনই গোপালের মতন সুবোধ শান্ত বালক ছিলেন না। ছাত্রজীবনেও দুষ্টুমি বুদ্ধি তাঁর সব সময় সজাগ থাকত এবং এদিক থেকে গোপালের চেয়ে রাখালের সঙ্গেই যে তাঁর সাদৃশ্য ছিল বেশি, সেকথা

আগে বলেছি। প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ অধ্যাপনাকালে একজন যোগী পুরুষের সাহচর্যে এসে হঠাৎ যোগসাধন করতে আরম্ভ করেন। তাঁর ছাত্ররা অনেকেই তাঁকে স্বচক্ষে যোগসাধন করতে দেখেছেন। তিনি নাকি আসন থেকে একটু ঊর্ধ্বেও উঠতে পারতেন। গুরুর যোগসাধন দেখে শিষ্যদের অনুকরণ করবার বাসনা হল। অনুকারীদের মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্রও ছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র, শ্রীশ বিদ্যারত্ন ও গিরিশ বিদ্যারত্ন, এই তিন বন্ধু মিলে প্রেমচন্দ্রের যৌগিক ক্রিয়া অনুকরণে প্রবৃত্ত হলেন। প্রতিদিন তাঁরা একসঙ্গে মিলে ঠনঠনে কালীবাড়ী থেকে সংস্কৃত কলেজ পর্যন্ত নিঃশ্বাস বন্ধ করে আসা-যাওয়া অভ্যাস করতে লাগলেন। শোনা যায়, এইভাবে অভ্যাস করতে করতে পরে তাঁরা ছ'মাসে প্রায় পাঁচ মিনিট নিঃশ্বাস বন্ধ করতে পারতেন।[১৩]

শ্রীশচন্দ্র ও গিরিশচন্দ্র উভয়েই ঈশ্বরচন্দ্রের অনুজতুল্য অনুরাগী বন্ধু ছিলেন। সুতরাং গুরুমশায়ের যোগসাধনপ্রণালীর অনুকরণে দম বন্ধ করে কলেজে আসার অভিনব পরিকল্পনা তাঁরই মস্তিষ্কপ্রসূত বলে মনে হয়। তর্কবাগীশ মশায়ের সামনে কোনদিন তিনি বা তাঁর বন্ধুরা অশোভন ব্যবহার কিছু করেননি। উদ্ধত বা অশিষ্ট আচরণ তাঁর প্রকৃতিবিরুদ্ধ ছিল। কিন্তু পরিহাস-প্রিয়তা ও নির্দোষ দুষ্টুমি করা ছিল তাঁর চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। দমবন্ধ করে বন্ধুদের সঙ্গে কলেজে আসা-যাওয়াটা সেই বৈশিষ্ট্যেরই প্রকাশ ছাড়া কিছু নয়। গোপালের মতন সুবোধ বালকেরা গুরুমশায়ের দেখাদেখি যোগাভ্যাস করবার জন্য কখন ঠন্‌ঠনে কালীবাড়ী থেকে গোলদীঘি পর্যন্ত দল বেঁধে দমবন্ধ করে আসা-যাওয়া অভ্যাস করত না।

ছেলেবেলা থেকে কবির দলে গান বেঁধে প্রেমচন্দ্র পদ্য রচনায় বেশ দক্ষ হয়ে উঠেছিলেন। তাঁর কাব্যানুরাগ সারাজীবন অব্যাহত ছিল। দৈনন্দিন জীবনের সমস্যা ও সংগ্রামের ঘাত-প্রতিঘাতে কোনদিন তা ম্লান হয়নি। কলকাতায় আসার পর এই কাব্যপ্রীতির জন্য কবি ঈশ্বরগুপ্তের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব হয়। তিনি গুপ্তকবির সঙ্গে শহরের নানা জায়গায় কবির লড়াই শুনতে যেতেন। সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক হবার পরেও তিনি নিজের বাড়ীতে উৎসব-পার্বণ উপলক্ষে কবির গানের ব্যবস্থা করতেন। সকলে

যখন 'যাত্রা' 'যাত্রা' বলে ক্ষেপে উঠত, তখন তিনি গোপনে লোক পাঠিয়ে বর্ধমান থেকে কবির দল আনিয়ে বাড়ীতে আসর জমাবার ব্যবস্থা করতেন।

রাত্রিতে যখন কবির গান আরম্ভ হত, তখন বাড়ীতে প্রকাশ্য স্থানে তাঁকে কেউ খুঁজে পেত না। একটি নির্জন কোণে তিনি বন্ধুদের নিয়ে চুপ করে বসতেন এবং দুই দলের রচয়িতাদের ডেকে গান রচনার বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করতেন, নিজেও অনেক গান লিখে দিতেন। গান শোনার চেয়ে, গান রচনাতেই তিনি আনন্দ পেতেন বেশি।

মনে হয়, প্রেমচন্দ্রের বাড়ীর উৎসব-পার্বণে ঈশ্বরচন্দ্র এই সব কবিগানের আসরেও সতীর্থদের সঙ্গে যোগ দিতেন। কারণ, কবিগানের প্রতি তাঁর ছেলেবেলা থেকেই বিশেষ অনুরাগ ছিল। ঘাটাল-বীরসিংহ অঞ্চলে, যেখানে তিনি বাল্যকালে মানুষ হয়েছেন, সেখানে সব বিখ্যাত কবির দল ছিল এক-সময়। কলকাতাতেও যখন তিনি লেখাপড়া করতে আসেন, তখন কবি-আখড়াই গানই ছিল শহরের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য আমোদ-প্রমোদের অনুষ্ঠান। এইসব গানের আসরে ঈশ্বরচন্দ্র মধ্যে মধ্যে যেতেন। পণ্ডিতমশায়দের বাড়ীর উৎসব-পার্বণে কলেজের ছাত্রদের এমনিতেই নিমন্ত্রণ হত। যেমন জয়গোপাল তর্কালঙ্কারের বাড়ীর সরস্বতী পূজায় কলেজের ছাত্ররা নিমন্ত্রিত হয়ে গিয়ে আমোদ-আহ্লাদ করত, তেমনি প্রেমচন্দ্রের গৃহের অনুষ্ঠানেও তারা যোগ দিত। গুরুমশায়ের যোগসাধনপ্রণালী অনুকরণ করতে যারা অনুপ্রাণিত হত, তারা যে তাঁর কবিতা ও গান রচনার প্রণালী অনুকরণ করবার চেষ্টা করত না, এমন কথা মনে হয় না।

জয়গোপাল তর্কালঙ্কার মশায় সংস্কৃত কাব্য পড়াতে পড়াতে, কবির বর্ণনা-মাধুর্যে মুগ্ধ হয়ে আহা-আহা করে উঠতেন এবং ভাবের ঘোরে বিভোর হয়ে থাকতেন। সেদিন আর পড়ান হত না। তাঁর ছাত্র এবং ঈশ্বরচন্দ্রের অলঙ্কারশাস্ত্রের অধ্যাপক প্রেমচন্দ্রও এই ধরনের একজন আত্মভোলা ভাবুক ছিলেন। আচার্য কৃষ্ণকমল লিখেছেন :[১৪]

> অধ্যাপনার সময় জয়গোপালের যে ভাবোচ্ছ্বাসের কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি, তাঁহার ছাত্র প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশকেও আমি সময়ে সময়ে তদবস্থ দেখিয়াছি। তিনি কুমারসম্ভবে যখন পড়িতেন—

ত্রিভাগশেষাসু নিশাসু চ ক্ষণং
নিমীল্য নেত্রে সহসা ব্যবুধ্যত।
ক্ব নীলকণ্ঠ ব্রজসীত্যলক্ষ্যবাক
অসত্যকণ্ঠার্পিতবাহুবন্ধনা॥

তখনই আহা, হা করিয়া উঠিতেন, তাঁহার ভাব লাগিয়া যাইত, আমাদেরও সেদিনকার মত পাঠ বন্ধ হইত।

প্রেমচন্দ্র সম্বন্ধে এই কথা বলে কৃষ্ণকমল লিখেছেন :

ঐ ভাবটি আমিও যে উত্তরাধিকার সূত্রে আমার শিক্ষাগুরু প্রেমচাঁদের নিকট হইতে পাই নাই, এমন কথা জোর করিয়া বলিতে পারি না। বায়রণের 'চাইল্ড হ্যারল্ড' পড়িতে পড়িতে অনেক সময় এমন ভাবোন্মত্ত হইতাম যে, আহা, হা, করিয়া বইখানি বন্ধ করিতে হইত।

জয়গোপাল ও প্রেমচন্দ্রের ভাবোন্মত্ততা উত্তরাধিকারসূত্রে অনেক ছাত্রও পেয়েছিলেন এবং পরবর্তী জীবনে অধ্যাপনাকালে তাঁরাও ঐরকম বিভোর হয়ে যেতেন। ঈশ্বরচন্দ্র কেবল উচ্ছ্বাসটুকু ছাড়া আর সবটাই তাঁর এই গুরুদের কাছ থেকে গ্রহণ করেছিলেন। জয়গোপাল ও প্রেমচন্দ্র উভয়েই প্রকৃত সাহিত্যরসিক ছিলেন। উভয়েই সংস্কৃত ও বাংলা রচনায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। রচনার কৌশল ঈশ্বরচন্দ্র তাঁর এই গুরুদের কাছ থেকেই শিক্ষা করেছিলেন। এই দুই ব্রাহ্মণপণ্ডিতের সংযত সৌম্যমূর্তির অন্তরালে একজন ভাবুক কবি বিরাজ করতেন। সেই কবিচিত্তের সংস্পর্শে এসে ঈশ্বরচন্দ্র ছাত্র-জীবনে যথেষ্ট লাভবান হয়েছিলেন।

প্রেমচন্দ্র ৩১ বছর ৯ মাস কাল সংস্কৃত কলেজে অলঙ্কারশাস্ত্রের অধ্যাপনা করেন। যে ঈশ্বরচন্দ্রকে তিনি জোর করে ধরে নিয়ে গিয়ে একদিন পরীক্ষার ঘরে রচনা লিখতে বসিয়ে দিয়েছিলেন, সেই ঈশ্বরচন্দ্র যখন কলেজের অধ্যক্ষ হন, তখনও তিনি অধ্যাপনা করেছেন এবং তার পরেও দীর্ঘকাল কাজ করে ১৮৬৪ সালে অবসর গ্রহণ করেন। ঈশ্বরচন্দ্রের অধ্যক্ষতাকালেও গুরুশিষ্যের মধুর শ্রদ্ধার সম্পর্ক কোনদিন ক্ষুন্ন হয়নি। প্রেমচন্দ্র সম্পর্কে এই সময়কার একটি ছোট্ট কাহিনী উল্লেখ করছি।[১৫]

ঈশ্বরচন্দ্রের বন্ধু গিরিশ বিদ্যারত্নের পুত্র হরিশচন্দ্র কবিরত্নও প্রেমচন্দ্রের ছাত্র ছিলেন। ক্লাসে একবার অলঙ্কারের কোন প্রশ্নের উত্তরে হরিশচন্দ্র লেখেন 'কাশীস্থিতগবাম্।' তর্কবাগীশ মশায় খুব ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁকে তিরস্কার করেন এবং বিদ্যাসাগর মশায়ের কাছে গিয়ে (তখন কলেজের অধ্যক্ষ) অভিযোগ করেন—'ঈশ্বর, তুমি বাপু এই সব ছেলেপিলের মাথা খাচ্ছ। বাংলায় সংস্কৃত ব্যাকরণের উপক্রমণিকা লিখে যে কি সর্বনাশ করেছ, তা বুঝবে না। এরা কিছুই শিখছে না।'

বিদ্যাসাগর মশায় গুরুকে শান্ত করে, হাসতে হাসতে বলেন : 'আর ভাবনা নেই, পণ্ডিত মশাই ! আমি এবার ব্যাকরণকৌমুদী লিখেছি, দেখবেন সব ঠিক হয়ে যাবে।'

প্রেমচন্দ্র 'ছাই হবে' বলে সেদিন চলে গিয়েছিলেন। বিদ্যাসাগর একটুও বিরক্ত হননি। তিনি জানতেন, বিদ্যাশিক্ষার ব্যাপারে সেকালের পণ্ডিত-মশায়দের এই গোঁড়ামিটুকু সহনীয়। আসলে, এটা ঠিক গোঁড়ামিও নয়, শিক্ষাপ্রণালী সম্বন্ধে কঠোরতা।

ব্যাকরণ-অশুদ্ধ কিছু বললে বা লিখলে যে-প্রেমচন্দ্রের মুহূর্তের মধ্যে ধৈর্যচ্যুতি ঘটত, কারও মধ্যে কবিত্বশক্তির আভাস পেলে সেই প্রেমচন্দ্রই আবার আনন্দে আত্মহারা হয়ে যেতেন। হরিশচন্দ্রের জীবনেই তার প্রমাণ আছে। হরিশচন্দ্রের 'কবিরত্ন' উপাধি প্রেমচন্দ্রই খুশি হয়ে দিয়েছিলেন, অথচ হরিশচন্দ্রকে নিয়েই একদিন তিনি বিদ্যাসাগরের কাছে গিয়ে অভিযোগ করেছিলেন। জয়গোপালের মতন প্রেমচন্দ্রও ছাত্রদের 'সমস্যা' পূরণ করতে দিতেন। একবার তিনি 'কথমুদ্যমন্তে' বলে একটি সমস্যা দেন। শনিবারে সমস্যা দিতেন, সোমবারে পূরণ করে এনে দিতে হত। যে শনিবারে তিনি এই সমস্যাটি দেন, সেই শনিবারে সন্ধ্যার সময়, হরিশচন্দ্রের বাসার কাছে একটি বড় লিচুবাগানে (এখন যেখানে মূক ও বধির বিদ্যালয় স্থাপিত) অনেক জোনাকি পোকা উড়ছিল। তাই দেখে হরিশচন্দ্র সমস্যাটি পূরণ করার প্রেরণা পান এবং লেখেন :

খদ্যোত তে দ্যুতিরিয়ং তিমিরে প্রগাঢ়ে,
যদ্দ্যোততে তদপি তে বহুমাননীয়ম্।

মার্ত্তণ্ডচণ্ডকিরণপ্রতিসারণীয়
ঘোরান্ধকারদমনে কথমুত্তমস্তে ॥

হরিশচন্দ্র তখন বারো বছরের বালক। তাঁর এই রচনাটি পাঠ করে প্রেমচন্দ্র এত খুশি হন যে তিনি তাঁকে 'কবিরত্ন' উপাধি দেন। উল্লেখযোগ্য হল, হরিশচন্দ্র সারাজীবন এই কবিরত্ন উপাধিই ব্যবহার করেছেন, সংস্কৃত কলেজের উপাধি বিশেষ ব্যবহার করেননি।

১৮৬৭ সালে প্রেমচন্দ্রের কাশীতে মৃত্যু হয়। হরিশচন্দ্র তাঁর মৃত্যুতে 'বিলাপ-ষট্‌কম' রচনা করেন। তার প্রথম শ্লোকটি হল—

পীতং যস্য সদা মুখাদ্বিগলিতং প্রোন্মীলনং চেতসাং
সানন্দং কবিতামৃতং নবরসোল্লাসৈকসারং পুরা।
পাদা যস্য চ সেবিতা দ্বিজকুলৈরন্তেবসদ্ভির্গতঃ
সোঽয়ং প্রেমসুধানিধির্বিধিবশাদস্তং প্রচেতোদিশি ॥

মুখ-বিগলিত যাঁর কবিতা-অমৃত-ধার
নবরসে পীযূষ-সমান,
চিত্তের উল্লাসকর মনসুখে নিরন্তর
সর্বজনে করিয়াছে পান ;
যাঁর পদ অনুক্ষণ অন্তবাসী দ্বিজগণ
সেবিয়াছে মেলিয়া সকলে,
ওই সেই গুণধর আজি প্রেমসুধাকর
পশ্চিমেতে যান অস্তাচলে ॥ *

প্রেমচন্দ্রের ছাত্রদের মধ্যে অনেকেই সেকালে জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছিলেন। বিদ্যায় ও পাণ্ডিত্যে তাঁদের সমতুল্য ব্যক্তি তখন

* হরিশচন্দ্র কবিরত্ন বলেছিলেন যে, পণ্ডিত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ (বিদ্যাসাগরের বন্ধু, শিবনাথ শাস্ত্রীর মাতুল, প্রেমচন্দ্রের ছাত্র) 'সোমপ্রকাশ' পত্রিকায় ছাপাবার সময় স্বয়ং এই বিলাপ-ষটকের বঙ্গানুবাদ করেন। (রামাক্ষয় চট্টোপাধ্যায় : প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশের জীবনচরিত ও কবিতাবলী, ৫ম সং, পরিশিষ্ট)।

খুব বেশি ছিলেন না। তাঁদের সকলের মধ্যে উজ্জ্বলতম রত্ন ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। তাঁর এই শিক্ষাগুরুর কাছ থেকে তিনি যে শুধু সাহিত্য, অলঙ্কার ও রচনা শিক্ষা করেছিলেন, তা নয়। শিক্ষকের চরিত্রের অনেক মহৎ গুণও তিনি উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছিলেন এবং তাঁর গভীর স্নেহ থেকে তিনি ছাত্রজীবনের পরেও কোনদিন বঞ্চিত হননি।

১৮৩৬ সালের গোড়ার দিকেই ঈশ্বরচন্দ্রের অলঙ্কারপাঠ শেষ হয়ে যায়। বার্ষিক পরীক্ষায় (১৮৩৫-৩৬ সালের) সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করে তিনি রঘুবংশ, সাহিত্যদর্পণ, কাব্যপ্রকাশ, রত্নাবলী, মালতীমাধব, উত্তররামচরিত, মুদ্রারাক্ষস, বিক্রমোর্বশী ও মৃচ্ছকটিক পারিতোষিক পান। ১৮৩৬ সালের মে মাস থেকে ১৮৩৮ সালের প্রথম ভাগ পর্যন্ত, দু'বছর তিনি পণ্ডিত শম্ভুচন্দ্র বাচস্পতির কাছে বেদান্তশ্রেণীতে অধ্যয়ন করেন।

বরিশাল জেলার উজীরপুর গ্রামে শম্ভুচন্দ্রের বাস ছিল। কলকাতায় এসে চতুষ্পাঠী খুলে তিনি অধ্যাপনা আরম্ভ করেন। টালার বাগানে তাঁর নিজের চতুষ্পাঠী ছিল। সংস্কৃত কলেজে নিযুক্ত হবার আগে তিনি প্রায় তিন বছর উইলসন সাহেবের পণ্ডিত ছিলেন। কেবল বেদান্তে নয়, স্মৃতিশাস্ত্রেও তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। বেদান্তশ্রেণীতে ছাত্রের সংখ্যা খুব বেশি ছিল না বলে, তিনি মধ্যে মধ্যে স্মৃতিশাস্ত্রেরও অধ্যাপনা করতেন। ঈশ্বরচন্দ্র প্রায় দু'বছর শম্ভুচন্দ্রের ছাত্র ছিলেন। বেদান্তশ্রেণীর শ্রেষ্ঠ ছাত্র হিসেবে তিনি যে তাঁর বিশেষ স্নেহভাজন ছিলেন, তা বলাই বাহুল্য। শম্ভুচন্দ্রের প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের প্রত্যক্ষ সান্নিধ্যলাভও সৌভাগ্যের কথা। দু'বছর তাঁর কাছে অধ্যয়ন করে ঈশ্বরচন্দ্র বার্ষিক পরীক্ষায় (১৮৩৭-৩৮ সালের) প্রথম স্থান অধিকার করেন এবং মনুসংহিতা, প্রবোধচন্দ্রোদয়, অষ্টাবিংশতিতত্ত্ব, দত্তকচন্দ্রিকা ও দত্তক-মীমাংসা পুরস্কার পান।

১৮৩৮ সালের প্রথম ভাগে তিনি স্মৃতিশ্রেণীতে প্রবেশ করেন। পণ্ডিত হরনাথ তর্কভূষণ তখন স্মৃতিশাস্ত্রের অধ্যাপক। এই শ্রেণীতে তাঁকে মনুসংহিতা, মিতাক্ষরা, দায়ভাগ, দত্তকমীমাংসা ও দত্তকচন্দ্রিকা, দায়তত্ত্ব, দায়ক্রমসংগ্রহ ও ব্যবহারতত্ত্ব পড়তে হয়েছিল। ঈশ্বরচন্দ্র একবছর স্মৃতিশ্রেণীতে অধ্যয়ন

করেন এবং মাসিক বৃত্তিও পান। তাঁর সহোদর শম্ভুচন্দ্র লিখেছেন যে পণ্ডিত হরচন্দ্র তর্কভূষণ দর্শনশাস্ত্রে পারদর্শী ছিলেন বটে, কিন্তু প্রাচীন স্মৃতিশাস্ত্রে তাঁর বিশেষ দৃষ্টি ছিল না। স্মৃতির ব্যবহারাধ্যায়ে তিনি ভালভাবে ব্যবস্থা স্থির করতে পারতেন না। ঈশ্বরচন্দ্র তাই মধ্যে মধ্যে তাঁর তৃপ্তির জন্য, অদ্বিতীয় পণ্ডিত হরচন্দ্র ভট্টাচার্যের কাছে স্মৃতি অধ্যয়ন করতে যেতেন।

স্মৃতিশাস্ত্র অধ্যয়ন করে তিনি হিন্দু ল' কমিটির পরীক্ষা দেবার সঙ্কল্প করেন। এই পরীক্ষায় পাশ করলে তখনকার দিনে আদালতের জজ-পণ্ডিতের চাকরি পাওয়া যেত। ১৮৩৯ সালের এপ্রিল মাসে ঈশ্বরচন্দ্র পরীক্ষা দিয়ে কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হন। এই সময় তাঁকে যে সার্টিফিকেট দেওয়া হয়, তাতে লেখা হয়—

> ...Issuar Chandra Vidyasagur was found and declared to be qualified by his eminent knowledge of the Hindu Law to hold the office of Hindoo Law officer in any of the Established Courts of Judicature.

১৮৩৯ সালের মে মাসের এই প্রশংসাপত্রে দেখা যায়, তাঁর নামের শেষে 'বিদ্যাসাগর' উপাধিটি ব্যবহার করা হয়েছে। সুতরাং ১৮৪১ সালে কলেজের পাঠ শেষ হবার পর, অধ্যাপকরা মিলিত হয়ে তাঁকে 'বিদ্যাসাগর' উপাধি দিয়েছিলেন, এ-ধারণা প্রচলিত হলেও ঠিক নয়। 'বিদ্যাসাগর' উপাধি কলেজের অধ্যয়ন শেষ হবার অনেক আগেই তিনি পেয়েছিলেন। অন্তত ১৮৩৯ সালের মে মাসের আগে পেয়েছিলেন।

১৮৩৯ সালের গোড়ার দিকে ঈশ্বরচন্দ্র ন্যায়শ্রেণীতে প্রবেশ করেন। কাঁচরাপাড়া নিবাসী নৈয়ায়িকশ্রেষ্ঠ প্রসিদ্ধ পণ্ডিত নিমাইচন্দ্র শিরোমণি ন্যায়শাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র কিছুদিন তাঁর কাছে ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করার সুযোগ পান। ১৮৪০ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে শিরোমণির মৃত্যু হয়। তাঁর স্থানে পণ্ডিত সর্বানন্দ ন্যায়বাগীশ কয়েকমাস অধ্যাপনা করেন। অগস্ট মাসে সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন ন্যায়শাস্ত্রের

স্থায়ী অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ন্যায়শ্রেণীর দ্বিতীয় বছরে ঈশ্বরচন্দ্র প্রধানত জয়নারায়ণেরই ছাত্র ছিলেন। জয়নারায়ণের মতন উদারচরিত্র মহাপণ্ডিতের কাছে শাস্ত্রাধ্যয়নের সুযোগ পাওয়াও তখন সৌভাগ্যের কথা ছিল।

কলকাতা শহরের দক্ষিণ-পশ্চিমে বড়িশার (বেহালা-বড়িশা) জমিদার সাবর্ণ চৌধুরীদের পোষকতায় জয়নারায়ণের পণ্ডিতপরিবার দীর্ঘকাল ধরে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁর সম্পাদিত 'শঙ্করবিজয়ঃ' গ্রন্থের মুখবন্ধে বিদ্যাশিক্ষা প্রসঙ্গে জয়নারায়ণ লিখেছেন :

> যেনালঙ্কারশাস্ত্রাণি প্রাপ্তানি রামতোষণাৎ।
> বিদ্যালঙ্কারবিখ্যাতাদাগমগ্রন্থকারকাৎ॥
> কলিকাতানগরাদারাৎ শালিকাগ্রামউত্তমঃ।
> গঙ্গাপশ্চিমকূলস্থস্তত্রাসীদ্ গোতমোপমঃ॥
> তর্কসিদ্ধান্তোপনামা জগন্মোহন নামধৃক্।
> তস্মাদতিসুবিখ্যাতাদধীতং যেন যত্নতঃ॥
> তর্কশাস্ত্রং তত্ত্বচিন্তামণিপ্রভৃতি বিস্তৃতং।
> দীধিতি প্রমুখঞ্চাপি গাদাধর্য্যাদিকন্তথা॥
> যেন গুর্জরদেশীয়ান্নাথুরামাখ্যশাস্ত্রিণঃ
> বেদান্তাদীন্যধীতানি বাগ্‌দেব্যাঃ পৌরুষাকৃতেঃ॥
>
> (১৬-২০ শ্লোক)

আগমগ্রন্থপ্রণেতা রামতোষণ বিদ্যালঙ্কারের কাছে জয়নারায়ণ অলঙ্কারশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। কলকাতা শহরের কাছে, গঙ্গার পশ্চিমকূলে 'শালিকা' নামক গ্রামে প্রসিদ্ধ পণ্ডিত, গোতমসদৃশ স্বভাব জগন্মোহন তর্কসিদ্ধান্ত বাস করতেন। তাঁর কাছে জয়নারায়ণ তর্কশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। গুজরাটদেশীয় প্রসিদ্ধ পণ্ডিত নাথুরাম শাস্ত্রীর কাছে বেদান্ত প্রভৃতি দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। নাথুরাম শাস্ত্রীর কাছে জয়নারায়ণ ও তারানাথ তর্কবাচস্পতি উভয়েই অধ্যয়ন করেছেন। তারানাথ ছাত্রজীবনে খুব চঞ্চলপ্রকৃতির ছিলেন বলে, নাথুরাম তাঁকে বলতেন—'তারা তু পবন এব।'

সালখের সুবিখ্যাত পণ্ডিত (জয়নারায়ণের অধ্যাপক) জগন্মোহন

তর্কসিদ্ধান্তের মৃত্যুর পর জয়নারায়ণ সেখানেই চতুষ্পাঠী স্থাপন করে অধ্যাপনা করতে আরম্ভ করেন। তিনি ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (পরে তাঁর ছাত্র) একই বছরে হিন্দু ল' কমিটির পরীক্ষা দিয়ে উত্তীর্ণ হন (১৮৩৯ সালে)। তারপর ১৮৪০ সালে সংস্কৃত কলেজে তিনি শিরোমণির শূন্যস্থানে ন্যায়ের স্থায়ী অধ্যাপক নিযুক্ত হন। তখন তিনি নারকেলডাঙ্গা অঞ্চলে এসে বাস করতে থাকেন,

যো নারিকেলডাঙ্গাখ্যগ্রামে লোহাধ্বসন্নিধৌ।
নিবসন্ সুধিয়ঃ শিষ্যানধ্যাপয়তি সাম্প্রতং ॥

"যিনি নারিকেলডাঙ্গা গ্রামে লোহাপথের (অথবা লোহাপট্টি) কাছে বাস করছেন এবং সম্প্রতি বুদ্ধিমান ছাত্রদের শাস্ত্র পড়াচ্ছেন।"

জয়নারায়ণের মতন সুমিষ্ট সরলস্বভাব সুপণ্ডিত, শুধু সেকালে বা আমাদের দেশে নয়, সর্বদেশে সর্বকালে বিরল। তাঁর সমান নৈয়ায়িক সে-সময়ে বাংলা-দেশে খুব অল্পই ছিলেন বলা চলে। নব্যন্যায়ের দেশে ন্যায়চর্চা তখন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। দু'-চার জন পণ্ডিত যাঁরা ন্যায়শাস্ত্রের অনুশীলন করতেন, তাঁদের মধ্যে জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের মতন ছিলেন। ন্যায়চর্চা ও নৈয়ায়িকদের ক্রমে এমন শোচনীয় অবনতি হয়েছিল যে তাঁরা চলনসই দু'-একখানি গ্রন্থপাঠ করে, দু'-চারটে চমক-লাগানো ফাঁকি শিক্ষা করে, যত্রতত্র টিকি নেড়ে 'অবেচ্ছদাবচ্ছেদক' করে বেড়াতেন। তাই তাঁরা সাধারণের চক্ষে বিদ্রূপের ও পরিহাসের পাত্র হয়ে উঠেছিলেন। জয়নারায়ণ এই শ্রেণীর পল্লবগ্রাহী পণ্ডিতদের মতন ছিলেন না। ন্যায়শাস্ত্রে তাঁর গভীর পাণ্ডিত্য ছিল। তাঁর মতন একজন প্রকৃত পণ্ডিতের কাছে ঈশ্বরচন্দ্র ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়নের সুযোগ পেয়ে ধন্য হয়েছিলেন।

পাণ্ডিত্যের সঙ্গে ছিল তাঁর চারিত্রিক সরলতা, মৃদুতা ও স্থিরতার আকর্ষণ। অত বড় পণ্ডিত হয়েও তিনি ঠিক শিশুর মতন সরলস্বভাব ছিলেন। নারকেলডাঙ্গায় তাঁর একটি দোতলা কোঠা ও দু'খানি লম্বা খোড়ো ঘর ছিল। কোঠাতে তিনি সপরিবারে বাস করতেন, একটি খোড়ো ঘরে তাঁর চণ্ডীমণ্ডপের কাজ চলত, আর একখানিতে তাঁর ছাত্ররা বাস

করতেন। মহেশ ন্যায়রত্ন তাঁর টোলে পড়তেন। সংস্কৃত কলেজে যে সব ন্যায়ের বই পড়ানো হত, তাঁর টোলে তার চেয়ে অনেক বেশি বই পড়ানো হত। তাঁর সুপরিচিত 'সর্বদর্শন-সংগ্রহ' নামক গ্রন্থের বঙ্গানুবাদের বিজ্ঞাপনে তিনি মহেশ ন্যায়রত্নকে যে সব বই পড়িয়েছিলেন, তার একটি তালিকা দিয়েছেন। তালিকা দেখলে যে-কোন পণ্ডিত অবাক হয়ে যাবেন। অনেক ছাত্র, কলেজ ছাড়াও, তাঁর বাড়ীতে পড়তে যেত। এখন তাঁর নামে 'জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন রোড' আছে, কিন্তু খোড়ো ঘরে সেই চণ্ডীমণ্ডপ বা টোল কিছুই নেই। তার পরে নারকেলডাঙ্গার লোহাপথের অনেক পরিবর্তন হয়ে গিয়েছে।

একবছরের মধ্যেই জয়নারায়ণ মুক্তাবলী সমেত ভাষাপরিচ্ছেদ, গোতমসূত্র ও নৈষধপূর্বভাগ শেষ করে দিতেন। ন্যায়শ্রেণীতে ঈশ্বরচন্দ্র তাঁর কাছে এই সব গ্রন্থ পাঠ করেছিলেন। সাধারণত ক্লাসে পড়াবার সময় তিনি কখনও কোন পুঁথি বা বই স্পর্শ করতেন না। সবই প্রায় তাঁর মুখস্থ ছিল। এরকম স্মৃতিশক্তি সচরাচর দেখা যেত না। পাঠ আরম্ভ করবার আগে ছাত্ররা পূর্বপাঠের শেষটুকু বলে দিত, অথবা নতুন পাঠের গোড়ার লাইন। তার পর আর কিছুই বলবার দরকার হত না। তিনি যেমন স্থূলাকার, তেমনি দীর্ঘাকৃতি পুরুষ ছিলেন। পড়াবার সময় বাঁ-হাতের তেলো মাথার টাকের উপর বুলোতে বুলোতে অনর্গল পাঠ্য আবৃত্তি করতেন। ঈশ্বরচন্দ্র ও অন্যান্য ছাত্ররা হতবাক হয়ে শুনতেন।

কেবল পড়াবার ভঙ্গি নয়, তাঁর চলাফেরা, কথাবার্তা, সবরকম ব্যবহারের একটা স্বতন্ত্র ভঙ্গি ছিল। অন্যান্য পণ্ডিতমশায়রা কাল কাপড়ের ছাতি মাথায় দিয়ে কলেজে আসতেন। তর্কপঞ্চানন মশায় কাপড়ের বিলেতি ছাতি ব্যবহার করতেন না। তাঁর একটি প্রকাণ্ড তালপাতার ছাতি ছিল, সেইটি মাথায় দিয়ে তিনি সংস্কৃত কলেজে আসতেন। ছাতির ঘেরাটোপের পরিধি প্রায় দশ-বারো হাত ছিল এবং দণ্ডটি (বাঁশের) ছিল প্রায় আট-ন' হাত। তিনি নিজ হাতে ছাতি ধরে আসতেন না, আসতে পারতেনও না। একজন ভৃত্য সেই সুবৃহৎ তালপাতার ছাতাটি কাঁধে করে আসত এবং তর্কপঞ্চানন মশায় বিপুল দেহ নিয়ে, একটি লাঠি ঠুকতে ঠুকতে, তার ছায়ায় থপ-থপ করে

চলতেন। এইভাবে নিয়মিত তিনি গোলদীঘির সংস্কৃত কলেজে আসতেন। ছাত্রদের কাছে তাঁর এই গমনাগমন নিশ্চয় খুব উপভোগ্য দৃশ্য ছিল।

তাঁর স্বভাবের মিষ্টতায় ছাত্ররা মন্ত্রমুগ্ধের মতন তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হত। কটু কথা বা রূঢ় কথা তাঁর মুখ দিয়ে বেরুত না। তাঁর সরলতা ও স্নেহাস্কারার জন্য, ছাত্ররা মধ্যে মধ্যে তাঁকে বিরক্ত করতে সাহস পেত, কিন্তু তিনি কখনও তাদের প্রতি বিরক্তি প্রকাশ করতেন না। স্থূলদেহের জন্য শেষদিকে তিনি প্রায় অথর্ব হয়ে পড়েছিলেন। সুতরাং একখানি তৃতীয় শ্রেণীর ছ্যাকরা গাড়ীতে করে তখন কলেজে যাতায়াত করতেন। মধ্যে মধ্যে ছাত্ররা তাঁর গাড়ীর পিছনের চাকা ধরে টানতে থাকত, গাড়ী চলতে পারত না, গাড়োয়ান মহারাগে বকাবকি করত। তর্কপঞ্চানন মশায় সম্পূর্ণ নির্বিকারভাবে গাড়ীর ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে, হাসতে হাসতে বলতেন :

'ও বাবারা, শুনছ বাবারা, শোন না বলি—তোমরা এরকম করে চাকা ধরে টানলে ঘোড়া কেমন করে যাবে বল ?'

ছেলেরা আরও উৎসাহিত হয়ে টানাটানি করত। তর্কপঞ্চানন মশায় চুপ করে শান্তভাবে গাড়ীর মধ্যে উঠে বসে থাকতেন, গাড়ী দাঁড়িয়ে থাকত, ঘোড়াও চলতে পারত না। মধ্যে মধ্যে মুখ বাড়িয়ে, গাড়ীর ভিতর থেকে, অসহায় শিশুর মতন তিনি বলতেন—'ও বাবারা শুনছ, ও বাবারা—'

'বাবারা' কোন কথায় কর্ণপাত করত না। গোলদীঘির পথের উপর ছ্যাকরা গাড়ী দাঁড়িয়ে থাকত। অবশেষে কলেজের অন্য এক দল ছেলে এসে তাঁর গাড়ীটিকে উদ্ধার করে চালু করে দিত। 'লক্ষ্মী বাবারা আমার' বলে তর্কপঞ্চানন মশায় নারকেলডাঙ্গামুখো রওয়ানা হতেন।

চাকা ধরে টানাটানির ব্যাপারে না হলেও, পণ্ডিতমশায়ের ছ্যাকরা গাড়ী উদ্ধারের কাজে ঈশ্বরচন্দ্রকে মধ্যে মধ্যে বোধ হয় যোগ দিতে হত। কারণ বিদ্যালয়ের গোপালদের মতন কোন ব্যাপারেই কখন তিনি উদাসীন বা নিরপেক্ষ থাকা পছন্দ করতেন না।

তালপাতার ছাতি মাথায় দিয়ে যিনি কলকাতা শহরের গোলদীঘি পর্যন্ত প্রত্যহ আসতেন, তিনি যে রীতিমত গোঁড়া পণ্ডিতমশায় ছিলেন, তা বলাই

বাহুল্য। কিন্তু জয়নারায়ণের গোঁড়ামি ছিল চারিত্রিক দৃঢ়তা, নিষ্ঠা ও সংযমের নিদর্শন। মানসিক সঙ্কীর্ণতা-প্রসূত যে গোঁড়ামি, তা তাঁর একেবারেই ছিল না। হিন্দুধর্মে ও হিন্দুশাস্ত্রে তাঁর প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ও শ্রদ্ধা থাকা সত্ত্বেও, তিনি এত উদার ছিলেন যে, ইংরেজী গ্রন্থ থেকে কেউ ভাল ভাল মত বা কথা উদ্ধৃত করে বললে, তিনি অত্যন্ত খুশি হতেন এবং ইংরেজীবিদ্যার প্রতি অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা প্রকাশ করতেন। একবার ন্যায়শ্রেণীতে পড়াবার সময়, 'বায়ুর ভার নেই' এই কথা বলতে, একজন ছাত্র উঠে বলে—'বায়ুর ভার আছে, পণ্ডিত-মশাই!' তিনি কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞাসা করেন—'কেমন করে জানলে বাবা?' ছাত্রটি ইয়োরোপীয় পণ্ডিতদের কথা বলে, যে উপায়ে তাঁরা প্রমাণ করেছেন, বুঝিয়ে দিল। তর্কপঞ্চানন মশায় পাঁচসাত মিনিট চুপ করে বসে রইলেন এবং বাঁ-হাতের তেলোটি টাকের উপর ঘষতে লাগলেন। তার পর খুশি হয়ে বললেন—'ত্যাখো দেখি বাবা, এই উপায়টি না জানার জন্য আমাদের পূর্বপুরুষরা এমন চমৎকার সত্যটি জানতে পারেননি।'

জয়নারায়ণের মতন গুণগ্রাহীও সচরাচর দেখা যেত না। কোন বুদ্ধিমান ও পরিশ্রমী ছাত্র দেখলে, তিনি তার জন্য কি করবেন দিশা পেতেন না। ছাত্রদের সঙ্গে তিনি বন্ধুর মতন ব্যবহার করতেন সব সময়। তাঁর স্বভাবের মধ্যে কোথাও পাণ্ডিত্যের অভিমানের কোন চিহ্নও ছিল না। এমন অনেক দিন হয়েছে, তিনি নিজের লেখা কবিতা ছাত্রদের দেখতে দিয়ে বলেছেন—'বাবারা, তোমরা একবার পড়ে দেখে, কেটে-কুটে ঠিক করে দাও দেখি। এসব তোমরা আমাদের চেয়ে বোঝ ভাল।'[১৬]

একালের আধুনিক 'পণ্ডিতদের' মধ্যেও এরকম নিরভিমান প্রকৃত পণ্ডিত অত্যন্ত বিরল।

পণ্ডিত জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চাননকে আচার্য কৃষ্ণকমল তাঁর 'পুরাতন প্রসঙ্গে'র মধ্যে '**Epicurean**' পর্যন্ত বলতে কুণ্ঠিত হননি। তিনি লিখেছেন:

> পণ্ডিত জয়নারায়ণ সম্পূর্ণ Epicurean ছিলেন। কেশব সেনকে লক্ষ্য করিয়া তিনি বলিতেন—'কেশব কেন ঈশ্বর ঈশ্বর করে বেড়ায়?

ওসব এদেশে ঢের হয়ে গেছে। যদি বিলাতি কলকব্জা এখানে করাবার চেষ্টা করে, তা হোলে উপকার হতে পারে।'

কেশব সেন হয়ত পণ্ডিত জয়নারায়ণের মন্তব্য শোনেননি। আর কোন ছাত্র তাঁর এই কথার মর্ম সেদিন, অথবা পরবর্তীকালে বুঝেছিলেন কি না, জানি না। জয়নারায়ণের একজন ছাত্র অন্তত গুরুর এই কথার সারমর্ম বুঝেছিলেন—'কেশব, কেন ঈশ্বর ঈশ্বর করে বেড়ায়? ওসব এদেশে ঢের হয়ে গেছে।' তিনি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

ঈশ্বরচন্দ্র কেন তাঁর সমসাময়িক আরও অনেক খ্যাতনামা ব্যক্তিদের মতন 'ঈশ্বর ঈশ্বর' করে বেড়াননি, তার উত্তর তিনি নিজে কখন দেবার প্রয়োজন-বোধ না করলেও, তাঁর পরমপূজনীয় গুরু জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন তার উত্তর দিয়ে গিয়েছেন। বিদ্যাসাগর তাঁর ছাত্র ছিলেন বলে তিনি গর্ববোধ করতেন এবং 'শঙ্করবিজয়ঃ' গ্রন্থের ভূমিকায় সেকথা সানন্দে তাই তিনি উল্লেখ করেছেন:

শ্রীযুক্তেশ্বরচন্দ্রাখ্যো বিদ্যাসাগরসঙ্গিতঃ।
যস্মান্ন্যায়াদিশাস্ত্রাণি বিখ্যাতোঽধীতবান্॥ (২২ শ্লোক)

'সেই জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন মহাশয়ের কাছে বিখ্যাত শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ন্যায়াদিশাস্ত্র অধ্যয়ন করেছিলেন।'

যেমন গুরু, তেমনি তাঁর শিষ্য। উভয়েই গর্ব করার মতন মানুষ ছিলেন। এরকম একজন 'এপিকিউরিয়ান', সংস্কারমুক্ত নৈয়ায়িক ব্রাহ্মণপণ্ডিতের ছাত্রদের মধ্যে অন্তত একজন যে বাংলাদেশের বিদ্যাসাগর হবেন, তাতে আর বিস্ময়ের কি আছে!

১৮৪১ সালেও ঈশ্বরচন্দ্র ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করেছিলেন, জয়নারায়ণের কাছে। মধ্যে কিছুদিন জ্যোতিষশ্রেণীতে হয়ত তিনি পণ্ডিত যোগাধ্যান মিশ্রের কাছে অধ্যয়ন করেছিলেন। কারণ তাঁর প্রশংসাপত্রে জ্যোতিষের অধ্যাপকেরও স্বাক্ষর দেখা যায়।

বারো বছর পাঁচ মাস অধ্যয়নের পর ঈশ্বরচন্দ্র ১৮৪১ সালের ৪ ডিসেম্বর

তারিখে সংস্কৃত কলেজের প্রশংসাপত্র পান। কলেজের অধ্যাপকরা সকলে মিলে দেবনাগর অক্ষরে লিখে তাঁকে একটি স্বতন্ত্র প্রশংসাপত্র দেন। পত্রখানি এই :

> অস্মাভিঃ শ্রীঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরায় প্রশংসাপত্রং দীয়তে। অসৌ কলিকাতায়াং শ্রীযুত কোম্পানিসংস্থাপিতবিদ্যামন্দিরে ১২ দ্বাদশ বৎসরান্ ৫ পঞ্চ মাসাংশ্চোপস্থায়াধোলিখিতশাস্ত্রাণ্যধীতবান।

১৮৪১ সালে ঈশ্বরচন্দ্রের ছাত্রজীবনের অধ্যয়নের কাজ শেষ হয়ে যায়। সামনে বিশাল কর্মময় জীবন-সমুদ্রের আহ্বান। গোলদীঘির কোম্পানী-সংস্থাপিত বিদ্যামন্দিরের বাইরের বৃহত্তর সমাজ তখন প্রবল ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ সমুদ্রের মতন তর্জন-গর্জন করে কিছুটা ক্লান্ত ও শান্ত হয়েছে।

এ-শান্তি সাময়িক। রণাঙ্গনের ক্ষণস্থায়ী বিরতির মতন অস্বস্তিকর। বিরতিটুকু যেন ঈশ্বরচন্দ্রের আবির্ভাব প্রত্যাশা করে বিরাজমান। প্রচণ্ড কলরবের পর, ১৮৪২ সালে যেন থমথম করছিল বাংলার সামাজিক পরিবেশ, আরও প্রচণ্ড কোলাহলের প্রতীক্ষায়। এমন সময় বিদ্যাসাগর গোলদীঘির বিদ্যামন্দির ছেড়ে বাইরের সমাজে কর্মক্ষেত্রে এলেন।

১০ | ছাত্রজীবনের সমাজচিত্র ১৮২৯-১৮৪১

দীর্ঘ বারো বছর পাঁচ মাস-কাল গোলদীঘির সংস্কৃত বিদ্যালয়ে বন্দী হয়ে ছিলেন বিদ্যাসাগর। নির্বাসিতের মতন জীবন কাটিয়েছিলেন বলা চলে। ছাত্রজীবনের একমাত্র তপস্যা হল অধ্যয়ন। আশ্রম ও তপোবনের মতন নিস্তব্ধ, নিস্তরঙ্গ সামাজিক জীবন ছিল যখন, তখন ধ্যানমগ্ন তপস্বীর আদর্শ অনুসরণ করাই ছিল ছাত্রদের শ্রেষ্ঠ কর্তব্য। গুরুগৃহের সমাজবিচ্ছিন্ন নির্জন পরিবেশে এ-কর্তব্য পালন করা আদৌ কঠিন ছিল না। কিন্তু গুরুগৃহ থেকে গোলদীঘি পর্যন্ত অনেক যুগের পথ এগিয়ে গেছে সমাজ। পরিবেশেরও অনেক পরিবর্তন হয়েছে। নিস্তরঙ্গ জীবনে তরঙ্গের সঞ্চার হয়েছে। নতুন যুগের কলকল্লোলে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে অসাড় মানুষ।

গোলদীঘির বিদ্যালয়গৃহে আর বন্দী হয়ে থাকা সম্ভব নয়। ছাত্র বা শিক্ষক কারও পক্ষে আর নির্ঝঞ্ঝাটে বসে জ্ঞানবিদ্যার তপস্যা করাও সম্ভব নয়। গোলদীঘির পরিপার্শ্ব তপস্যার প্রতিকূল। তবু অধিকাংশ ছাত্রের কাছে অধ্যয়ন তখন তপস্যার মতনই ছিল। তা সত্ত্বেও, ১৮২৯ থেকে ১৮৪১ সালের মধ্যে, নবযুগের আদর্শসংঘাতে, কলকাতার জনসমাজে এমন প্রবল আলোড়ন ও তরঙ্গবিক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছিল যে, সংস্কৃত বিদ্যালয় তো দূরের কথা, শহরের টোল-চতুষ্পাঠী-গুরুগৃহও তার ঘাত-প্রতিঘাত থেকে আত্মরক্ষা করতে পারেনি।

১৮২৯ থেকে ১৮৪১ সাল পর্যন্ত ঈশ্বরচন্দ্রের ছাত্রজীবনকে নিঃসন্দেহে আধুনিক বাংলার ঐতিহাসিক যুগসন্ধিক্ষণ বলা যায়। এই বারো বছরে ঈশ্বরচন্দ্র বাল্যকাল থেকে কৈশোর উত্তীর্ণ হয়ে, যৌবনে পদার্পণ করেছেন। আট-নয় বছর বয়সের বালক থেকে তিনি একুশ-বাইশ বছরের যুবক হয়েছেন। তাঁর কৈশোর-যৌবনের এই অভিষেককালেই নব্যবঙ্গের ঐতিহাসিক অভিষেক হয়েছে। দৃষ্টির অন্তরালে হয়নি, সামনে হয়েছে।

দিনের পর দিন ঈশ্বরচন্দ্র এই সময় দেখেছেন, প্রাচীন ও নবীনের সংঘাত-মুখর সামাজিক আন্দোলনের উত্থান-পতন। গোলদীঘির বিদ্যামন্দিরের প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে দেখেছেন। গোলদীঘি থেকে দয়েহাটায় যাতায়াতের পথে দেখেছেন। দূর থেকে দেখেননি, খুব কাছাকাছি থেকে দেখেছেন। কারণ যে সংস্কৃত কলেজে তিনি অধ্যয়ন করতেন, যেখানে তাঁর ছাত্রজীবনের বারো বছরের অধিকাংশ সময় কেটেছে, সেই সংস্কৃত কলেজের সংলগ্ন গৃহেই ছিল হিন্দু-কলেজ। একই পথ ও প্রাঙ্গণ দিয়ে উভয় বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ছাত্রদের যাতায়াত করতে হত:

> ...the buildings attached to the Hindoo College are occupied as follows :—The centre upper roomed house by the Sanscrit College. The two wings lower roomed houses by the Hindoo College.

হিন্দু-কলেজ ছিল ঝটিকাকেন্দ্র। দু'দিকের ঝড়ের ঝাপটা থেকে সংস্কৃত কলেজের পক্ষে পরম নিশ্চিন্তে নিরপেক্ষতার নীড়ে ডানা গুটিয়ে বসে থাকা সম্ভব ছিল না।

ঝড় ওঠে ঈশ্বরচন্দ্রের ছাত্রজীবনে। প্রবল ঝড়। রক্ষণশীল বাংলার সমাজের ভিত পর্যন্ত কেঁপে ওঠে। বয়ঃসন্ধিকালে বিদ্যাসাগর বাংলার যুগসন্ধি-ক্ষণের ঘূর্ণিবাত্যার এই প্রচণ্ড দাপট স্বচক্ষে দেখবার সুযোগ পান।

তাঁর কর্মজীবনের দুর্গম পথটি ছাত্রজীবনেই তিনি মনে-মনে রচনা করেন। রচনা করা কঠিন। কিন্তু মোটামুটি একটি পরিকল্পনা খসড়া করা অসম্ভব নয়।

রক্ষণশীল ও প্রগতিশীল, দুই দলের উচ্ছ্বাস-আবেগ, উত্তাপ-উদ্‌গিরণ দেখে তিনি স্থিরচিত্তে সত্যকার উদারতার প্রশস্ত রাজপথটি বেছে নিয়েছিলেন।

সংস্কৃত কলেজ ও হিন্দু কলেজ একই প্রাঙ্গণে ও পরিবেশে অবস্থিত হলেও, দুই বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ছাত্রদের মধ্যে সামাজিক স্তরভেদ ও দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য ছিল যথেষ্ট। সংস্কৃত কলেজে কেবল দরিদ্র ব্রাহ্মণ-বৈদ্যের সন্তানরা পড়ত যে তা নয়, সঙ্গতিপন্ন মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলেরাও পড়ত। কিন্তু তাদের সংখ্যা খুব অল্প। হিন্দু কলেজে পড়ত ধনিক বাঙালী রাজামহারাজের বংশধররা, নতুন বেনিয়ান ও বণিক ব্যবসায়ীদের দুলালরা। সেখানে জাতিভেদ ছিল না এবং কুলকৌলীন্যের মানদণ্ড দিয়ে বিদ্যালয়ের শিক্ষাধিকার স্বীকৃত হত না।

দুই বিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্যে স্বভাবতঃই তাই চালচলনে, কথাবার্তায়, আলাপ-আলোচনায় পার্থক্য ও বিরোধ ফুটে উঠত। মধ্যে মধ্যে সেই বিরোধ উভয় বিদ্যালয়ের ছাত্রদের মনোমালিন্যে, এমন কি মারামারির মধ্যেও প্রকাশ পেত।

কেবল ছাত্রদের মধ্যে নয়, দুই বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মধ্যেও কোন সামাজিক বা প্রীতির সম্পর্ক ছিল বলে মনে হয় না। সংস্কৃত কলেজের পণ্ডিতমশায়রা হিন্দু কলেজের পাশ্চাত্ত্যভাবাপন্ন শিক্ষকদের বিশেষ সুনজরে দেখতেন না। আর হিন্দু কলেজের শিক্ষকরা যে সংস্কৃত কলেজের পণ্ডিতদের সম্বন্ধে বিশেষ উচ্চধারণা পোষণ করতেন না, তা বলাই বাহুল্য। আধুনিক ইংরেজী শিক্ষার অহঙ্কারে মনে-মনে হয়ত তাঁরা পণ্ডিতমশায়দের সম্পর্কে একটা তাচ্ছিল্যের ভাব পোষণ করতেন।

সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদের জ্ঞানবিদ্যা সম্বন্ধে হিন্দু কলেজের শিক্ষকদের কি রকম ধারণা ছিল, সে সম্পর্কে একটি কাহিনী উদ্ধৃত করছি। কাহিনীটি ভূদেব মুখোপাধ্যায় একখানি চিঠিতে তাঁর ছাত্রজীবনের ঘটনাবলী বর্ণনাপ্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন। ভূদেববাবু প্রথমে সংস্কৃত কলেজের ছাত্র ছিলেন। তিনি ঈশ্বরচন্দ্রের চেয়ে বয়সে প্রায় পাঁচ বছরের ছোট। সংস্কৃত কলেজ ছেড়ে প্রায় তিন বছর তিনি তিনটি স্কুলে কিছু-কিছু ইংরেজী শিক্ষা করেন। অবশেষে চোদ্দ বছর বয়সে হিন্দু কলেজের অষ্টম শ্রেণীতে ভর্তি হন। ঈশ্বরচন্দ্র তখন সংস্কৃত কলেজে ন্যায়শ্রেণীর ছাত্র। মাইকেল মধুসূদন দত্ত হিন্দু কলেজে

ভূদেববাবুর সহপাঠী ছিলেন। ১৮৩৯ সালের কথা। এই সময়কার একটি ঘটনা সম্পর্কে ভূদেববাবু লিখেছেন : [২]

রামচন্দ্র মিত্র নামক জনৈক শিক্ষক আমাদিগকে পড়াইতেন। আমি যেদিন প্রথম ভর্ত্তি হইলাম, সেই দিন রামচন্দ্রবাবু পৃথিবীর গোলত্বের বিষয় আমাদিগকে বুঝাইয়া দেন। ইংরাজীওয়ালা মাত্রেই, বিশেষতঃ ইংরাজী শিক্ষকেরা, ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও স্বদেশীয় শাস্ত্রের প্রতি শ্লেষ বাক্য প্রয়োগ করিতে বড়ই ভালবাসেন। আমার পিতা যে একজন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ছিলেন, রামচন্দ্রবাবু তাহা জানিতেন এবং সেই কারণেই পড়াইতে পড়াইতে আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন—'পৃথিবীর আকার কমলা লেবুর মত গোল। কিন্তু ভূদেব, তোমার বাবা একথা স্বীকার করিবেন না।' আমি কোন কথা কহিলাম না, চুপ করিয়া রহিলাম। স্কুলের ছুটির পর বাড়ী আসিলাম। কাপড়চোপড় ছাড়িতে দেরি সহিল না, একেবারে বাবার কাছে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—'বাবা, পৃথিবীর আকার কি রকম?' তিনি বলিলেন, 'কেন বাবা, পৃথিবীর আকার গোল।' এই কথা বলিয়াই আমাকে একখানি পুথি দেখাইয়া দিলেন, বলিলেন, 'ঐ গোলাধ্যায় পুথিখানির অমুক স্থানটি দেখ দেখি।' আমি সেই স্থানটি বাহির করিয়া দেখিলাম তথায় লেখা রহিয়াছে :

'করতল কলিতামলকবদমলং বিদন্তি যে গোলং'।

বচনটি পাঠ করিয়া মনে একটু বলের সঞ্চার হইল। একখানি কাগজে ঐটি টুকিয়া লইলাম। পরদিন স্কুলে আসিয়া রামচন্দ্রবাবুকে বলিলাম, 'আপনি বলিয়াছিলেন, আমার বাবা পৃথিবীর গোলত্ব স্বীকার করিবেন না। কেন, বাবা ত পৃথিবী গোলই বলিয়াছেন, এই দেখুন তিনি বরং এই শ্লোকটি আমাকে পুথির মধ্যে দেখাইয়া দিয়াছেন।' রামচন্দ্রবাবু সমস্ত দেখিয়া ও শুনিয়া বলিলেন, 'কথাটা বলায় আমার একটু দোষ হইয়াছিল; তা তোমার বাবা বলবেন বৈ কি। তবে অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত এ বিষয়ে অনভিজ্ঞ।'

রামচন্দ্রবাবুর স্বীকারোক্তির মধ্যেও ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের প্রতি অবজ্ঞার ভাব প্রকাশ পেয়েছে। ইংরেজী বিদ্যালয়ের নব্যশিক্ষিত শিক্ষকদের ধারণা ছিল যে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতরা কোন বিদ্যাতেই তাঁদের সমকক্ষ নন, সংস্কৃত ছাড়া যাঁরা ইংরেজী জানেন না, তাঁরা প্রকৃত বিদ্বান ন'ন। অনেকের মনেই তখন এই মনোভাব প্রবল হয়ে উঠেছিল।

ভূদেববাবুর পিতার উত্তর শুনে রামচন্দ্রবাবু লজ্জিত হলেও তিনি পণ্ডিতদের সম্বন্ধে তাঁর ধারণা পরিবর্তন করেননি। ক্লাসের মধ্যে যখন শিক্ষক রামচন্দ্র-বাবুর সঙ্গে ছাত্র ভূদেবের কথাবার্তা হচ্ছিল, তখন আর একজন ছাত্র একদৃষ্টে ভূদেবের দিকে চেয়ে ছিলেন। ছুটির পর সেই ছাত্রটি সোজা ভূদেবের কাছে এসে 'সেকহ্যাণ্ড' করে জিজ্ঞাসা করেন, 'ভাই তোমার নাম কি? তোমার বাড়ী কোথায়?' ছাত্রটির নাম (মাইকেল) মধুসূদন দত্ত। মধুসূদনের সঙ্গে ভূদেবের এই প্রথম পরিচয়।

আরও একজন ছাত্র যদি ঐ ক্লাসে উপস্থিত থাকতেন, তাহলে নিশ্চয় ভূদেবের সৎসাহসের তারিফ করতেন মুক্তকণ্ঠে। কিন্তু তিনি তখন হিন্দু কলেজের সংলগ্ন গৃহে পণ্ডিত জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চাননের কাছে ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করছেন। তাঁর নাম ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের প্রতি অন্ধ ভক্তি তাঁর ছিল না যেমন, ইংরেজীনবীশদের প্রতিও তেমনি কোন অন্ধ অনুরাগ ছিল না। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের গোঁড়ামি, অথবা প্রগতির নামে ইংরেজীবিদদের অত্যুগ্র আধুনিকতা, কোনটাই তিনি অনুমোদন করতেন না।

ছাত্রজীবনে তিনি দীর্ঘ বারো বছর ধরে, রক্ষণশীল ও প্রগতিশীল দলের আন্দোলনের মধ্যে, ইংরেজী শিক্ষার পদ্ধতি ও ধারার মধ্যে, একদিকে এই অন্ধ গোঁড়ামি, আর একদিকে প্রগতির নামে অবাধ উচ্ছৃঙ্খলতার তাণ্ডব দেখেছিলেন। তাই দুই পথের কোনটিই তিনি কর্মজীবনে চলার জন্য বেছে নেননি।

ঈশ্বরচন্দ্র সংস্কৃত কলেজে ভর্তি হন ১৮২৯ সালের জুন মাসে। ছ'মাসের মধ্যে, ১৮২৯ সালের ডিসেম্বরে, বেণ্টিঙ্ক সতীদাহ ও সহমরণপ্রথা অবৈধ বলে ঘোষণা করেন।

ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে রক্ষণশীল হিন্দুসমাজের সম্মিলিত প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়, রব ওঠে যে বিধর্মীরা এদেশী ধর্মাচরণে হস্তক্ষেপ করছেন। আইন পাশ করে এইভাবে প্রচলিত ধর্মকর্ম ও প্রথা রহিত করবার কোন অধিকার বিধর্মী বিদেশীদের নেই। এই আইনের বিরুদ্ধে আন্দোলন করার জন্য ১৮৩০ সালের ১৭ জানুয়ারী 'ধর্মসভা' স্থাপিত হয়। ১৪ জানুয়ারী বড়লাটের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে দু'টি আবেদনপত্র পেশ করা হয়। সাক্ষাৎকারীদের মধ্যে পণ্ডিত নিমাইচরণ শিরোমণি, হরনাথ তর্কভূষণ, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, গোপী-মোহন দেব, রাধাকান্ত দেব, মহারাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুর, নীলমণি দে, ভবানীচরণ মিত্র, গোকুলনাথ মল্লিক ও রামগোপাল মল্লিকের নাম উল্লেখ-যোগ্য। দুটি আবেদনপত্রের মধ্যে একটিতে কলকাতার ৬২৫ জন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি এবং ১২০ জন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত স্বাক্ষর করেন। দ্বিতীয় পত্রটিতে কলকাতার পাশাপাশি গ্রামাঞ্চলের ৩৪৬ জন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি এবং ২৮ জন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের স্বাক্ষর দেওয়া হয়। আবেদনপত্র দু'টি অগ্রাহ্য করেন বড়লাট সাহেব। তার তিন দিন পরে, ১৭ জানুয়ারী ধর্মসভা স্থাপিত হয়।[৩] ১৭ এপ্রিল তারিখে, বটতলার গলিতে কাশীনাথ মল্লিকের বাড়ীতে ধর্মসভার যে বৈঠক হয়, তাতে দেখা যায় যে, কলকাতার পণ্ডিতদের মধ্যে হরনাথ তর্কভূষণ, নীলমণি ন্যায়ালঙ্কার, জয়গোপাল তর্কালঙ্কার, রামজয় তর্কালঙ্কার, শম্ভুচন্দ্র বাচস্পতি, নিমাইচাঁদ শিরোমণি, জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন, নাথুরাম শাস্ত্রী প্রমুখ পণ্ডিতেরা সভার অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন।[৪]

এই পণ্ডিতদের মধ্যে অনেকেই সংস্কৃত কলেজে অধ্যাপনা করতেন এবং ঈশ্বরচন্দ্রের শিক্ষক ছিলেন।

সমস্যার ঘাত-প্রতিঘাতে বাইরের সামাজিক জীবন যখন আলোড়িত হয়ে ওঠে, তখন দেবগৃহে বন্দী পাষাণ দেবতাও চঞ্চল হয়ে ওঠেন। গোঁড়া ব্রাহ্মণ পণ্ডিতরাও তাই তাঁদের টোল-চতুষ্পাঠী ও বিদ্যামন্দিরে গা-ঢাকা দিয়ে আত্মরক্ষা করতে পারেননি। সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপকরা প্রকাশ্যভাবে সামাজিক আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন।

নবযুগের এই সামাজিক আন্দোলনের ঐতিহাসিক বৈশিষ্ট্য হল, সভাসমিতি স্থাপন করে সম্মিলিতভাবে আলাপ-আলোচনা ও বাদ-প্রতিবাদ করা। এ

ডিরোজিও

জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন

বৈশিষ্ট্য পূর্বের সমাজ-জীবনে কোন কালে ছিল না। পূর্বে পণ্ডিতমশায়রা রাজা-রাজড়াদের, অথবা উপদেশপ্রার্থীদের কোন বিষয়ে মতামত দিতেন, বিচার করে বলে দিতেন, কোন্‌টা শাস্ত্রসম্মত, কোন্‌টা নয়। সকলে মিলে 'ধর্মসভা' বা অন্য কোন সভা স্থাপন করে মতামত ব্যক্ত করার কোন রীতি বা অধিকার আগে ছিল না।

ব্রাহ্মণ পণ্ডিতরাও ধর্মসভায় যোগ দিয়েছিলেন, স্বাধিকার সম্বন্ধে সচেতন হয়ে। এই স্বাধিকারবোধ সম্বন্ধে সংস্কৃত কলেজের পণ্ডিতরাও বিশেষভাবে সজাগ ছিলেন। বাইরের সমাজ-জীবনের সমস্যাকে তাঁরা বিদ্যামন্দিরের সীমানা থেকে দূরে ঠেলে দেননি। অধ্যাপকের কর্তব্য করেও, তাঁরা সামাজিক জীবের কর্তব্য পালনে ত্রুটী করেননি। নিজেদের বিশ্বাস ও স্বাধীন মতামত নিয়ে তাঁরা প্রকাশ্যে সেদিনকার সামাজিক সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলেন। সরকারীভাবে বেআইনী বলে যা ঘোষিত হয়েছে, তার বিরুদ্ধে তাঁরা নির্ভয়ে প্রতিবাদ করেছেন।

ঈশ্বরচন্দ্র সর্বপ্রথম এই চারিত্রিক নির্ভীকতা শিক্ষা করেছেন তাঁর শিক্ষকদের কাছ থেকে। দশ-এগারো বছরের বালক যখন তিনি, সতীদাহ ও সহমরণপ্রথা নিয়ে তখন সরকারী আইনের বিরুদ্ধে তুমুল আন্দোলন আরম্ভ হয়। ব্যাকরণশ্রেণীতে তখন তিনি পড়ছেন। বয়স ও বিদ্যা, কোনদিক থেকেই তার বিরুদ্ধে বা সপক্ষে মতামত গঠন করবার মতন সময় তখনও হয়নি। তবু, বাইরের এই প্রবল আন্দোলনের ঘাত-প্রতিঘাতে তাঁর কিশোরচিত্তে কোন তরঙ্গেরই সৃষ্টি হয়নি, এমন কথা বলা যায় না। বিশেষ করে, সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপকরাই যখন প্রত্যক্ষভাবে সেই আন্দোলনে যোগদান করেছিলেন তখন তাঁদের প্রিয় ছাত্র যে কেবল গৃহবন্দী হয়ে পুঁথিপাঠ করেছিলেন, তা মনে হয় না।

বাইরের আন্দোলন ক্রমেই ঘোরাল ও জোরাল হয়ে ওঠে। নতুন নতুন সমস্যার আঘাতে আরও প্রবল ঘূর্ণির সৃষ্টি হতে থাকে। সহমরণের পক্ষে ও বিপক্ষের আন্দোলন সমাজ-জীবনের অন্যান্য স্তরে ও ক্ষেত্রে ছড়িয়ে পড়ে।

যেমন সব আন্দোলনের সময় হয়, মোটামুটি দুটি দলে বিভক্ত হয়ে যায়

সমাজ। ধর্মসংস্কার ও সমাজসংস্কারের পক্ষে, প্রগতিশীল ভাবধারার সমর্থকদের অপ্রতিদ্বন্দ্বী নেতা ছিলেন তখন রামমোহন রায়। বিপক্ষে রক্ষণশীল দলের নেতা ছিলেন শোভাবাজারের রাজবাড়ীর গোপীমোহন ও রাধাকান্ত দেব। বিপক্ষদল ইংরেজী শিক্ষা বা স্ত্রীশিক্ষার সমর্থন করলেও, তার মধ্যে ব্যাপক সংস্কারের মনোভাব প্রবল ছিল না। নতুন ইংরেজ রাজাদের কাছে ইংরেজী শিক্ষা ভিন্ন তখন পদমর্যাদা লাভ করা এবং তাঁদের অধীনে চাকুরী পাওয়া সম্ভব হত না। সেই কারণেও রক্ষণশীলদের মধ্যে ইংরেজী শিক্ষার আগ্রহ অনেক ক্ষেত্রে প্রগতিশীলদের তুলনায় বেশি দেখা যেত। সুতরাং এই আগ্রহ দিয়ে সেই সময়কার সামাজিক মতামতের বা দৃষ্টিভঙ্গির বিচার করা সমীচীন নয়।

একদিকে রামমোহন রায়ের দল, আর একদিকে রাধাকান্ত দেবের দল—কলকাতার সমাজ তখন এই দুটি প্রধান দলে বিভক্ত ছিল। দুই দলেই নতুন যুগের বাঙালী ধনিক ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা নেতৃত্ব করতেন। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতরাও দুই দলের সঙ্গেই যুক্ত ছিলেন। তাঁরা সকলেই যে রক্ষণশীলতার সমর্থক ছিলেন তা নয়, অনেকে প্রগতিশীল মতবাদও পোষণ করতেন।

রামমোহন রায় আত্মীয় সভা (১৮১৫) ও ইউনিটেরিয়ান কমিটি নামে (১৮২১) দু'টি সভা আগে স্থাপন করেছিলেন। প্রধানত ধর্মতত্ত্ব নিয়ে আলোচনার জন্য গঠিত হলেও, এই সভায় সামাজিক সমস্যা নিয়েও আলোচনা হত। পরে ১৮২৮ সালে 'ব্রাহ্মসমাজ' স্থাপিত হয়। ব্রাহ্মসমাজ ও ধর্মসভা, যথাক্রমে প্রগতিশীল ও রক্ষণশীল দলের প্রতিনিধি-প্রতিষ্ঠান হয়ে ওঠে।

সাধারণ লোকে ব্রাহ্মসমাজকে বলতেন 'শীতলসভা' এবং ধর্মসভাকে বলতেন 'গুড়ুমসভা'। স্থির ধীর শান্তভাবে, বিচার-বিশ্লেষণ করে, যুক্তির কষ্টিতে যাচাই করে, প্রত্যেকটি সামাজিক প্রথাকে গ্রহণ ও বর্জন করার জন্য ব্রাহ্মসমাজ আবেদন-নিবেদন করত বলে, তার নাম দেওয়া হয়েছিল 'শীতলসভা'। আর ধর্ম গেল, শাস্ত্র গেল বলে ধর্মসভা তারস্বরে প্রতিবাদ করত এবং কটুবাক্যের তোপধ্বনি করত বলে, তার নাম দেওয়া হয় 'গুড়ুমসভা'।

এই শীতলসভা ও গুড়ুমসভা সমাজ-সমরাঙ্গনে অবতীর্ণ হল সহমরণ-নিবারণ বিধান লক্ষ্য করে। ১৮২৯-৩০ সালে ঈশ্বরচন্দ্রের সংস্কৃত কলেজে

পাঠারম্ভের প্রথম দিকেই এই বাকযুদ্ধ ও আরজি-আবেদন-সম্বলিত সামাজিক আন্দোলন তীব্র হয়ে উঠল।

রামমোহন রায় সহমরণ-নিবারণের জন্য দশ-বারো বছর আগে থেকেই আন্দোলন আরম্ভ করেছিলেন। ১৮১৮ সালে তাঁর 'সহমরণ বিষয় প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তকের সম্বাদ' প্রকাশিত হয়। তার আগে ১৮১৭ সালে, পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার সদর দেওয়ানী আদালতের প্রধান বিচারপতির অনুরোধে শাস্ত্রগ্রন্থ মন্থন করে, সহমরণের বিরুদ্ধে অভিমত জানান। কিন্তু তাঁর এই ব্যক্তিগত মতামত নিয়ে কোন আলোচনা বা আন্দোলনের সূত্রপাত হয়নি। তাঁর মতন আরও অনেক পণ্ডিত হয়ত ব্যক্তিগত মতামত এইভাবে ব্যক্ত করতেন, যদি তাঁদের মতামত জিজ্ঞাসা করা হত। সহমরণ বিষয়টিকে ব্যক্তিগত মতামতের ক্ষেত্র থেকে প্রকাশ্য আলোচনা ও আন্দোলনের ক্ষেত্রে নিয়ে আসেন রামমোহন রায়। ১৮১৮ সালে তাঁর প্রথম পুস্তিকা প্রকাশিত হবার পর, তার উত্তরে কালাচাঁদ বসুর আদেশে পণ্ডিত কাশীনাথ তর্কবাগীশ ১৮১৯ সালে 'বিধায়ক নিষেধকের সম্বাদ' নামে পুস্তিকা প্রচার করেন। তারপর রামমোহন আবার 'সহমরণ বিষয় প্রবর্ত্তক নিবর্ত্তকের দ্বিতীয় সম্বাদ' ১৮১৯ সালে প্রকাশ করেন। বাদানুবাদের ভিতর দিয়ে ক্রমেই বিষয়টি এইভাবে সামাজিক আন্দোলনের ইন্ধন যোগাতে থাকে।

১৮২৯ সালেও 'সহমরণ বিষয়' নামে রামমোহন একটি পুস্তিকা লেখেন। ধর্মসভার প্রতিবাদে, আরজি-আবেদনে, আন্দোলন যখন দানা বাঁধতে থাকে, তখন ১৮৩০ সালের নভেম্বরে রামমোহন বিলাতযাত্রা করেন।

ধর্মসভাপন্থীরা বিলাতে যে আবেদন পাঠান, তা মঞ্জুর হয় না। তাই নিয়ে রক্ষণশীল মহলের বিক্ষোভ আরও বেশি প্রকাশ পেতে থাকে। প্রগতিশীলদের পক্ষে, রামমোহনের অনুপস্থিতিতে, তাঁর পুত্র রাধাপ্রসাদ রায় এবং রমানাথ ঠাকুর ও বৈকুণ্ঠনাথ রায়, ব্রাহ্মসমাজের ট্রাস্টিরূপে আন্দোলন চালাতে থাকেন।

সহমরণ-নিবারণ আইন নিয়ে আন্দোলন আরম্ভ হবার সঙ্গে সঙ্গে আর একটি সমস্যা সমগ্র সমাজকে প্রবলভাবে আলোড়িত করে তোলে। ধর্মান্তরের সমস্যা। পাদ্রি সাহেবরা এদেশে অনেক আগে থেকেই ধর্মপ্রচার করছিলেন।

ব্যাপটিস্ট মিশনের কেরী, মার্শম্যান, ওয়ার্ড প্রমুখ পাদ্রিদের প্রচেষ্টায় খ্রীস্টধর্মের প্রচারের ক্ষেত্র ক্রমেই বিস্তীর্ণ হচ্ছিল। কেরীর বাঙালী মুন্‌শী রামরাম বসু ১৮০২ সালেই ইংরেজী থেকে বাংলায় অনুবাদ করে খ্রীস্টসঙ্গীত প্রকাশ করেন। তার নমুনা এই :

হে খৃষ্ট যিশু মুকতিদ।
পাপির পাপ কারাগারে হে খৃষ্ট যিশু।
হেদে খৃষ্ট যিশু মুকতিদ।
যিশু খৃষ্ট মুক্তিদাতা হে।
হেদে পাপের প্রায়শ্চিত্য।
সেই সেই জগৎ করতা হে খৃষ্ট যিশু।

রামরাম বসু পাদ্রি সাহেবদের অনুরোধে 'খৃষ্টবিবরণামৃতং' নামে কবিতায় একখানি খ্রীস্টচরিতও লিখেছিলেন।[৫]

খ্রীস্টধর্মের প্রচার আন্দোলন অব্যাহত ধারায় চলেছিল, কিন্তু উনিশ শতকের প্রথম পাদ পর্যন্ত পাদ্রি সাহেবরা সমাজের উচ্চস্তরে বা শিক্ষিত স্তরের মধ্যে খুব বেশি প্রভাব বিস্তার করতে পারেননি। সাধারণত হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের উপেক্ষিত ও দরিদ্রদের দিকেই তাঁদের প্রখর দৃষ্টি ছিল এবং তার ভিতর থেকে কিছু লোককে তাঁরা ধর্মান্তরিতও করেছিলেন। উপেক্ষিত সমাজকোণে এই ধর্মান্তরের ব্যাপার প্রধানত সীমাবদ্ধ ছিল বলে, সাধারণ লোকসমাজে তার বিশেষ কোন প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়নি। ১৮৩০ সালের পর থেকে ধর্মান্তরের সমস্যা সম্পূর্ণ নতুনরূপে দেখা দিল।

মনে হয় যেন সামাজিক সমস্যাগুলি ঈশ্বরচন্দ্রের কলকাতায় আগমন ও সংস্কৃত বিদ্যালয়ে প্রবেশকাল পর্যন্ত প্রতীক্ষা করছিল। তারপর ধীরে ধীরে, ১৮২৯-৩০ থেকে ১৮৪০-৪১ সালের মধ্যে, সমস্যাগুলি প্রবল সামাজিক আলোড়নের সৃষ্টি করে, ঈশ্বরচন্দ্রের ছাত্রজীবনে। সমাজ-রণাঙ্গনের ভবিষ্যৎ সেনাপতি প্রথম সংগ্রামের সম্পূর্ণ রূপ স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেন।

১৮৩০ সালে যখন উভয় পক্ষের সমস্ত শক্তি নিয়ে, 'শীতলসভা' ও 'গুড়ুমসভা' সংগ্রামে অবতীর্ণ হল, সেই সময় পাদ্রি আলেকজাণ্ডার ডাফ

সস্ত্রীক কলকাতায় এসে পৌঁছলেন। রামমোহন রায় তখনও বিলাত যাত্রা করেননি। ডাফ সাহেব তাঁর সঙ্গে দেখা করে একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনার কথা জানালেন। চিৎপুর রোডে ফিরিঙ্গী কমল বসুর যে-বাড়ীর বাইরের ঘর দু'খানিতে ব্রাহ্মসভার অধিবেশন হত, রামমোহনের সাহায্যে সেই ঘর দু'খানি ভাড়া নিয়ে ডাফ কলকাতায় আসার দু'মাসের মধ্যে 'জেনারেল অ্যাসেমবলিজ ইনস্টিটিউশন' প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাই ডাফ সাহেবের আসল উদ্দেশ্য ছিল না। তাঁর প্রধান লক্ষ্য ছিল খ্রীস্টধর্ম প্রচার।

প্রচারের ক্ষেত্রও তখন প্রস্তুত ছিল। বারো বছর হয়ে গেছে, হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। হিন্দু কলেজে শিক্ষিত যুবকের দল আধুনিক পাশ্চাত্য ভাবধারা প্রচারে উদ্‌যোগী হয়েছেন। প্রচলিত কুসংস্কার ও গোঁড়ামির বন্ধন থেকে তাঁদের মন মুক্ত। বুদ্ধি ও যুক্তি দিয়ে প্রত্যেক প্রশ্ন ও সমস্যাকে বিচার করে তাঁরা গ্রহণ ও বর্জন করতে শিখেছেন। তাঁদের কাছে খ্রীস্টধর্মের মাহাত্ম্যের কথা প্রচার করলে, তার ফলাফল ভাল ছাড়া মন্দ হবে না। ডাফ সাহেব বুদ্ধিমান ও দূরদর্শী। শহর ছেড়ে গ্রামে ধর্মপ্রচার করতে তিনি গেলেন না। তিনি ভাবলেন, কলকাতা শহরের শিক্ষিত সমাজের মধ্যে যদি খ্রীস্টধর্মের প্রচার করা যায় এবং তার প্রভাব বিস্তার করা যায়, তাহলে তার ফল অনেক বেশি সুদূরপ্রসারী হবে। গ্রামের একশত অশিক্ষিত উপেক্ষিত লোককে খ্রীস্টধর্মে দীক্ষা দেওয়ার চেয়ে শহরের একজন শিক্ষিত ভদ্র যুবককে দীক্ষা দেবার চেষ্টা করা অনেক ভাল। তাতে শতগুণ বেশি সামাজিক প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে এবং খ্রীস্টধর্মের প্রভাবও অনেক বেশি বাড়বে।

খ্রীস্টধর্ম সম্বন্ধে বক্তৃতার ব্যবস্থা করলেন ডাফ সাহেব। কয়েকজন পাদ্রি সাহেব মিলে কয়েকটি বক্তৃতা দেবেন, খ্রীস্টধর্মের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করবেন। বুদ্ধিমানের মতন ডাফ এ কথাও প্রচার করে দিলেন যে, বক্তৃতার পর শ্রোতারা স্বাধীনভাবে তার সমালোচনা করতে পারবেন। তাঁর নিজের বাসগৃহের (হেদুয়ায়) একতলার হলঘরে বক্তৃতার ব্যবস্থা হল। অগস্ট মাসের গোড়ার দিকে (১৮৩০ সালেই) পাদ্রি হিল সাহেব প্রথম বক্তৃতা দিলেন।

ব্রাহ্মসভা ও ধর্মসভার বাদানুবাদে এমনিতেই উত্তপ্ত হয়ে ছিল কলকাতার হিন্দু সমাজ। হিল সাহেবের বক্তৃতার পর যেন বিস্ফোরণ হল। প্রচণ্ড প্রতিবাদের বিস্ফোরণ। ডাফ সাহেব নিজে সেই অভিজ্ঞতার বিবরণ যেভাবে লিপিবদ্ধ করে গিয়েছেন তার মর্ম এই :[৬]

> সমস্ত শহর হৈ-হৈ করে উঠল। বক্তৃতার সঙ্গে সঙ্গে এমন প্রচণ্ড প্রতিক্রিয়া দেখা দিল চারিদিকে যে বর্ণনা করা যায় না। এরকম একটা বদ্ধমূল ধারণা যেন সকলের মনে জন্মাল যে আমরা সৎ-অসৎ যে-কোন উপায়ে টাকাপয়সার প্রলোভন দেখিয়ে বা জাদু করে, বাঙালী যুবকদের জবরদস্তি করে ধর্মান্তরিত করার সংকল্প গ্রহণ করেছি। কয়েকদিন ধরে শহরের চারিদিকে কেবল সভা আর বৈঠক চলতে থাকল। প্রতিবাদ-সভার কোলাহলে মুখর হয়ে উঠল কলকাতা। খ্রীস্টধর্মের এই আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা কিভাবে করা যায়, তাই নিয়ে সকলে প্রকাশ্যে আলাপ-আলোচনা করতে লাগলেন। অভিভাবকরা অনেকে হিন্দু কলেজের কর্তৃপক্ষের কাছে তাঁদের অভিযোগ নিবেদন করলেন। আক্রোশ তাঁদের হিন্দু কলেজের বিরুদ্ধে। কলেজের কর্তৃপক্ষরা বিচলিত ও ব্যস্ত হয়ে সভায় মিলিত হলেন এবং তরুণ ছাত্রদের এই উচ্ছৃঙ্খল আচরণের জন্য তিরস্কার করে এক প্রস্তাব পাশ করলেন। প্রস্তাবে তাঁরা পরিষ্কার ভাষায় জানিয়ে দিলেন যে ভবিষ্যতে আর কোন সভা-সমিতিতে হিন্দু কলেজের ছাত্ররা যোগদান করতে পারবে না, বিশেষ করে ধর্মসভাতে তো একেবারেই না।
>
> শহরের ইংরেজী পত্রিকাগুলি এক সুরে পাদ্রি সাহেবদের সপক্ষে যুক্তি দিয়ে হিন্দু কলেজের কর্তৃপক্ষের এই কঠোর নিষেধাজ্ঞার তীব্র ভাষায় সমালোচনা করলেন।

এই সময় সংস্কৃত কলেজের ব্যাকরণশ্রেণীর দশ বছরের ছাত্র ঈশ্বরচন্দ্র শঙ্কিত দৃষ্টিতে দেখলেন, সংলগ্ন হিন্দু কলেজের গৃহ থেকে ঝড় উঠছে কলকাতায়। গোলদীঘির আকাশে বিক্ষোভের মেঘ স্তবকিত। জনসমাজ যেন বিভ্রান্ত ও বিহ্বল।

গুড়ুমসভার গুড়ুম শব্দের ঘন ঘন প্রতিধ্বনিতে শহর কম্পমান। ঈশ্বরচন্দ্র তার মধ্যে বসে মুগ্ধবোধের পাঠ আয়ত্ত করছেন।

হিন্দু কলেজে শিক্ষিত 'ইয়ং বেঙ্গল' দল রক্ষণশীলদের আক্রমণে বিচলিত হলেন না। তাঁরাও দ্বিগুণ উৎসাহে প্রতি-আক্রমণ আরম্ভ করলেন। ১৮৩১ সালে নব্যবঙ্গের অন্যতম মুখপাত্র কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর বিখ্যাত ইংরেজী 'এন্‌কোয়ারার' পত্রিকা প্রকাশ করলেন। দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় 'জ্ঞানান্বেষণ' পত্রিকা প্রকাশিত হল।

উৎসাহের আতিশয্যে যুবকরা এমন আচরণ করতে লাগলেন যাতে রক্ষণশীল দলের প্রচারের সুবিধা হল বেশি। একটির পর একটি উচ্ছৃঙ্খলতার দৃষ্টান্ত তাঁরা চোখে আঙুল দিয়ে দেখাতে থাকলেন। ঘটনাক্রমও তাঁদের সাহায্য করল।

পাদ্রিদের বিরুদ্ধে যখন আন্দোলন চলছে, হিন্দু কলেজের বিজাতীয় ও বিধর্মী শিক্ষার ফলাফলে অভিভাবকরা যখন বিচলিত হয়ে পড়েছেন, সেই সময় শহরের মধ্যে আবার এমন একটি ঘটনা ঘটল, যাতে সকলেই সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল। ঘটনাটি ঘটল ১৮৩১ সালের অগস্ট মাসে।

কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় থাকতেন ঠনঠনে কালীতলার পাশে গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেনে। পাড়াটি সে-সময় যে ব্রাহ্মণপ্রধান পাড়া ছিল, তার প্রমাণ এখনও পাওয়া যায়। একদিন সন্ধ্যাবেলায়, কৃষ্ণমোহনের অনুপস্থিতিতে, তাঁর গৃহে তাঁর তরুণ বন্ধুবান্ধব কয়েকজন আলোচনার জন্য মিলিত হন। কুসংস্কার ও গোঁড়ামির বিরুদ্ধে সকলেই গরম গরম বক্তৃতা দেন। প্রতিজ্ঞা করেন যে ধর্মের নামে কোন গোঁড়ামি বা কুসংস্কার তাঁরা বরদাস্ত করবেন না, বিষের মতন সমস্ত জীর্ণ আচার ও প্রথা বর্জন করবেন। তরুণদের বৈঠকে যা হয়, আলোচনাকালে উত্তেজনা যখন চরম সীমায় পৌঁছয়, তখন কেউ প্রস্তাব করেন যে তাঁদের এই সংস্কারমুক্ত মনের বাহ্য প্রমাণ দিতে হবে এমন কোন কাজ করে যা প্রচলিত আচারবিরুদ্ধ। যে-বন্ধুর বাড়ীতে বসে এই সব জল্পনা হচ্ছিল, তিনি তখন উপস্থিত ছিলেন না। সিদ্ধান্ত হল, পাশের মুসলমানদের দোকান থেকে গোমাংস কিনে এনে ভক্ষণ করে, তার হাড়গুলি প্রতিবেশী

একজন গোঁড়া ব্রাহ্মণের গৃহে নিক্ষেপ করতে হবে। কাজটি সুসম্পন্ন করতে পারলে প্রমাণিত হবে যে তাঁরা সংস্কারমুক্ত।

তাই তাঁরা প্রমাণ করলেন। গোমাংস ভক্ষণ করে গোহাড় নিক্ষেপ করলেন ব্রাহ্মণ প্রতিবেশীর গৃহে।* পাড়ার লোক সকলে উত্তেজিত হয়ে এসে কৃষ্ণমোহনের বাড়ী চড়াও করল। কৃষ্ণমোহন তখন ফিরে এসেছেন বাড়ীতে। বন্ধুদের এই বিচারবুদ্ধি তিনি নিজে সমর্থন করুন বা না-ই করুন, ঘটনাটি যখন ঘটে গেছে তখন বন্ধুদের বিরুদ্ধে কিছু বলা বা করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হল না। প্রতিবেশীরা দাবি করলেন, ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে। কৃষ্ণমোহনের পরিবারের সকলে প্রতিবেশীদের দাবি সমর্থন করলেন। কিন্তু কৃষ্ণমোহন অন্যায় স্বীকার করলেন না এবং তার জন্য ক্ষমা চাইতেও রাজী হলেন না। অবশেষে সেই রাত্রিতেই তাঁকে গৃহত্যাগ করতে হল।

বন্ধুদের সঙ্গে যখন তিনি নিজ গৃহ চিরজীবনের মতন ত্যাগ করে চলে আসছিলেন, তখন বাইরের বিক্ষুব্ধ প্রতিবেশীরা পথের উপর তাঁদের আক্রমণ করতে উদ্যত হয়। হওয়াই স্বাভাবিক। অনেক কষ্টে কৃষ্ণমোহন পাড়া ছেড়ে বেরিয়ে আসেন। রাত্রিতে কোথায় যাবেন, কার গৃহে আশ্রয় নেবেন, তার কিছু ঠিক নেই। দূরে এক পরিচিতের গৃহে আত্মগোপন করে তাঁকে আশ্রয় নিতে হয়। কিন্তু হিন্দুপল্লীতে কেউ তাঁকে আশ্রয় দিতে সাহস করেন না। অবশেষে ইংরেজ-পল্লীতে চৌরঙ্গীর দিকে এসে তিনি এক ইংরেজের গৃহে আশ্রয় পান। এই সময় পাদ্রি ডাফের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয় এবং খ্রীস্টধর্ম সম্বন্ধে আলোচনা হয়। এর আগে কোন বিশেষ ধর্ম সম্বন্ধে তাঁর কোন অনুরাগ বা অনুসন্ধিৎসা কিছুই ছিল না।[৭]

পাদ্রি ডাফের সঙ্গে পরিচিত হবার পর কৃষ্ণমোহন খ্রীস্টধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হতে থাকেন। পাদ্রিদের প্রভাবে এই সময় হিন্দু কলেজের ছাত্রদের মধ্যে দু'-চারজন খ্রীস্টধর্মের বেশ অনুরাগী হয়ে ওঠেন।

* প্রতিবেশী ব্রাহ্মণদের নাম ভৈরবচন্দ্র চক্রবর্তী ও শম্ভুচন্দ্র চক্রবর্তী (Ramachandra Ghosha : A Biographical Sketch of the Rev. K. M. Banerjea : Calcutta, 1893 : 24-26)।

১৮৩২ সালের অগস্ট মাসে হিন্দু কলেজের ছাত্র মহেশচন্দ্র ঘোষ খ্রীস্টধর্মে দীক্ষা নেন। এই ধর্মান্তর সম্বন্ধে কৃষ্ণমোহন তাঁর 'এনকোয়ারার' পত্রে মন্তব্য করেন :

> The education of the college made him abjure Hinduism as a means of superstition ; and the weekly lectures of Mr. D. excited in him a desire to inquire into the claims of Christianity...We hope ere long to be able to witness more and more such happy results in this country.
>
> হিন্দু কলেজের শিক্ষার ফলে মহেশচন্দ্র হিন্দুধর্মকে কুসংস্কারের আবর্জনা-স্তূপ মনে করে বর্জন করতে পেরেছেন। মিস্টার ডি-র (ডাফ) বক্তৃতা শুনে শুনে তিনি খ্রীস্টধর্ম সম্বন্ধে সত্যানুসন্ধানের প্রেরণা পেয়েছেন। আমরা আশা করি, অদূর ভবিষ্যতে আরও অনেকে মহেশচন্দ্রের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করবেন।

কৃষ্ণমোহনের এই মন্তব্যের ঐতিহাসিক তাৎপর্য আছে। ইয়ং বেঙ্গলের তদানীন্তন মনোভাব ও চিন্তাধারা এর মধ্যে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। হিন্দু কলেজের শিক্ষার ফলাফল সম্বন্ধে তিনি নিজেই মত প্রকাশ করেছেন। ডাফ সাহেবদের বক্তৃতার প্রত্যক্ষ ফলাফলও তাঁর উক্তির মধ্যে স্বীকৃত হয়েছে। সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল তাঁর শেষ কথাটি। আরও অনেকে মহেশচন্দ্রের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করুন, এই তিনি কামনা করেন।

কৃষ্ণমোহনের এই কামনার মধ্যে যে সামাজিক সঙ্কটের আভাস পাওয়া যায়, তা তখন উপেক্ষণীয় ছিল না।

মহেশচন্দ্রের পর কৃষ্ণমোহন নিজে খ্রীস্টধর্মে দীক্ষা নেন, ১৮৩২ সালের অক্টোবর মাসে। কলকাতার সংবাদপত্রে তার বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয় এই মর্মে :

> This sacred ordinance was administered in the presence of a numerous and highly respectable company of ladies and gentlemen, and of upwards of forty natives, the majority of whom are quondam pupils of the Hindoo College and were some of its brightest ornaments.

বিজ্ঞপ্তির মধ্যে সমাজের চিত্রটি আরও পরিষ্কার হয়ে ফুটে উঠেছে। হিন্দু কলেজে শিক্ষিত 'ইয়ং বেঙ্গল' দলের মনের ঝোঁক কোন্ দিকে, তাও বোঝা যায়।

কৃষ্ণমোহনের পর, সেই বছর ডিসেম্বর মাসে গোপীনাথ নন্দী ধর্মান্তরিত হন। শোনা যায়, গির্জার কাছে তাঁর মা'য়ের আকুল ক্রন্দনেও গোপীনাথ বিচলিত হননি।

কলকাতা ছেড়ে গ্রামে মা'য়ের কাছে যাবার জন্য ঈশ্বরচন্দ্র প্রায় বিচলিত হয়ে উঠতেন এবং মধ্যে মধ্যে যেতেনও।

মহেশচন্দ্র, কৃষ্ণমোহন, গোপীনাথ প্রভৃতি যুবকেরা যখন হিন্দু কলেজের শিক্ষার ফলে, ডাফ, হিল প্রমুখ পাদ্রি সাহেবদের বক্তৃতা শুনে, হিন্দুধর্মে বীতশ্রদ্ধ হয়ে খ্রীস্টধর্মে দীক্ষা নিচ্ছিলেন, তখন সংস্কৃত কলেজের ছাত্র ঈশ্বরচন্দ্রের বয়স এগারো-বারো বছর। ব্রাহ্মণসন্তানের উপনয়নের সময়।

কৃষ্ণমোহন মা-ভাই-বোনদের ছেড়ে গৃহত্যাগ করেছেন, খ্রীস্টধর্মে দীক্ষা নিয়েছেন। গোপীনাথ মা'য়ের ক্রন্দনেও বিচলিত হননি।

ঈশ্বরচন্দ্র তখন শহর থেকে গ্রামে ফিরে গেছেন মা'য়ের কাছে। তাঁর উপনয়ন হয়েছে। দরিদ্র ব্রাহ্মণসন্তানের দরিদ্রের মতন শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠানসম্মত উপনয়ন।

সমাজের আকাশে ঘনঘোর স্তূপে মেঘ জমছে। এগার বছরের বালক ঈশ্বরচন্দ্র বিস্ময়াবিষ্ট দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন সেই মেঘের দিকে। উপনয়ন হয়ে গেছে। ব্রাহ্মণসন্তান দ্বিজত্ব লাভ করেছেন, যেমন আরও অনেকে করেন তেমনি। তা নিয়ে কোন সমারোহ বা কোলাহল কিছুই হয়নি।

এদিকে আর এক ব্রাহ্মণসন্তান সমগ্র সমাজ তোলপাড় করে তুলেছেন। কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। বন্ধুবান্ধবদের গোমাংস ভক্ষণ ও গোহাড় নিক্ষেপের ঘটনার পর তিনি গৃহত্যাগী হয়ে শেষ পর্যন্ত ইংরেজপল্লী চৌরঙ্গীতে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছেন। ডাফ সাহেবের সঙ্গে আলাপ-পরিচয়ের পর তিনি

খ্রীস্টধর্মের প্রতি কৌতূহলী হয়ে অবশেষে ধর্মান্তরিতও হয়েছেন। কৃষ্ণমোহন ও হিন্দু কলেজের শিক্ষিত অন্যান্য তরুণ যুবকদের ধর্মান্তরের ফলে হিন্দুসমাজের সর্বস্তরে প্রবল আলোড়ন আরম্ভ হয়েছে। পাদ্রি সাহেবদের প্রচারের ফলে হিন্দুসমাজের নিম্ন স্তরে ধর্মান্তর আগে থেকেই আরম্ভ হয়েছিল, কিন্তু তাতে উচ্চসমাজে বিশেষ সাড়া পড়েনি। কলকাতা শহরে শিক্ষিত ভদ্রসন্তানরা যখন ১৮৩০-৩২ সাল থেকে খ্রীস্টান হতে লাগলেন, তখন সমাজের সর্বস্তরে তাই নিয়ে তর্কবিতর্ক, আলাপ-আলোচনা ও বাদ-প্রতিবাদ আরম্ভ হল। কৃষ্ণ-মোহনের ধর্মান্তরের পর কলকাতার হিন্দুসমাজে যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছিল, সে-সম্বন্ধে ডাফ সাহেব নিজে যা লিখেছেন তার মর্ম এই :

> যদিও কয়েকজন যুবক ধর্মান্তরিত হয়েছিলেন তাহলেও তার গুরুত্ব খুব বেশি। পূর্বভারতে ইংরেজীশিক্ষিত সম্ভ্রান্ত ভদ্রসন্তানদের মধ্যে এর আগে খ্রীস্টধর্মের প্রচার এ-রকম সার্থক হয়নি। কৃষ্ণমোহনের ধর্মান্তরের কথাই বলি। কলকাতা শহরের আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই কৃষ্ণমোহনের নাম জানতেন, তাঁর শিক্ষাদীক্ষা ও প্রতিভার কথাও তাঁদের অজানা ছিল না। তিনি যখন খ্রীস্টধর্মে দীক্ষা নিলেন তখন শহরের পথে-ঘাটে, হাটবাজারে তাই নিয়ে আলাপ-আলোচনা, তর্ক-বিতর্ক হতে লাগল। দল বেঁধে শহরের লোক কৃষ্ণমোহনের কথা আলোচনা করতে লাগলেন। দিনে-দুপুরে, গাছতলায় ছায়ায় বসে তাই নিয়ে জল্পনা-কল্পনা আরম্ভ হল। প্রত্যেক গৃহস্থ পরিবারের একমাত্র আলোচ্য বিষয় হল কৃষ্ণমোহন। কলকাতার সর্বত্র সকলের মুখে মুখে কৃষ্ণমোহনের নাম ধ্বনিত হতে লাগল। একজন কেন, একশ বা একহাজার জন নিম্নবর্ণের অশিক্ষিত হিন্দু ধর্মান্তরিত হলেও, তাই নিয়ে একটুও সাড়া পড়ত কি না সন্দেহ, আলোড়ন তো দূরের কথা। কৃষ্ণমোহন খ্রীস্টধর্মে দীক্ষা নিয়ে কলকাতার হিন্দু সমাজের মূল পর্যন্ত সজোরে নাড়া দিয়েছিলেন।

হিন্দু সমাজের প্রচণ্ড প্রতিবাদ এবং ধর্মসভার আক্রোশ ও আক্রমণের তীব্র-ভাষায় জবাব দিচ্ছিলেন তিনি তাঁর ইংরেজী পত্রিকায়। জবাবের ভাষা (ইংরেজীতে) অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মতন। তার মর্ম এই :

যেহেতু আমরা পবিত্র ও সনাতন হিন্দুধর্মের আওতা থেকে মুক্ত হয়েছি, সেই কারণে আমাদের প্রতি লাঞ্ছনা ও অত্যাচারের অন্ত নেই। গোঁড়া হিন্দুর দল ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছেন, কারণ ধর্মের নামে কুসংস্কারের বেদীমূলে আমরা শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করতে রাজী নই। আমাদের বিবেক আছে, বুদ্ধি আছে, এবং তার কোনটাই আমরা পরিত্যাগ করতে নারাজ। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, আমরা ন্যায় ও সত্যের পথে চলেছি। সেই বিশ্বাস থেকে আমরা সহজে বিচলিত হব না। ধৈর্য ধরে দৃঢ় পদে আমরা অগ্রসর হব। বিরুদ্ধবাদীরা যদি কাণ্ডজ্ঞানশূন্য হয়ে মারমুখী হন এবং তাঁদের আক্রমণ যদি আমরা প্রতিরোধ করতে না পারি, তাহলে আমরা প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জন দিতে প্রস্তুত, তবু আমাদের সঙ্গত অধিকারের ক্ষেত্র থেকে আমরা এক ইঞ্চি নড়ব না। আমরা জানি, প্রতিদিন সনাতনপন্থীরা নানাভাবে আমাদের অপদস্থ করার জন্য চক্রান্ত করছেন। আমাদের চরিত্র, আমাদের কীর্তি সম্বন্ধে নানারকমের আজগুবি মিথ্যা-কথা প্রচারপত্রের মারফৎ লোকসমাজে প্রচার করছেন। ধর্মান্ধতা ও বিদ্বেষজাত যত রকমের বর্বর পন্থা বা কৌশল আছে, আমাদের উপর তা প্রয়োগ করা হচ্ছে। কিন্তু আমরা সবরকমের বর্বরতা লাঞ্ছনা ও অত্যাচার স্থিরচিত্তে সহ্য করব, কারণ আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে এরকম কোলাহল ও হৈ-হল্লা ছাড়া কোন জাতির বা সমাজের সংস্কার সাধন করা সম্ভব নয়। হিন্দু সমাজের গোঁড়ামি ও ধর্মান্ধতা নির্মূল করতে হলে, সংস্কারক যাঁরা, সমাজকল্যাণব্রতী যাঁরা, তাঁদের এই সব লাঞ্ছনা ও অত্যাচার হাসিমুখে বরণ করতে হবে। আমরা সেই সংস্কারের ও কল্যাণের ব্রত গ্রহণ করেছি। সনাতনীদের রক্তচক্ষু দেখে আমরা ভীত হব না। কাপুরুষদের মতন ভয় কখন সংস্কারকর্মীদের সঙ্গী হতে পারে না। ইতিহাস তার সাক্ষী এবং ইতিহাস আমাদের পক্ষে। লুথারও একদিন এইভাবে সমস্ত পীড়ন সহ্য করে ধর্মসংস্কারের পথে এগিয়ে গিয়েছিলেন, গোঁড়ামির পাহাড় ধূলিসাৎ করে দিয়েছিলেন। নক্সও একদিন ধর্মান্ধদের বিরুদ্ধে তীব্র সংগ্রাম করে স্কটল্যাণ্ডে ধর্মসংস্কারের দুর্গম পথে অগ্রসর হয়েছিলেন। আজ তাই আমরাও আমাদের ভাগ্যবান

> বলে মনে করি। কারণ আমরা হিন্দুধর্মের সংস্কারের কাজে ব্রতী হয়েছি। আমরা প্রগতির ভেরী বাজিয়েছি এবং আরও বাজাব। আমরা হিন্দুধর্মের কুসংস্কার ও গোঁড়ামিকে আক্রমণ করেছি, ভবিষ্যতে আরও করব। যতদিন না আমরা জয়ী হব, ততদিন পর্যন্ত সব নির্যাতন নীরবে সহ্য করে আক্রমণ চালিয়ে যাব।

আঠার বছরের কিশোর বালকের লেখা, কল্পনা করা যায় না। ঈশ্বরচন্দ্রের চেয়ে বয়সে কৃষ্ণমোহন সাত বছরের বড় ছিলেন। অগ্রজতুল্য কৃষ্ণমোহন যখন সমাজের কূপমণ্ডুকতা ও গোঁড়ামির বিরুদ্ধে এইভাবে সংগ্রাম করছিলেন তখন তার প্রকৃত তাৎপর্য উপলব্ধি করবার মতন বয়স ও বুদ্ধি ঈশ্বরচন্দ্রের হয়নি। তিনি তখন সংস্কৃত কলেজের ব্যাকরণশ্রেণীতে মুগ্ধবোধের পাঠ নিয়েই ব্যস্ত ছিলেন। ভাষার ব্যাকরণের চেয়ে জীবনের ও সমাজের ব্যাকরণ যে আরও কত জটিল, তা তখনও তিনি জানতেন না। পরবর্তী কর্মজীবনে, শিক্ষা ও সমাজসংস্কারের আন্দোলনে, কৃষ্ণমোহন তাঁর অন্যতম সঙ্গী ও সমর্থক ছিলেন। মনে হয় যেন, ঈশ্বরচন্দ্রের ভবিষ্যৎ কর্মজীবনের কঠিন ব্রতের কথা মনে করেই কৃষ্ণমোহন আঠার বছর বয়সে লিখেছিলেন: 'সমাজসংস্কারক যাঁরা, সমাজকল্যাণব্রতী যাঁরা, তাঁদের লাঞ্ছনা ও অত্যাচার সহ্য করাই ধর্ম।'

হিন্দুত্ব বর্জনের এই মনোভাব সেদিন বালক ঈশ্বরচন্দ্রের মনে কিভাবে রেখাপাত করেছিল, কেউ জানেন না। চারিদিকের এই আলোড়ন তাঁর বালকচিত্তে নিশ্চয় সামান্য একটু ঢেউ তুলেছিল। আমার ধর্ম, আমার সমাজ আমি সংস্কার করব, কিন্তু তার জন্য ধর্ম ত্যাগ করব কেন? সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বাইরে যাব কেন? ধর্মসংস্কারক যাঁরা তাঁরা তো নিজেদের ধর্ম ত্যাগ করেননি কোনদিন? সব ধর্মেরই তো নিজস্ব গোঁড়ামি, নিজস্ব কুসংস্কার আছে। নিজের ধর্মের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে, অন্য ধর্মের আশ্রয় গ্রহণ করা অথবা নতুন কোন ধর্ম-সম্প্রদায় গঠন করার যুক্তি কোথায়?

এসব প্রশ্ন ঠিক এইভাবে কোন বালকের মনে জাগবার কথা নয়। ঈশ্বরচন্দ্র যদিও সাধারণ বালক ছিলেন না, তবু এত কথা তাঁর মনে হয়নি

সেদিন, কারণ তিনি যে পরিবারে জন্মেছিলেন তাও গোঁড়া ব্রাহ্মণ-পরিবারই ছিল এবং বাল্যজীবনে তিনি সম্পূর্ণ তার প্রভাবাচ্ছন্ন ছিলেন। তাই মনে হয়, প্রশ্ন তাঁর মনে না জাগলেও, হিন্দু কলেজের শিক্ষিত তরুণদের এই স্বধর্মবিদ্বেষ সেদিন তাঁর আদৌ ভাল লাগেনি। সনাতনপন্থীদের উগ্রতাও তাঁর ভাল লাগবার কথা নয়। উভয় দলের উগ্রতা ও বিদ্বেষের হলাহলের মধ্যে বালক ঈশ্বরচন্দ্র ছাত্রজীবনেই তাঁর মনটিকে তৈরি করার সুযোগ পেয়েছিলেন। বুঝেছিলেন, ব্রাহ্মধর্মী বা খ্রীস্টধর্মীদের পথে অগ্রসর হলে, এক গোঁড়ামি থেকে আর-এক গোঁড়ামির জালেই শেষ পর্যন্ত জড়িয়ে পড়তে হবে। সমাজ-সংস্কারের সংগ্রামে তাঁদের সহযোগিতা কাম্য হলেও, তাঁদের ধর্মান্দোলনের চোরাগলির পথ বর্জনীয়। এত গভীরভাবে একথা সেদিন না বুঝলেও, ছাত্রজীবনে এই সত্যের আভাস ঈশ্বরচন্দ্র অনেকবার পেয়েছিলেন।

কলকাতার সম্ভ্রান্ত হিন্দু সমাজে পাদ্রি সাহেবরা ধর্মান্তরের ব্যাপার নিয়ে, ১৮৩০-৩২ সালের মধ্যে, এক পারিবারিক সঙ্কটের সৃষ্টি করলেন। পারিবারিক সঙ্কট ছাড়া এই সঙ্কটকে আর কিছু বলা যায় না। হিন্দু কলেজে ধার্মিক পরিবারের হিন্দু সন্তানরা পড়তেন। ধনিক হলেও তাঁরা অধিকাংশই উদারপন্থী ছিলেন না। দু'চারজন সম্ভ্রান্ত পরিবারের যুবকদের ধর্মান্তরের পর প্রায় প্রত্যেক হিন্দু পরিবারে গভীর উদ্বেগ ও অশান্তি দেখা দিল। পরিবারের অভিভাবকরা সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলেন। কলকাতা শহরে তখন কতজন ছাত্র হিন্দু কলেজে ও অন্যান্য ইংরেজী বিদ্যালয়ে লেখাপড়া শিখত এবং তার মধ্যে আনুমানিক কত জন খ্রীস্টধর্মে দীক্ষা নিয়েছিল, তার আভাস তখনকার সংবাদপত্র থেকে পাওয়া যায়। ১৮৩১ সালের ৫ মে 'সমাচারচন্দ্রিকা' পত্রিকা লিখছেন :

> শ্রীশ্রীযুত ইংলণ্ডাধিপতির অধীন এ প্রদেশে অর্থাৎ সুবে বাংলা বেহার উড়িষ্যার মধ্যে যত মনুষ্য আছে ইহার মধ্যে হিন্দু ৯ নয় কোটি লোক হইবেক তন্মধ্যে কলিকাতা নগরে তাহার সহস্রাংশের একাংশ হইবেক ইহাতে ৪।৫ পাঁচ শত বালক হিন্দু কলেজ এবং অন্যান্য ও

মিসিনারিদিগের পাঠশালায় ইংরেজি বিদ্যাভ্যাস করিতেছে এই বালকগুলির মধ্যে ৩০।৪০ জন হইবেক নাস্তিক হইয়াছে…

চার-পাঁচ শত বালক ইংরেজী শিখছে। ১৮৩১ সালের কথা। অর্থাৎ ঈশ্বরচন্দ্র যখন সংস্কৃত কলেজে শিক্ষা করছেন, তখনকার কথা। তাদের মধ্যে ত্রিশ-চল্লিশ জন নাস্তিক হয়েছে। শতকরা সাত-আট জন। খুব অল্প নয়। পারিবারিক জীবনে উদ্বেগ সৃষ্টির পক্ষে যথেষ্ট। কলকাতার প্রায় প্রত্যেক মধ্যবিত্ত হিন্দু পরিবারে তখন এই নাস্তিকতা ও ধর্মান্তরের সমস্যা নিয়ে আলাপ-আলোচনা হচ্ছে। সংবাদপত্র থেকে তারও পরিষ্কার আভাস পাওয়া যায়। ১৮৩১ সালের ৯ মে 'সমাচারচন্দ্রিকা' লিখছেন :

এক্ষণে এতন্নগরে হিন্দুদিগের ঘরে ঘরে অন্য কোন চর্চ্চাপেক্ষা যে কএক জন নাস্তিক হইয়াছে ইহারদিগের কথোপকথনে অধিককাল ক্ষেপণ হয় বিশেষতঃ ভাগ্যবন্ত লোকের বৈঠকখানায় প্রায় প্রতিদিন এই কথা হইয়া থাকে কেহ কহেন মহাশয় কি কাল হইল ধর্ম্ম-কর্ম্ম আর থাকে না কেহ কহেন কালের দোষ কেন দেও এই কলিকাল কি সর্ব্ব দেশ সর্ব্ব জাতির উপর নহে কেন না এমত বুঝা যায় না যে অমুক ইঙ্গরেজ হিন্দু হইতে বাঞ্ছা করিয়াছেন এবং হিন্দু কি মুসলমানের ন্যায় পোসাক-পরিচ্ছদ করণপূর্ব্বক আপনি সুখবোধ করেন অথবা যিনি ২ বাঙ্গলা পার্সি ইত্যাদি এতদ্দেশীয় লেখাপড়া শিক্ষা করিয়াছেন তাঁহারা পরস্পর এতদ্দেশীয় ভাষায় কথোপকথন করেন কি পত্রাদি লেখেন…।

কলকাতা শহরে, 'ভাগ্যবন্ত লোকের বৈঠকখানায়' বিশেষ করে, তখন প্রধান আলোচ্য বিষয় হয়ে উঠেছিল, নতুন ইংরেজী শিক্ষিত তরুণদের নাস্তিকতা ও খ্রীস্টধর্মের প্রতি আকর্ষণের সমস্যা। আলোচনার মধ্যে সঙ্কটের সুস্পষ্ট আভাসও পাওয়া যায়। তার ফলে, ইংরেজী শিক্ষার প্রতি এবং তার প্রধান কেন্দ্র হিন্দু কলেজের প্রতি কলকাতার হিন্দুসমাজের মনোভাব ক্রমে বিরূপ হয়ে ওঠে। সংবাদপত্রে হিন্দু কলেজের শিক্ষা সম্বন্ধে অভিভাবকদের নানারকমের অভিযোগ প্রকাশ পেতে থাকে। 'সমাচারচন্দ্রিকা', 'সংবাদ-

প্রভাকর' প্রভৃতি পত্রিকা থেকে এই অভিযোগের কয়েকটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করছি। জনৈক হিন্দু কলেজের ছাত্রের পিতা 'সমাচারচন্দ্রিকা'তে দুঃখ করে যা লেখেন তার মর্ম এই :

'আমি বিদেশী মানুষ, এই শহরে বিষয়কর্ম করি। শুনলাম, হিন্দু কলেজ নামক পাঠশালায় বড় বিদ্যাচর্চা হয়। ছেলে পড়ালেই বড় বিদ্বান হয়। বড় বড় সাহেবরা এসে তার পরীক্ষা নেন। কৃতবিদ্য হলে পরে রাজসরকারে বড় কাজ পাওয়া যায়। এতে লোভাকৃষ্ট হয়ে, অতিক্লেশে মাসিক বেতন দিতে স্বীকার করে নিজের ছেলেকে দেশ থেকে আনিয়ে, ঐ কলেজে নিযুক্ত করলাম। তাতে যে উৎপাতগ্রস্ত হয়েছি তার কিঞ্চিৎ লিখছি। আপনি দেশের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী, 'ধর্মপ্রতিপালনচেষ্টক'। যদি এই লিপি প্রকাশ করেন তবে তাতে আমার যে উপকার হবে তা তেমন কিছু নয়, কিন্তু আমার মত লোভাকৃষ্ট অনেক ছেলের অভিভাবকের উপকার হতে পারে।

'আপন বিষয়ানুসারে পুত্রকে উত্তম পোষাক দিলাম। প্রতি দিন প্রাতে পাঠশালায় পাঠাই। সন্তানটি শান্ত ও বশীভূত ছিল। চন্দ্রিকা-প্রকাশক মহাশয়, বলতে কি, আমি নির্ধন মানুষ। পুত্রটি ঘরের কাজ কখন কখন দেখত এবং ডাকলেই কাছে আসত। কোন কথা জিজ্ঞাসা করলেই উত্তর দিত। কিন্তু কিছুকালের মধ্যে বিপরীত রীতি হতে লাগল। পরে দেশের রীত্যনুসারে আচার-ব্যবহার ও পোষাক ত্যাগ করল। অর্থাৎ চুল কাটা, সাপাতু জুতাধারী মালাহীন, এসে এক দোকানে বাসা করে থাকেন। একদিন অবগাহনানন্তর পূজার নৈবেদ্যাদি সঙ্গে নিয়ে জগদীশ্বরীর সন্নিধানে উপস্থিত হয়ে তাবতের সঙ্গে অষ্টাঙ্গে প্রণাম করলেন। কিন্তু উক্ত গৃহস্থের সুসন্তানটি প্রণাম করলেন না। ব্রহ্মাদি দেবতার দুরারাধ্যা যিনি তাঁকে এই বালক কেবল বাক্যের দ্বারা সম্মান করলেন, যেমন গুড মর্নিং ম্যাডাম ইত্যাদি। এই কথা শুনে অনেকেই কানে আঙুল দিয়ে পলায়ন করে। তার পিতা তাকে প্রহার করবার জন্য উদ্যত হয়। কোন ভদ্র ব্যক্তি নিবারণ করে বলেন, ক্ষান্ত হও, এস্থানে রাগ প্রকাশ করা উচিত নয়। তাতে ঐ বালকের পিতা আক্ষেপ করে বলে, ওরে আমি কি ঝকমারি করে তোকে হিন্দু কলেজে দিয়েছিলাম। তোর জন্যে আমার জাত মান সব গেল।

আমি একঘরে হয়েছি, ধর্মসভায় যেতে পারি না। এই সব খেদোক্তি শুনে অনেকে সেই ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করলেন, আমরা শুনেছি কলকাতার অনেক বাঙালী বড় মানুষ হিন্দু কলেজে অধ্যক্ষতা করেন, তবে কেন ছেলেদের এমন কুব্যবহার হয়।...'

এইভাবে, ১৮৩০-৩১ সাল থেকে, বিভিন্ন সংবাদপত্রে হিন্দু কলেজে শিক্ষিত ছাত্রদের নানারকমের কীর্তিকাহিনী প্রকাশিত হতে থাকে। সাধারণত হিন্দু কলেজের শিক্ষানীতির বিরুদ্ধেই চিঠিপত্র ছাপা হত। দু'-চার জন অবশ্য তার প্রতিবাদও করতেন। হিন্দু কলেজ নিয়ে বেশ বাদানুবাদ চলতে থাকে। ধর্মসভাপন্থী 'সমাচার-চন্দ্রিকা' পত্রিকায় প্রধানত হিন্দু কলেজের বিরোধী পক্ষের চিঠিপত্র প্রকাশিত হত। চন্দ্রিকার এই অভিযোগ প্রকাশের উত্তরে জনৈক 'যথার্থবাদিনঃ' তখন 'সমাচারদর্পণ' পত্রিকায় (২১ জানুয়ারী, ১৮৩৯) যা লেখেন, তার মর্ম এই :

'চন্দ্রিকাকার মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করি যে হিন্দু কলেজ স্থাপিত হওয়ার পূর্বে কি হিন্দু বালকদের কখন কোন কদাচার ছিল না, কেবল বহু পরিশ্রম করে, এই কলেজে বিদ্যাভ্যাস করে তারা সহস্র অপরাধে অপরাধী হচ্ছে? কলেজ স্থাপিত হবার আগে এদেশের বাঁকা বাবুরা তাঁদের পিতৃবিয়োগের পর পৈতৃক ধনের অধিকারী হয়ে, মদ্যপান যবনীগমন ইত্যাদি কোন্ অবৈধ কর্ম না করেছেন? পৈতৃক ধন কি ভাবে না অপব্যয় করেছেন? পূর্বে এই রাজধানীতে কয়েকটা দল হয়েছিল, গাঁজাখুরি ঝকমারি সবলোট ইত্যাদি। বিদ্যার অভাবে তখন ভদ্রলোকের সন্তানেরা এই সব দলের মধ্যে প্রবেশ করে কোন্ অসৎকর্ম না করেছেন? কি ভাবে না তাঁদের পিতামাতাদের মনঃপীড়া দিয়েছেন?'

ধর্মসভাপন্থীদের অভিযোগ ও আন্দোলনের প্রতিবাদ করে চিঠিপত্র প্রকাশিত হচ্ছিল। কৃষ্ণমোহন তীব্র ভাষায় তাঁর ইংরেজী 'এন্‌কোয়ারার' পত্রিকায় তার জবাব দিচ্ছিলেন। কেবল পত্রিকায় জবাব দিয়ে তিনি ক্ষান্ত

হননি। এই সময় *The Persecuted* বা 'উৎপীড়িত' নামে একখানি ইংরেজী নাটকও তিনি লিখেছিলেন। ঠিক নাটক নয়, একটি পঞ্চাঙ্ক নাট্যধর্মী নক্শা বলা চলে। ভূমিকায় কৃষ্ণমোহন লেখেন :

> The Author's purpose has been to compute its excellence by measuring the effects it will produce upon the minds of the rising generation. The inconsistencies and the blackness of the influential members of the Hindoo Community have been depicted before their eyes. They will now clearly perceive the wiles and tricks of the Bramins and thereby be able to guard themselves against them.
>
> লেখকের উদ্দেশ্য হল, উদীয়মান তরুণ সম্প্রদায়ের মনের উপর এই রচনাটি কতখানি প্রভাব বিস্তার করল, তাই দিয়ে তার সার্থকতা যাচাই করা। হিন্দু সমাজের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের চরিত্রের অসঙ্গতি ও কদর্যতা তাঁদের চোখের সামনে প্রকাশ করাই আমার লক্ষ্য। এই রচনার মধ্য দিয়ে তাঁরা দেখতে পাবেন যে ব্রাহ্মণদের অপকৌশল ও দুরভিসন্ধি কি ভয়াবহ এবং তা থেকে আত্মরক্ষা করা কত প্রয়োজন।

নাটকটি স্ত্রীচরিত্র-বর্জিত। নতুন ইংরেজী শিক্ষার ফলে কি ভাবে বিজাতীয় রীতিনীতি আদবকায়দা হিন্দু যুবকদের মধ্যে প্রসার লাভ করছে এবং কুসংস্কারাচ্ছন্ন গুরুপুরোহিত-শাসিত প্রাচীন হিন্দু সমাজে কি ভাবে তার প্রতিক্রিয়া হচ্ছে, নাটকটির প্রধান প্রতিপাদ্য হল তাই। শিক্ষিত হিন্দু যুবকদের দু'টি দলে ভাগ করা হয়েছে। এক দলকে বলা হয়েছে 'Young Hindoos', এঁরাই 'ইয়ং বেঙ্গল' বলে পরিচিত দলের প্রকৃত প্রতিনিধি। অন্য দলকে বলা হয়েছে 'Hindoo Youths'—এঁরা সংস্কারপন্থী, কিন্তু ধর্ম-ভীরু, সমাজভীরু ও সাবধানী। বাণীলাল, শ্যামনাথ, ইন্দ্রনাথ, চন্দ্রকুমার প্রথম দলভুক্ত এবং ভৈরব, কেদারমোহন, হরিচাঁদ প্রভৃতি দ্বিতীয় দলভুক্ত। মহাদেব মুখোপাধ্যায় একজন গোঁড়া ধর্মভীরু হিন্দু, কিন্তু কপট বা অনাচারী ন'ন। কিন্তু প্রাচীন হিন্দু সমাজের কামদেব, দেবনাথ প্রভৃতি মুখপাত্ররা ধর্মের মুখোস

পরে সবরকমের কুকর্ম করেন, বাইরে ধার্মিক সেজে থাকেন। তর্কালঙ্কার ও বিদ্যাবাগীশ নামে দুই গুরুপুরোহিত যেমন ভণ্ড, তেমনি ধূর্ত ও অর্থলোভী। ধর্মান্ধ অজ্ঞ শিষ্যবৃন্দের শাঁসাল মাথায় কাঁঠাল ভেঙে তাঁরা আড়ালে সবরকমের কুকর্ম করে দিন কাটান। তর্কালঙ্কার বলছেন, শিষ্যদের সম্পর্কে :

> Greater brutes never lived in the world. They call us God ? as if we had more hands and noses than other people. O how I wish that these asses continue involved in all these prejudices ?
>
> এর চেয়ে বেশি বর্বর মানুষ পৃথিবীতে কোথাও কোনদিন বাস করত বলে মনে হয় না। ওরা আমাদের ভগবান বলে, যেন অন্যান্য মানুষের চেয়ে আমাদের বেশি হাত-পা নাক আছে। এই গর্দভের দল যতদিন এ রকম কুসংস্কারে আচ্ছন্ন হয়ে থাকে, ততদিন আমাদের সুবিধা।

তর্কালঙ্কারের মুখ দিয়ে কৃষ্ণমোহন যে এই কথাগুলি নিজেই বলেছিলেন, তা পরিষ্কার বোঝা যায়।

নিরীহ গোঁড়া হিন্দু ভদ্রলোক মহাদেব তাঁর পুত্র বাণীলালকে বলছেন, সমাজচ্যুত যদি না হতে চাও, তাহলে লোকের কাছে বাড়ীতে পানভোজনের ব্যাপার অস্বীকার কর। মিথ্যার আশ্রয় নিতে বাণীলাল রাজী নয়, অথচ বৃদ্ধ পিতার অনুরোধ সহজে প্রত্যাখ্যান করাও সম্ভব নয়। বাণীলালের সামনে সমস্যা হল :

A FATHER VERSUS TRUTH

পিতা, না সত্য, কোনটা বড় ?

সত্যের অপলাপ করা ডিরোজিওর মন্ত্রশিষ্য ইয়ং বেঙ্গলের প্রতিনিধির পক্ষে সম্ভব নয়। বাণীলাল তাই বলছেন :

> No—a father's cries are not stronger than those of truth ..... I will bear up all like a man.
>
> না, পিতার ক্রন্দন বা কাকুতি সত্যের চেয়ে বড় নয়। আমি সমস্ত দুঃখ মানুষের মতন বরণ করব।

বাণীলালের চরিত্রে কৃষ্ণমোহন নিজের জীবনকে চিত্রিত করেছেন। যুক্তি ও সত্যই যে ইয়ং বেঙ্গলের কাছে সব চেয়ে বেশি শ্রদ্ধেয়, এই কথাই তিনি বলতে চেয়েছেন। পিতা পরিবার স্নেহ ভালবাসা, সব তার কাছে তুচ্ছ।

'পার্সিকিউটেড' নাটকের মধ্যে, উনিশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকের বাঙালী হিন্দু সমাজের চিত্র সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। গোঁড়ামির চিত্র, ভণ্ডামির চিত্র, ইংরেজী শিক্ষার প্রতিক্রিয়ার চিত্র, নব্যশিক্ষিত তরুণ সমাজের চিত্র।

ইয়ং বেঙ্গলের সমস্ত চারিত্রিক উচ্ছৃঙ্খলতার মধ্যে যে সত্যটি সবচেয়ে বড় হয়ে ফুটে উঠেছিল, সে হল স্বাতন্ত্র্য ও সত্যের মর্যাদাবোধ। নবজাগ্রত সেই বোধশক্তির কাছে সাময়িকভাবে ঐতিহ্যবোধ, সামাজিক ও পারিবারিক কর্তব্য ও দায়িত্ববোধ, সব তখন তলিয়ে গিয়েছিল। ভাঙ-ভাঙ রবে সমাজ মুখর হয়ে উঠেছিল। ভগ্নস্তূপের মধ্যে নবযুগের 'হিউম্যানিজমে'র একবৃন্তের দু'টি ফুল ফুটে উঠল, আত্মস্বাতন্ত্র্যবোধ এবং বিচারসহ সত্যের শ্রেষ্ঠত্ববোধ। সমাজের পঙ্কিল পরিবেশে এ যেন দু'টি সদ্য-ফোটা পদ্মফুল।

দীর্ঘ বারো বছর ঈশ্বরচন্দ্রের ছাত্রজীবন কলকাতা শহরের এই সামাজিক পরিবেশের মধ্যে কেটেছে। সত্যের সঙ্গে সংস্কারের সংগ্রামে, তিনি সংস্কৃত কলেজের গবাক্ষ দিয়ে, গোলদীঘি ও ঠনঠনিয়ার দিকে চেয়ে, বাংলার তরুণ সৈনিকদের, হাসিমুখে নির্ভীকচিত্তে সমস্ত নির্যাতন বরণ করতে দেখেছেন। বড়বাজারে দয়েহাটার নির্জন ঘরে বসে, সংস্কৃত ব্যাকরণ, অলঙ্কার, সাহিত্য ও দর্শনের পাঠ অভ্যাস করতে করতে, বেকন, হিউম, টম পেইন পড়া ইংরেজী-শিক্ষিত এই তরুণদের উচ্ছৃঙ্খলতার নানা কাহিনী শুনেছেন তিনি তাঁর পিতার কাছে।

পিতৃমাতৃগতপ্রাণ ঈশ্বরচন্দ্রের পক্ষে বাণীলালদের 'A Father Versus Truth' কথার প্রকৃত তাৎপর্য বোধ হয় সেদিন উপলব্ধি করা সম্ভব হয়নি।

সত্যের সংগ্রামে যিনি শত বাণীলালের শক্তি নিয়ে সমাজ-রণাঙ্গনে অবতীর্ণ হয়েছিলেন, তিনি সেদিন অন্তত বুঝতে পারেননি যে কৃষ্ণমোহনের এই বাণীলালের এ-উক্তির অর্থ কি?

'No—a father's cries are not stronger than those of truth.'

কিশোর ছাত্র ঈশ্বরচন্দ্রের মনের তটে সেদিন অসংখ্য প্রশ্ন ঢেউয়ের পর ঢেউয়ের মতন আছড়ে পড়েছিল। সব প্রশ্নের উত্তর তিনি খুঁজে পাননি। সে বয়সও হয়নি তাঁর। বিদ্যা বুদ্ধি মন, সবই অপরিণত। তবু নির্মল কিশোরচিত্ত প্রাচীন ও নবীনের সংঘাতে সেদিন গভীরভাবে আলোড়িত হয়েছিল বলে মনে হয়।

১৮৩০-৩২ সালের এই সব ঘটনা-বিপর্যয়ের ফলে হিন্দু সমাজের কর্ণধাররা বেশ চিন্তিত হয়ে পড়েন। নানা পত্রিকায় হিন্দু কলেজের শিক্ষা-পদ্ধতির তীব্র সমালোচনার ফলে তাঁরা অনেকেই নিজেদের ছেলেদের কলেজ ছাড়িয়ে দেন। ১৮৩১ সালের ২৬ এপ্রিল, 'সমাচারচন্দ্রিকা' লেখেন :

> আমরা শুনিয়াছি ৪৫০ কিংবা ৪৬০ জন বালক ঐ কালেজে পাঠার্থে আসিত এক্ষণে প্রায় দুই শত বালক কলেজ ত্যাগ করিয়াছে অধ্যক্ষ মহাশয়েরা ইহার কারণ অনুসন্ধান করিলেই সকলই জানিতে পারিবেন। পরিত্যাগি দুই শত বালকের মধ্যে প্রধান লোকের সন্তান অনেক আমরা সে সকল নামের বিশেষ তত্ত্ব করি নাই কিন্তু জনরব হইয়াছে যে শ্রীযুত বাবু গোপীমোহন দেব শ্রীযুত বাবু হরিমোহন ঠাকুর ও শ্রীযুত বাবু নবীনকৃষ্ণ সিংহ এবং শ্রীযুত বাবু আশুতোষ দেব প্রভৃতি অনেক প্রধান লোক বালকদিগকে কালেজে যাইতে নিষেধ করিয়াছেন···

জনরব সম্পূর্ণ সত্য কিনা বলা যায় না। আংশিক সত্য হলেও, পরিষ্কার বোঝা যায়, সম্ভ্রান্ত পরিবারের অনেকে তাঁদের সন্তানদের কলেজে যাওয়া বন্ধ করেছিলেন। 'সমাচারচন্দ্রিকা'র সংবাদ যদি সত্য হয় এবং ৪৬০ জন ছাত্রের মধ্যে যদি প্রায় দু'শ ছাত্র কলেজ ত্যাগ করে থাকে, তাহলে ডিরোজিওর শিষ্য ইয়ং বেঙ্গল দলের আন্দোলনের আঘাত হিন্দু কলেজে যে কত প্রচণ্ডভাবে লেগেছিল, তা সহজেই অনুমান করা যায়।

সংস্কৃত কলেজের ব্যাকরণশ্রেণীতে বসে ঈশ্বরচন্দ্র শুধু কলেজের ভাঙন নয়, সমাজেরও ভাঙা-গড়া দেখেছিলেন।

কলেজের অধ্যক্ষদের মধ্যে প্রায় সকলেই ছিলেন ধনিক সম্ভ্রান্ত হিন্দু। কলেজের ভবিষ্যতের কথা তাঁরা চিন্তা করতে লাগলেন। সকলে মিলে সমস্ত দোষ শিক্ষক ডিরোজিওর স্কন্ধে চাপিয়ে নিশ্চিন্ত হলেন। ১৮৩১ সালের ২৩ এপ্রিল কলেজের অধ্যক্ষরা এক বৈঠকে মিলিত হয়ে ডিরোজিওর আচরণ ও ধর্মবিদ্বেষী শিক্ষানীতি সম্পর্কে আলোচনা করেন। অধ্যক্ষদের মধ্যে প্রবল মতভেদ হয়। উইলসন, হেয়ার, শ্রীকৃষ্ণ সিংহ ডিরোজিওকে পদচ্যুত করার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেন। অবশেষে কলেজের স্বার্থে ডিরোজিওকে বরখাস্ত করার প্রস্তাব গৃহীত হয়।[৮] কলেজের অন্যতম পরিচালক হোরেস হেম্যান উইলসন যে অভিযোগপত্র ডিরোজিওকে পাঠান, তার উত্তরে তিনি যা লেখেন তার মর্ম এই :

> আমি যে পদ্ধতিতে শিক্ষা দিই তাতে যদি কলেজের ছাত্রদের প্রচলিত ধর্মবিশ্বাস টলে থাকে, তার জন্য আমি দায়ী নই। ছাত্রদের মনে কোন বিশ্বাস বা বদ্ধ ধারণা প্রতিষ্ঠিত করা আমার সাধনাতীত। যদি কয়েকজনের নাস্তিকতার জন্য আমি অপরাধী গণ্য হয়ে থাকি, তাহলে অন্যান্য সকলের আস্তিকতার জন্যও যা কিছু কৃতিত্ব তা আমারই প্রাপ্য বলতে হয়। বিশ্বাস করুন, সাধারণত কোন নগণ্য বিষয় সম্বন্ধেও আমি কোন সুনিশ্চিত অভিমত ব্যক্ত করি না। সব বিষয় সম্বন্ধেই আমার মনে যে প্রশ্ন, যে অনিশ্চয়তা ও সংশয়ভাব আছে, তাতে কোনরকম গোঁড়ামির আমি প্রশ্রয় দিতে পারি না। আমি কখন এমন কথা বলতে পারি না যে 'এটা ঠিক, আর ওটা ঠিক নয়'।

উত্তরে কোন ফল হয়নি। ডিরোজিওকে শেষ পর্যন্ত কলেজ ছাড়তে হয়েছিল। কলেজের ছাত্ররা কোন বিদায়সভার আয়োজন করে তাঁর প্রতি সেদিন শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করার কোন সুযোগ পায়নি। ম্লানমুখে, মাথাহেঁট করে, নবীন বাংলার অন্যতম দীক্ষাগুরু তাঁর শিক্ষায়তন থেকে সেদিন বিদায় নিতে বাধ্য হয়েছিলেন।

গোলদীঘির এই বিদ্যালয়-প্রাঙ্গণে সভার সমারোহ না হলেও, ছাত্রদের মধ্যে নিশ্চয় সেদিন চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছিল। শিক্ষক ডিরোজিওর প্রসঙ্গ

সকলের মুখে মুখে শোনা গিয়েছিল। সংস্কৃত কলেজ ও হিন্দু কলেজের প্রাঙ্গণ একই ছিল। গঙ্গাধর তর্কবাগীশের ছাত্র ঈশ্বরচন্দ্র ডিরোজিওকে চোখের দেখা দেখেছিলেন নিশ্চয়। ডিরোজিও ও তাঁর ছাত্রদের উপর দিয়ে যে ঝড় বয়ে গিয়েছিল সেদিন তাও তিনি আগাগোড়া দেখেছিলেন।

কলেজ ছাড়বার কয়েক মাস পরে, ১৮৩১ সালের ডিসেম্বর মাসে ডিরো-জিওর অকালমৃত্যু হল।

এদিকে, ১৮৩০ সালের দ্বিতীয়ভাগে, অ্যালেকজাণ্ডার ডাফ সাহেব কলকাতায় পৌঁছবার পরে, হিন্দুধর্মবিরোধী আন্দোলন যখন প্রবল হয়ে উঠল এবং ধর্মান্তরের সমস্যা সামাজিক সঙ্কটরূপে দেখা দিল, তখন রামমোহন রায় বিলাতযাত্রা করলেন (১৯ নভেম্বর ১৮৩০)।

বাংলার এক ঐতিহাসিক যুগসন্ধিক্ষণে, সংস্কার আন্দোলনের প্রত্যক্ষ নেতৃত্ব ত্যাগ করে রামমোহন রায় বিলাত যাত্রা করলেন। অল্পদিনের মধ্যে রামমোহনের মৃত্যু হল বিদেশে (১৮৩৩, ২৭ ডিসেম্বর)।

উত্তাল তরঙ্গসঙ্কুল সমাজবক্ষে ইয়ং বেঙ্গল দল কাণ্ডারীহীন অবস্থায় অসহায়ের মতন নিক্ষিপ্ত হলেন। শক্তিশালী ধর্মসভাপন্থীদের বিরুদ্ধে তাঁরা এই অসহায় অবস্থায়, দৃঢ়চিত্তে সংগ্রাম করেছেন। সেই সংগ্রামে তাঁদের একমাত্র শক্তি ছিল অবিচলিত আদর্শানুরাগ ও অপরাজেয় সত্যনিষ্ঠা। ঈশ্বরচন্দ্র তার সমস্ত উত্থান-পতন স্বচক্ষে দেখেছিলেন।

কৃষ্ণমোহন যখন বিবাহ করেন তখন তাঁর বয়স পনের-ষোল বছর এবং তাঁর বালিকাবধূ বিন্দুবাসিনীর বয়স ছ'বছর। যখন তিনি খ্রীস্টধর্মে দীক্ষা নেন, তখন তাঁর স্ত্রীর বয়স ন-দশ বছর মাত্র। ধর্মান্তরিত হয়ে তাঁকে উভয়-সঙ্কটে পড়তে হয়। পারিবারিক জীবন থেকে তিনি যখন বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে বাধ্য হন, তখন সাময়িকভাবে তাঁকে এই বালিকাবধূর সংসর্গও কিছুদিনের জন্য ত্যাগ করতে হয়।

ডিরোজিও ও রামমোহনের মৃত্যুর পরে ইয়ং বেঙ্গলের তরী যখন ঘূর্ণিবাত্যায় সমাজবক্ষে টলটলায়মান, কৃষ্ণমোহন ও তাঁর কয়েকজন তরুণ বন্ধু যখন তার কাণ্ডারী, তখন ঈশ্বরচন্দ্র সাহিত্যশ্রেণীতে জয়গোপাল তর্কালঙ্কারের ছাত্র।

বাংলার নব্য ইংরেজী-শিক্ষিত তরুণরা যখন বেকন, লক, হিউম, ভলটেয়ার, টম পেইন পড়ছেন, তখন ঈশ্বরচন্দ্র তাঁর প্রিয় অধ্যাপকের কাছে রঘুবংশ, কুমারসম্ভব, মেঘদূত, শকুন্তলা ইত্যাদি সাহিত্য-রসভাণ্ডার আস্বাদন করছেন। তখন তাঁর বয়ঃসন্ধিক্ষণ।

এই সময় ঈশ্বরচন্দ্রের বিবাহ হয়। রামজীবনপুর গ্রামের আনন্দচন্দ্র অধিকারী প্রথমে বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করে যান। তাঁর যাত্রার দল ছিল বলে সকলে তাঁকে 'অধিকারী' বলত। যাত্রার দলের অধিকারীরা তখন যথেষ্ট অর্থ উপার্জন করতেন। আনন্দচন্দ্র ধনিক ছিলেন, তাঁর বড় কোঠা বাড়ী ছিল। ব্রাহ্মণসন্তান, কলকাতা শহরে লেখাপড়া শিখছে শুনে তিনি পাত্র-নির্বাচন করতে এসেছিলেন। কিন্তু বীরসিংহের ভাবী জামাতার পর্ণকুটীর দেখে তাঁর মন উঠল না। ঈশ্বরচন্দ্রও যাত্রার দলের অধিকারীর কন্যা বিবাহ করতে সম্মত হলেন না। বিবাহের সম্বন্ধ ভেঙে গেল। পরে জগন্নাথপুরের চৌধুরীবাড়ী বিবাহ স্থির হল, কিন্তু তাও শেষ পর্যন্ত ঘটে উঠল না। অবশেষে ক্ষীরপাই গ্রামনিবাসী পণ্ডিতবংশের শত্রুঘ্ন ভট্টাচার্য একদিন বীর-সিংহ গ্রামে ঠাকুরদাসের গৃহে এসে বললেন: 'ঈশ্বর শুনছি নাকি বিদ্বান হয়েছে, কলকাতার কলেজে লেখাপড়া শিখছে। তাই ভাবছি, সৎপাত্রে কন্যাদান করব।' ভট্টাচার্য মহাশয় কোষ্ঠী গণনা করে দেখেছেন, তাঁর কন্যাটি খুবই সুলক্ষণা। বিবাহের কোন অন্তরায় নেই।

ক্ষীরপাই গ্রামের শত্রুঘ্ন ভট্টাচার্যের কন্যা দিনময়ী দেবীর সঙ্গে ঈশ্বরচন্দ্রের বিবাহ হল। তাঁর বয়স তখন বছর চোদ্দ হবে। ঢাক-ঢোল বাজিয়ে, পাল্কি চড়ে, ক্ষীরপাই থেকে ঈশ্বরচন্দ্র তাঁর বালিকাবধূ দিনময়ীকে নিয়ে বীরসিংহে এলেন।

ছাত্রজীবনেই ঈশ্বরচন্দ্রের উপনয়ন ও বিবাহ হয়ে গেল।

এদিকে বাইরের সামাজিক আলোড়ন ক্রমে পত্র-পত্রিকার আলোচনা ও সভা-সমিতির বৈঠকী বিতর্কে পরিণত হল। সামাজিক জীবনের নানা-বিধ সমস্যার ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে, স্বাধীনভাবে তর্কবিতর্ক ও আলাপ-

আলোচনা করার তাগিদ থেকেই সভা-সমিতির বিকাশ হয়। বাংলার সমাজ-জীবনে এই ধরনের অবাধ আলোচনার সভা-সমিতি সম্পূর্ণ নতুন প্রতিষ্ঠান। মধ্যযুগের সমাজে এর কোন অস্তিত্ব ছিল না। মানুষের জীবনের বাঁধাধরা প্রয়োজন ও সমস্যার তখন চিরাচরিত পদ্ধতিতেই সমাধান করা হত। স্বাধীন আলাপ-আলোচনার তাগিদও ছিল না তখন, স্বাধীনতাও ছিল না। নতুন সামাজিক পরিবেশে সেই তাগিদ এল, স্বাধীনতাও পাওয়া গেল। সভা-সমিতির প্রাচুর্য ও বৈচিত্র্যের মধ্যে তার প্রকাশ হল। সামাজিক আন্দোলনের অন্যতম প্রাণকেন্দ্র হল এই সভা-সমিতিগুলি। ঈশ্বরচন্দ্রের ছাত্রজীবনেই এমন কতকগুলি সভা-সমিতির প্রতিষ্ঠা হল, বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসে যার গুরুত্ব অনস্বীকার্য। ঈশ্বরচন্দ্রের ছাত্রজীবনকে বাংলার সভা-সমিতির এই স্বর্ণযুগ বলা চলে। এই সময়কার বহু সভা-সমিতির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল :

অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান হিন্দু অ্যাসোসিয়েশন (১৮৩০)
জ্ঞানসন্দীপন সভা (১৮৩০)
সর্বতত্ত্বদীপিকা সভা (১৮৩২)
সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা (১৮৩৮)
তত্ত্ববোধিনী সভা (১৮৩৯)

সাহিত্য বিজ্ঞান দর্শন সমাজ শিক্ষা অর্থনীতি ইত্যাদি এমন কোন যুগোপযোগী বিষয় ছিল না, যা নিয়ে এই সব সভা-সমিতিতে আলোচনা না হত। বাংলার শিক্ষিত-সমাজের এই আলোচনামুখর পরিবেশে ঈশ্বরচন্দ্রের ছাত্রজীবন কেটেছে। কিশোর বালক থেকে তিনি যুক্তিবাদী যুবক হয়ে উঠেছেন।

আরও একটি কথা এই প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার। সমাজ শিক্ষা প্রভৃতি যে সব বিষয় নিয়ে ঈশ্বরচন্দ্র তাঁর কর্মজীবনের অধিকাংশ সময় সংগ্রাম করেছিলেন, সংস্কারের যে সব সমস্যা তাঁর কাছে সবচেয়ে গুরুতররূপে দেখা দিয়েছিল, তার সবগুলিই তাঁর ছাত্রজীবনে, ইয়ং বেঙ্গলের আন্দোলনের ও আলোচনার মধ্য দিয়ে সকলের কাছে প্রধান বিচার্য ও বিবেচ্য বিষয় হয়ে

উঠেছিল। ঈশ্বরচন্দ্র তাঁর কর্মজীবনের সমস্ত প্রেরণা তাঁর ছাত্রজীবনের সামাজিক আন্দোলনের ধারার ভিতর থেকেই পেয়েছিলেন। হঠাৎ ব্যক্তিগত জীবনের কোন ঘটনায় বিচলিত হয়ে, অথবা মাতৃভক্তি বা পিতৃভক্তির প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে তিনি সমাজসংস্কারের আন্দোলনে অবতীর্ণ হননি। সে-রকম কোন উপকথা বা কিংবদন্তী রচনা করে, তাই দিয়ে তাঁর বিরাট কর্মজীবনের উৎস-সন্ধানে যাত্রা করা অর্থহীন ও যুক্তিহীন।

সমাজ-জীবনের ইতিহাস বা সামাজিক আন্দোলনের ইতিহাসও তা নয়। সমাজ-জীবনে কোন সমস্যা ও প্রয়োজন যখন ঐতিহাসিক মর্যাদা নিয়ে, অন্তত সবচেয়ে সচেতন একশ্রেণীর লোকের মনে প্রতিষ্ঠিত হয়, সমাজের প্রাণকেন্দ্র যখন তাই নিয়ে; যত মৃদুমন্দ ভাবেই হোক, স্পন্দিত হতে থাকে, তখন সেই সমাজের ভিতর থেকেই শক্তিমান, প্রতিভাবান, দূরদর্শী ও সৎসাহসী পুরুষরা সংস্কারকের রূপে আবির্ভূত হন। 'সম্ভবামি যুগে যুগে' কথার ঐতিহাসিক ও সামাজিক অর্থও তাই।

মানবসমাজে যুগে যুগে যত যুগপুরুষ জন্মেছেন, তাঁদের কর্মময় জীবনের সর্বপ্রধান উৎস লোকসমাজ। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরও তার ব্যতিক্রম ন'ন।

বাইরের আন্দোলনের একটি অতি প্রবল তরঙ্গোচ্ছ্বাস যখন পারিবারিক জীবনের সুস্থির ভিত্তিকে পর্যন্ত সজোরে নাড়া দিয়ে, সবেমাত্র সাময়িকভাবে প্রশমিত হয়েছে এবং একেবারে শান্ত হয়ে যায়নি, তখন গোলদীঘির বিদ্যালয়ের প্রাচীরঘেরা প্রাঙ্গণ থেকে ঈশ্বরচন্দ্র বাইরের সমাজের মুক্ত অঙ্গনে এসে দাঁড়ালেন।

১১ | কর্মজীবনের সূচনা

লালদীঘির ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে ঈশ্বরচন্দ্র, ১৮৪১ সালের ২৯ ডিসেম্বর, বাংলা বিভাগের সেরেস্তাদারের (প্রধান পণ্ডিতের) পদে নিযুক্ত হলেন। গোলদীঘির বিদ্যালয়ে অধ্যয়নের পর্ব শেষ হবার কয়েকদিনের মধ্যেই লালদীঘির কলেজে তিনি চাকরি পেলেন। গোলদীঘির দ্বাদশ বছর ছাত্রজীবনের পর, কর্মজীবনের শুরু হল লালদীঘিতে।

লালদীঘির পরিপার্শ্ব তখন কেমন ছিল, সে সম্বন্ধে একজন বিদেশী প্রত্যক্ষদর্শী যা লিখেছেন তার মর্ম এই :[১]

> ট্যাঙ্ক স্কয়ারের উত্তরদিকে হল রাইটার্স বিল্ডিং নামে সুন্দর সারবন্দী গৃহশ্রেণী। দক্ষিণদিকে হল পাবলিক এক্সচেঞ্জ এবং কয়েকটি সদাগরী আপিস, পশ্চিমদিকে ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক ও কাস্টম হাউস এবং পুবদিকে 'বেঙ্গল ক্লাব হাউস' ও 'ম্যুর হিকি অ্যাণ্ড কোম্পানী'র নিলামঘর। এদেশী লোকেরা ট্যাঙ্ক স্কয়ার অঞ্চলকে লালদীঘি বলে। লালদীঘির দক্ষিণে হেস্টিংসের একটি মর্মর মূর্তি আছে। স্কয়ারের পুবদিকে ওল্ড কোর্ট হাউস স্ট্রীট। রাইটার্স বিল্ডিং-এ আগে কোম্পানীর রাইটাররা থাকতেন। এখন তার একটি অংশে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ স্থাপিত হয়েছে।

১৮৪২-৪৩ সালের লালদীঘির বর্ণনা। যে সময় থেকে ঈশ্বরচন্দ্র নিয়মিতভাবে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে যাতায়াত করতে আরম্ভ করেন, সেই সময়ের কথা।

নবযুগের বাংলার ইতিহাসে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ একটি আলোকস্তম্ভের মতন দাঁড়িয়েছিল একদিন। চারিদিকে তখন অন্ধকার ও বিশৃঙ্খলা। বণিকের মানদণ্ডটিকে রাতারাতি রাজদণ্ডে পরিণত করার পথে অন্তরায় অনেক। কোন্ দিকে, কোন্ পথে চলতে হবে, তা নির্ণীত হয়নি, অথচ বিদেশী হঠাৎ-শাসকরা দুর্নীতির জোয়ারে গা-ভাসিয়ে চলেছেন। এই সময় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ তাঁদের দিকনির্ণয়ের জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়, ১৮০০ সালে।

বিদ্যাসাগর যখন সেরেস্তাদারের পদে নিযুক্ত হলেন, তখন তাঁর বয়স বাইশ বছর। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বয়স তখন বিয়াল্লিশ। এতদিন ধরে কলেজের হলঘরে ইংরেজ সিবিলিয়ানদের সঙ্গে এদেশী পণ্ডিতদের প্রত্যক্ষ পরিচয় ঘটেছে। পণ্ডিত ও মুনশীরা যে কেবল সিবিলিয়ানদের বাংলা ফার্সী হিন্দী ভাষা শিক্ষা দিয়েছেন তা নয়, নিজেরাও অনেকে ইংরেজী শিখেছেন। কেবল ভাষার বিনিময় হয়নি, ভাবেরও বিনিময় হয়েছে। ভারতীয় ও ইয়োরোপীয় জীবনের ভাবধারা ও সামাজিক আদর্শের আদান-প্রদান হয়েছে। কেবল গোলদীঘির হিন্দু কলেজে হয়নি, লালদীঘির ফোর্ট উইলিয়ম কলেজেও হয়েছে।

যে বাংলা গদ্যভাষায় আজ আমরা বিচার-বিতর্ক করি, সাহিত্য রচনা করি, তারও জন্মস্থান ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ।

হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার অনেক আগে থেকেই ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে পাশ্চাত্ত্য ভাবধারার আমদানি আরম্ভ হয়েছে এবং নবযুগের তরুণ ছাত্রদের আগে সেযুগের পণ্ডিতমশাইরা সেই ভাবধারার সংস্পর্শে এসেছেন। বাংলা-দেশের এই কলকাতা শহরের লালদীঘির তীরে, সদাগরী পরিবেশের মধ্যে, পূর্ব-পশ্চিমের 'উপহার' দেওয়া-নেওয়ার পালা প্রথম শুরু হয়েছে।

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের শেষ পর্বে, অপরাহ্ণকালে বলা চলে, বিদ্যাসাগর মহাশয় তার প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে আসার সুযোগ পেয়েছিলেন। তা পেলেও, হ্যালিডে, সিটন-কার, বিডন প্রমুখ এমন একদল আদর্শোদ্দীপ্ত সিবিলিয়ানের

প্রত্যক্ষ সান্নিধ্যলাভ তিনি করেছিলেন, যাঁদের বলিষ্ঠ উদারনীতি ও বিচারবুদ্ধি তাঁকে বিশেষভাবে কর্মজীবনে অনুপ্রাণিত করেছিল। কর্মজীবনের প্রারম্ভের এই প্রেরণা তাঁর ভবিষ্যৎ জীবনের দিকনির্ণয়ে যে কতকটা অন্তত সাহায্য করেছিল, তা অস্বীকার করা যায় না।

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা করেছিলেন লর্ড ওয়েলেসলি। রেভারেণ্ড হাটন তাঁর ওয়েলেসলি-জীবনীর প্রথমেই লিখেছেন :[২]

> On the roll of British Rulers of India there is no greater name than that of Richard Marquess Wellesley...if it was Clive who won and Hastings who preserved the English foothold in the great peninsula, it was Wellesley incontestably who founded the British Empire in the East.

ভারতের ব্রিটিশ শাসকদের মধ্যে ওয়েলেসলির মতন কৃতী পুরুষ অল্পই ছিলেন। ক্লাইভ সাম্রাজ্য জয় করেছিলেন, হেস্টিংস তা রক্ষা করেছিলেন, আর ওয়েলেসলি তার পাকাপোক্ত ভিত পত্তন করেছিলেন বলা চলে। হাটনের কথা মিথ্যা নয়। ওয়েলেসলির মতন দূরদর্শী ও দৃঢ়চিত্ত শাসক, উনিশ শতকের প্রথমার্ধে, আর কেউ এদেশে আসেননি।

মহীশূর-বিজয়ী ওয়েলেসলির আভিজাত্যবোধ যেমন সজাগ ছিল, নজর তেমনি উঁচু ছিল। উপেক্ষিত বণিকের স্তর থেকে তিনি ইংরেজদের প্রকৃত শাসকের স্তরে উন্নীত করতে চেয়েছিলেন এবং করেছিলেনও। উইলিয়ম হিকি তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন যে, ওয়েলেসলি যে রকম বিলাসিতার মধ্যে বাস করতেন তা কল্পনাতীত। তাঁর আসবাবপত্র, উৎসব, খানাপিনা, ভোজসভা, চালচলনের জমক দেখে কলকাতার লোক স্তম্ভিত হয়ে যেত। সর্বব্যাপারে যেমন তিনি রাজকীয় চালে চলতেন, তেমনি রাজকীয় ভঙ্গিতে চিন্তাও করতেন। মধ্যযুগের নোংরা অবিন্যস্ত বন্দর-নগর থেকে, কলকাতা শহরকে আধুনিক মহানগরে রূপান্তরিত করার পরিকল্পনা তিনিই করেছিলেন। ব্রিটিশ

শাসকদের নতুন রাজধানীর আভিজাত্য ও স্বাতন্ত্র্য কলকাতা শহরের বাইরের রূপের মধ্যে ফুটে উঠুক, এই ছিল তাঁর কাম্য। কলকাতায় রাস্তাঘাট, ড্রেন, স্কয়ার ও নতুন নতুন গৃহনির্মাণের পরিকল্পনা তিনিই করেন। অভিজাত মহানগরের কেন্দ্রস্থলে থাকবে ভারতের বড়লাট বাহাদুরের প্রাসাদতুল্য অট্টালিকা। এও ওয়েলেসলির পরিকল্পনা। তার জন্য পুরনো গবর্ণমেণ্ট হাউস ভেঙে, তার সঙ্গে কাউন্সিল হাউস এবং আরও ষোলখানা প্রাইভেট ম্যানসান দখল করে (সব ক'টি নতুন গৃহ, পাঁচ বছরের বেশি তৈরি হয়নি), সেগুলি সব ধূলিসাৎ করে দিয়ে নতুন লাট সাহেবের অট্টালিকা নির্মাণ করার পরিকল্পনা করেন ওয়েলেসলি।[৩] পুব-পশ্চিম, উত্তর-দক্ষিণের বিশাল প্রশস্ত উদ্যান ও স্কোয়ারের মধ্যে 'লাটসাহেবের বাড়ী' কলকাতা শহরের হাজার হাজার অট্টালিকার সভায় সভাপতির মতন বিরাজ করবে। তবেই তো ইংরেজ শাসকের মর্যাদা বজায় থাকবে। ওয়েলেসলির সব পরিকল্পনাই ছিল এইরকম রাজকীয় পরিকল্পনা।

রাজকীয় হলেও, অথবা মধ্যযুগের মতন জমকবহুল হলেও, ওয়েলেসলির চিন্তাধারার মধ্যে যে প্রশস্ততা ছিল, শিক্ষা ও সমাজ-সংস্কারের ক্ষেত্রে তার প্রয়োগের ফলাফল একদিক থেকে ভালই হয়েছিল। হাটন তাই মন্তব্য করেছেন : 'Of a piece with his magnificence in entertainment was the attitude which Wellesley assumed towards public works, the arts and learning.'[৪] কেবল লাটপ্রাসাদ নয়, কলকাতা মহানগরে ঠিক অক্সফোর্ড কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের মতন একটি বিদ্যায়তন স্থাপন করতে হবে, এও তাঁর পরিকল্পনা ছিল। এই বিদ্যায়তনে নতুন ইংরেজ সিবিলিয়ানরা এদেশের ভাষা, সাহিত্য, লোকাচার, সামাজিক রীতিনীতি ইত্যাদি শিক্ষা করবেন। শিক্ষা দেবেন এদেশের পণ্ডিতরা। এইভাবে শিক্ষা পেলে তাঁরা শাসনযোগ্যতা অর্জন করবেন। তা না হলে তরুণ বয়সে স্বদেশ (ইংলণ্ড) থেকে কেবল কয়েকটি বাণিজ্যের সূত্র মুখস্থ করে এসে, সদাগরী সঙ্কীর্ণ মনোবৃত্তি নিয়ে অন্য দেশের শাসক হওয়া যায় না। শিক্ষার অভাবে তাঁরা উচ্ছৃঙ্খল, স্বেচ্ছাচারী ও অনুদার হতে বাধ্য হন। দেশের লোক তাঁদের শ্রদ্ধা করতে পারে না। ইংরেজ শাসকরা এখন আর কোম্পানীর আমলের বণিকদের

এজেণ্ট নন, তাঁরা ইংরেজ জাতির প্রতিনিধি। ইংরেজদের শিক্ষাদীক্ষা, সংস্কৃতি ও জাতীয় ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক যদি তাঁরা না হতে পারেন, তাহলে 'সাত সমুদ্দুর তের নদী' পার হয়ে এসে, পরদেশ শাসন করার কোন অধিকার তাঁদের নেই। যে দেশ শাসন করতে হবে, সে-দেশের ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও সমাজ-জীবন সম্বন্ধেও যথেষ্ট জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। তার জন্য একটি বিদ্যায়তন স্থাপন করা প্রয়োজন, যেখানে এদেশের পণ্ডিতরা ভাবী ইংরেজ শাসকদের শিক্ষা দেবেন। কোম্পানীর ডিরেক্টরদের এই সব সবিস্তারে জানিয়ে ওয়েলেসলি একটি 'নোট' পাঠান (১০ জুলাই, ১৮০০)। কলেজের কাজ আরম্ভ হয় ১৮০০ সালের ২৪ নবেম্বর থেকে।[৫]

ওয়েলেসলির ইচ্ছা ছিল, অক্সফোর্ড-কেম্ব্রিজের মতন একটি আবাসিক বিদ্যায়তন স্থাপন করা। সেই উদ্দেশ্যে তিনি গার্ডেনরীচ অঞ্চলে পাঁচখানি ভাল বাগানবাড়ী কিনেছিলেন এবং নতুন করে গৃহনির্মাণের পরিকল্পনাও করেছিলেন। যতদিন তা না হয়, ততদিনের জন্য মধ্য কলকাতায় ম্যাকডোনাল্ড নামে একজন ড্যান্সিংমাস্টারের প্রকাণ্ড অট্টালিকা (পাবলিক এক্সচেঞ্জ) তিনি লীজ নেন।[৬] পরে রাইটার্স বিল্ডিংএ ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ স্থানান্তরিত হয় এবং কোম্পানীর ডিরেক্টরদের পোষকতার অভাবে গার্ডেনরীচের পরিকল্পনা ত্যাগ করতে হয়। অক্সফোর্ড-কেম্ব্রিজের আদর্শে পেট্রন, ভিজিটার, প্রোভোস্ট প্রভৃতি নিযুক্ত হন। আর্বী ফার্সী হিন্দুস্থানী ও বাংলা ভাষা-সাহিত্য শিক্ষা দেবার জন্য এদেশী অনেক পণ্ডিত ও মৌলবীও নিযুক্ত হন। বাংলা বিভাগের প্রধান অধ্যাপক নিযুক্ত হন পাদ্রি উইলিয়ম কেরী। প্রধান পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, দ্বিতীয় পণ্ডিত রামনাথ বাচস্পতি, এবং সহকারী পণ্ডিত শ্রীপতি রায়, আনন্দচন্দ্র শর্মা, রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়, কাশীনাথ তর্কালঙ্কার, পদ্মলোচন চূড়ামণি, রামরাম বসু। পণ্ডিতদের মাসিক বেতনও তখনকার দিনের বিচারে ভালই ছিল। প্রধান পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয়ের বেতন ছিল মাসিক ২০০৲, দ্বিতীয় পণ্ডিত রামনাথের ১০০৲। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের তখন স্বর্ণযুগ।

বিদ্যাসাগরের আমলে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের এ-অবস্থা ছিল না। তখন তার দীনাবস্থা। গোড়া থেকেই কোম্পানীর বণিকবুদ্ধিসর্বস্ব ডিরেক্টররা ওয়েলেসলির এই শিক্ষাদীক্ষার সাড়ম্বর আয়োজনকে সুনজরে দেখেননি।

কলেজের কাজ আরম্ভ হবার অল্পদিন পরেই, ১৮০২ সালের ২৭ জানুয়ারীর একটি পত্রে তাঁরা কলেজ বন্ধ করে দিতে বলেন। পত্র পেয়ে ওয়েলেসলি ক্ষুব্ধ হন বটে, কিন্তু কলেজ বন্ধ না করে পত্রোত্তরে আবার তার আবশ্যকতার কথা উল্লেখ করেন। বিলাতের 'ইণ্ডিয়া আফিসে'র দলিলপত্রের মধ্যে একটি ঐতিহাসিক পত্র আছে এই শিরোনামে: 'Mr. Hasting's observations on Lord Wellesley's minute relative to the College at Fort William.'[৭] ওয়েলেসলির প্রস্তাব সমর্থন করে হেষ্টিংস যা মন্তব্য করেন তার মর্ম এই:

> প্রায় বছর পঁয়ত্রিশ আগে আমি এ-বিষয়ে একটি পরিকল্পনা খসড়া করি। তাতে আমি প্রস্তাব করি যে, অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি ফার্সী অধ্যাপকের পদ সৃষ্টি করা হোক এবং ফার্সী শিক্ষার ব্যবস্থা করা হোক। প্রস্তাবটি মুদ্রিত করে আমি কোম্পানীর ডিরেক্টরদের পাঠাই। বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলার আমার প্রস্তাব সমর্থন করেন। স্বর্গীয় ডক্টর জনসন বলেন যে প্রস্তাব গৃহীত হলে তিনি অন্যান্য সব ব্যবস্থা করে দেবেন। কিন্তু তা হয় না এবং প্রস্তাবটিকে চাপা দিয়ে দেওয়া হয়। একথা বলার উদ্দেশ্য এই যে, হঠাৎ আমি কোন সাময়িক ইচ্ছার বশে লর্ড ওয়েলেসলির প্রস্তাব সমর্থন করছি না। এ-সম্বন্ধে দীর্ঘকাল ধরে আমি নিজেও চিন্তা করেছি এবং ওয়েলেসলির প্রস্তাব আমি সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করি। তাঁর প্রস্তাব আরও বিস্তৃত এবং তিনি বাংলাদেশে এই শিক্ষার ব্যবস্থা করতে চান। এদিক দিয়েও তাঁর বক্তব্য আমি যুক্তিসঙ্গত ও প্রণিধেয় মনে করি।

ওয়েলেসলির নিজের যুক্তি এবং তাঁর সমর্থকদের যুক্তির চাপে কোম্পানীর কর্তারা তাঁদের পূর্বমত সংশোধন করে, ১৮০৩ সালের ২ সেপ্টেম্বর জানান যে, কলেজ রাখা হোক, কিন্তু মাদ্রাজ ও বোম্বাইয়ের রাইটারদের জন্য নয়, কেবল বাংলাদেশের রাইটারদের জন্য রাখা হোক। ১৮০৭ সাল থেকে তাই করা হয়, প্রোভোস্ট, ভাইস-প্রোভোস্টের পদ তুলে দেওয়া হয়, পণ্ডিত-মুনশীদের সংখ্যাও অনেক কমিয়ে দেওয়া হয়। কলেজের পূর্বপ্রাধান্য তাতে রীতিমত ক্ষুণ্ণ হয়।

এর মধ্যে আবার ১৮০৬ সালের ২১ মে কোম্পানীর ডিরেক্টররা জানান যে হেলিবেরিতে তাঁরা সিবিলিয়ানদের শিক্ষার জন্য একটি কলেজ স্থাপনের সঙ্কল্প করেছেন এবং সেখানে কেবল ইয়োরোপীয় বিদ্যা নয়, প্রাচ্য বিদ্যা ও ভাষা তাঁরা শিক্ষা করবেন। তবে হয়ত হেলিবেরি কলেজে তাঁদের প্রাচ্য বিদ্যা ও ভাষাশিক্ষা সম্পূর্ণ হবে না এবং তার জন্য তাঁদের ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে আরও কিছুদিন শিক্ষা দেওয়ার প্রয়োজন হবে। যথাসম্ভব স্বল্পব্যয়ে সেই উদ্দেশ্যে কলেজের কাজ চালাতে হবে। হেলিবেরির এই কলেজ স্থাপিত হবার পর স্বভাবতই ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের গুরুত্ব অনেক কমে যায়। উইলিয়ম বেণ্টিঙ্কের আমলে কলেজের কাজকর্ম আরও সঙ্কুচিত হয়। একজন সেক্রেটারী, তিনজন পরীক্ষক ও কয়েকজন মাত্র পণ্ডিত ও মুনশী ছাড়া বাকি সব অধ্যাপক ও তাঁদের সহকারীদের কর্মচ্যুত করা হয়।

১৮৪১-৪২ সালে বিদ্যাসাগর যখন ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাংলা বিভাগের প্রধান পণ্ডিতের পদে নিযুক্ত হন, তখন নতুন নিয়মকানুন প্রবর্তন করে কলেজের কাজ আরও সঙ্কুচিত করা হয়। ১৮৪১ সালের ২৩ জুন এই নিয়মাবলী প্রবর্তিত হয় (Rules and Regulations of the College of Fort William, 1841)। বিদ্যাসাগর তার ছ' মাস পরে কলেজে যোগদান করেন। কলেজের সিবিলিয়ান ছাত্রদের জীবনযাত্রার দিকে আরও সতর্ক দৃষ্টি দেবার জন্য সেক্রেটারীকে অনুরোধ করা হয়। সেক্রেটারীর সম্মতি ও অনুমোদন ভিন্ন ছাত্ররা কলেজগৃহের বাইরে কোন স্থানে বাস করতে পারবেন না। অকর্মণ্য ও অলস ছাত্রদের যত শীঘ্র সম্ভব দেশে ফিরে যেতে হবে। একবছরের মধ্যে কোন ছাত্র যদি দু'টি ভাষা শিখতে না পারেন, তাহলে আলস্য না অক্ষমতা, কি কারণে তিনি তা পারেননি, সেক্রেটারী সে-বিষয়ে তদন্ত করবেন। আলস্যের জন্য হলে তৎক্ষণাৎ সেই ছাত্রকে স্বদেশে পাঠাবার ব্যবস্থা করতে হবে। আর অক্ষমতার জন্য হলে তাঁকে আরও তিন মাস সময় দেওয়া হবে। যদি তার মধ্যেও তিনি শিখতে না পারেন, তাহলে দেশে ফিরে যেতে হবে। ১৮৪২ সালের ২০ জুলাই থেকে, বাংলা ও ফার্সী শিক্ষার বদলে বাংলা ও উর্দু ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের এই নতুন পরিবেশে বিদ্যাসাগরের কর্মজীবন শুরু হয়।

কলেজের পরিবেশের ও সিবিলিয়ান ছাত্রদের জীবনযাত্রার এই পরিবর্তন সম্বন্ধে সমসাময়িক কোন সমালোচক 'ক্যালকাটা রিভিউ' (১৮৪৬ সালে) পত্রিকায় যা লেখেন তার মর্ম এই :[৮]

কলেজের কেবল নামটিই আছে এখন, আর কিছুই নেই। তার লক্ষ্য, তার শিক্ষাপদ্ধতি ও পরিবেশ, ত্রিশ বছর আগে যা ছিল, এখন আর তা নেই। সিবিলিয়ান ছাত্রদের মনোবৃত্তির বা জীবনযাত্রার একটা যে মৌলিক পরিবর্তন কিছু হয়েছে, তা নয়। খেলোয়াড়, পড়ুয়া ও সেরা জেণ্টলম্যান হবার বাসনা এখনও তাঁদের উগ্র। ভল্লুক-শিকার ও বাঘ-শিকারে কৃতিত্ব দেখানো এখনও তাঁদের প্রধান লক্ষ্য। মাথায় গবর্ণমেণ্টের সরকারী নিয়ম-কানুন ছাড়া আর কোন বস্তুর স্থান নেই। লেখাপড়াটা গৌণ ব্যাপার। এখনও চৌরঙ্গীর সালোঁতে তাঁদের দৈনন্দিন জীবনের বেশির ভাগ সময় কেটে যায়। তবে আগেকার সিবিলিয়ান ছাত্রদের সঙ্গে তাঁদের তফাৎ এই যে, বিলাসিতার বহর তাঁদের অনেক কম, এবং তার কারণ আর্থিক। এখনও যে তাঁরা ঋণগ্রস্ত হন না, তা নয়। তবে আগে ঋণের বহর লাখ টাকা পর্যন্ত ছাড়িয়ে যেত, এখন সেটা পাঁচ হাজারে এসে দাঁড়িয়েছে।

'বিদ্যাসাগর' উপাধি পেয়ে ঈশ্বরচন্দ্র সংস্কৃত কলেজের পাঠ শেষ করেছেন। তার কয়েক দিনের মধ্যেই সরকারী চাকরিও পেলেন। পিতা ঠাকুরদাসের মনে সেদিন যে কি ভাবের উদয় হয়েছিল, তা কেউ জানে না। না জানলেও বোঝা যায়। বাগবাজারের সিংহ মহাশয়ের বাড়ী বসে একদিন আট বছরের বালক ঈশ্বরচন্দ্রের শিক্ষা নিয়ে তর্কবিতর্ক হয়েছিল। দরিদ্র অসহায় পিতার পুত্রটিকে তাঁর আত্মীয়-স্বজন এমন কোন শিক্ষা দিতে চেয়েছিলেন, বাইরের নির্মম জগতে যার বিনিময়-মূল্য আছে, যার দৌলতে সহজে কোন সাহেবের হৌসে চাকরি পাওয়া যায়। সে-বিদ্যা সেদিন ইংরেজী-বিদ্যা হলেই চলত। ঠাকুরদাসের ইচ্ছা ছিল ঈশ্বরচন্দ্র গ্রামে গিয়ে চতুষ্পাঠী খোলেন এবং অধ্যাপনা করে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতবংশের সন্তানের কর্তব্য পালন করেন। স্বপ্নবিলাসী তিনি ছিলেন না,

তাঁর পুত্রও ছিলেন না। ভাল চাকরি করে ঈশ্বর তাঁর সংসার স্বচ্ছন্দে প্রতিপালন করবে, এরকম কোন বাসনা কোনদিন তাঁর মনে বাসা বাঁধেনি। তবু যেদিন ঈশ্বরচন্দ্র সসম্মানে সরকারী চাকরিতে নিযুক্ত হলেন, সেদিন নিশ্চয় ঠাকুরদাসের মন খুশিতে ভরে উঠেছিল। শহর থেকে দূরে বীরসিংহ গ্রামেও এই আনন্দের বার্তা রটে গিয়েছিল।

পিতা ছিলেন মাসিক দশ টাকা বেতনের চাকরিজীবী। সারা দিন টাকা আদায় করে ঘুরে ঘুরে, ত্রিশ দিন পরে তিনি নিজে দশটি টাকা মজুরি পেতেন। এখন ঈশ্বরচন্দ্রের মাসিক বেতন হল পঞ্চাশ টাকা, পিতার বেতনের পাঁচ গুণ। বয়সও ঠাকুরদাসের পঞ্চাশ হয়েছে, প্রৌঢ় হয়েছেন তিনি। দেহ-মনে ক্লান্তির চিহ্ন ফুটে উঠেছে। দশ টাকা বেতনের চাকরি করার এখন আর তাঁর প্রয়োজন কি? একদিন ঠাকুরদাসকে ঈশ্বরচন্দ্র বললেন: 'বাবা, এখন আর আপনার এরকম হাড়ভাঙা খাটুনি খেটে দশ টাকা রোজগার করার দরকার নেই। আমি তো পঞ্চাশ টাকা বেতন পাব, তাতেই কোনরকমে কুলিয়ে যাবে। আপনি এখন দেশে ফিরে গিয়ে বিশ্রাম নিন। পঞ্চাশ টাকা থেকে কুড়ি টাকা করে প্রতি মাসে আপনাকে পাঠাব, বাকি ত্রিশ টাকায় কলকাতার বাসা খরচ চালিয়ে নেব।'

পুত্র আর সেই দশ-বারো বছর আগেকার একগুঁয়ে একাঘেঁড়ে 'ঈশ্বর' নন শুধু, পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। বাইশ বছর তাঁর বয়স হয়েছে, বিবাহিত তিনি, নাবালক নন। তাঁর কথা সহজে ফেলা যায় না। ঠাকুরদাস প্রথমে আপত্তি করেন। সেকালের পিতাদের আত্মস্বাতন্ত্র্যবোধ এত প্রবল ছিল যে সহজে তাঁরা পুত্রনির্ভর হতে চাইতেন না। দশ টাকা বেতনের সামান্য চাকরি হলেও, ঠাকুরদাস তাই দিয়ে অসামান্য কাজ করেছেন। কেবল সংসার প্রতি-পালন করেননি, ঐ দশ টাকা দিয়ে তিনি ঈশ্বরচন্দ্রকে শহরে লেখাপড়া শিখিয়ে 'বিদ্যাসাগর' করে গড়ে তুলেছেন, মানুষ করেছেন। সরকারী পঞ্চাশ টাকার চাইতে এই বেসরকারী দশ টাকার দাম অনেক বেশি।

শেষ পর্যন্ত ঠাকুরদাসের আপত্তি টিকল না। কেউ কেউ বলেন, এই সময় তিনি একদিন কলকাতার পথে অশ্বের পদাঘাতে আহত হন। তার জন্য ঈশ্বরচন্দ্র তাঁকে দেশে পাঠাবার জন্য আরও ব্যস্ত হয়ে ওঠেন। কথাটা মিথ্যা

না-ও হতে পারে। কলকাতা শহরে তখন আধুনিক 'মোটর-ট্র্যাফিক' না থাকলেও, ঘোড়ার গাড়ী ও ঘোড়ার উৎপাত ছিল যথেষ্ট। পথে দুর্ঘটনাও কম ঘটত না। ঠাকুরদাসকে পথে পথে চাকরির কাজে ঘুরে বেড়াতে হত। একদিন দুর্ঘটনা ঘটা আশ্চর্য নয়। যাই হোক, চাকরি ছেড়ে শেষ পর্যন্ত তিনি দেশে ফিরে যেতে রাজী হন। পনের বছর বয়সে তিনি কলকাতা শহরে চাকরি করতে এসেছিলেন। তখন ঈশ্বরচন্দ্র জন্মাননি। প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর ধরে তিনি একটানা একঘেয়ে চাকরি করছেন। কৈশোর থেকে প্রৌঢ়ত্বে পা দিয়েছেন। এখন তাঁর বিশ্রাম নেওয়া দরকার।

চাকরি ছাড়ার সময় ঠাকুরদাসের মনিব তাঁকে সদুপদেশ দেন : 'বৃদ্ধ বয়সে চাকরি ছেড়ে পুত্রের মুখাপেক্ষী হবেন না। শহরের চাকরি, ছেলে বয়সে তরুণ, কখন কি মতিগতি হয় ঠিক নেই, শেষজীবনে বিপদে পড়বেন।' ঠাকুরদাস বলেন : 'আমার ছেলেকে আমি চিনি। আপনার উপদেশ শিরোধার্য করতে পারলাম না।' অবশেষে তিনি চাকরি ছাড়লেন।

শহর ছেড়ে গ্রামে ফিরে গেলেন ঠাকুরদাস। ঈশ্বরচন্দ্র প্রতি মাসে তাঁকে কুড়ি টাকা করে পাঠাতেন, বাকি ত্রিশ টাকায় অতিকষ্টে কলকাতার বাসা-খরচ চালাতেন। বাগবাজার ছেড়ে তখন তিনি বহুবাজার অঞ্চলে বাসা করলেন। বাগবাজারে সিংহ-পরিবারে তার আগে থেকেই তাঁদের স্থান সঙ্কুলান হচ্ছিল না। দুই ভাই দীনবন্ধু ও শম্ভুচন্দ্র বাসায় থাকতেন। চারজনের পক্ষে দয়েহাটার বাড়ীতে থাকা সম্ভব হচ্ছিল না। খাওয়া-দাওয়ার কষ্ট তো ছিলই, বাসেরও কষ্ট হচ্ছিল। শেষদিকে ঈশ্বরচন্দ্র নিজে রান্না করে, সকলকে খাইয়ে-দাইয়ে, কলেজে পড়তে যেতেন। এই সময় ঠাকুরদাস ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়েন। সিংহ-পরিবারের আর্থিক অবস্থাও খুব খারাপ হয়। তাঁরা বাড়ীর খানিকটা অংশ ভাড়া দিতে বাধ্য হন। তখন ঠাকুরদাস তাঁর পুত্রদের নিয়ে দয়েহাটায় সিংহদের এক প্রতিবেশীর গৃহে একটি পরিত্যক্ত কক্ষে কোনরকমে রাত্রিযাপন করতেন। ঈশ্বরচন্দ্রের ছাত্রজীবনের শেষকালটা এই দুরবস্থার মধ্যে কেটেছিল। সুতরাং চাকরি পাবার পর প্রথমেই বাসা বদল করার প্রয়োজন হল। বাগবাজার ছেড়ে তাঁরা বহুবাজারে গেলেন।

বহুবাজারে পঞ্চাননতলায় নিতাই সেনের বাড়ীতে প্রথমে ঈশ্বরচন্দ্রের বাসা

ছিল। বাড়ীর বাইরের দু'টি ঘর ভাড়া নিয়ে তিনি থাকতেন। একটি ঘরে তিনি ও তাঁর ভাইরা থাকতেন, আর একটি ঘরে অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনরা থাকত। কলকাতা শহরের বাসা তখন গ্রাম্য আত্মীয়কুটুম্বের কাছে তীর্থস্থানের মতন ছিল। পরিবারের মধ্যে একজন কারও বাসা হলে, অন্যান্য সকলে যে যখন সুযোগ পেতেন সেখানে এসে কিছুদিন বাস করে যেতেন। কেউ লেখাপড়া শিখতে আসতেন, কেউ আসতেন চাকরির ধান্ধায়, কেউ কালীঘাট তীর্থদর্শনে, কেউ বা গঙ্গাস্নানের পুণ্যার্জনের আশায়। রুগ্ন আত্মীয়রা আসতেন রোগমুক্ত হতে, কন্যাদায়গ্রস্তরা আসতেন শহরে পাত্রের সন্ধানে। যৌথপরিবারের ডালপালাগুলি তখনও অবিচ্ছিন্ন ছিল। পরিবারের স্ত্রী-পুরুষরা স্নেহকরুণা, দয়াদাক্ষিণ্য থেকে সহজে কাউকে বঞ্চিত করতেন না। এই অবস্থায় ঈশ্বরচন্দ্রের মতন দরিদ্র ব্রাহ্মণসন্তান সরকারী চাকরি পেয়ে বাসা করলে, সেই বাসাটি যে আত্মীয়জনের অবশ্যগম্য তীর্থস্থান হয়ে উঠবে, তাতে বিস্মিত হবার কিছু নেই।

নিতাই সেনের বাড়ী ছেড়ে কিছুদিন পরে হৃদয়রাম বন্দ্যোপাধ্যায়ের বৈঠকখানা বাড়ীতে তিনি নতুন বাসা করে উঠে যান। বাসায় তখন ঈশ্বরচন্দ্র ও তাঁর দুই সহোদর ভাই ছাড়াও, দু'জন খুড়তুতো ভাই, দু'জন পিসতুতো ভাই, একজন মাসতুতো ভাই ও শ্রীরাম নামে ভৃত্য বাস করত। মোট ন'জন। বাসা ভাড়া দিয়ে, এই ন'জনের আহারাদির খরচ ত্রিশ টাকায় চালাতে হত। রান্নাবান্না পালাক্রমে নিজেদেরই করতে হত, ঈশ্বরচন্দ্রও করতেন। রান্নাবান্না করে খেয়েদেয়ে তিনি ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে চাকরি করতে যেতেন। বহুবাজার থেকে কলেজে যাতায়াতের সুবিধা হত। বহুবাজারে বাসা করার অন্যতম কারণও বোধ হয় তাই ছিল। তা ছাড়া আরও একটি কারণ ছিল যা অনেকেরই অজ্ঞাত। বহুবাজারে 'জেলিয়াপাড়া' ও অন্যান্য পাড়ায় চন্দ্রকোণা ক্ষীরপাই ঘাটাল ও আরামবাগ অঞ্চলের লোকের বাস তখন বেশি ছিল। বীরসিংহের আশপাশের গ্রামের অনেক লোকজন এই অঞ্চলে বসবাস করতেন। এ অঞ্চলের প্রাচীন পরিবারের মধ্যে এখনও অধিকাংশই ঘাটাল ও আরামবাগ অঞ্চলের লোক। তাঁরা নানাজাতির লোক হলেও এবং ভিন্ন বৃত্তিজীবী হলেও, ঈশ্বরচন্দ্রের সঙ্গে তাঁদের অনেকের পরিচয় ও বন্ধুত্ব ছিল।

বহুবাজার অঞ্চলের স্থায়ী বাসিন্দাদের মধ্যে অনেকে এই কারণে ঈশ্বরচন্দ্রকে প্রায় স্বগ্রামবাসী বলে মনে করতেন। তখন যদিও তিনি স্বনামধন্য 'বিদ্যাসাগর' হননি, তাহলেও দরিদ্র ব্রাহ্মণের ছেলে লেখাপড়া শিখে পণ্ডিত হয়েছেন, সরকারী কলেজে পণ্ডিতের চাকরি পেয়েছেন, এ খবর অনেকেই রাখতেন এবং সেজন্য তাঁকে শ্রদ্ধাও করতেন। বহুবাজার অঞ্চলে বাসা করার এও একটি কারণ হতে পারে।

বহুবাজারের বাসা থেকে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে যাতায়াতের সুবিধা ছিল সবচেয়ে বেশি। সোজা পথ ধরে মাইল খানেক হাঁটলেই রাইটার্স বিল্ডিং। অধিকাংশ সময় ঈশ্বরচন্দ্র হেঁটেই কলেজে যেতেন মনে হয়। কারণ ত্রিশ টাকায় কলকাতার বাসা খরচ কুলিয়ে, পাল্কি বা ঘোড়ার গাড়ী ভাড়া করে কলেজে যাতায়াত করার মতন উদ্‌বৃত্ত অর্থ থাকত না। অতএব হেঁটেই চাকরি করতে যেতে হত। তা ছাড়া, বহুবাজার থেকে রাইটার্স বিল্ডিং পর্যন্ত তাঁর পক্ষে হেঁটে যাওয়া আদৌ কষ্টকর বোধ হত না। স্বচ্ছন্দে তিনি হেঁটে যেতেন। বহুবাজার ছাড়িয়ে টিরেটা বাজার, কসাইতলার পাশ দিয়ে লালবাজার পার হয়ে তিনি লালদীঘির রাইটার্স বিল্ডিংএ ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে পৌঁছতেন এবং ছুটির পর আবার হেঁটেই ফিরে আসতেন বাসায়।

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে ঈশ্বরচন্দ্রের সঙ্গে অনেক প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী ইংরেজ কর্মচারীর পরিচয় হবার সুযোগ হল। ক্যাপটেন মার্শাল ক্রমেই এই বাঙালী পণ্ডিতের কাজকর্মে, ব্যবহারে ও চরিত্রগুণে মুগ্ধ হলেন। শিক্ষা-পরিষদের (Council of Education) সেক্রেটারী ডক্টর ময়েটের সঙ্গে তিনি ঈশ্বরচন্দ্রের পরিচয় করিয়ে দিলেন। মার্শাল সাহেবের পরামর্শেই তিনি ইংরেজী ও হিন্দী শিখতে আরম্ভ করেন। সিবিলিয়ান ছাত্রদের পরীক্ষার কাগজপত্র তাঁকে দেখতে হত। ছাত্রদের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শেও আসতে হত। তার জন্য ইংরেজী ও হিন্দী শিক্ষার প্রয়োজন হল।

একজন হিন্দুস্থানী পণ্ডিতের কাছে তিনি নিয়মিত হিন্দী শিখতে আরম্ভ করেন। তাঁকে তিনি মাসিক দশ টাকা বেতন দিতেন। সকালে যতক্ষণ সময় পেতেন, তিনি এই পণ্ডিতের কাছে হিন্দী শিখতেন। ইংরেজীর শিক্ষক

ছিলেন সুরেন্দ্রনাথের পিতা, তালতলানিবাসী ডাক্তার দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। তখন অবশ্য তিনি ডাক্তারী পাশ করেননি। হেয়ার সাহেবের স্কুলে দুর্গাচরণ শিক্ষকতা করতেন। ঈশ্বরচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর গভীর সৌহার্দ্য ছিল। প্রায় প্রত্যেক দিন বিকেলবেলায় দুর্গাচরণ বেড়াতে আসতেন ঈশ্বরচন্দ্রের বাসায়। তালতলা থেকে বহুবাজার খুব দূর নয়। বিকেলে এসে দুই বন্ধুতে বসে নানা বিষয়ে তর্কবিতর্ক ও গল্প করতেন। কথাপ্রসঙ্গে একদিন ঈশ্বরচন্দ্রের ইংরেজীশিক্ষার কথা উঠলে, দুর্গাচরণবাবু স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে তাঁকে ইংরেজী শেখাতে রাজী হন। কিছুদিন পরে দুর্গাচরণের এক ছাত্র নীলমাধব মুখোপাধ্যায়ের উপর তাঁর ইংরেজী শিক্ষার ভার পড়ে। তার পরে হিন্দু কলেজের ছাত্র রাজনারায়ণ গুপ্তের কাছে তিনি ইংরেজী শেখেন। রাজনারায়ণ প্রতিদিন ঈশ্বরচন্দ্রের বাসায় আহার করে হিন্দু কলেজে পড়তে যেতেন এবং যৎকিঞ্চিৎ পারিশ্রমিকও পেতেন। এইভাবে ঈশ্বরচন্দ্রের ইংরেজী শিক্ষা চলতে থাকল। আশৈশব তাঁর চরিত্রের অন্যতম গুণ ছিল একগুঁয়েমি। যখন যা করব বলে তিনি মনে করতেন, তা সমস্ত বাধাবিপত্তি ঠেলে শেষ পর্যন্ত করতেন। তা না করতে পারলে, কিছুতেই তিনি স্বস্তি পেতেন না। ইংরেজী ও হিন্দী শিক্ষাও আরম্ভ করে, শেষ না করা পর্যন্ত তাই তিনি একদিনের জন্যও ক্ষান্ত হননি।

এদিকে সংস্কৃত চর্চারও তাঁর বিরাম ছিল না। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে চাকরি করার সময় তিনি আবার ভাল করে সাংখ্য ও পুরাণ অধ্যয়ন করেন। বাড়ীতেও তখন সংস্কৃত চর্চার ধুম পড়ে যায়। অনেকে তাঁর কাছে সংস্কৃত শিখতে আসতেন। তাঁদের মধ্যে শ্যামাচরণ সরকার, রামরতন মুখোপাধ্যায়, নীলমণি মুখোপাধ্যায়, রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। সহজ প্রণালীতে সংস্কৃত শিক্ষা দেবার কৌশল তিনি জানতেন। অনেক চিন্তা করে এই নতুন প্রণালী তিনি উদ্ভাবন করেছিলেন। শিক্ষার্থীরা বিস্মিত হয়ে যেতেন। এত সহজে যে দুরূহ দেবভাষা মর্ত্যের মানুষের পক্ষে শেখা সম্ভব, তা এর আগে কেউ কোনদিন কল্পনাও করতে পারতেন না। সকলেই তাঁর কাছে সংস্কৃত শিক্ষার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। গণ্যমান্য পরিচিত ব্যক্তিরা তাঁর কাছে পাঠ নেবার জন্য বাসায় আসতে আরম্ভ করলেন। একদিকে তিনি

নিজে ইংরেজী শিখছেন, আর একদিকে অন্যদের সংস্কৃত শিক্ষা দিচ্ছেন সহজ প্রণালীতে। এইভাবে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের চাকুরী জীবনের অবসর সময়টুকু কাটতে লাগল।

রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় বহুবাজার-নিবাসী বিখ্যাত বেনিয়ান হৃদয়রাম ব্যানার্জির পৌত্র। বিদ্যাসাগরের বাসার সামনেই তাঁর বাড়ী ছিল এবং তখন হৃদয়রামের বাড়ীর বৈঠকখানা ভাড়া নিয়ে বিদ্যাসাগর মহাশয় থাকতেন। রাজকৃষ্ণবাবুর বয়স তখন পনের-ষোল বছর। তিনি দুবেলা ঈশ্বরচন্দ্রের কাছে আসতেন এবং আলাপ-পরিচয় করতেন। ক্রমে উভয়ের পরিচয় অন্তরঙ্গ হয়ে ওঠে। রাজকৃষ্ণবাবু তাঁর সংস্কৃত পড়ানো দেখতেন ও শুনতেন। সংস্কৃত কাব্যপাঠও তিনি অনেকদিন শুনে মুগ্ধ হয়েছেন। ক্রমে তাঁর সংস্কৃত শিক্ষার ইচ্ছা প্রবল হল। হিন্দু কলেজে তিনি কিছুদিন পড়ে, অল্প বয়সেই পড়াশুনা ছেড়ে দিলেন। সংস্কৃত শিক্ষার ইচ্ছা হলেও প্রকাশ করতে তিনি সঙ্কোচবোধ করেন। একদিন হঠাৎ তাঁর মনোবাসনা তিনি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কাছে প্রকাশ করে ফেলেন। কিন্তু সংস্কৃত মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ আয়ত্ত করা কঠিন ভেবে তিনি মুষড়ে পড়েন। ঈশ্বরচন্দ্র তাঁকে আশ্বাস দিয়ে বলেন : 'মুগ্ধবোধের দুর্লঙ্ঘ্য গিরিশৃঙ্গ তোমাকে সহজেই পার করিয়ে দেব, চিন্তা করো না। একদিন সমস্ত বোধশক্তি বিসর্জন দিয়ে এই মুগ্ধবোধের দুর্বোধ্য সূত্র মুখস্থ করেছি। পরে যখন সাহিত্যের রসসমুদ্রে অবগাহন করে ভাষা সম্বন্ধে বোধোদয় হয়েছে, তখন বুঝেছি ব্যাকরণের মহিমা কি এবং তা হৃদয়ঙ্গম করার কৌশল কি। তোমার কোন ভয় নেই, ব্যাকরণ-আতঙ্ক থেকে তোমাকে নিষ্কৃতি দেব। সংস্কৃত শিখতে তোমার কষ্ট হবে না।'

রাজকৃষ্ণ আশান্বিত হয়েও, ঠিক ভরসা পাচ্ছিলেন না। পরে একদিন এসে তিনি দেখেন যে, কয়েক দিস্তা কাগজে বাংলা অক্ষরে নতুন এক ব্যাকরণ লেখার কাজ ঈশ্বরচন্দ্র প্রায় শেষ করে ফেলেছেন। উদ্দেশ্য, রাজকৃষ্ণ ও তাঁর বাসার অন্যান্য শিক্ষার্থীদের সংস্কৃত শিক্ষা দেওয়া। এই প্রণালী থেকেই পরে বিদ্যাসাগর মহাশয় 'উপক্রমণিকা' ও 'ব্যাকরণকৌমুদী' রচনার প্রেরণা পান। মুগ্ধবোধের আতঙ্ক থেকে তিনি দেবভাষাশিক্ষার্থী সাধারণ মানুষকে এইভাবে মুক্ত করেন।

এই সময় সংস্কৃত কলেজে জুনিয়র ও সিনিয়র পরীক্ষার প্রচলন ছিল। ঈশ্বরচন্দ্র রাজকৃষ্ণকে সিনিয়র পরীক্ষা দেবার জন্য প্রস্তুত হতে বলেন। 'আমি কি পরীক্ষায় পাশ করতে পারব?' বলে রাজকৃষ্ণবাবু প্রায় হাল ছেড়ে দেন। ঈশ্বরচন্দ্র বলেন: 'ঠিক পারবে। রোজ খাওয়া-দাওয়া করে আমার সঙ্গে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে যাবে। কলেজের কাজের ফাঁকে আমি তোমায় পড়াব। তারপর আবার বাড়ীতে এসে পড়বে। একটু পরিশ্রম করতে হবে। পারবে না করতে?'

এর পর না পারার কথা ওঠে না। না পারলেও পারতে হয়। তাই তাঁকে করতে হত। রোজ সকালে খেয়েদেয়ে বেলা ন'টার সময় তিনি ঈশ্বরচন্দ্রের সঙ্গে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে যেতেন। সেখানে কাজের ফাঁকে পড়াশুনা হত। বেলা তিনটার পর কলেজের কাজ শেষ করে ঈশ্বরচন্দ্র তাঁকে পড়াতেন, সন্ধ্যা পর্যন্ত। তারপর বাসায় ফিরে আবার পড়া ও পড়ানো চলত। অনেক দিন তাঁর বাসাতেই রাত্রে খাওয়া-দাওয়া করে রাজকৃষ্ণবাবু ঘুমিয়ে থাকতেন।

এইভাবে চার-পাঁচ বছরের পাঠ বছর দুই আড়াইয়ের মধ্যে শেষ করে, রাজকৃষ্ণবাবু সংস্কৃত কলেজের সিনিয়র পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। শহরময় এ বার্তা রাষ্ট্র হয়ে যায়। ঈশ্বরচন্দ্র এক অসাধ্যসাধন করেছেন। রাষ্ট্র হবারই কথা। ধনিক বেনিয়ানবংশের নন্দনকে সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত করে তোলা সহজ কাজ নয়। তিনি যেমন হিন্দু কলেজের ছাত্রের কাছে ইংরেজী শিখতেন, তেমনি ইংরেজী-শিক্ষিত অনেক হিন্দু কলেজের ছাত্রও তাঁর কাছে সংস্কৃত শিখত।

ঈশ্বরচন্দ্রের বহুবাজারের বাসাবাড়ীর বৈঠকখানা ক্রমে ছোটখাট একটি বিদ্যায়তনে পরিণত হল। ইংরেজী হিন্দী সংস্কৃত শিক্ষা আরম্ভ হল সেখানে। শিক্ষক ও শিক্ষার্থী, একসঙ্গে দু'জনেরই কর্তব্য তিনি করতে লাগলেন। কর্ম-জীবনের শুরু হল শিক্ষা দিয়ে। তখনও তার সীমানা বহুবাজার থেকে লালদীঘি পর্যন্ত বিস্তৃত। আধুনিক যুগের বাংলার শ্রেষ্ঠ শিক্ষাগুরু, বহুবাজার থেকে লালদীঘির এই সঙ্কীর্ণ সীমানার মধ্যেই, শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষানবীশি করেন।

১২ | সমাজ-জীবনের খরস্রোত ১৮৪১-৫০

দুস্তর কর্মজীবনের সামনে যখন ঈশ্বরচন্দ্র এসে দাঁড়ালেন, তখন বাইরের সমাজ-জীবনে বহুমুখী খরস্রোত বইছে। দশ বছর আগে ছাত্রজীবনের প্রারম্ভে, সমাজের যে-চিত্র তিনি দেখেছিলেন, তার সঙ্গে এ-চিত্রের পার্থক্য অনেক। তখন ডিরোজিওর শিষ্য-ছাত্রবৃন্দ ইয়ং বেঙ্গল দলের সামাজিক প্রগতির অত্যুৎসাহ যেমন উদ্দাম, তেমনি উগ্র ও উচ্ছৃঙ্খল ছিল। কিশোর বয়সের প্রথম প্রেরণা চারিদিকের বাঁধ ভেঙে বাইরে সর্বত্র উপ্‌চে পড়ছিল। তাই একদিকে কেবল পূর্বপক্ষের 'ভাঙ ভাঙ' রব, আর একদিকে প্রতিপক্ষের 'হায় হায়' আর্তনাদে মুখর হয়ে উঠেছিল সেদিনের সমাজ। কিশোর বালক ঈশ্বরচন্দ্র বিহ্বল হয়ে সে-দৃশ্য দেখেছিলেন, গোলদীঘির বিদ্যালয় থেকে।

তারপর দীর্ঘ দশ-বারো বছর কেটে গেছে। নদী-প্রবাহের পাললিক স্তরের মতন অনেক মাটি জমেছে মনের গভীরে। সেদিনের নিতান্ত বালকেরা এখন মানুষ হয়েছে। বিচারবুদ্ধি তাদের স্থির, ধীর ও শান্ত হয়েছে। ভাঙনের সঙ্গে যুগপৎ গড়নের আবশ্যকতাও সকলে বোধ করেছেন। ফেনিল আবর্তের পরিবর্তে সমাজের বুকে স্থির খাতবাহী খরস্রোত সঞ্চারিত হয়েছে। বিভিন্ন সভা-সমিতি ও পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে শিক্ষা ও সমাজ-সংস্কারের নানাবিধ সমস্যা লোকচক্ষুর সামনে তুলে ধরা হচ্ছে। সমস্যা সমাধানের পথেরও সন্ধান

করছেন সকলে। নানা পথ ও নানা মতের সংঘর্ষ চলছে। পথের সন্ধানই বড় কথা। কেবল আলোচনা ও সমালোচনা নয়, আঘাত ও প্রতিঘাত নয়, অথবা কেবল এগিয়ে চলার একটা অন্ধ আবেগসর্বস্ব আগ্রহ বা আকাঙ্ক্ষাও নয়। সেই আবেগ ও আকাঙ্ক্ষাকে একটা সুচিন্তিত কর্মপন্থার বাস্তব ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করাই আসল কথা।

ঊনবিংশ শতাব্দীর চতুর্থ দশকের সামাজিক জীবনে এই সত্যের উপলব্ধি, বাইরের সমস্ত বিকৃতির মধ্যেও, যত ব্যাপক ও গভীর হয়ে ওঠে, তৃতীয় দশকে ততটা হয়নি। তৃতীয় দশকের আন্দোলনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল আবেগ-সর্বস্বতা। চতুর্থ দশকে সুচিন্তিত কর্মপন্থার অনুসন্ধানই প্রধান হয়ে উঠল। কেবল কথা নয়, কাজ করার প্রয়োজনও সকলে বোধ করলেন। আবেগ ও আতিশয্যকে সংযত করে, প্রত্যেকটি অনাচার ও ব্যভিচারের বিরুদ্ধে পদে পদে সংগ্রাম করে, প্রত্যক্ষ কর্মপন্থা গ্রহণ করে, সামাজিক লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে চলাই হল, এই সময়কার সমস্ত প্রগতিশীল আন্দোলনের প্রধান উদ্দেশ্য ও বৈশিষ্ট্য।

ঈশ্বরচন্দ্রের কর্মজীবন-প্রসঙ্গে একথা বিশেষভাবে মনে রাখা প্রয়োজন। কারণ তাঁর কর্মজীবনের প্রেরণা তাঁর মাতৃভক্তি এবং কেবল তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের উপলব্ধি থেকে আসেনি। মাতৃভক্তি, যে-কোন ব্যক্তির মতন, ঈশ্বরচন্দ্রেরও ব্যক্তিগত চরিত্রের গুণ। সমাজ-জীবনের কর্মধারার সঙ্গে তার কোন প্রত্যক্ষ সম্পর্ক নেই। সবচেয়ে বড় কথা, কেবল হৃদয়াবেগের বশীভূত হয়ে কর্মজীবনের কঠোর পথে এগিয়ে চলার পক্ষপাতী ঈশ্বরচন্দ্র কোনকালেই ছিলেন না। তাই এত বড় মানবপ্রেমিক হয়েও তিনি কোনদিন সেই প্রেম বাইরে লোকচক্ষুর সামনে প্রকাশ বা জাহির করতে চাননি। নির্মম বাস্তবতা-বোধ, গভীর সমাজচেতনা, সত্যনিষ্ঠা ও নির্মল যুক্তিবাদিতার অন্তরালে তাঁর হৃদয়াবেগ সবসময় অন্তঃসলিলার মতন প্রবাহিত হত। বাইরের জীবনে তা উচ্ছ্বাসে তরঙ্গায়িত হয়ে উঠত না।

কর্মজীবনের প্রেরণা তো বটেই, তার প্রত্যেকটি নীতি, পন্থা ও পরিকল্পনা পর্যন্ত ঈশ্বরচন্দ্র তাঁর সমসাময়িক সমাজ-জীবন থেকে সংগ্রহ করেছিলেন। শিক্ষার ক্ষেত্রেই হোক, আর সমাজসংস্কারের ক্ষেত্রেই হোক, কোন ক্ষেত্রে কোন

আন্দোলনই তিনি কেবল আত্মোপলব্ধির প্রেরণায় করতে প্রবৃত্ত হননি। আরও পরিষ্কার করে বলা যায়, ব্রাহ্মসমাজ ও ইয়ং বেঙ্গল দলের প্রগতিশীল আন্দোলনের ধারা থেকেই তিনি কর্মজীবনের প্রেরণা পেয়েছিলেন এবং বিশেষ কোন দলভুক্ত না হয়েও তিনি সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে সেই আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করে সকলের সহযাত্রী হতে পেরেছিলেন। তাঁর নিজের চারিত্রিক সদ্‌গুণাবলী, এই স্বাতন্ত্র্য ও নেতৃত্ব অর্জনে তাঁকে কতকটা সাহায্য করেছিল।

যে সময় ঈশ্বরচন্দ্র ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে সেরেস্তাদারের চাকরি নিয়ে তাঁর কর্মজীবন আরম্ভ করেন, সেই সময় কলকাতার তথা বাংলার সামাজিক, নৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশ কি রকম ছিল, তা জানা এইজন্যই প্রয়োজন। কি পরিবেশের মধ্যে তিনি ধীরে ধীরে পা ফেলে তাঁর কর্মজীবনের লক্ষ্যের পথে এগিয়ে গিয়েছিলেন, তা না জানলে তাঁর প্রকৃত ঐতিহাসিক ভূমিকার সুবিচার করা সম্ভব নয়।

১৮৪১ থেকে ১৮৫০ সাল পর্যন্ত তাঁর কর্মজীবনের প্রস্তুতির পর্ব বলা যায়। এর মধ্যে ১৮৪১ সালের ডিসেম্বর থেকে ১৮৪৬ সালের এপ্রিল পর্যন্ত, প্রায় চার বছর চার মাস কাল তিনি ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে একটানা সেরেস্তাদারি করেন। তারপর প্রায় এক বছর তিন মাস ৬ এপ্রিল ১৮৪৬ থেকে ১৬ জুলাই ১৮৪৭ পর্যন্ত সংস্কৃত কলেজের সহকারী সম্পাদকের কাজ করেন। পরে আবার প্রায় এক বছর নয় মাস, ১ মার্চ ১৮৪৯ থেকে ৪ ডিসেম্বর ১৮৫০ পর্যন্ত ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের হেড রাইটার ও কোষাধ্যক্ষের কাজ করেন। একবার ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ, একবার সংস্কৃত কলেজ, এইভাবে তাঁর প্রথম কর্মজীবন প্রধানত চাকরির টানাটানিতেই কেটে যায়। অবশেষে ১৮৫০ সালের ৫ ডিসেম্বর তিনি সংস্কৃত কলেজের সাহিত্যের অধ্যাপক নিযুক্ত হন এবং তার একমাস কয়েকদিন পরেই (১৮৫১, ২২ জানুয়ারী) কলেজের অধ্যক্ষপদ লাভ করেন। তখন তাঁর বয়স একত্রিশ বছর। এই সময় থেকেই তাঁর কর্মজীবনের মধ্যাহ্নের শুরু। মধ্যের একুশ থেকে একত্রিশ বছর পর্যন্ত দশটি মূল্যবান বছর তিনি যে কেবল সরকারী চাকরি করে অপচয় করেছেন, তা নয়। বাইরের

বৃহত্তর সমাজের পাঠশালায় তিনি তাঁর কর্মজীবনের শিক্ষানবীশি করেছিলেন। গোলদীঘির কলেজের শিক্ষার পরে লালদীঘির এ-শিক্ষার গুরুত্ব অল্প নয়।

অগ্রগতির কথা বলবার আগে, সমাজের অবনতি ও অধোগতির লক্ষণ ঈশ্বরচন্দ্র যা দেখেছিলেন, তার কথা বলা যাক।

আধুনিক নাগরিক জীবনের সব চেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হল, অজ্ঞাতকুলশীলতা Anonymity)। গ্রাম্যসমাজে মানুষের সঙ্গে মানুষের যে প্রত্যক্ষ মুখোমুখি পরিচয় থাকে, পরিবারের সঙ্গে পরিবারের যে কুলগত সম্পর্কের বাঁধন থাকে, নাগরিক সমাজে তা থাকে না। একজন নগরবাসী আর একজনের কাছে অজ্ঞাতকুলশীল ছাড়া কিছু নয়।[১] উনিশ শতকের চতুর্থ দশকে, ঈশ্বরচন্দ্র যখন কলকাতার বৃহত্তর নাগরিক সমাজ-জীবনের সান্নিধ্যলাভ করতে আরম্ভ করেন, তখন তার এই বৈশিষ্ট্যটি বেশ পরিষ্কার ফুটে উঠেছিল। বৃত্তি ও ব্যবসায়ের ধাক্কায় গ্রাম ছেড়ে শহরে এসে, সকলে তাদের বংশপরিচয় ও আত্মপরিচয় হারিয়ে ফেলত। একই অঞ্চলের লোক এক পাড়ায় বসবাস করলে হয়ত পরস্পরকে চিনত জানত, তা না হলে চেনা-জানার কোন সুযোগই হত না। ঈশ্বরচন্দ্র যখন বহুবাজারে বাস করে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে চাকরি করতেন, তখন দু'একজন ঘাটালবাসী ছাড়া, তাঁর পাড়ার লোকে কেউ তাঁকে চিনত না। চেনবার মতন স্বনামধন্যও তিনি তখন হননি। যখন হয়েছিলেন তখনও খুব বেশি লোক তাঁকে চিনত জানত বলে মনে হয় না। হয়ত নামে জানত, আজও যেমন আমরা বহু স্বনামধন্য ব্যক্তিকে কেবল নামে জানি, তেমনি। সংবাদপত্রে বা সাময়িকপত্রে তখন ফটোগ্রাফও ছাপা হত না, সুতরাং স্বনামধন্য বিদ্যাসাগরের সঙ্গেও সাধারণ শহরবাসীর কোনরকম্ পরিচয় হবার সুযোগ হয়নি কোনদিন। অজ্ঞাতকুলশীলের সাধারণ শহুরে সমাজে অজ্ঞাত অবস্থাতেই তিনি যেমন ছাত্রজীবন কাটিয়েছেন, তেমনি কর্মজীবনও আরম্ভ করেছেন। শহরের নতুন ধনিক বণিক অভিজাত-সমাজে তাঁর কোন স্থান ছিল না। কুলকৌলীন্যের বদলে নতুন যুগের বিত্তকৌলীন্যও তিনি অর্জন করেননি। সবদিক দিয়েই তিনি ছিলেন অজ্ঞাতকুলশীল, শহরের অধিকাংশ সাধারণ

মানুষের মতন। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সেরেস্তাদার যে তিনি, একথাও শহরের দু'চার দশ জন ছাড়া কেউ জানত না।

বহুবাজারের পথ দিয়ে লালদীঘির কলেজে যখন তিনি যাতায়াত করতেন, তখন হয়ত উড়িয়াপাড়া লেনের (বর্তমানে রমানাথ কবিরাজ লেন) শ্রীনাথ বিশ্বাসের মতন দু'একজন প্রতিবেশী তাঁর দিকে আঙুল দেখিয়ে বলতেন: 'বাঁড়ুজ্জের পো যাচ্ছে, আমাদের পাশের গাঁয়ের গরীব বামুনের ছেলে। লেখাপড়া শিখে কেমন বিদ্বান হয়েছে। সাহেবদের কলেজে পণ্ডিতের চাকরি পেয়েছে।' বীরসিংহের পাশের গ্রাম উদয়গঞ্জে শ্রীনাথচন্দ্র বিশ্বাসের বাড়ী। ঈশ্বরচন্দ্রের সমসাময়িক তিনি এবং প্রায় একই সময়ে তিনি কলকাতায় এসে জেলিয়াপাড়ায় বসবাস করেন। ঈশ্বরচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত পরিচয়ও ছিল। মৎস্য-ব্যবসায়ী হলেও, শিক্ষার প্রতি তাঁর যথেষ্ট অনুরাগ ছিল এবং প্রায়ই তিনি তাঁর ছেলেদের কাছে ঈশ্বরচন্দ্রের কথা বলতেন। শিক্ষাই যে মানুষকে এবং একটা জাতিকে বড় করে তোলে, সামাজিক মর্যাদা দান করে, একথা তিনি সর্বদাই স্বজাতীয় ও স্বপরিবারের লোকজনদের বুঝাবার চেষ্টা করতেন। ঈশ্বরচন্দ্রই ছিলেন তাঁর আদর্শ দৃষ্টান্ত।

স্বগ্রামবাসী প্রতিবেশী শ্রীনাথ বিশ্বাসের মতন দু' চারজন ছাড়া, বহুবাজার পাড়ার খুব বেশি লোকের সঙ্গে তাঁর পরিচয় থাকার কথা নয়। বহুবাজারে ব্যবসায়ীদেরই বাস ছিল বেশি, সুতরাং পরিচয় হবার সুযোগও ছিল না। হৃদয়রাম ব্যানার্জির বাড়ীর একাংশ তিনি ভাড়া নিয়ে থাকতেন এবং তাঁর পৌত্র রাজকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব হয়েছিল। তিনি তাঁকে সংস্কৃত শিক্ষা দিতেন, একথা আগে বলেছি।* সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জির পিতা তালতলাবাসী দুর্গাচরণ

* বহুবাজারনিবাসী শ্রীভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (এঁরই বৃদ্ধপ্রপিতামহ হৃদয়রাম বন্দ্যোপাধ্যায়) অনুসন্ধান করতে আমাকে জানিয়েছেন: 'ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় আমার প্রপিতামহ ৺অভয়চরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (৺হৃদয়রামের জ্যেষ্ঠপুত্র) মহাশয়ের সময় আমাদের বাড়ীতে ছিলেন। আমার মেজঠাকুরদাদা ৺রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার নিকট সংস্কৃত শিক্ষা করিয়াছিলেন। আমাদের বাড়ীর ঠিকানা ৫৩বি, হিদারাম ব্যানার্জি লেন। এই বাড়ীর যে ঘরে বিদ্যাসাগর মহাশয় বাস করিতেন তাহা ভাঙ্গিয়া নূতন করিয়া মেরামত করা হইয়াছে। আমাদের হুকিয়া ষ্ট্রীটের বাড়ীতেও বিদ্যাসাগর মহাশয় বাস করিতেন।'—বি. ঘো.

বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আরও কয়েকজন তাঁর গৃহে ইংরেজী ও সংস্কৃত শিক্ষার ব্যাপারে যাতায়াত করতেন। এর বেশি লোকের সঙ্গে তাঁর পরিচয় থাকলেও, প্রাত্যহিক যোগাযোগ বিশেষ ছিল না। কলেজে সিবিলিয়ান ছাত্রদের পড়ানো, নিজে ইংরেজী শেখা, এবং অন্যদের সংস্কৃত শিক্ষা দেওয়া, এই ছিল তাঁর দৈনন্দিন জীবনের প্রধান কাজ। কাজের ফাঁকে ফাঁকে শিক্ষার সমস্যা সম্পর্কে অনেক প্রশ্ন তাঁর মনে জাগত, সমাজ সম্বন্ধেও অনেক কথা তিনি চিন্তা করতেন। চিন্তা করবার মতন বয়সও হয়েছিল তখন এবং সামাজিক জীবনধারায় চিন্তার উপাদানও তখন যথেষ্ট ছিল।

নিস্তরঙ্গ সমাজে ছাত্রজীবনে হঠাৎ যে প্রবল তরঙ্গবিক্ষোভ দেখেছিলেন তিনি, কর্মজীবনের প্রারম্ভে তা অনেকটা সংযত হলেও, একেবারে শান্ত হয়নি। কোন সামাজিক আলোড়নই তা হয় না। চতুর্থ দশকেও হিন্দু কলেজের ছাত্রদের মধ্যে যে সব উচ্ছৃঙ্খলতার লক্ষণ দেখা যেত, তা আগেকার তুলনায় কম উৎকট নয়। রাজনারায়ণ বসু এই সময় হিন্দু কলেজের ছাত্র ছিলেন। তিনি লিখেছেন : 'আমার সহাধ্যায়ীর মধ্যে মাইকেল মধুসূদন দত্ত, প্যারীচরণ সরকার, জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, যোগেশচন্দ্র ঘোষ, আনন্দকৃষ্ণ বসু, জগদীশনাথ রায়, ঈশ্বরচন্দ্র মিত্র, নীলমাধব মুখোপাধ্যায়, গিরীশচন্দ্র দেব ও গোবিন্দচন্দ্র দত্ত প্রধান ছিলেন'। সকলেই রাজনারায়ণের সতীর্থ না হলেও, দু'এক ক্লাস উপর-নিচে সকলে একই সময়ে হিন্দু কলেজে পড়তেন। ঈশ্বরচন্দ্রও সংস্কৃত কলেজে পড়বার সময়, শেষদিকে এঁদের অনেককে হিন্দু কলেজে যাতায়াত করতে দেখেছেন। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও রামমোহনের কনিষ্ঠ পুত্র রমাপ্রসাদ রায়ও, ঈশ্বরচন্দ্রের ছাত্রাবস্থায় ১৮৩১-৩২ সালে, কিছুদিনের জন্য হিন্দু কলেজে পড়েছিলেন। ছাত্রজীবনে এঁদের কারও সঙ্গেই তাঁর প্রত্যক্ষ পরিচয়ের সুযোগ হয়নি। একই সীমানার মধ্যে সংলগ্ন বিদ্যালয়ে এঁরা সকলে লেখাপড়া করেছেন। দেবেন্দ্রনাথ, মাইকেল মধুসূদন, প্যারীচরণ, কেউই তখন ছাত্রজীবনে ঈশ্বরচন্দ্রকে চিনতেন না, জানতেন না। দরিদ্র ব্রাহ্মণসন্তান, সংস্কৃত কলেজের ছাত্র ঈশ্বরচন্দ্র হয়ত হিন্দু কলেজের ছাত্র ধনিক-নন্দনের কাছে উপেক্ষার পাত্রই ছিলেন। মধুসূদন বা তাঁর সমসাময়িক অন্যান্য হিন্দু কলেজের ছাত্রদের মতন ঈশ্বরচন্দ্র ভৃত্যসহ পাল্কি

চড়ে কলেজে যাতায়াত করতেন না। পোশাক-পরিচ্ছদের নূতনত্বে ও পারিপাট্যে মধুসূদনের মতন তিনি সকলের দৃষ্টিও আকর্ষণ করতে পারেননি। সুতরাং কর্মজীবনে যাঁদের সঙ্গে নানাভাবে নানাকাজে তিনি মিলিত হয়েছেন, তাঁদের অনেকের সঙ্গে ছাত্রজীবনে কাছাকাছি চলাফেরা করেও, তাঁর আলাপ-পরিচয়ের সুযোগ হয়নি। সে-সুযোগ পরে হয়েছিল কর্মজীবনে।

হিন্দু কলেজের ছাত্রদের আচার-ব্যবহার প্রসঙ্গে রাজনারায়ণ বসু বলেছেন :[২]

> তখন হিন্দু কলেজের ছাত্রেরা মনে করিতেন যে, মদ্যপান করা সভ্যতার চিহ্ন, উহাতে দোষ নাই। তখনকার কলেজের ছোকরারা মদ্যপায়ী ছিলেন বটে, কিন্তু বেশ্যাসক্ত ছিলেন না। তাঁহাদিগের এক-পুরুষ পূর্বের যুবকেরা মদ্যপান করিত না—কিন্তু অত্যন্ত বেশ্যাসক্ত ছিল ; গাঁজা, চরস খাইত, বুলবুলের লড়াই দেখিত, বাজি রাখিয়া ঘুড়ি উড়াইত ও বাবরি রাখিয়া মস্ত পাড়ওয়ালা ঢাকাই ধুতি পরিত। কলেজের ছোকরারা এই সকল রীতি একেবারে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।

একপুরুষ আগেকার যে ছাত্রদের কথা রাজনারায়ণ বলেছেন, তাঁরা ঈশ্বরচন্দ্রের ছাত্রজীবনের সমসাময়িক হিন্দু কলেজের ছাত্র। দশ-বারো বছরে হিন্দু কলেজের ছাত্রদের যে পরিবর্তন হয়েছিল, তার আভাস পাওয়া যায় রাজনারায়ণের উক্তিতে। কিন্তু এ-পরিবর্তন উল্লেখযোগ্য নয়। চতুর্থ দশকেও, বিদ্যাসাগরের কর্মজীবনের প্রথম যুগে, কলকাতার বাঙালী উচ্চ-সমাজের মনোভাবের বিশেষ পরিবর্তন হয়নি। নৈতিক পরিবেশ যেমন কলুষিত তেমনই ছিল প্রায়। আচার্য কৃষ্ণকমল বয়সে আরও নবীন। ১৮৪০ সালে তিনি জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৮৪৮ সালে সংস্কৃত কলেজে ভর্তি হন। তাঁর স্মৃতিকথায় তিনি কলকাতার ধনিক সমাজের আচার-ব্যবহারের যে খণ্ড খণ্ড বর্ণনা দিয়ে গিয়েছেন, তা থেকেই বোঝা যায়, তাঁদের মনোভাবের বিশেষ পরিবর্তন হয়নি। অন্তত উনিশ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত। আচার্য কৃষ্ণকমল বলেছেন যে ইংরেজদের দেখাদেখি বাঙালীরাও তখন আলাদা রেসকোর্স করেছিলেন। ঘোড়দৌড় হত কলকাতার উত্তরাংশে রাজা নরসিংহের বাগানে

(পোস্তার রাজা)। তাতে অনুষ্ঠানের কোন ক্রটি ছিল না। Starter ছিল, jockey ছিল, bookmaker ছিল, betting ছিল। সাতুবাবুর দৌহিত্র শরৎবাবু, লাটুবাবুর পোষ্যপুত্র মন্মথবাবু, হাটখোলার দত্তবাবুরা ঘোড়দৌড়ের ঘোড়া আনতেন। শরৎবাবু নিজেই jockey হতেন। প্রত্যেক বছর শীতকালে ঘোড়দৌড় হত। সাতুবাবুর মাঠে হত বুলবুলির লড়াই। এখন যেখানে সাতুবাবুর বাজার, সেখানে বড় মাঠ ছিল। শীতকালে সেই মাঠে মহা ধুমধামের সঙ্গে বুলবুলির লড়াই হত। মাঠের মধ্যে অনেক তাঁবু পড়ত। পোস্তার রাজা দেড়শ এবং সাতুবাবু দেড়শ trained বুলবুলি আনতেন। দুই দলের লড়াই হত। লড়াইয়ে হেরে গেলে একদলের পাখিরা যখন উড়ে যেত, তখন অন্যদলের লোকেরা 'বো-মারা' বলে উল্লাসে চীৎকার করে উঠত।[৩]

গোলদীঘি থেকে তো বটেই, লালদীঘির ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ থেকেও বিদ্যাসাগর কলকাতার আকাশে সখের বুলবুলিদের বহুবার এইভাবে উড়তে দেখেছেন এবং উল্লসিত জনতার 'বো-মারা' ধ্বনি শুনেছেন।

বাঙালী সমাজের তেমন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন তখনও বিশেষ কিছু হয়নি। কেবল ছাত্রসমাজে নয়, ছাত্রদের অভিভাবক-সমাজেও। ১৮৪২ সালে প্রকাশিত 'বিদ্যাদর্শন' পত্রিকায় কলকাতার জনৈক 'বড়মানুষ' এই সময় তাঁর কয়েক দিনের রোজনাম্‌চা প্রকাশ করেন। কলকাতার উচ্চসমাজের জীবন-ধারার আভাস এই রোজনাম্‌চা থেকে কতকটা পাওয়া যায় :

> গত বৃহস্পতিবার—প্রাতঃকালে বেলা ৯ ঘণ্টার সময়ে নিদ্রাভঙ্গ হইল, ১০॥ ঘণ্টার সময়ে প্রাতঃক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া চা-পান করিলাম, পরে দুই চারিজন বন্ধু আসিলেন তাঁহারদিগের সহিত দুটো খোসগল্প করিয়া স্নান করিলাম, স্নান করিয়া আর কর্ম্ম কি, বেলা যখন ১১॥টা তখন ভোজন করা গেল, ভোজনান্তে যেমন অভ্যাস আছে, কিঞ্চিৎ কাল নিদ্রাগত হইলাম, এবং বেলা যখন দুই প্রহর চারি ঘণ্টা তখন শয্যা হইতে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক দশজন বন্ধুর সহিত তাস খেলা এবং অন্য অন্য প্রকার আমোদ করা গেল, তাহাতে বড়ই উল্লাস হইয়াছিল,

পর্য্যন্ত সন্ধ্যার পর রাত্রি দশ ঘণ্টাবধি গান বাদ্য করিয়া আহারান্তে স্থানান্তরে গমন করিলাম।

শুক্রবার—৭ ঘণ্টার সময় বাটী আসিয়া একবার নিদ্রা গেলাম, ১০ টার সময়ে নিদ্রা ভঙ্গ হইল, সে দিন আর চা পান করিতে ইচ্ছা হইল না, স্নানভোজন করিতে দুই প্রহর অতীত হইল, পরে নিদ্রা গিয়া বেলা যখন ৩টা তখন একবার নীলাম দেখিতে গমন করিলাম, আমার চেরেটের জন্য একটা যুড়ি ক্রয় করিতে মানস ছিল, কিন্তু মনোমত প্রাপ্ত হইলাম না, সুতরাং নীলাম পরিত্যাগপূর্ব্বক একবার সুপ্রীম কোর্ট এবং কার ঠাকুরের হৌস দেখিয়া বাটী আসিলাম, বস্ত্র ত্যাগ করিয়া জল পান করিলে আমি, হরিবাবু এবং শ্যামবাবু একত্র হইয়া বাগানে গমন করিলাম, সেদিন আর বাটী আসা হইল না, রাত্রি ১০টার সময়ে বাগান হইতে অমনি স্থানান্তরে গমন করিয়াছিলাম।

শনিবার—শুক্রবার কোন বিষয় উপলক্ষে অধিক রাত্রি জাগরণ প্রযুক্ত স্থানান্তরে অধিক বেলা অবধি নিদ্রা যাইতেছিলাম, পরে দুই-জন বন্ধু সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া বেলা ১০টার সময়ে আমার নিদ্রাভঙ্গ করিলেন, তাহারদিগের সহিত অনেক পরিহাস ও কথোপ-কথনপূর্ব্বক স্থির হইল যে খড়দহে রাসযাত্রা দেখিতে যাইব, অনন্তর বাটী আসিয়া স্নান ভোজনান্তে খড়দহে যাত্রা করিলাম, দুইজন··· লোকও সঙ্গে ছিল, তাহাতে যেরূপ আমোদ হইয়াছে তাহা বর্ণনা করা যায় না।

রবিবার—অদ্য বেলা দুই প্রহরের সময়ে বাটী আসিয়াছি, আবার— বাবুর বাগানে নিমন্ত্রণ আছে, বৈকালে যাইব, সেখানেও অদ্য রাত্রিতে অত্যন্ত আমোদ হইবে।

কলিকাতা বড়মানুষ

৬ অগ্রহায়ণ, রবিবার

১৮৪২ সালের (১২৪৮ সন) কথা। 'বিদ্যাদর্শন' পত্রিকায় এই 'রোজনাম্‌চা'টি পত্রাকারে প্রকাশিত হয়েছিল।[৪] নিচে সম্পাদকীয় মন্তব্য ছিল এই: 'বড়-

মান্নুষ মহাশয় যে সুখের পত্র লিখিয়াছেন, সকলেই তাহা পাঠ করিয়া অনেক আমোদ করিতে পারিবেন, আমরা তাঁহার প্রতি এই মাত্র উক্তি করি যে, তিনি যদি তাঁহার সমুদয় জীবনের এইরূপ বৃত্তান্ত প্রকাশ করেন, তবে জনসমাজে কি প্রকার পরিহাসের পাত্র হইবেন, তাহা বিবেচনা করুন।'

'বিদ্যাদর্শন' পত্রিকা পরিচালনা করতেন অক্ষয়কুমার দত্ত, বিদ্যাসাগরের সমবয়স্ক আর একজন বাঙালী কর্মী ও প্রতিভাবান পুরুষ। কর্মজীবনের অনেক ক্ষেত্রে তিনি বিদ্যাসাগরের সহযোগী বন্ধু ছিলেন। ১৮৪২ সালে ঈশ্বরচন্দ্র যখন ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে সেরেস্তাদারি করছেন, তখন অক্ষয়কুমার কলকাতার তত্ত্ববোধিনী পাঠশালায় শিক্ষকতা করছেন। এই সময় টাকীর প্রসন্নকুমার ঘোষের সহযোগিতায় তিনি 'বিদ্যাদর্শন' পত্রিকা প্রকাশ করতে আরম্ভ করেন। মাত্র ছয় সংখ্যা 'বিদ্যাদর্শন' প্রকাশিত হয়েছিল। তখনও, মনে হয়, ঈশ্বরচন্দ্রের সঙ্গে অক্ষয়কুমারের পরিচয় হয়নি। তার কিছুদিন পরেই, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা সম্পাদনাকালে অক্ষয়কুমারের সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ পরিচয় হয়।

অক্ষয়কুমার তাঁর নিজের পত্রিকায় ১৮৪২ সালে কলকাতার উচ্চসমাজের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার যে বিবরণ প্রকাশ করেছেন, তার সঙ্গে তাঁর নিজের এবং তাঁর বন্ধু ও সহকর্মী ঈশ্বরচন্দ্রের জীবনযাত্রার কোন সম্পর্কই ছিল না।

'সম্বাদ ভাস্কর' পত্রিকা থেকে এই সময়কার সামাজিক অবস্থার আরও দু'একটি বিবরণ দিচ্ছি। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষদিক থেকে কলকাতা শহরে প্রধানত ধনিকদের উদ্‌যোগেই বারোয়ারী পূজার প্রচলন হয়। উনিশ শতকের চতুর্থ দশকে এই বারোয়ারী উৎসবের কি চরম বিকৃতি ঘটে, সেই প্রসঙ্গে 'সম্বাদ ভাস্কর' লিখেছেন :[৫]

> বারোএয়ারির উৎপত্তি কি পল্লীগ্রাম কি কলিকাতা সকল স্থানেই সমান, কলিকাতার মধ্যেও অকর্ম্মণ্য জঘন্য লোকেরা বারোএয়ারি ছলে পাড়ায় পাড়ায় বিস্তর অত্যাচার করে, পাড়ার মধ্যে দশ বিশ জন একত্র হইয়া চাঁদা ফাঁদিলে সকলকেই সে ফাঁদে পড়িতে হয়, বিশেষতঃ গরীব লোকেরা তাহার মধ্যে না গেলে পল্লীতে বসতি করিতে পারে না। পণ্ডজ্ঞান পাণ্ডারা নানা প্রকারে তাহাদিগের উপর অন্যায় করে, ভিন্ন

> পরিশ্রমি দীন লোকেরদের এই বিশেষ ভয় পাণ্ডাদলের ক্রোধ হইলে স্ত্রীলোকদিগের মানের উপর কলঙ্ক হইবে, অতএব আপনারা দুঃখ পাইয়াও গরীবেরা বারোএয়ারির চাঁদা অগ্রে দেয়, ইহাতে কলিকাতায় প্রায় প্রতি পল্লীর দরিদ্র লোকেরদের অতিশয় দুঃখ হইয়াছে, বারোএয়ারি পাণ্ডারা এইরূপে সকলের মাথায় হাত বুলায়, কিন্তু তাহারদিগের কর্ম্ম এই যে দেবদেবীর এক এক প্রতিমূর্ত্তি খাড়া করিয়া তদুপলক্ষে বোতলের ঘাড় ভাঙ্গে, আর…কবির আসরে উন্মত্ত হইয়া নৃত্য করে…

বারোয়ারীর যখন এই অবস্থা তখনও ঈশ্বরচন্দ্র বহুবাজারেই বাস করছেন এবং চাকরি করছেন লালদীঘির কলেজে। বহুবাজারে বাস করেও তাঁকে যে বারোয়ারীর কোন উপদ্রব সহ্য করতে হয়নি, তা মনে হয় না। উপদ্রবের চেয়েও বড় কথা হল, নাগরিক সমাজের লক্ষ্যহীন কেন্দ্রচ্যুত জীবনের যে বিকট রূপ তিনি এই বারোয়ারী উৎসবের মধ্যে স্বচক্ষে দেখেছিলেন, তাতে তাঁর পক্ষে নিশ্চিন্তে সেরেস্তাদারি করা সম্ভব হয়নি।

সমাজের বড়লোকদের কুৎসিত বিলাস-বৈচিত্র্যের অন্ত ছিল না যেন। জনৈক পত্রলেখক 'সম্বাদ ভাস্কর' পত্রিকার উক্ত সংখ্যাতেই লিখেছেন:

> …সম্পাদক মহাশয়, লজ্জার কথা কি কহিব গত শনিবার প্রাতে আমি গঙ্গাতীরে ভ্রমণ করিতেছিলাম তাহাতে দেখিলাম মাহেশ হইতে এক বজরা আসিতেছে, ঐ বজরাতে খেম্‌টা নাচ হইতেছিল, তাহাতে আরোহি বাবুরা নর্ত্তকীদিগের নিতম্বের পশ্চাৎ পশ্চাৎ এমত নৃত্য করিলেন তাদৃশ নৃত্য ভদ্র সন্তানেরা করিতে পারেন না…শুক্রবার শেষ রাত্রিতে চন্দ্রগ্রহণ হইয়াছিল, এই জন্য স্ত্রীলোকেরা অতি প্রাতে গঙ্গাস্নানে গিয়াছিলেন, বাবুরা ঐ কুলবালাগণকে তাহা দেখাইয়া ত্রিকুল পবিত্র করিলেন…

১৮৪৪ সালেও এসব পূর্ণোদ্যমে চলছিল। কেবল কুলবালারা ন'ন, মধ্যে মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্রকেও গঙ্গাতীরে কলকাতার বজ্‌রাবিলাসী বাবুদের এই খেম্‌টানৃত্য দেখতে হয়েছে, কারণ সকাল-সন্ধ্যায় তখন ভ্রমণের অন্যতম আকর্ষণীয় স্থান ছিল গঙ্গার তীর।

১৮৪৫ সালে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' কলকাতার সামাজিক অবস্থার চরম বিকৃতির প্রতি ইঙ্গিত করে লেখেন: [৮]

> এই কলিকাতা নগরের প্রতি পল্লীতে এ প্রকার সমূহ ব্যক্তির অধিষ্ঠান আছে, যাহারা ক্রমাগত দলবদ্ধ হইয়া বিবিধ কুকর্ম্মসূচক আমোদেই অজস্র লিপ্ত থাকে।...বিশেষতঃ বালকেরা যখন শাসনকর্ত্তা পিতা-ভ্রাতা প্রভৃতিকে অহরহ দুষ্কর্ম্ম পঙ্কে পতিত হইতে দেখে, তখন আপনারা তৎপথ অবলম্বন করিতে কেন শঙ্কা করিবে? ইহা কি শত স্থানে প্রত্যক্ষ হয় নাই, যে পিতার রক্ষিতাগণিকার গৃহে অতি বালক পুত্রাদি সম্বন্ধে গমনাগমন করিতেছে? তথায় তাহারা পরিপাটীরূপে লম্পট ব্যবহার শিক্ষা করিয়া বয়স্ক হইলে কণ্টকস্বরূপ যে তাহাঁদিগের পরিবারের পীড়াদায়ক হইবেক তাহাতে সন্দেহ কি?
>
> অধুনা লম্পটবিদ্যা শিক্ষার পাঠশালা স্বরূপ কলিকাতা হইয়াছে। পল্লীগ্রামস্থ ভদ্র অথচ ধনহীন নবীন যুবারা অনেকে বিষয় কার্য্যের জন্য কলিকাতায় আগমনপূর্ব্বক অনেক কৌশলে কোন এক স্ববয়স্ক ধনির আশ্রয় গ্রহণ করে; তাহাদিগের ভাগ্যবশতঃ যদি সেই বাবু কুচরিত্র এবং লম্পট হয়েন, তবে বিদ্যা, বুদ্ধি, যশ, বীর্য্য একেবারে তাহাদিগের নষ্ট হয়। তাহারা সেই বাবুর তুষ্টির জন্য তাঁহার প্রিয় কুকর্ম্ম সকলের উৎসাহ প্রদান করিতে থাকে, বরঞ্চ তাহার সম্পাদন জন্য উদ্যোগি এবং নিপুণ হয়, এবং যে সকল ঘৃণিত ও গর্হিত আমোদের আস্বাদন পূর্ব্বে অজ্ঞাত ছিল, তাহাতেও ঐ বাবুর নিকটে সুন্দর রূপে শিক্ষিত হয়।

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সেরেস্তাদার ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর দেখছিলেন: 'অধুনা লম্পটবিদ্যা শিক্ষার পাঠশালা স্বরূপ কলিকাতা হইয়াছে।' নবযুগের বাংলার প্রাণকেন্দ্র কলকাতা সত্যিই কি আদর্শ জাগৃতিকেন্দ্র হয়ে উঠছে? কত বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে কলকাতায়, নতুন বিদ্বৎ-সমাজও একটা গড়ে উঠেছে। কিন্তু সেই বিদ্বৎ-সমাজ কোন নৈতিক প্রভাব কলকাতার জনসমাজে তখনও তেমন বিস্তার করতে পারেননি কেন? বেকন, লক, হিউম, টম পেইনের নতুন দর্শন, নতুন পাশ্চাত্ত্যবিজ্ঞান, সাহিত্য, ইতিহাস প্রভৃতি কন্ঠ-

রকমের সব বিদ্যাই তো দান করা হচ্ছে কলকাতা শহরে, কিন্তু তবু কেন সব বিদ্যার উপরে লম্পটবিদ্যা বড় হয়ে উঠেছে ?

লালদীঘির কলেজে সিবিলিয়ান ছাত্রদের পড়াতে পড়াতে, মধ্যে মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্রের মনে হত 'লম্পটবিদ্যা শিক্ষার পাঠশালা' কলকাতা শহরের কথা এবং তার চেয়ে অনেক বড় পাঠশালা বাংলাদেশের কথা। এ পাঠশালায় হবে না। এ পাঠশালা ভেঙে ফেলে অথবা সংস্কার করে আবার নতুন করে পাঠশালা গড়ে তুলতে হবে দেশে।

•

আধুনিক ধনতান্ত্রিক যুগের আশীর্বাদ থেকে অনেকখানি বঞ্চিত হলেও, কলকাতা শহর তার অভিসম্পাতগুলি থেকে আদৌ বঞ্চিত হয়নি। উপর থেকে তলা পর্যন্ত সমস্ত স্তরের বিলাস-ব্যভিচারের মধ্যেই যে কেবল তা প্রকট হয়ে উঠেছিল তা নয়, নতুন বাণিজ্যনগর কলকাতার বাণিজ্যিক জীবনেও তা পরিস্ফুট হয়ে উঠছিল। ১৮৪৫ ও ১৮৪৬ সালের 'সমাচারচন্দ্রিকা' পত্রিকা থেকে তার দৃষ্টান্তস্বরূপ দু' একটি সংবাদ উদ্ধৃত করছি :[৭]

॥ তণ্ডুলে কৃত্রিমতা ॥

অবগত হওয়া গেল যে বাজারের মহাজনেরা তণ্ডুল মহার্ঘ্য হওয়াতে কৃত্রিমতা প্রকাশ করিতেছে তাহার বিশেষ শুনা যাইতেছে যে তণ্ডুলের মহাজনেরা বালামের সহিত সবেদা মিলিত করিয়া আতপ তণ্ডুল কহিয়া তিন টাকা পাঁচ আনা মোণ দরে বিক্রয় করিতেছে ইহাতে আমরা তাহাদিগকে কহিতেছি যে তাহারা উক্ত কৃত্রিমতা ত্যাগ করুক নতুবা মহাবিপদ ঘটিবেক।

॥ বাঙ্গাল বেঙ্ক চেকে কৃত্রিমতা ॥

অবগত হওয়া গেল যে গত ১লা মার্চে বাঙ্গাল বেঙ্কে ২০০০ টাকার একখানি জাল চেক ধরা পড়িয়াছে তাহাতে যে ব্যক্তি ঐ কৃত্রিম কাগজ বদলাই করিতে গিয়াছিল সে তৎক্ষণাৎ পোলীসে প্রেরিত হইল।

সমাজের সর্বস্তরে দুর্নীতির এই সংক্রমণ দেখে ঈশ্বরচন্দ্র কেবল শঙ্কিত হয়ে ক্ষান্ত হননি। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, কর্মজীবনের সুচিন্তিত প্রস্তুতির প্রয়োজন

আছে। কেবল উপর থেকে ছেঁটে ফেললে চলবে না, তলা থেকে উপ্‌ড়ে ফেলতে হবে অনেক কিছু। কেবল শৌখিন শিক্ষার বাইরের চাকচিক্যে সামাজিক সুনীতি ও সুস্থ জীবনের প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হবে না। কেবল শহরের মুষ্টিমেয় ধনীর দুলালদের শিক্ষা দিয়ে নতুন সমাজ গড়ে তোলা যাবে না। শিক্ষার নতুন পরিকল্পনা ও ব্যাপক প্রসার প্রয়োজন। সমাজের ব্যাধির গোপন বীজাণু-গুলিকে একটি-একটি করে ধ্বংস করা প্রয়োজন।

বাঙালী সমাজের বড় বৈশিষ্ট্য দলাদলি। নতুন শহুরে সমাজে এ বৈশিষ্ট্যের বিচিত্র বিকাশ দেখেছিলেন বিদ্যাসাগর। তাঁর ছাত্রজীবনে 'ধর্মসভা', 'ব্রাহ্মসভা', 'ইয়ং বেঙ্গল' প্রভৃতি দলের যে দলাদলি শুরু হয়েছিল, কর্মজীবনে সেই দলাদলি আরও ডালপালা বিস্তার করে জটিল হয়ে উঠল। দলের মধ্যে উপদলের সৃষ্টি হতে লাগল। 'ধর্মসভা'র মধ্যে আশুতোষ দেবের দল, রাধাকান্ত দেবের দল এবং এইরকম আরও অনেক দলের মধ্যে উপদল গজিয়ে উঠল। এইসব দল-উপদলের, বিশেষ করে 'ধর্মসভা'র, সমাজ-জীবনে কতখানি প্রভাব ছিল, তা একজন দলভুক্তের এই পত্রখানি থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় :[৮]

> …শ্রীযুত রাধাকান্ত দেব বাহাদুর মৎপ্রতিপালকেষু। পোষ্য শ্রীজয়চন্দ্র মিত্রস্য—সবিনয় নিবেদনমিদং। আমি কিয়ৎকাল শ্রীযুত আশুতোষ দে সরকার বাবুজীর দলেতে ছিলাম এক্ষণে সে-দলের নানাপ্রকার গোলযোগ দেখিয়া সে-দল পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্মভয়ে মহারাজার দলস্থ হইলাম কিমধিকমিতি সন ১২৫০ সাল তারিখ ২৪ কার্ত্তিক—শ্রীজয়চন্দ্র মিত্রস্য।

'ধর্ম্মভয়ে মহারাজার দলস্থ হইলাম' কথাটি লক্ষণীয়। আশুতোষ দেব মহাশয়ের কাছে লিখিত অনুরূপ আর একখানি আবেদনপত্রের বক্তব্য আরও বেশি ভয়াবহ। পত্রখানি এই :[৯]

> পরম পোষ্টৃবর শ্রীযুক্ত বাবু আশুতোষ দেব দলপতি মহাশয় পোষ্টৃবরেষু।
>
> পোষ্য শ্রীমধুসূদন মিত্রস্য বিনয়পূর্ব্বক নিবেদনমিদং। আমি বহু কালাবধি মহাশয়ের দলস্থ থাকিয়া সামাজিকতা ব্যবহার করিয়া আসিতে-

ছিলাম, গত বৎসর আমার অজ্ঞাতসারে শ্রীযুত ঘটক সুধাকরের চাতুরীতে শ্যামবাজার নিবাসি শ্রীযুত ভৈরবচন্দ্র সরকারের কন্যার সহিত আমার দ্বিতীয় পুত্র শ্রীশ্যামাচরণ মিত্র বাবাজীর দ্বিতীয় পক্ষে বিবাহ হয় তজ্জন্য মহাশয় আমাকে দোষী করিয়া স্বীয় দলে স্থগিত রাখিয়াছেন এক্ষণে যথাশাস্ত্র প্রায়শ্চিত্তপূর্ব্বক উক্ত পুত্রবধূকে আমার অনুমতিক্রমে আমার পুত্র পরিত্যাগ করিলেন, পরে যদ্যপি ঐ পুত্র আমার আজ্ঞানুরূপ না করেন তবে তাহাকে আমি পরিত্যাগ করিব ইহা ধর্ম্মতঃ স্বীকার করিলাম এক্ষণে মহাশয় পূর্ব্ববৎ স্বীয় দলে গ্রহণ করিয়া বিহিত আজ্ঞা করিবেন নিবেদনমিতি ৬ই জ্যৈষ্ঠ ১২৪৯ সাল।

শ্রীমধুস্থদন মিত্র। সাং সিমুলিয়া।

'বেঙ্গল স্পেক্টেটর' পত্রিকা পত্রখানি উদ্ধৃত করে মন্তব্য করেছেন:

এতৎ পত্রাবলোকনে আমারদিগের মনোমধ্যে পত্রলেখক ও আশুতোষ বাবু এবং উক্ত নির্দ্দয় ও নিষ্ঠুর কার্য্যের সহকারি ব্যক্তিদিগের প্রতি এতাদৃশ অবজ্ঞা ও ক্রোধ উপস্থিত হইয়াছে যে তাহা এস্থলে ব্যক্ত না করিয়া সম্বরণ করিতে পারিলাম না। হিন্দুধর্ম্মে অথবা পৃথিবী মণ্ডলস্থ অন্য কোন ধর্ম্মে উক্তরূপ কার্য্যের আদেশ কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না, হায়! দলবৃদ্ধি করিবার নিমিত্ত যে ব্যক্তি পিতা পুত্র ও স্ত্রী পুরুষের বিচ্ছেদের কারণ হয় তাহার কি কখন নিষ্কৃতি হইবে আর যে দুরাত্মা আপন পুত্রকে ধর্ম্মদার পরিত্যাগ করিতে অনুমতি করে ও আশুতোষ বাবুর অনুগ্রহ প্রাপ্তির নিমিত্ত এবং তাঁহার বন্ধুবর্গের সহিত আহার ব্যবহার করণার্থ আপন আত্মজকেও পরিত্যাগ করিতে উদ্যত তাহার কথাই বা কি কহিব…।

হিন্দুধর্মের রক্ষক অভিভাবকরা এইভাবে নিজেদের দল রক্ষার জন্য কোনরকমের অধর্মাচরণ করতে কুণ্ঠিত হতেন না। অথচ এঁরাই ইয়ং বেঙ্গল দলের যুবকদের প্রথাবিরুদ্ধ আচরণে, 'ধর্ম গেল, জাত গেল, সমাজ গেল' বলে সব চেয়ে তারস্বরে হল্লা করতেন। সে-হল্লা ছাত্রজীবনেও ঈশ্বরচন্দ্র যথেষ্ট শুনেছেন। কর্মজীবনে তার আরও বিকৃত কঙ্কালটি তাঁর চোখের সামনে

ভেসে উঠল। টাকার জোর থাকলে, ধর্মও যে হাতের মুঠোয় থাকে, প্রতিদিন ধর্মসভার দলাদলির মধ্যে তিনি তার অজস্র প্রমাণ পেতে থাকলেন। দল ও দলাদলি সম্বন্ধে তাঁর বিভীষিকা বাড়তে লাগল।

পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে দলাদলির আসল রূপটি যেমন ধরা পড়ে, এমন আর কিছুতেই পড়ে না। উনিশ শতকের চতুর্থ দশকে পত্র-পত্রিকার জোয়ার এসেছিল কলকাতা শহরে। নানাদলের নানামতের সব পত্র-পত্রিকা। তার মধ্যে একদিকে সাংবাদিকতার নতুন আদর্শধারা যেমন প্রবর্তিত হয়েছিল, তেমনি দলাদলির রুচিহীনতা ও অশালীনতাও প্রকট হয়ে উঠেছিল। সাংবাদিকতার সুস্থ ধারাটি ছিল ক্ষীণ, দলাদলির বিকৃত ধারাটি ছিল অনেক বেশি প্রবল। ১৮৪৭ সালের 'দুর্জ্জনদমন মহানবমী' পত্রিকা থেকে এই দলাদলিজনিত সাংবাদিক রুচিবিকৃতির একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি :[১০]

ঈশ্বরের অনন্ত গুণের পার নাই।
ঈশানাদি নানারূপে ব্যাপ্ত সর্ব্ব ঠাঁই ॥
স্বরূপ জানিল যেই সেই জিত বিশ্ব।
স্বর্গ অপবর্গতুল্য ধনী আর নিঃস্ব ॥
রক্তশ্বেত পীতকৃষ্ণ চতুর্ব্বর্ণ ধর।
রজস্তম সত্ত্বগুণে যুক্ত চরাচর ॥
গুণভেদে যে প্রভু কপিল ব্যাস ভৃগু।
গুণযোগে তিনিই যান মগপেগু ॥
পরতন্ত্র নন যিনি স্বতন্ত্র স্বরূপ।
পরম্পরাসিদ্ধ আছে তাঁর রূপারূপ ॥
তব ধ্যানে জ্ঞানে জীব যে হয় সংযত
তত্ত্বমসি মন্ত্রে তারে তরাও সতত ॥
তোষরোষ তুলাতুল্য মায়ায় বিগতো।
তোমার মায়ায় মুগ্ধ চরাচর যতো ॥
রসগন্ধ শব্দ স্পর্শ রূপ পঞ্চাকার।
রচনা আশ্চর্য্য এই অখিল সংসার ॥

বায়ুপরি তেজাকাশ ভূমি সমুদ্ভবা।
বাঙ্‌মনের অগোচর কিরূপ সম্ভবা ॥
পেষিরূপ ব্রহ্মাণ্ড প্রসবে লোমকূপে।
পেষণী সমান তুমি মহাকাল রূপে ॥
রত্নাকর জলশায়ী কভু যোগেশ্বর।
রতিমতি লজ্জারূপা বিশ্বের আকর ॥
গায়ত্রী প্রণবরূপা রুদ্রাণী শুভগা।
গাথারূপ নিগমের যোগসূত্রে যোগা ॥
লেখকের সাধ্য কি তোমার গুণ বলে।
লেহন করহ মাধ্বী সহস্রার দলে ॥
হাবভাব রসগর্ত্তা শক্তি স্বাধা স্বাহা।
হাল ধরি ভয়ে কাঁপাইলা সর্ব্বসহা ॥
গীতাবেদ তোমার বর্ণনে অনুরাগী।
গিরীশ ত্বদীয় যোগে সংসার বিরাগী ॥

ইংরেজীতে যাকে 'অ্যাক্রষ্টিক' (Acrostic) বলে, কবিতাটি হল সেই শ্রেণীর। প্রত্যেক পংক্তির প্রথম বর্ণ একত্র করলে রচয়িতার উদ্দেশ্য বোঝা যায়। উদ্ধৃত কবিতাটিতে দুটি করে লাইন নিয়ে একটি পংক্তি করা হয়েছে। সেইজন্য প্রথম তৃতীয় পঞ্চম সপ্তম লাইন এবং দ্বিতীয় চতুর্থ ষষ্ঠ লাইন, এইভাবে লাইন ধরে প্রথম বর্ণ একত্র করতে হবে। পত্রিকার সম্পাদকের উদ্দেশ্য 'সংবাদ প্রভাকর' সম্পাদক কবি ঈশ্বর গুপ্তকে গালাগালি দেওয়া। তার নমুনা হল—'ঈ শ্ব র গু প ত তো র বা পে র—' ইত্যাদি। দলাদলির ফলে সাংবাদিকতা রুচিবিকৃতির কোন্ চরম সীমায় নেমেছিল, এই অ্যাক্রষ্টিক কবিতাটি তার একটি জলন্ত দৃষ্টান্ত।

নবযুগের প্রধান জাগৃতিকেন্দ্র কলকাতা মহানগরেই যখন আলোর পাশে স্তরে স্তরে এরকম গভীর অন্ধকার জমছিল, ভাঙনের দ্রুততালের সঙ্গে যখন গড়নের ছন্দপতন ঘটছিল, তখন বাংলার গ্রামীণ সমাজের ও সাধারণ গ্রাম্য

মানুষের, কৃষকের ও কারিগরের অবস্থা যে দুর্দশার কোন সীমায় পৌঁছেছিল, তা কল্পনা করতেও ভয় হয়। ইংরেজ শাসকরা এর মধ্যে গ্রাম্যসমাজে তাঁদের শাসন ও শোষণের দীর্ঘ বাহু প্রসারিত করেছেন, তাঁদের লোভ বেড়েছে এবং তা চরিতার্থ করার কলাকৌশলও তাঁরা উদ্ভাবন করেছেন। এদেশী উপশোষকশ্রেণীও অর্ধশতাব্দীর মধ্যে আরও বেশি ভয়াবহ হয়ে উঠেছেন এবং অসহায় গ্রাম্য প্রজাদের উপর অত্যাচার করতে তাঁরা অনেক বেশি দক্ষ হয়েছেন। তাঁদের নাগরিক উচ্ছৃঙ্খলতার ও বিলাসিতার খোরাক যোগাতে হয়েছে গ্রামের নিঃস্ব প্রজাদের। গ্রাম ও গ্রামের মানুষকে অস্থি-চর্মসার কঙ্কালে পরিণত করে শানবাঁধানো ইটপাথরের শৌখিন শহর গড়ে উঠেছে কলকাতায়। সমসাময়িক পত্রিকা থেকে তার একটি দীর্ঘ বিবরণ উদ্ধৃত করছি :[১১]

> ...যে দেশে রাজা ও রাজ-নিয়ম আছে, এবং যে স্থানের প্রজারা বহু-বেতন-ভুক্ উত্তমোত্তম রাজ-কর্ম্মচারি নিয়োগের উপযোগি যথেষ্ট কর প্রদান করে, সে দেশ যে এমত অশাসিত থাকে, এবং তত্রত্য লোকের ধন, মান, প্রাণাদি কিছুই যে সায়ত্ত নহে, ইহাতে তথাকার রাজ কার্য্যেরই ত্রুটি স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু পাঠকবর্গ যেন এমন মনে না করেন, যে আমাদের রাজপুরুষদিগের সমুদায় কার্য্যই এইরূপ বিশৃঙ্খল। যে বিষয়ে তাঁহাদিগের স্বার্থ আছে, তাহাতে যত্ন, পরিশ্রম ও উৎসাহের কিছুমাত্র অল্পতা দেখা যায় না,—বোধহয় তাঁহারা আত্ম-লাভার্থে প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়া অতি দুষ্কর কর্ম্মও সম্পন্ন করিতে পারেন। স্বার্থ সাধনে প্রবৃত্ত হইলে উহাদের মনের প্রভাব বৃদ্ধি হয়, এবং অঙ্গসকল দ্বিগুণ বল ধারণ করে। রাজস্ব সংগ্রহার্থে কি অপূর্ব্ব কৌশল, কি পরিপাটী নিয়ম, কি অদ্ভুত নৈপুণ্য প্রকাশ করিয়াছেন। প্রজারা নিঃস্ব ও নিরন্ন হউক, তথাপি তাহারদিগকে নিরূপিত রাজস্ব দিতেই হইবে, ভূস্বামির সর্ব্বস্বান্ত হউক, তথাপি তিনি ত্রিমাসের পর কপর্দ্দক মাত্র রাজস্বও অনাদায়ি রাখিতে পারেন না। অনাবৃষ্টি হইয়া সমুদায় শস্য শুষ্ক হউক, জল প্লাবন হইয়া দেশ উচ্ছিন্ন যাউক, রাজস্ব দানে অক্ষম হইয়া প্রজারা পলায়ন করুক, তথাপি নির্দ্দিষ্ট দিবসে

সূর্য্যাস্তের প্রাক্‌কালে তাঁহাকে সমস্ত রাজস্ব নিঃশেষে পরিশোধ করিতেই হইবে…

…এই রূপ রাজার প্রতি প্রজার, কর্ত্তব্য সাধন বিষয়ে রাজপুরুষদিগের যত্ন, নৈপুণ্য ও বিক্রম প্রকাশের কিছুমাত্র ত্রুটি দেখা যায় না, কিন্তু প্রজার প্রতি রাজার কর্ত্তব্য সমস্ত বিষয়েই তাহার সম্যক্ বৈপরীত্য প্রতীত হইতেছে। সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখিয়া নিরীক্ষণ করিলে সমুদায় বাঙ্গালা দেশ সিংহ-ব্যাঘ্রাদি-সমাকীর্ণ মহারণ্যের ন্যায় বোধ হয়, যেখানে কোন নিয়ম নাই, কাহারও শাসন নাই ; যেখানে নৃশংস স্বভাব হিংস্র-জীবসকল নিরুপদ্রব নির্ব্বিরোধ প্রাণিদিগের প্রাণ নাশার্থেই সর্ব্বদা সচেষ্ট আছে। প্রজাদের ধন সম্পত্তিতে রাজার কিছু স্বভাব-সিদ্ধ স্বত্ব নাই ; তিনি তাহাদের ধন মান প্রাণাদি রক্ষা করিবেন বলিয়াই কর গ্রহণ করেন। কিন্তু আমাদের রাজপুরুষেরা যদার্থে কর গ্রহণ করেন, তৎসাধন বিষয়ে তাঁহারা যেমন মনোযোগি, পল্লীগ্রামস্থ প্রজাদিগের বিষম দুরবস্থাই তাহার সাক্ষী রহিয়াছে।

বাংলার পল্লীসমাজ 'সিংহ-ব্যাঘ্রাদি সমাকীর্ণ মহারণ্যের ন্যায় বোধ হয়' বলে লেখক মন্তব্য করেছেন। তারপর বাঙালী ভূস্বামীদের অমানুষিক অত্যাচার সম্বন্ধে যে বর্ণনা দিয়েছেন তা এককথায় লোমহর্ষক বলা যায় :

…বাঙ্গালাদেশের অনেক ভূস্বামিরই এই প্রকার উপদ্রব, এবং অনেক প্রজারই এই প্রকার যাতনা। সংপ্রতি কৃষ্ণনগর জেলার কোন কোন ভূস্বামি ও তাহারদের কর্ম্মচারিদিগের চরিত্র শ্রবণ করিয়া বিস্ময়াপন্ন হওয়া গেল। তাঁহারা প্রজাদের স্থাবরস্থাবর সম্পত্তি দূরে থাকুক, তাহারদিগের শরীরও আপনার অধিকার ভুক্তজ্ঞান করেন, এবং তদনুসারে তাহারদিগের কায়িক পরিশ্রমও আপনার ক্রীত বস্তু বোধ করিয়া তাহার উপর দাওয়া করেন। তাঁহারদের এই প্রকার অখণ্ড্য অনুমতি আছে, যে বিনা মূল্যে ও বিনা বেতনে তাঁহারদিগেক গোপেরা দুগ্ধ দান করিবেক, মৎস্যোপজীবিরা মৎস্য প্রদান করিবেক, নাপিতে ক্ষৌর করিবেক, যান-বাহকে বহন করিবেক, চর্ম্মকারে চর্ম্মপাদুকা প্রদান করিবেক, ইত্যাদি সকলেই স্ব স্ব উপজীব্যোচিত অনুষ্ঠান দ্বারা তাহার-

দিগের সেবা করিবেক। ক্রীত দাসকেও ঐরূপ দাসত্ব করিতে হয় না। সেও স্বীয় কার্য্যের বেতন স্বরূপ অন্ন বস্ত্র প্রাপ্ত হয়। আর ইহারা স্বীয় অধিকারস্থ ব্যবসায়ীদিগের নিকট যাবতীয় বস্তু ক্রয় করেন, তাহারও উচিত মূল্য দান করেন না। ইহারা যে পণে দ্রব্য গ্রহণ করেন, তাহার নাম "সরকারী মূল্য"—সে মূল্য ইহারদের ইচ্ছাধীন—সে মূল্য সাধারণ-রূপে প্রচলিত হইলে বাণিজ্য ব্যবসায় উচ্ছিন্ন হইত। হায়! এই প্রকার অত্যাচার করিয়াও ক্ষান্ত নহেন, তাহারদিগের উপজীবিকারও হন্তা হয়েন। দূরদেশীয় মনুষ্যেরা ইহারদের আচরণ শ্রবণ করিলে সহসা বোধ করিতে পারেন, প্রজাকুল সমূলে উন্মূল করাই ইহারদের উদ্দেশ্য।...

...ভূস্বামিরা যে কত প্রকার কৌশল করিয়া লোকের ধন হরণ করেন, তাহা নির্ব্বাচন করা দুষ্কর। ব্রাহ্মণের ব্রহ্মোত্তর ও দেবতার দেবোত্তর গ্রহণ করা কোন কোন ভূস্বামির সঙ্কল্প হইয়াছে। আমারদিগের সর্ব্বশোষক গভর্ণমেণ্টকে যথা সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিয়া ব্রাহ্মণদিগের যৎকিঞ্চিৎ যাহা অবশিষ্ট আছে, তাঁহারা তাহা অপহৃত করিয়া আত্মসাৎ করেন কত কত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত এবিষয়ের প্রতিকারার্থে ব্যক্তি বিশেষের দ্বারে দ্বারে ক্রন্দন করিয়া ভ্রমণ করিতেছেন, কিন্তু কিছুতেই তাঁহারদের অন্ন-হন্তা ভূস্বামিদিগের কঠোর হৃদয়ে কারুণ্যরসের সঞ্চার হয় না। তাঁহারা রোদন করিলে তিনি বধির বৎ ব্যবহার করেন; বোধ হয়, যেন আপনাকে স্বাধিকারস্থ সমস্ত প্রজার সমস্ত বস্তুর অদ্বিতীয় স্বত্বাধিকারি জ্ঞান করিয়া তাহা অধিকার করিবার নিমিত্ত সর্ব্বদাই ব্যস্ত থাকেন। কখন দেখ, তিনি লোভাক্রান্ত হইয়া পুনঃ পুনঃ ভূমি পরিমাণ পূর্ব্বক নানা কৌশলে রাজস্বের বাহুল্য করিতেছেন, কখন কোন প্রজার নিরূপিত কর পরিবর্ত্তন করিয়া যথেচ্ছা বৃদ্ধি করিতেছেন, কখন বা সাতিশয় ধনতৃষ্ণা-পরবশ হইয়া স্বেচ্ছানুসারে এক প্রজার ভূমি গ্রহণ পূর্ব্বক অধিকতর করে, অন্যের হস্তে সমর্পণ করিতেছেন। আহা! মধ্যে মধ্যে এ প্রকারও ঘটে, যে কোন দুঃখি প্রজা ভূস্বামির নিকট একখণ্ড সকর ভূমি বা কোন অপকৃষ্ট উদ্যান গ্রহণ করিয়া যত্ন ও শ্রম সহকারে, তাহার পারিপাট্য ও উন্নতি করিয়াছে, এবং আগামি বর্ষে তাহার সেই সমুদায়

পরিশ্রমের যথেষ্ট ফললাভ সম্ভাবনায় মনে মনে পরম পুলকিত রহিয়াছে, ইতিমধ্যে অন্য এক ব্যক্তি আগমন করিয়া কহিলেক 'আমি তোমার ভূমি অধিকার করিতে চলিলাম, ভূস্বামির নিকট সমধিক কর প্রদানে স্বীকার পাইয়া তাহা গ্রহণ করিয়াছি।' একথা শ্রবণমাত্রে সেই প্রজার মুণ্ডে যেন অকস্মাৎ বজ্রাঘাত হয়; তাহার আশারূপ রমণীয় বৃক্ষ সমূলে উন্মূলিত হয়।

ভূস্বামিদের নির্যাতন-কৌশলের একটি তালিকাও দিয়েছেন লেখক। মধ্যযুগের সমাজে এ-তালিকা দেখলে কেউ বিস্মিত হতেন না। কিন্তু ইংরেজের সৃষ্ট নতুন জমিদারশ্রেণী অত্যাচারের অপকৌশলে সেকালের সামন্তদেরও যে লজ্জা দিয়েছিলেন, তা এই বিবরণ দেখলে বোঝা যায়:

ভূস্বামিদিগের লোকে বলদ্বারা তাহারদের ধান্য গ্রহণ করে, গো সকল হরণ করে, এবং তাহারদিগকে······জল-মগ্ন করে ও প্রহার করে। ভূস্বামী ও দারোগা এবং তাহারদের কর্ম্মচারিরা প্রজাদিগের যে প্রকার শারীরিক দণ্ড করে, তাহা কলিকাতাবাসি অনেক লোকে সবিশেষ অবগত নহেন। অতএব পশ্চাৎকয়েক প্রকার কায়দণ্ডের বিবরণ করা যাইতেছে:

১। দণ্ডাঘাত ও বেত্র্যাঘাত করে।

২। চর্ম্মপাদুকা প্রহার করে।

৩। বংশকাষ্ঠাদি দ্বারা বক্ষঃস্থল দলন করিতে থাকে। (২০শে জ্যৈষ্ঠের ভাস্কর পত্রে ইহার উদাহরণ আছে)

৪। খাপরা দিয়া কর্ণ ও নাসিকা মর্দ্দন করে।

৫। ভূমিতে নাসিকা ঘর্ষণ করায়।

৬। পৃষ্ঠভাগে বাহুদ্বয় নীত রাখিয়া বন্ধন করিয়া বংশদণ্ডাদি দ্বারা মোড়া দিতে থাকে।

৭। গাত্রে বিছুটি দেয়।

৮। হস্তদ্বয় ও পাদদ্বয় নিগড়-বদ্ধ করিয়া রাখে।

৯। কর্ণধারণ করিয়া ধাবন করায়।

১০। কাটা দিয়া হস্ত দলন করিতে থাকে। (অর্থাৎ দুই খান কঠিন বাখারির এক দিক বাঁধিয়া তাহার মধ্যে হস্ত রাখিয়া মর্দ্দন করিতে থাকে। এই প্রাণ-ঘাতক যন্ত্রের নাম কাটা)।

১১। গ্রীষ্মকালে প্রচণ্ড রৌদ্রে পাদদ্বয় অতি বিমুক্ত করিয়া ইষ্টকোপরি ইষ্টক হস্তে দণ্ডায়মান করিয়া রাখে।

১২। অত্যন্ত শীতের সময় জলমগ্ন করে ও গাত্রে জল নিঃক্ষেপ করে।

১৩। গোণীবদ্ধ করিয়া জলমগ্ন করে।

১৪। ভাদ্র ও আশ্বিন মাসে ধান্যের গোলায় পুরিয়া রাখে। (সেই সময় গোলার অভ্যন্তর অত্যন্ত উষ্ণ হয়, এবং ধান্য হইতে প্রচুর বাষ্প উঠিতে থাকে)।

১৫। চুনের ঘরে রুদ্ধ করিয়া রাখে।

১৬। কারারুদ্ধ করিয়া উপবাসি রাখে, অথবা ধান্যের সহিত তণ্ডুল মিশ্রিত করিয়া তাহাই এক সন্ধ্যা আহার করিতে দেয়।

১৭। গৃহ মধ্যে রুদ্ধ করিয়া লঙ্কা মরীচের ধূম প্রদান করে।

বাংলার গ্রাম্যসমাজ শোষণ করে এইভাবে কলকাতা শহরে নবযুগের নতুন নাগরিক সমাজের সৌধ গড়ে উঠছিল। তার মধ্যে নবজাগরণের মন্ত্র উচ্চারিত হচ্ছিল বটে, কিন্তু গ্রাম্যজীবনের শোকসঙ্গীতের বিষাদের সুরের মধ্যে তার মাদকতা সাধারণ মানুষের কানে পৌঁছচ্ছিল না। নবযুগের ও নবজাগরণের ইতিহাসের এই বৈশিষ্ট্য, অর্থাৎ তার সঙ্কীর্ণ নগরকেন্দ্রিকতা, বাংলাদেশেও পূর্ণমাত্রায় দেখা দিয়েছিল। পরিপার্শ্বের ব্যাপক ভাঙনের মধ্যে, একটি কেন্দ্রে, নতুন যুগের নতুন শহরে, নতুন উচ্চশ্রেণীর মধ্যে, কেবল নবজাগরণের সুর ধ্বনিত হয়ে উঠেছিল।

১৩ | 'নূতন উষার স্বর্ণদ্বার'

সখের বুলবুলিরা যখন কলকাতার আকাশে উড়ে বেড়াচ্ছিল, বজরাবিলাসী বাবুরা যখন গঙ্গার বুকে খেমটানৃত্য করছিলেন, তখন 'ইয়ং বেঙ্গল' দল মাটির আকাশে ডানা-ঝাপটানির পালা শেষ করে, মাটির বন্ধন ফেলে, আকাশের কিনারা খুঁজতে উন্মুখ হয়ে উঠেছেন। অনেক দিন আগে, ইয়ং বেঙ্গলের দীক্ষাগুরু ডিরোজিও তাঁর প্রায় সমবয়স্ক তরুণ শিষ্যদের এই ডানা-ঝাপটানির কথা মনে করে লিখেছিলেন,

> Expanding like the petals of young flowers
> I watch the gentle opening of your minds
> And sweet loosening of the spell that binds
> Your intellectual energies and powers, that stretch
> (Like young birds in soft summer hour),
> Their wings to try their strength.

লালদীঘির রাইটার্স বিল্ডিং-এর ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ থেকে আসা-যাওয়ার পথে, বিদ্যাসাগর নবীন বাংলার মুখপাত্রদের এই ডানা-ঝাপটানির ধ্বনিও শুনতে পাচ্ছিলেন, বুলবুলিদের বো-মারা ধ্বনির সঙ্গে। তিনি নিজেও তাঁদের

একজন ছিলেন। যদিও ইয়ং বেঙ্গল দলের সঙ্গে তাঁর কোন যোগাযোগ তখনও ছিল না, এবং ব্যক্তিগত পরিচয়ও অনেকের সঙ্গে তাঁর হয়নি, তাহলেও মনে মনে তিনি তাঁদের দাবি-দাওয়াতেই যেন সাড়া পেতেন। তাঁর মনেও ঐ একই প্রশ্ন গুমরে উঠত,

শিকলদেবীর ঐ যে পূজাবেদী
চিরকাল কি রইবে খাড়া ?

ইয়ং বেঙ্গলের প্রমত্ততার ঘোর তখনও অবশ্য কাটেনি। অশান্তভাব তখনও একেবারে শান্ত হয়নি। 'ঝড়ের মতন বিজয়কেতন নেড়ে' তখনও তাঁরা বাছা-বাছা সব ভুলগুলো এনে তাঁদের চলার পথে জড়ো করছিলেন। ব্ল্যাক পাদ্রি 'কেষ্ট বন্দ্যো' তখন ডাফ, ডিয়ালট্রি প্রমুখ পাদ্রিদের সঙ্গে হিন্দুদের ধর্মান্তরিত করবার কাজে সোৎসাহে হাত মিলিয়েছেন। ইয়ং বেঙ্গলের তখন তিনি একজন অন্যতম গোষ্ঠীপতি। কেবল হিন্দুধর্মের নয়, ব্রাহ্মধর্মেরও তিনি ঘোর বিরোধী। তরুণ-সমাজে তখন তাঁর অসাধারণ প্রতিপত্তি। অর্থাৎ এমন এক সময়, যখন তারুণ্যের প্রতিমূর্তি মধুসূদন। যখন তরুণের চোখে 'মধু'র স্বপ্ন, 'মধুর' চোখে অজানা অনন্ত আকাশভরা তারার মতন স্বপ্ন।

মধুসূদন দত্ত তখনও 'মাইকেল' হননি। তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ শুভাকাঙ্ক্ষী বন্ধু বিদ্যাসাগরের সঙ্গে তখনও তিনি মিলিত হননি, তাঁর সন্ধানও পাননি। বাংলার নববসন্তের প্রথম কবির কণ্ঠে কাকলি অবশ্য তখনই শোনা যাচ্ছিল। বিদ্যাসাগর তা শুনতে পাননি। লালদীঘির ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে তিনি চাকরির জন্য যখন যাতায়াত করতেন, তখন হিন্দু কলেজের ছাত্র কিশোর মধুসূদন মুখে-মুখে ইংরেজীতে গান রচনা করতেন। কিশোর কবিচিত্তের কামনা-বাসনা সব গানের মধ্যে মূর্ত হয়ে উঠত—

I sigh for Albion's distant shore,
Its Valleys green, its mountains high ;
Tho' friends, relations, I have none
In that far clime, yet Oh ! I sigh
To cross the vast Atlantic wave
For glory or a nameless grave !

দূর শ্বেতদ্বীপ তরে, পড়ে মোর আকুল নিশ্বাস,
যেথা শ্যাম উপত্যকা, উঠে গিরি ভেদিয়া আকাশ ;
নাহি সেথা আত্মজন ; তবু লঙ্ঘি অপার জলধি
সাধ যায় লভিবারে যশঃ কিম্বা অ-নামা সমাধি।

ধুতি-চাদর-চটি পরে লালদীঘির কলেজের পথে যেতে যেতে বিদ্যাসাগর ভাবতেন বীরসিংহের কথা, বীরসিংহের মতন বাংলার আরও অনেক গ্রামের কথা, বাংলার মানুষের কথা। আচকান-পায়জামা-বুট পরে, দু'জন ভৃত্যসহ পাল্কি চড়ে গোলদীঘির কলেজে যেতে যেতে মধুসূদন ভাবতেন 'দূর শ্বেতদ্বীপে'র কথা, 'যেথা শ্যাম উপত্যকা, উঠে গিরি ভেদিয়া আকাশ'। নবীন বাংলার দু'জোড়া চোখের দু'রকমের স্বপ্ন। ওয়ার্ডস্বার্থ আর শেলীর 'স্কাইলার্ক'। একজনের স্বপ্ন আকাশচারী হয়েও মানবপ্রীতির টানে কেবল মাটিতে আছাড় খেয়ে পড়তে চায়। আর-একজনের স্বপ্ন হতে চায় 'বৈশাখের নিরুদ্দেশ মেঘ'।

বাঙালীর চরিত্রের দু'টি দিক, বিদ্যাসাগর ও মধুসূদন, বাঙালীর মানসলোকের দুই মেরু।

দু'জোড়া চোখ, দু'জোড়া কাণ। চোখে-চোখে, কাণে-কাণে তফাৎ অনেক। তবু এ-চোখের দৃষ্টিশক্তি ও দৃষ্টিভঙ্গি এবং এ-কাণের শ্রবণশক্তি একেবারে নতুন।

একদিন এক বিচিত্র দৃশ্য দেখলেন বিদ্যাসাগর, লালদীঘির ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ থেকে। সেদিন ১৮৪৩ খ্রীস্টাব্দের ৯ ফেব্রুয়ারী, বৃহস্পতিবার। হিন্দু কলেজের পলাতক ছাত্র মধুসূদন দত্তের খ্রীস্টধর্মে দীক্ষাগ্রহণের স্মরণীয় দিন।

রাইটার্স বিল্ডিংএর কলেজে থাকলেও, এদৃশ্য দেখার কোন অসুবিধা হয়নি তাঁর। দু'পা এগিয়ে হয়ত তিনি অন্যমনস্কভাবে সেদিন মিশন রো'র ওল্ড মিশন চার্চের সামনে এসে চুপ করে দাঁড়িয়েছিলেন। বহুবাজারের বাসায় থাকলেও, মধুসূদনের ধর্মান্তরের ব্যাপার নিয়ে আগে থেকেই শহরে যেরকম হৈ-চৈ হয়েছিল, তাতে তাঁর পক্ষে নির্দিষ্ট দিনে কয়েক পা হেঁটে মিশন রো'তে আসা অসম্ভব নয়।

হিন্দু কলেজের ছাত্রদের দু'-চারজনের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের সাক্ষাৎ পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতাও হয়েছিল। যখন তিনি ইংরেজী শিখছিলেন এবং সংস্কৃত শিক্ষা দিচ্ছিলেন নিজের বাসাবাড়ীতে, তখন হিন্দু কলেজের ছাত্রদের কাছ থেকে তিনি মধুসূদনের কথা নিশ্চয় শুনেছিলেন। মধুসূদনের কাব্যপ্রতিভার কথা, খোশ-পোষাকের কথা, মেজাজের কথা, নিশ্চয় তাঁর কাণে গিয়েছিল। সংস্কৃত কলেজে পড়বার সময় তিনি মধুসূদনকে দেখেননি বলেও মনে হয় না। হিন্দু কলেজ থেকে হঠাৎ অন্তর্ধান এবং ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গে মধুসূদনের অবস্থানের বার্তা যখন শহরময় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিল, তখন বিদ্যাসাগরও নিশ্চয় কৌতূহলী হয়েছিলেন।

বিদ্যাসাগরের বয়স তখন তেইশ বছর, মধুসূদনের বয়স উনিশ-কুড়ি।

মিশন রো'র চারিদিকে, ওল্ড মিশন চার্চের সামনে সেদিন শহরের সাহেব বিবি ও পাদ্রিদের নানারকমের ঘোড়ার গাড়ীর ভিড় জমেছিল। শহরের কৌতূহলীর সংখ্যাও দর্শকদের মধ্যে যথেষ্ট ছিল বলে অনুমান করা যায়। কারণ, পাদ্রি সাহেবরা সেদিন গোলমালের আশঙ্কায় গির্জার সামনে সশস্ত্র সৈনিক গার্ড মোতায়েন রেখেছিলেন। সদর দেওয়ানী আদালতের প্রতিপত্তিশালী উকিল রাজনারায়ণ দত্তের একমাত্র পুত্র, হিন্দু কলেজের প্রতিভাবান ছাত্র মধুসূদন দত্তকে পাদ্রিরা খ্রীস্টধর্মে দীক্ষা দেবেন, এ সংবাদ সেদিনকার সীমাবদ্ধ নাগরিক সমাজে কারও অজানা থাকার কথা নয়। বোঝা যায়, সাধারণ শহরবাসীরও বেশ ভিড় হয়েছিল গির্জার চারিদিকে।

এগারো বছর আগে, কলকাতা শহরে আর একবার এইরকম চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছিল, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় যেদিন খ্রীস্টধর্মে দীক্ষিত হয়েছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্রের বয়স তখন বারো বছর, সংস্কৃত কলেজের ব্যাকরণশ্রেণীর ছাত্র তিনি। তরুণদের এই আচরণের এবং পাদ্রি সাহেবদের ধর্মাভিযানের প্রকৃত তাৎপর্য সেদিন তিনি উপলব্ধি করতে পারেননি। এখন তিনি আর বারো বছরের বালক নন, তেইশ বছরের যুবক। ছাত্র নন, পণ্ডিত, এবং পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। তেইশ বছরের বিদ্যাসাগর চোখের সামনে দেখছেন, তাঁর অনুজতুল্য এক অপরিচিত যুবক খ্রীস্টধর্মে দীক্ষা নিচ্ছেন। তার জন্য তিনি নিজগৃহ থেকে পালিয়ে দুর্গের মধ্যে আশ্রয় নিয়েছেন। পাদ্রিদের উল্লাসের

সীমা নেই। কৃষ্ণমোহন এসেছেন দীক্ষা-উৎসবে 'chosen witness' হয়ে। উৎসব উপলক্ষে মধুসূদনের নিজের রচিত সঙ্গীতের সমবেত স্বর গির্জার ভিতর থেকে তরঙ্গায়িত হয়ে আসছে বাইরে,

Long sunk in Superstition's night,
By Sin and Satan driven
I Saw not,—cared not for the light,
That leads the Blind to Heaven.

I sat in darkness, Reason's eye
was shut, was closed in me ;
I hastened to Eternity
O'er Error's dreadful Sea !

But now, at length thy grace O Lord !
Bids all around me shine ;
I drink thy sweet, thy precious word
I Kneel before thy shrine !

I've broke Affection's tenderest ties
For my blest Saviour's sake
All, all I love beneath the skies
Lord ! I for thee forsake !

এ-সঙ্গীতের ভাবার্থে বিদ্যাসাগরের মন বেদনায় ভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছিল হয়ত, কিন্তু তার রচয়িতার মনোভাব তিনি কিছুতেই সমর্থন করতে পারেননি। মানুষের মুক্তিদাতা কোন অদৃশ্য ঈশ্বর সম্বন্ধে তাঁর কোন ধারণা ছিল না। সেরকম কোন মুক্তিদাতার অস্তিত্ব সম্বন্ধে তিনি কোনদিন চিন্তা করার প্রয়োজনও বোধ করেননি। যুক্তিবাদী তরুণ যুবকেরা কেন ধর্মান্তরিত হয়ে, ঈশ্বর বদল করে, পুরোহিতের বদলে পাদ্রি ও আচার্যের উপদেশ শুনে, কুসংস্কারের অন্ধকার প্রেতপুরী থেকে আলোকরাজ্যে যাত্রা করতে চান এবং

সেই চাওয়ার মধ্যে যুক্তি কোথায়, বিদ্যাসাগর তা বুঝতে পারতেন না। বুঝতে না পারলেও তিনি কোন ধর্মমত নিয়ে কোনদিন কারও সঙ্গে আলোচনা করেননি, প্রকাশ্যে তো নয়ই। তাঁর প্রিয়জনদের মধ্যে অনেকের সঙ্গে এবিষয়ে গভীর মতভেদ থাকলেও, কর্মজীবনে হাত মিলিয়ে চলার পথে কোনদিন তা দুর্লঙ্ঘ্য অন্তরায় সৃষ্টি করেনি।

মধুসূদনের ধর্মান্তরে বিদ্যাসাগর আরও অনেকের মতন ব্যথিত হয়েছিলেন। ১৮৪৩ সালের ৯ ফেব্রুয়ারী, বৃহস্পতিবার দিনটি তাঁর কি ভাবে কেটেছিল, কেউ জানে না। প্রায় প্রতিদিন যাঁরা তাঁর বাসায় আসতেন, তাঁদের সঙ্গে সেদিন তিনি কি আলাপ-আলোচনা করেছিলেন, তা জানলে হয়ত তাঁর মানসিক প্রতিক্রিয়ার কথা জানা যেত। কিন্তু তাও জানবার উপায় নেই। নৈরাশ্যে একেবারে ভেঙে না পড়লেও, সেদিন যে তিনি কোন উজ্জ্বল ভবিষ্যতের সম্ভাবনায় উৎসাহিত হয়ে ওঠেননি, এ কথা ঠিক।

মধুসূদনের মতন একেবারে কাঁচা বয়সের তরুণদের মধ্যে, 'পাগলামি, তুই আয় রে দুয়ার ভেদি' ভাব প্রবল হলেও, ইয়ং বেঙ্গল দলের বয়ঃজ্যেষ্ঠরা নিঃসন্দেহে তখন প্রকৃতিস্থ হয়ে উঠেছেন। তাঁদের সামাজিক দায়িত্ববোধও তখন অনেক সজাগ হয়েছে। নানারকমের সভাসমিতিতে মিলিত হয়ে তাঁরা সমাজের জটিল সমস্যাগুলি নিয়ে আলাপ-আলোচনা করছেন। পত্রপত্রিকার মধ্য দিয়ে সেগুলি লোকচক্ষুর সামনে তুলে ধরছেন। সমাধানের পথ খুঁজছেন তাঁরা। সভাসমিতির মধ্যে 'সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা' ও 'তত্ত্ববোধিনী সভা' প্রধান। পত্রপত্রিকার মধ্যে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' ও 'বেঙ্গল স্পেক্টেটর' প্রগতিশীল দলের উল্লেখযোগ্য মুখপত্র।

চতুর্থ দশকে, নবীন বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ভিত-গঠনের এই উদ্‌যোগপর্বে বিদ্যাসাগর তাঁর কর্মজীবন আরম্ভ করেছিলেন। এই উদ্‌যোগ ও প্রয়াসের ভিতর থেকেই তিনি তাঁর পথেরও সন্ধান পেয়েছিলেন। মধুসূদনের ধর্মান্তরের মতন দু'-একটি দুর্ঘটনায় তিনি একেবারে হতাশ হবার মতন কোন কারণ খুঁজে পাননি।

যে সময় মধুসূদনের ধর্মান্তরের ব্যাপার নিয়ে কলকাতা শহরে কোলাহল হচ্ছিল, সেই সময় 'সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা', 'তত্ত্ববোধিনী সভা' প্রভৃতি

সভা-সমিতির বৈঠকে এবং 'বেঙ্গল স্পেক্টেটর', 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা', প্রভৃতি পত্রিকায় নানাবিষয় ও সমস্যা নিয়ে আলাপ-আলোচনা, তর্কবিতর্ক, বাদ-প্রতিবাদ চলছিল। নব্যশিক্ষিত যুবকরা বিভিন্ন গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিলেন বলা চলে। প্রধানত ধর্মমত নিয়েই তাঁদের মধ্যে বিরোধ ছিল; সামাজিক সমস্যা ও মতামত নিয়ে বিশেষ মতভেদ ছিল না। দেবেন্দ্রনাথের ব্রাহ্মধর্ম প্রচারকার্যের বিরোধী ছিলেন ইয়ং বেঙ্গলের একটি দল। তাঁদের দলনেতা ছিলেন রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন। দেবেন্দ্রনাথ ও তাঁর সহকর্মীদের উদ্দেশ্য ছিল, নব্যশিক্ষিত হিন্দু যুবকদের স্বধর্মবিদ্বেষী মনোভাব সংযত করা এবং পাদ্রিদের স্বার্থপ্রণোদিত প্রচারের প্রতিবাদ করা। কৃষ্ণমোহনের সমর্থকরা হিন্দুধর্ম ও ব্রাহ্মধর্ম দুয়েরই বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করেছিলেন। পাদ্রিরাও এই সময় খ্রীস্টধর্ম প্রচারের স্বর্ণ সুযোগ পেয়েছিলেন।

ধর্মান্দোলনের এই কোলাহলে একটি দিনের জন্যও বিদ্যাসাগর তাঁর কণ্ঠস্বর যোগ করেননি। নীরবে তিনি দূরে সরে দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি জানতেন, ধর্মের বিপক্ষে বা পক্ষে আন্দোলন করে কোনদিন সমাজের স্থায়ী কল্যাণ কিছু করা সম্ভব হবে না। শক্তি ও সামর্থ্যের অপচয় ছাড়া ধর্মান্দোলন আর কিছু নয়। এক গোঁড়ামি ছেড়ে আর এক গোঁড়ামির গোড়াপত্তনের জন্য এইভাবে শক্তিক্ষয় করতে তাঁর নির্মল পরিচ্ছন্ন যুক্তিবাদী মন সায় দেয়নি কোনদিন। কোন সমাজের ব্যাধির চিকিৎসা না করলে, কোন সম্প্রদায়ের 'ঈশ্বরে'র পক্ষেই তার saviour হওয়া সম্ভব হবে না। এ রকম একটা বুদ্ধি-যুক্তি-নির্ভর বিশ্বাস মনে মনে পোষণ না করলে, বিদ্যাসাগরের পক্ষে এই পরিবেশের মধ্যে বাস করেও ধর্ম সম্বন্ধে এমন নির্বিকার থাকা সম্ভব হত না। এ বিশ্বাসের সঙ্গে নাস্তিকতা বা আস্তিকতার কোন সম্পর্ক নেই।

মধুসূদনের খ্রীস্টধর্মে দীক্ষা গ্রহণের কয়েক মাস পরে, ১৮৪৩ সালের ২১ ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন। 'আত্মজীবনী'তে এ-সম্বন্ধে তিনি লিখেছেন :[১]

> ১৭৬৫ শকের ৭ই পৌষে আমরা ব্রাহ্মধর্ম্ম-ব্রত গ্রহণ করিবার দিন স্থির করিলাম। সমাজের যে নিভৃত কুঠরীতে বেদপাঠ হইত, তাহা একটা যবনিকা দিয়া আবৃত করিলাম; বাহিরের লোক কেহ সেখানে না

আসিতে পারে, এই প্রকার বিধান করিলাম। সেখানে একটি বেদী স্থাপিত হইল ; সেই বেদীতে বিদ্যাবাগীশ আসন গ্রহণ করিলেন। আমরা সকলে তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিয়া বসিলাম। আমাদের মনে এক নূতন উৎসাহ জন্মিল ; অদ্য আমাদের প্রতি-হৃদয়ে ব্রাহ্মধর্ম্ম-বীজ রোপিত হইবে। আশা হইল, এই বীজ অঙ্কুরিত হইয়া কালে ইহা অক্ষয় বৃক্ষ হইবে, এবং যখন ইহা ফলবান হইবে, তখন ইহা হইতে আমরা নিশ্চয় অমৃতলাভ করিব।...

প্রথম, শ্রীধর ভট্টাচার্য্য উঠিয়া বেদীর সম্মুখে প্রতিজ্ঞা পাঠ করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন। পরে, শ্যামাচরণ ভট্টাচার্য্য ; পরে আমি। তাহার পরে পরে, ব্রজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, গিরীন্দ্রনাথ ঠাকুর, আনন্দচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, তারকনাথ ভট্টাচার্য্য, হরদেব চট্টোপাধ্যায়, অক্ষয়কুমার দত্ত, হরিশ্চন্দ্র নন্দী, লালা হাজারী লাল, শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায়, ভবানীচরণ সেন, চন্দ্রনাথ রায়, রামনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়, শশীভূষণ মুখোপাধ্যায়, জগচ্চন্দ্র রায়, লোকনাথ রায় প্রভৃতি ২১ জন ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন।

তত্ত্ববোধিনী সভা যখন প্রথম সংস্থাপিত হয়, তখন সেই একদিন, আর অদ্য ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণের এই আর একদিন। ১৭৬১ শক হইতে ক্রমে ক্রমে এত দূর আমরা অগ্রসর হইলাম যে, অদ্য ব্রহ্মের শরণাপন্ন হইয়া আমরা ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিলাম। এই ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া আমরা নূতন জীবন লাভ করিলাম। আমাদের উৎসাহ ও আনন্দ দেখে কে?

ব্রাহ্ম সমাজের এ একটা নূতন ব্যাপার। পূর্ব্বে ব্রাহ্মসমাজ ছিল, এখন ব্রাহ্মধর্ম্ম হইল। ব্রহ্ম ব্যতীত ধর্ম্ম থাকিতে পারে না, এবং ধর্ম্ম ব্যতীতও ব্রহ্ম লাভ হয় না। ধর্ম্মেতে ব্রহ্মেতে নিত্য সংযোগ। এই সংযোগ বুঝিতে পারিয়া আমরা ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিলাম। ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া আমরা ব্রাহ্ম হইলাম, এবং ব্রাহ্মসমাজের সার্থক্য সম্পাদন করিলাম।

১৮৪৩ সালের ৯ ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার, ২১ ডিসেম্বরও বৃহস্পতিবার। ওল্ড মিশন চার্চ ও ব্রাহ্মসমাজে দু'টি ধর্মদীক্ষানুষ্ঠান হয়। দুই বৃহস্পতিবারের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য কোথায়? পার্থক্য আছে, ধর্মের ক্ষেত্রে, কিন্তু সেটা তো বাইরের পার্থক্য। ভিতরের পার্থক্য বিদ্যাসাগরের খোলা চোখে ধরা পড়েনি।

তত্ত্ববোধিনী সভা ও ব্রাহ্মসমাজ সেদিন পাদ্রিদের অভিযান অনেকটা প্রতিরোধ করেছিল ঠিকই। তা না করলে হয়ত শিক্ষিত হিন্দুদের মধ্যে আরও কিছু খ্রীস্টানের সংখ্যা বাড়ত। তা না বেড়ে ব্রাহ্মের সংখ্যা বেড়েছে। কিন্তু তাতে বৃহত্তর বাঙালী সমাজের লাভক্ষতি কি হয়েছে, তার খতিয়ান করে কেউ দেখেননি। সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতা ও গোঁড়ামি সমাজ থেকে দূর হয়েছে কি?

কঠোর বস্তুবাদী অক্ষয়কুমার দত্ত ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হয়েছিলেন। পরে ধর্ম বিষয়ে দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর গুরুতর মতভেদ হলেও, প্রথমে তিনি দীক্ষা গ্রহণে আপত্তি করেননি। ধর্মের ব্যাপারে সব দিক দিয়ে মুক্তপুরুষ ছিলেন বিদ্যাসাগর। অথচ সামাজিক ব্যাপারে তত্ত্ববোধিনী সভা ও তত্ত্ব-বোধিনী পত্রিকার সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ রাখার প্রয়োজনীয়তা তিনি বোধ করেছিলেন এবং যোগাযোগ রেখেও ছিলেন। তত্ত্ববোধিনী সভার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট থেকেও তিনি ধর্ম বিষয়ে একেবারে নির্লিপ্ত ছিলেন।

'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় পাদ্রিদের আচরণের কঠোর সমালোচনা করা হত। ব্রাহ্মসমাজের সভ্যবৃন্দ ও খ্রীস্টান পাদ্রিরা এই সময় ধর্মপ্রচারের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন বললে ভুল হয় না। কলকাতার বাইরে (যেমন কৃষ্ণনগর বর্ধমান প্রভৃতি স্থানে) পাদ্রিরা যেমন অভিযান করতেন, ব্রাহ্মরাও তেমনি তাঁদের ধর্মান্তরের প্রয়াস ব্যর্থ করবার চেষ্টা করতেন। এই প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলে শিক্ষিত হিন্দুসমাজের একাংশ এই সময় খ্রীস্টধর্মে ও ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হন। বৃহত্তর সামাজিক আন্দোলন ধর্মান্দোলনের চোরাগলিতে কতকটা পথ হারিয়ে ফেলে।

ধর্ম নিয়ে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রচণ্ড বাক্‌যুদ্ধ চলতে থাকে। পাদ্রিদের কঠোর ভাষায় আক্রমণ করা হয়। চোদ্দ বছরের উমেশচন্দ্র সরকার যখন তাঁর এগারো বছরের স্ত্রীর সঙ্গে খ্রীস্টধর্ম গ্রহণ করেন, তখন 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' লেখেন :[২]

> অন্তঃপুরস্থ স্ত্রী পর্য্যন্ত স্বধর্ম্ম হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া পরধর্ম্মকে অবলম্বন করিতে লাগিল! এই সকল সাংঘাতিক ঘটনাকে প্রত্যক্ষ দেখিয়াও কি আমারদিগের চৈতন্য হয় না? আর কতকাল আমরা অনুৎসাহ নিদ্রাতে অভিভূত থাকিব? ধর্ম্ম যে এককালীন নষ্ট হইল, এ দেশ

> যে উচ্ছিন্ন হইবার উপক্রম হইল, এবং আমারদিগের হিন্দুনাম যে চিরকালের মত লুপ্ত হইবার সম্ভাবনা হইল! মিশনারীদিগের দৌরাত্ম্য এ পর্য্যন্ত সহ্য হইয়াছিল, কিন্তু এইক্ষণে সহিষ্ণুতার সীমা বহির্ভূত হইতেছে। পূর্ব্বাবধি তাহারা কেবল কৌশলজাল বিস্তার করিয়াছিল, কিন্তু এইক্ষণে তাহার সহিত প্রবল অন্যায় আচরণ সকলকে মিশ্রিত করিতেছে।

কয়েক মাস পরে পত্রিকায় আবার এই বিষয় নিয়ে লেখা হয় :[৩]

> নির্লজ্জ মিশনারিরা শতবৎসরাবধি হিন্দুধর্ম্মের উচ্ছেদ চেষ্টা করিতেছে, শত বৎসরাবধি খৃষ্টধর্ম্মে এ দেশকে অভিষিক্ত করিবার যত্ন করিতেছে, মধ্যে মধ্যে মাতাপিতার ক্রোড় হইতে স্নেহের সন্তানকেও হরণ করিতেছে, তথাপি এদেশীয় লোকের চৈতন্য হয় না—তথাপি মিশনারিদিগের দুশ্চেষ্টা নিবারণের কোন সদুপায় ধার্য্য হয় না। সত্যের পথে যখন তাহারা কণ্টক বিস্তার করিতেছে, তখন সত্যের সাধকেরা কি প্রকারে নীরব রহিয়াছেন?

উমেশচন্দ্র সরকার ছিলেন দেবেন্দ্রনাথের 'হাউসে'র সরকার, রাজেন্দ্র-নাথের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। উমেশ ও তাঁর স্ত্রীর ধর্মান্তরে দেবেন্দ্রনাথ খুবই বিচলিত হন। তিনি লিখেছেন: 'অন্তঃপুরের স্ত্রীলোক পর্যন্ত খৃষ্টান করিতে লাগিল! তবে রোস, আমি ইহার প্রতিবিধান করিতেছি।' তাঁর অনুরোধে অক্ষয়কুমার প্রতিবাদ করে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রবন্ধ লেখেন। প্রতিদিন সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত গাড়ী করে তিনি কলকাতা শহরের গণ্যমান্য হিন্দুদের বাড়ী বাড়ী গিয়ে অনুরোধ করেন, পাদ্রিদের স্কুলে ছেলেদের না পাঠাতে। রাজা রাধাকান্ত দেব, সত্যচরণ ঘোষাল, রামগোপাল ঘোষ সকলেই তাঁর সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন। তিনি লিখেছেন: 'ইহাতেই ধর্ম-সভা ও ব্রহ্মসভার যে দলাদলি, এবং যাহার সঙ্গে যাহার যে অনৈক্য ছিল, সকলি ভাঙ্গিয়া গেল।' একটি সভা ডেকে নতুন বিদ্যালয় স্থাপনের পরিকল্পনা করা হল। বিনা বেতনে হিন্দুর ছেলেরা এই বিদ্যালয়ে পড়বে। আশুতোষ দেব ও প্রমথনাথ দেব দশ হাজার টাকা দিলেন। রাজা সত্যচরণ

ঘোষাল তিন হাজার টাকা, ব্রজনাথ ধর দুই হাজার টাকা, রাধাকান্ত দেব এক হাজার টাকা দিলেন। মোট চল্লিশ হাজার টাকা উঠল। বিদ্যালয়ের নাম হল 'হিন্দুহিতার্থী বিদ্যালয়'। ভূদেব মুখোপাধ্যায় এই বিদ্যালয়ের প্রথম শিক্ষক হন। দেবেন্দ্রনাথ লিখেছেন: 'সেই অবধি খৃষ্টান হইবার স্রোত মন্দীভূত হইল, একেবারে মিশনরিদিগের মস্তকে কুঠারাঘাত পড়িল।'

কেবল খ্রীস্টধর্ম ও পাদ্রিদের বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করেই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার পরিচালকরা ক্ষান্ত হননি। বৈদান্তিক মতবাদ প্রচার করে, ধর্মতত্ত্ববিষয়ে রচনা প্রকাশ করে, দেবেন্দ্রনাথ ও তাঁর অনুরাগীরা পাদ্রি-প্রচারিত খ্রীস্টধর্মের মাহাত্ম্য ম্লান করবার জন্য বদ্ধপরিকর হয়েছিলেন। তাতে কোন সামাজিক সুফল যে ফলেনি তা নয়। কিন্তু তত্ত্ববোধিনী সভা ও তার মুখপত্রের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট কয়েকজন সভ্য এই আধ্যাত্মিক আদর্শ প্রচারে খুব বেশি উৎসাহিত হচ্ছিলেন না। এই কয়েকজন সভ্যের মধ্যে প্রধানতম হলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমার দত্ত। দু'জনেই সাহিত্য, বিজ্ঞান ও সমাজসংস্কারের মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে তত্ত্ব-বোধিনীর সংস্পর্শে এসেছিলেন, ধর্মচর্চা বা আধ্যাত্মিক জ্ঞানানুশীলনের জন্য নয়। অক্ষয়কুমার ব্রাহ্ম হলেও ঘোর বস্তুবাদী ও বৈজ্ঞানিক মনোভাবা-পন্ন ছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র তো 'ঈশ্বর' নিয়ে চিন্তা করারই অবকাশ পেতেন না। দুই বন্ধুর এইদিক দিয়ে এক ঐতিহাসিক মিলন হয়েছিল তত্ত্ব-বোধিনী সভায়। দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে উভয়েরই নানাবিষয়ে মতবিরোধ হতে লাগল। তা সত্ত্বেও, 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র প্রথম প্রকাশকাল (১৭৬৫ শক, ১ ভাদ্র) থেকে দীর্ঘ বারো বৎসর পর্যন্ত যে অক্ষয়কুমার তার সম্পাদক ছিলেন এবং সভার প্রতিষ্ঠাকাল (১৭৬১ শক, ২১ আশ্বিন) থেকে না হলেও, কয়েকবছর পর থেকে সভ্য হয়ে সভার শেষ দিন পর্যন্ত যে বিদ্যাসাগর তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন এবং শেষে তার সম্পাদকও ছিলেন, একথা ভাবলে অবাক হতে হয়। অবাক হতে হয় দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের উদারতা ও গুণগ্রাহিতার কথা ভেবে। বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়-কুমারের অনাধ্যাত্মিক মনোভাবে যথেষ্ট বিরক্ত হলেও, দেবেন্দ্রনাথ তাঁদের

শক্তি ও প্রতিভাকে স্বীকার করতে কুণ্ঠিত হতেন না এবং সভা ও পত্রিকার কল্যাণে তাঁদের সহযোগিতাও অপরিহার্য বলে মনে করতেন।

বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমার সমবয়সী ছিলেন। বিদ্যাসাগর যখন ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে সেরেস্তাদারী করেন, অক্ষয়কুমার তখন তত্ত্ববোধিনী সভার সংস্পর্শে এসে, তত্ত্ববোধিনী পাঠশালায় শিক্ষকতা এবং পরে পত্রিকা সম্পাদনার কাজ করেন। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে অক্ষয়কুমারের পরিচয় হয় কবি ঈশ্বর গুপ্তের মধ্যস্থতায়। অক্ষয়কুমারের জেঠতুতো ভাই হরমোহন দত্ত সুপ্রীম কোর্টের মাস্টার আপিসের বড়বাবু ছিলেন। কোর্টের বিজ্ঞাপনাদির সমস্ত দায়িত্ব ছিল তাঁর উপর। 'সংবাদ-প্রভাকর' সম্পাদক ঈশ্বর গুপ্ত বিজ্ঞাপনলাভের আশায় হরমোহনের কাছে যাতায়াত করতেন। এই সময় অক্ষয়কুমারের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। দেবেন্দ্রনাথের তত্ত্ববোধিনী সভা প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৩৯ সালে। প্রতিষ্ঠার দু'-একমাস পরেই ঈশ্বর গুপ্ত এই সভার সভ্যশ্রেণীভুক্ত হন। 'অক্ষয়-চরিত'কার নকুড়চন্দ্র বিশ্বাস লিখেছেন :[৪]

> এক দিবস সন্ধ্যাকালে তাঁহার সমভিব্যাহারে অক্ষয়বাবু সভা দেখিতে যান। দেখিতে গিয়া মহানুভব দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিকট পরিচিত হন। এই পরিচয় দত্তজর সৌভাগ্যের মূল। ইহার অব্যবহিত পরে উল্লিখিত শকের (১৭৬১ শক) ১১ই পৌষ তারিখে ঈশ্বর গুপ্তের প্রস্তাবে ও ভগবতীচরণ চট্টোপাধ্যায়ের পোষকতায় ইনি সভ্য মনোনীত হন। পর বৎসর অর্থাৎ ১৭৬২ শকের ১লা (আষাঢ়) শনিবার তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা সংস্থাপিত হইলে, ইনি ৮৲ টাকা বেতনে উহার শিক্ষকতায় নিযুক্ত হন। ৪ঠা শ্রাবণ হইতে বেতন ১০৲ টাকা হয়। তারপর ১৪৲ টাকা বেতনে তৃতীয় শিক্ষক হন।

তত্ত্ববোধিনী সভার মুখপত্র 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' প্রকাশিত হয় ১৮৪৩ সালের ১৬ অগস্ট। পত্রিকার সম্পাদক নির্বাচনের ব্যাপারে স্থির হয় যে 'বেদান্ত ধর্ম্মানুযায়ী সন্ন্যাস ধর্ম্মের এবং সন্ন্যাসীদিগের প্রশংসাবাদ' সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ

লিখে দেবেন্দ্রনাথের কাছে পাঠাতে হবে। যাঁর রচনা সর্বোৎকৃষ্ট হবে তিনিই সম্পাদকের পদে অভিষিক্ত হবেন। নকুড়চন্দ্র লিখেছেন :[৫]

> ভবানীচরণ সেন, অক্ষয়কুমার দত্ত প্রভৃতি কৃতবিদ্য ব্যক্তিগণের মধ্যে ইহার প্রতিযোগিতা হয়। অক্ষয়বাবুর প্রবন্ধটি সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া বিবেচিত হইলে, ইনি ৩০৲ বেতনে নিযুক্ত হন। তখন এই পদ 'গ্রন্থ-সম্পাদকতা' বলিয়া অভিহিত ছিল।

পত্রিকা প্রকাশের উদ্দেশ্য ও পত্রিকার সম্পাদক নির্বাচন প্রসঙ্গে দেবেন্দ্রনাথ আত্মজীবনীতে বলেছেন :[৬]

> আমি ভাবিলাম, তত্ত্ববোধিনী সভার অনেক সভ্য কার্য্যসূত্রে পরস্পর বিচ্ছিন্নভাবে আছেন। তাঁহারা সভায় কোন সংবাদই পান না, অনেক সময় উপস্থিত হইতেও পারেন না। সভায় কি হয়, অনেকেই তাহা অবগত নহেন। বিশেষতঃ ব্রাহ্মসমাজে বিদ্যাবাগীশের ব্যাখ্যান অনেকেই শুনিতে পান না; তাহার প্রচার হওয়া আবশ্যক। এতদ্ব্যতীত, যে সকল বিষয়ে লোকের জ্ঞান বৃদ্ধি ও চরিত্র শোধনের সহায়তা করিতে পারে, এমন সকল বিষয়ও প্রকাশ হওয়া আবশ্যক। আমি এইরূপ চিন্তা করিয়া ১৭৬৫ শকে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রচারের সঙ্কল্প করি।
>
> পত্রিকার একজন সম্পাদক নিয়োগ আবশ্যক। সভ্যদিগের মধ্যে অনেকেরই রচনা পরীক্ষা করিলাম। কিন্তু অক্ষয়কুমার দত্তের রচনা দেখিয়া আমি তাঁহাকে মনোনীত করিলাম। তাঁহার এই রচনাতে গুণ ও দোষ দুইই প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম। গুণের কথা এই যে, ইহাতে তিনি জটা-জুট-মণ্ডিত ভস্মাচ্ছাদিত-দেহ তরুতলবাসী সন্ন্যাসীর প্রশংসা করিয়াছিলেন। কিন্তু চিহ্নধারী বহিঃসন্ন্যাস আমার মতবিরুদ্ধ। আমি মনে করিলাম, যদি মতামতের জন্য নিজে সতর্ক থাকি, তাহা হইলে ইহার দ্বারা অবশ্যই পত্রিকা সম্পাদন করিতে পারিব।
>
> ফলতঃ তাহাই হইল। আমি অধিক বেতন দিয়া অক্ষয় বাবুকে ঐ কার্য্যে নিযুক্ত করিলাম। তিনি যাহা লিখিতেন, তাহাতে আমার মতবিরুদ্ধ কথা কাটিয়া দিতাম, এবং আমার মতে তাঁহাকে আনিতে

চেষ্টা করিতাম ; কিন্তু তাহা আমার পক্ষে বড় সহজ ব্যাপার ছিল না। আমি কোথায়, আর তিনি কোথায়! আমি খুঁজিতেছি, ঈশ্বরের সহিত আমার কি সম্বন্ধ ; আর তিনি খুঁজিতেছেন, বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির কি সম্বন্ধ ; আকাশ-পাতাল প্রভেদ!

ফলতঃ, আমি তাঁহার ন্যায় লোককে পাইয়া তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার আশানুরূপ উন্নতি করি। অমন রচনার সৌষ্ঠব তৎকালে অতি অল্প লোকেরই দেখিতাম। তখন কেবল কয়েকখানা সংবাদপত্রই ছিল ; তাহাতে লোকহিতকর জ্ঞানগর্ভ কোন প্রবন্ধই প্রকাশ হইত না। বঙ্গদেশে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা সর্ব্বপ্রথমে সেই অভাব পূরণ করে।...

দেবেন্দ্রনাথের এই উক্তি থেকেই পরিষ্কার বোঝা যায়, অক্ষয়কুমারের সঙ্গে তাঁর মতামতের বিরোধ কত গভীর ছিল। বিস্ময়কর হল, তা সত্ত্বেও, প্রথম থেকেই তিনি অক্ষয়কুমারকে পত্রিকার সম্পাদক মনোনীত করেছিলেন। মতামত সম্বন্ধে সজাগ হয়েও তিনি সহজে অক্ষয়কুমারের মত বদলাতে পারতেন না। কিন্তু তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সাহিত্যিক সমৃদ্ধি ও উন্নতি কামনা করেই তিনি নিজের ধর্মমত সব সময় জোর করে সম্পাদকের উপর বা গ্রন্থাধ্যক্ষ-সমিতির সভ্যদের উপর চাপাতেন না। কেবল সম্পাদকের সঙ্গে নয়, গ্রন্থাধ্যক্ষদের দু'-একজনের সঙ্গেও তাঁর মতবিরোধ হত। তাঁদের মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর অন্যতম।

এসিয়াটিক সোসাইটির মতন দেবেন্দ্রনাথও 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র জন্য একটি 'Paper Committee' বা প্রবন্ধ-নির্বাচনী সভা স্থাপন করেন। সভ্যদের 'গ্রন্থাধ্যক্ষ' বলা হত। পাঁচ জন গ্রন্থাধ্যক্ষ নিয়ে সভা গঠিত হয় এবং পাঁচ জনের মধ্যে কেউ অবসর গ্রহণ করলে অন্য একজন মনোনীত হতেন। এই গ্রন্থাধ্যক্ষদের মধ্যে ছিলেন,

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর	আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ
রাজেন্দ্রলাল মিত্র	প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারী
দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর	রাধাপ্রসাদ রায়
রাজনারায়ণ বসু	শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায়
আনন্দকৃষ্ণ বসু	শ্রীধর ন্যায়রত্ন

এবং আরও অনেকে।

ঈশ্বরচন্দ্র ১৭৭০ শকের (১৮৪৮ সাল) ২৩ শ্রাবণ অধ্যক্ষসভার অধিবেশনে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার 'পেপার-কমিটি'র সভ্য নির্বাচিত হন। কিন্তু তার আগেই অক্ষয়কুমারের সঙ্গে তাঁর আলাপ-পরিচয় হয়।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার নিয়ম ছিল যে, গ্রন্থ-সম্পাদক বা গ্রন্থাধ্যক্ষ বা অন্য যে কেউ হন, প্রত্যেকের রচনা পত্রিকায় প্রকাশিত হবার আগে পেপার-কমিটির অধিকাংশ সভ্যের দ্বারা পঠিত ও মনোনীত হওয়া প্রয়োজন। কমিটির সভ্যদের প্রস্তাব অনুযায়ী যে-কোন রচনা সংশোধন ও পরিবর্তন করাও চলতে পারে। সম্পাদক অক্ষয়কুমারের রচনা দেবেন্দ্রনাথ নিজে প্রায় রাত্রি ১২টা পর্যন্ত জেগে সংশোধন করে দিতেন। তারপর সেগুলি গ্রন্থাধ্যক্ষদের কাছে পাঠানো হত। এই সময় রাধাকান্ত দেবের দৌহিত্র আনন্দকৃষ্ণ বসু একজন গ্রন্থাধ্যক্ষ ছিলেন। তাঁর কাছে অক্ষয়কুমারের রচনাগুলি প্রেরিত হত। বিদ্যাসাগরের সঙ্গে আনন্দকৃষ্ণের ও শ্রীনাথ ঘোষের (রাধাকান্ত দেবের জামাতা) গভীর বন্ধুত্ব ছিল। নানাবিষয়ে আলাপ-আলোচনার জন্য, বিশেষ করে ইংরেজী শিক্ষার জন্য তিনি প্রায়ই আনন্দকৃষ্ণের কাছে যাতায়াত করতেন।[৭] আনন্দকৃষ্ণ তাঁকে মধ্যে মধ্যে অক্ষয়কুমারের প্রবন্ধগুলি দেখে দিতে বলতেন এবং তিনি যত্ন করে দেখে দিতেন। এইভাবে কিছুদিন অক্ষয়কুমারের প্রবন্ধগুলি দেখে দেবার পর একদিন আনন্দবাবু বিদ্যাসাগরকে বললেন: 'অক্ষয়বাবু আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চান।' বিদ্যাসাগর মহাশয় বলেন: 'বেশ তো তাঁকে একদিন আসতে বলবেন।' কথামতো অক্ষয়বাবু একদিন এসে ঈশ্বরচন্দ্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং বলেন: 'আমার প্রবন্ধগুলি আপনি অনুগ্রহ করে দেখে দিয়ে যে কত উপকার করেছেন, তা বলা যায় না। এইভাবে যদি আপনি একটু কষ্ট করে দেখে দেন, তাহলে চিরবাধিত হবো।' ঈশ্বরচন্দ্র সন্তুষ্টচিত্তে সম্মত হন।* নকুড়চন্দ্র লিখেছেন: 'বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত দত্তজর এই প্রথম আলাপ-পরিচয়। ইহার পর অর্থাৎ ১৭৭০ শকের ২৩ শ্রাবণ তারিখের অধ্যক্ষসভার অধিবেশনে তিনি পেপার-কমিটির সভ্যশ্রেণী-ভুক্ত হন।'[৮]

* কথাগুলি 'অক্ষয়-চরিত'কার বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিজমুখে শুনেছিলেন।

পেপার-কমিটির কাজকর্ম কি ভাবে পরিচালিত হত তার কয়েকটি দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করছি। দৃষ্টান্তগুলি ঈশ্বরচন্দ্র প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য :[৯]

কবিরপন্থিদিগের বৃত্তান্তবিষয়ক পাণ্ডুলেখ্য প্রেরণ করিতেছি। যথা-বিহিত অনুমতি করিবেন। নিবেদনমিতি।

তত্ত্বোধিনী সভা শ্রীঅক্ষয়কুমার দত্ত।
১৪ আশ্বিন, ১৭৭০ গ্রন্থ-সম্পাদক।

প্রেরিত প্রস্তাব পাঠে পরম পরিতোষ পাইলাম। ইহা অতি সহজ ও সরল ভাষায় সুচারুরূপে রচিত ও সঙ্কলিত হইয়াছে। অতএব পত্রিকায় প্রকাশ বিষয়ে আমি সন্তুষ্ট চিত্তে সম্মতি প্রদান করিলাম। ইতি।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মা।

শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর উক্ত পাণ্ডুলেখ্যর স্থানে স্থানে যে সকল পরিবর্ত্তন করিয়াছেন, তাহা অতি উত্তম হইয়াছে।

শ্রীশ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায়।

প্রেরিত পাণ্ডুলেখ্য প্রকাশযোগ্য।

শ্রীরাজেন্দ্রলাল মিত্র।
শ্রীরাজনারায়ণ বসু।

শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় বঙ্গ ভাষায় মহাভারত অনুবাদ করিতে আরম্ভ করিয়া তাহার এক অংশ প্রেরণ করিয়াছেন দৃষ্টি করিবেন। আপনারা দেখিবেন তাহা অতি সুচারু শুদ্ধ ভাষায় পরিপাটীরূপে লিখিত হইয়াছে। তাহা পাঠ করিয়া পাঠকেরা পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হইবেন এবং পত্রিকার বিষয়ে তাঁহাদিগের অনুরাগ বৃদ্ধি পাইতে পারিবেক। এতদ্ভিন্ন আমারদিগের পূর্ব্বকার আচার-ব্যবহারাদির যেরূপ নিদর্শন পাওয়া যায় এমত আর কুত্রাপি নাই, অতএব এই বাঙ্গালা

অনুবাদ দ্বারা ভারতবর্ষের পুরাবৃত্ত সন্ধায়ি এতদ্দেশীয় ব্যক্তিদিগেরও উপকার হইবেক। নিবেদনমিতি।

তত্ত্ববোধিনী সভা শ্রীঅক্ষয়কুমার দত্ত।
২৬ পৌষ, ১৭৭০ গ্রন্থ-সম্পাদক।

গ্রন্থ-সম্পাদক মহাভারতের অনুবাদ বিষয়ে উত্তম বিবেচনা করিয়াছেন ইহা অবশ্য প্রকাশ কর্ত্তব্য।

শ্রীআনন্দকৃষ্ণ বসু।

অতি সুললিত ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছে এবং ভরসা করি এইরূপ প্রকাশ ক্রমশঃ হয়, তাহা হইলে অনেক উপকার সম্ভাবনা।

শ্রীশ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায়

এতদ্রূপ মহাভারতের অনুবাদ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাকে অতি লোক-প্রিয় করিবেক।

শ্রীরাজনারায়ণ বসু।

পেপার-কমিটির এই কার্যপ্রণালী থেকে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা পরিচালনার সুনিয়ন্ত্রিত সুসংযত পদ্ধতিটি চোখের সামনে ভেসে ওঠে। জানি না, বাংলা পত্রিকার ইতিহাসে পরবর্তীকালে ক'খানি পত্রিকা এইভাবে পরিচালিত হয়েছে! পরিচালনার পদ্ধতির মধ্যে লক্ষ্য করলে, আরও একটি ব্যাপার পরিষ্কার বোঝা যায়। অক্ষয়কুমার পত্রিকাটিকে কেবল ধর্মতত্ত্বের রহস্য বিচারের পত্রিকা করতে চাননি। বিবিধ জ্ঞানবিজ্ঞান সাহিত্য দর্শন ইতিহাস পুরাবৃত্ত সমাজ ইত্যাদি নানাবিষয়ে অনুশীলনের একটি উচ্চাঙ্গের পত্রিকা তিনি করতে চেয়েছিলেন। সে-কাজে যে তিনি কৃতকার্য হয়েছিলেন, একথা দেবেন্দ্রনাথও স্বীকার করেছেন। শিবনাথ শাস্ত্রী লিখেছেন :[১০]

তত্ত্ববোধিনী বঙ্গদেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পত্রিকা হইয়া দাঁড়াইল। তৎপূর্ব্বে বঙ্গসাহিত্যের, বিশেষতঃ দেশীয় সংবাদপত্র সকলের অবস্থা কি ছিল,

> এবং অক্ষয়কুমার দত্ত সেই সাহিত্য-জগতে কি পরিবর্ত্তন ঘটাইয়াছিলেন তাহা স্মরণ করিলে, তাঁহাকে দেশের মহোপকারী বন্ধু না বলিয়া থাকা যায় না। 'রসরাজ', 'যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল' প্রভৃতি অশ্লীলভাষী কাগজগুলি ছাড়িয়া দিলেও 'প্রভাকর' ও 'ভাস্করের' ন্যায় ভদ্র ও শিক্ষিত সমাজের জন্য লিখিত পত্র সকলেও এমন সকল ব্রীড়াজনক বিষয় বাহির হইত, যাহা ভদ্রলোকে ভদ্রলোকের নিকট পাঠ করিতে পারিত না। এই কারণে রামগোপাল ঘোষ প্রভৃতি ডিরোজিওর শিষ্যগণ ঘৃণাতে দেশীয় সংবাদপত্র স্পর্শও করিতেন না। কিন্তু অক্ষয়কুমার দত্ত সম্পাদিত তত্ত্ববোধিনী যখন দেখা দিল, তখন তাঁহারা পুলকিত হইয়া উঠিলেন। রামগোপাল ঘোষ একদিন লাহিড়ী মহাশয়কে বলিলেন—'রামতনু! রামতনু! বাঙ্গালা ভাষায় গম্ভীর ভাবের রচনা দেখেছ? এই দেখ', বলিয়া তত্ত্ববোধিনী পাঠ করিতে দিলেন।

বাংলা ভাষায় গম্ভীর ভাবের রচনা 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় যাঁরা প্রবর্তন করেন, অক্ষয়কুমার দত্ত নিঃসন্দেহে তাঁদের অন্যতম। অক্ষয়কুমারের রচনা-শক্তির বিকাশে যাঁরা প্রত্যক্ষভাবে সাহায্য করেন, তাঁদের মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সর্বাগ্রে স্মরণীয়। রাজনারায়ণ বসু তাঁর 'বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক বক্তৃতা'য় বলেছেন: 'অনেকে অবগত নহেন যে, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট অক্ষয়কুমার দত্ত কত উপকৃত আছেন। তাঁহারা তাঁহার লেখা প্রথম প্রথম বিস্তর সংশোধন করিয়া দিতেন।'

ঈশ্বরচন্দ্রের সহানুভূতি ও সমর্থন ভিন্ন অক্ষয়কুমার একা কখনও তত্ত্ববোধিনীর হাল ধরে রাখতে পারতেন না। দেবেন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিকতার আকর্ষণে সভা ও পত্রিকা দুইই হয়ত ধর্মতত্ত্বের বিচ্ছিন্ন দ্বীপে ভেসে যেত। খ্রীস্টধর্মের প্রচারের উত্তর-প্রত্যুত্তর দেওয়াই হত তার অন্যতম কর্তব্য। সমাজ-জীবনের বৃহত্তর ক্ষেত্রে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করা সম্ভব হত না। অক্ষয়কুমার তা হতে দেননি। সম্পাদকীয় কর্তব্য পালনে তিনি যে চারিত্রিক দৃঢ়তার পরিচয় দিয়েছিলেন, তা অতুলনীয়। তত্ত্ববোধিনীর গ্রন্থাধ্যক্ষ বিদ্যাসাগরের অকুণ্ঠ উৎসাহ তাঁর দৃঢ়তাকে অনেকক্ষেত্রে আরও অনমনীয় করে তুলেছিল।

অক্ষয়কুমার সম্বন্ধে দেবেন্দ্রনাথ বলেছিলেন : 'আমি কোথায়, আর তিনি কোথায়! আমি খুঁজিতেছি, ঈশ্বরের সহিত আমার কি সম্বন্ধ ; আর তিনি খুঁজিতেছেন, বাহ্য বস্তুর সহিত মানব-প্রকৃতির কি সম্বন্ধ ; আকাশ-পাতাল প্রভেদ।' কার্যক্ষেত্রে, সভা ও পত্রিকা পরিচালনকালে ক্রমেই তিনি এ সত্য তীব্রভাবে উপলব্ধি করতে আরম্ভ করলেন। কেবল অক্ষয়কুমারকে নিয়ে নয়, বিদ্যাসাগরকে নিয়েও। বিদ্যাসাগর প্রসঙ্গেও তিনি স্বচ্ছন্দে বলতে পারতেন, 'আমি কোথায়, আর তিনি কোথায়!'

ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে তত্ত্ববোধিনী সভার মিলনের পর দেবেন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন সভাটিকে ব্রাহ্মসমাজেরই মুখ্য প্রতিষ্ঠানে পরিণত করতে। অক্ষয়কুমার ব্রাহ্ম হয়েও তা চাননি। ব্রাহ্মদের মধ্যে আরও অনেকে তা চাননি। বিদ্যাসাগর তো চান-ই নি। যাঁরা তা চাননি, তাঁরা মনে করতেন যে ব্রাহ্ম-সমাজের সঙ্গে তত্ত্ববোধিনী সভার কোন লক্ষ্যগত প্রভেদ না থাকলে, সভার সামাজিক প্রতিপত্তি খণ্ডিত হবে। সমাজ ও সভার আপেক্ষিক মূল্যায়ন নিয়ে দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে সভার সভ্যদের মতবিরোধ হত। পত্রিকার প্রবন্ধ নির্বাচনের ব্যাপারেও যে-দৃষ্টিতে রচনার বিচার করা হত, তাতে সব সময় দেবেন্দ্রনাথের ধর্মপিপাসু মন পরিতৃপ্ত হত না।

অনেক সময় প্রত্যক্ষ সংঘর্ষও এড়িয়ে চলা সম্ভব হত না। ঈশ্বরের স্বরূপ নির্ধারণের ব্যাপারে এবং সংস্কৃত ভাষায় রচিত দেবেন্দ্রনাথের উপাসনা-পদ্ধতির বিরুদ্ধে অক্ষয়কুমার আন্দোলন করতেও দ্বিধা করেননি। বেদান্তবাদ ও বেদের অভ্রান্ততাবাদের প্রতিবাদ করে তিনি বিচার-বিশ্লেষণ আরম্ভ করেন। শিবনাথ শাস্ত্রী লিখেছেন :[১১] 'প্রধানতঃ তাঁহারই প্ররোচনাতে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর উভয় বিষয়ে গভীর চিন্তায় ও শাস্ত্রানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন।' তাহলেও, ঘন ঘন বিরোধ ও সংঘর্ষের ফলে দেবেন্দ্রনাথ ক্রমেই তিতবিরক্ত হয়ে ওঠেন। 'ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিতও দেবেন্দ্রনাথের সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয় একবার তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় ধর্মতত্ত্ব অপেক্ষা বিধবা বিবাহ প্রচারেই অধিক উৎসাহ প্রকাশ করিয়া ব্রাহ্ম সমাজভুক্ত অথচ রক্ষণশীল লোকদিগকে বিরক্ত করিয়া তোলেন।'

বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমার দু'জনেই ঘোর যুক্তিবাদী ছিলেন। অক্ষয়কুমার

প্রায় বলতেন, কৃষকরা পরিশ্রম করে শস্য পায়, জগদীশ্বরের কাছে প্রার্থনা করে কোনঁ কৃষাণের কস্মিনকালেও শস্য লাভ হয়নি। প্রার্থনার ফলাফল যে শূন্য, কিছু নয়, তা তিনি বীজগণিতের সমীকরণ প্রণালীতে এইভাবে বুঝিয়ে দিতেন,

পরিশ্রম = শস্য

পরিশ্রম + প্রার্থনা = শস্য

প্রার্থনা = শূন্য (০)

বলা বাহুল্য, প্রার্থনার ক্ষেত্রেও অক্ষয়কুমারের এই বীজগণিতের সূত্র-প্রয়োগ এবং ধর্মতত্ত্বের বদলে বিদ্যাসাগরের বিধবা-বিবাহাদি বিষয়ে অধিকতর আগ্রহ, দেবেন্দ্রনাথ সম্পূর্ণ বরদাস্ত করতে পারতেন না। একবার রাজনারায়ণ বসু মেদিনীপুর ব্রাহ্মসমাজে একটি বক্তৃতা করেন। তত্ত্ববোধিনীর গ্রন্থাধ্যক্ষরা (অক্ষয়কুমার ও বিদ্যাসাগর তাঁদের মধ্যে প্রধান) বক্তৃতাটি পত্রিকায় প্রকাশযোগ্য মনে করেননি। এই সময় অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়ে দেবেন্দ্রনাথ একখানি পত্রে লেখেন :[১২]

> এ বক্তৃতা আমার বন্ধুদিগের মধ্যে যাঁহারা শুনিলেন তাঁহারাই পরিতৃপ্ত হইলেন ; কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে তত্ত্ববোধিনী সভার গ্রন্থাধ্যক্ষেরা ইহাকে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে প্রকাশযোগ্য বোধ করিলেন না। কতকগুলান নাস্তিক গ্রন্থাধ্যক্ষ হইয়াছে, ইহারদিগকে এ পদ হইতে বহিষ্কৃত না করিয়া দিলে আর ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের সুবিধা নাই।

এ রকম কঠোর খেদোক্তি দেবেন্দ্রনাথ সহজে করেননি। 'কতকগুলান নাস্তিক গ্রন্থাধ্যক্ষ' বলতে তিনি কাদের কথা বলছেন, তাও পরিষ্কার বোঝা যায়। অবশেষে ১৭৮১ শকের বৈশাখ মাসে (১৮৫৯, মে) দেবেন্দ্রনাথ 'তত্ত্ববোধিনী সভা' তুলে দেন। উল্লেখযোগ্য হল, সভার শেষ জীবনে বিদ্যাসাগরই তার সম্পাদক ছিলেন। ১৭৮১ শকের ২৬ বৈশাখ সাংবৎসরিক সভার যে নোটিশ প্রকাশিত হয়, তাও 'শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মা' স্বাক্ষরিত।

আমি কোথায়, আর তিনি কোথায়! আকাশ-পাতাল প্রভেদ!

দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে এ রকম 'আকাশ-পাতাল প্রভেদ' থাকা সত্ত্বেও,

বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমার কি করে তত্ত্ববোধিনী সভা ও পত্রিকার সঙ্গে দীর্ঘকাল ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন, ভাবলে অবাক হতে হয়। বিশেষ করে বিদ্যাসাগরের কথা মনে হলে আরও অবাক হতে হয়। আর্থিক বা চাকরি-বাকরির স্বার্থের ব্যাপারে তত্ত্ববোধিনীর সঙ্গে তাঁর যোগ ছিল না। কর্মজীবনে তাঁর প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপত্তি এই সময় ক্রমেই বাড়ছিল। মতামতের ব্যাপারে কোনকালেই তিনি আপসরফার বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন না। মতের সংঘর্ষ বা বিরোধ তিনি কখন সহ্য করতে পারতেন না। বিদ্যাসাগর-চরিত্রের সব চেয়ে বড় দুর্বলতা ও ত্রুটি ছিল এই 'অসহিষ্ণুতা'। মেজাজও এ-ব্যাপারে তাঁর অত্যন্ত খেয়ালী ছিল। মুহূর্তের মধ্যে যে-কোন গুরুবিষয়ে তিনি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারতেন। তাই মনে হয়, 'আকাশ-পাতাল প্রভেদ' সত্ত্বেও বিদ্যাসাগর কি জন্য শেষ দিন পর্যন্ত তত্ত্ববোধিনী সভার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত ছিলেন? কি করে তাঁর পক্ষে থাকা সম্ভব হয়েছিল?

ধর্মান্দোলনের প্রতি ঈশ্বরচন্দ্রের আস্থা ছিল না। বরং তিনি মনে করতেন, ধর্মান্দোলনে সামাজিক আন্দোলন ব্যাহত হয়। তবু এ কথা ভাবা যায় না যে মধুসূদন দত্তের মতন প্রতিভাবান যুবকদের, নিজধর্ম পরিত্যাগ করে, খ্রীস্টধর্ম গ্রহণের ব্যাকুলতা দেখে তিনি আদৌ চিন্তিত ও ব্যথিত হননি। নিশ্চয় হয়েছিলেন। কৃষ্ণমোহনের মতন জ্ঞানীগুণী ব্যক্তির পক্ষে গোঁড়া পাদ্রিসাহেবে পরিণত হওয়াও তিনি সামাজিক শুভলক্ষণ বলে মনে করতেন না। ডাফ, ডিয়াল্‌ট্রি প্রমুখ পাদ্রিদের অনেক চারিত্রিক গুণ থাকলেও, তাঁদের ধর্মপ্রচারের কলাকৌশল তিনি সমর্থনযোগ্য মনে করতেন না। এদিকে ব্রাহ্মধর্মের প্রচারে যে এ-ব্যাধির উপশম হবে, এ-বিশ্বাসও তাঁর ছিল না। ব্যাধি 'cure' করা সম্ভব হলেও, 'prevent' করা সম্ভব নয়। মূল সমস্যা হল, দিকনির্ণয় করা। সামাজিক কর্তব্যের ও আন্দোলনের দিকনির্ণয় করা। দিকভ্রান্ত যাঁরা, তাঁদের একবার যদি আসল চলার পথটি দেখিয়ে দেওয়া যায়, আসল সমস্যা ও কর্তব্যের সন্ধান দেওয়া যায়, তাহলে তাঁরা অসাধ্য সাধন করতে পারেন। এ-বিশ্বাস তাঁর ছিল। তিনি জানতেন, মধুসূদন বা কৃষ্ণমোহন সাধারণ মানুষ নন। ব্রাহ্মসমাজ ও তত্ত্ববোধিনী সভার সভ্যদের মধ্যেও প্রতিভাবান যুবকের অভাব নেই। পাদ্রিদের দলে যোগ দেওয়ার কথা তিনি কল্পনা করতে পারতেন না।

সনাতন হিন্দুধর্মপন্থীদের সঙ্গে তো নয়ই। বাকি থাকে ব্রাহ্ম সমাজ-তত্ত্ববোধিনীর দলও। এ দলের সঙ্গে অনেকদূর পথ অগ্রসর হওয়া যায়। এ দলের সঙ্গে থেকে যদি নতুন গোঁড়ামির রাশ খানিকটা টেনে রাখা যায়, ধর্মান্দোলনের চোরাগলির পথ থেকে যদি সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের প্রশস্ত পথের দিকে তার গতি ঘুরিয়ে দেওয়া যায়, তাহলে সাময়িক দুর্যোগের অন্ধকার কেটে যাবে, নতুন উষার স্বর্ণদ্বার খুলতে খুব বেশি বিলম্ব হবে না।

এইরকম ধারণার বশবর্তী হয়ে বিদ্যাসাগর তাঁর কর্মজীবনের উদ্‌যোগপর্বে, উনিশ শতকের চতুর্থ দশকে, তত্ত্ববোধিনী সভা ও পত্রিকার প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে এসেছিলেন। ধারণা তাঁর মিথ্যা হয়নি। তাতে তিনি নিজেও উপকৃত হয়েছিলেন এবং তাঁর সান্নিধ্যে অন্যান্য সহকর্মিরাও লাভবান হয়েছিলেন। সভার মধ্যে থেকে তিনি তার ধর্মপ্রবণতার ও গোঁড়ামির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছিলেন, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আদর্শকে বড় করে তুলে ধরবার চেষ্টা করেছিলেন। তত্ত্ববোধিনীর নবীন সভ্যদের মধ্যে সকলেই প্রায় তাঁর সহযোদ্ধা ছিলেন। অক্ষয়কুমার দত্ত ছিলেন তাঁর একান্ত অনুরাগী ও বিশ্বস্ত সেনানায়ক।

১৪ | নবজাগরণ

নতুন শক্তির আঘাতে নিস্তরঙ্গ সমাজের বুকে যখন স্পন্দন জাগে, তখন তার ভিতরের অস্থিপঞ্জর পর্যন্ত অনুরণিত হয়ে ওঠে। বিদ্যাসাগরের কর্মজীবনের প্রারম্ভে, প্রাণহীন বাংলার সমাজের বুকেও এই অনুরণন শোনা গিয়েছিল। কেবল চিরাচরিত 'ধর্ম' সম্বন্ধেই যে মানুষের মনে নানাবিধ প্রশ্ন জেগেছিল, তা নয়। সমাজ-জীবনের অন্যান্য ক্ষতস্থানও নবজাগ্রত মানুষের দৃষ্টিতে ধরা পড়েছিল। এমন কোন সামাজিক সমস্যা ও প্রশ্ন ছিল না, যা মানুষের মনকে তখন নাড়া দেয়নি। সমস্যা যত জটিল হোক না কেন, কুসংস্কারের যত গভীর স্তর পর্যন্ত তার জট জড়িয়ে থাকুক না কেন, নির্ভয়ে ইয়ং বেঙ্গল ও ব্রাহ্মসমাজপন্থীরা তার মুখোমুখি দাঁড়াবার চেষ্টা করেছিলেন, তার সমাধানের পন্থা নিয়ে আলোচনা করেছিলেন। সনাতনপন্থীদের সশব্দ সোরগোলে তাঁরা বিচলিত হননি, ভয় পাননি।

জীবন ও সমাজের নানাদিক নিয়ে এই দুঃসাহসিক প্রশ্নোত্তর ও তর্ক-বিতর্কের যুগে, বিদ্যাসাগর তাঁর প্রথম যৌবনের কর্মোন্মুখ অস্থির মনটিকে এক-একটি লক্ষ্যের শিখরে স্থিরভাবে নিবদ্ধ করবার সুযোগ পেয়েছিলেন।

শিক্ষা ও সমাজসংস্কার আন্দোলনের সমস্ত প্রেরণা তিনি বাইরের সমাজ-

জীবনের নতুন তরঙ্গের ঘাতপ্রতিঘাত থেকেই পেয়েছিলেন। কোনটাই তিনি নিজে উদ্ভাবন করেননি। তাঁর ব্যক্তিগত অনুভূতি ও কল্যাণবুদ্ধির সঙ্গে বাইরের সমাজচেতনার যে ঐতিহাসিক মিলন হয়েছিল, তার ফলেই তিনি নবযুগের বাংলায় অন্যতম সারথি হতে পেরেছিলেন।

কলকাতা শহরের অনেক বড়মানুষ 'বিদ্যাদর্শন' পত্রিকায় তাঁর রোজনামচার মধ্যে জীবনের যে চিত্র ফুটিয়ে তুলেছিলেন, সেইটাই সামাজিক সত্যের সবটুকু নয়। রোজনামচার বিকৃত রূপ ছাড়াও জীবনের আরও একটা দিক তখন বাইরের সমাজে ফুটে উঠেছিল, যার প্রভাব শহরের বড়মানুষদের প্রভাবের তুলনায় খুব নগণ্য ছিল না।

ধর্ম ও ধর্মান্তরের সমস্যা তখন বড় হয়ে উঠলেও, সকলের মনপ্রাণ ধর্মের রাজ্যেই বন্দী ছিল না। ইয়ং বেঙ্গল ও ব্রাহ্মসমাজ দলের যুবকরা, জীবনের নবমন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে, কেবল ধর্মসংস্কারের কাজে নিজেদের হারিয়ে ফেলেননি। সমাজের আরও নির্মম সত্যগুলিকে তাঁরা প্রত্যক্ষ সংগ্রামের ক্ষেত্রে টেনে নামিয়ে এনেছিলেন। যাঁরা এই কাজে ব্রতী হয়েছিলেন, নবীন বাংলার সেই যুবসমাজের মধ্যে বিদ্যাসাগর ছিলেন অন্যতম। পরে বিদ্যাসাগরই তার শীর্ষস্থান দখল করেছিলেন।

বাংলার সমাজ-জীবনেও অনেক নতুন গতিশক্তি তখন সক্রিয় হয়ে উঠেছিল। একত্রে এমন কতকগুলি ঘটনার সমাবেশ হয়েছিল তখন যে তার প্রতিক্রিয়ায় সমাজের সবচেয়ে অসাড় অচৈতন্য দিকটাতেও নতুন সাড়া জেগেছিল, নতুন চৈতন্যের উদয় হয়েছিল। তার মধ্যে দাসত্বপ্রথার উচ্ছেদ, জর্জ টমসনের কলকাতায় আগমন, সভাসমিতির বিস্তার, বিকাশ ও কর্মতৎপরতা সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য।

বিদ্যাসাগর যখন ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে কাজ করছিলেন এবং মাইকেল মধুসূদন দত্ত যে-সময়ে হিন্দু কলেজ থেকে পালিয়ে খ্রীস্টধর্মে দীক্ষাগ্রহণ করেছিলেন, সেই সময়, সেই বছরেই, ১৮৪৩ সালে আমাদের দেশে দাসত্বপ্রথা-নিরোধ আইন পাশ হয়।

বহুকাল ধরে দাসত্বপ্রথা আমাদের দেশে প্রচলিত ছিল। দেশভেদে ও সামাজিক অবস্থাভেদে তার রূপ ভিন্ন হলেও, কেনাগোলামি ছাড়া তাকে আর কিছু বলা যায় না। বাংলাদেশের নানাজায়গায় গোলাম কেনাবেচা হত এবং বংশানুক্রমে গোলামি করত মানুষ। কলকাতা শহরেও উনিশ শতকের প্রথম দিক পর্যন্ত, অন্যান্য পণ্যদ্রব্যের মতন, গোলাম কেনাবেচা হয়েছে, ব্যবসায়ীরা গোলাম কিনে জাহাজ বোঝাই করে বিদেশে চালান দিয়েছেন। সাহেবরা বাড়ীতে দাসদাসী রেখেছেন এবং গোলামের মতনই তাদের প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহার করেছেন। বিদ্যাসাগর তাঁর ছাত্রজীবনেও কেনাগোলামির এই কুৎসিত রূপ দেখেছেন কলকাতা শহরে। 'ক্যালকাটা গেজেট', 'সমাচার দর্পণ' প্রভৃতি সমসাময়িক পত্রিকায় মানুষ বিক্রীর ও গোলাম কেনাবেচার অনেক বিজ্ঞাপন ও সংবাদ প্রচারিত হয়েছে। ইংরেজরা প্রথম দিকে এই গোলামিকে প্রশ্রয় দিয়েছেন, এদেশের মানুষের সঙ্গে তাঁদের সাধারণ প্রভু-ভৃত্য সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার জন্য। পরে ইংলণ্ডেই যখন সমাজের একদল মানুষের মধ্যে নতুন মানবতাবোধ জেগেছে, এবং উদার ধর্মান্দোলনের সঙ্গে যখন এই মানবতার আন্দোলন এক হয়ে মিশে গিয়ে শক্তিশালী সামাজিক আন্দোলন গড়ে উঠেছে, উইলবারফোর্সের (Wilberforce) ও বাক্সটনের (Buxton) মতন সমাজনেতাদের আবির্ভাব হয়েছে, তখন ইংরেজ শাসকরাও বর্বর গোলামিপ্রথাকে তাঁদের সাম্রাজ্য থেকে উচ্ছেদ করতে সচেষ্ট হয়েছেন।

উনিশ শতকের গোড়ার দিকেই ইংলণ্ডে দাসত্ববিরোধী আন্দোলন গড়ে উঠেছিল। ১৮০৭ সালে দাস-ব্যবসা (Slave trade) রহিত হয় এবং ১৮৩৬ সালে বৃটিশ-সাম্রাজ্যের সর্বত্র তার ফলাফল কার্যকর হয়। সেই সময় যে সব ইংরেজ শাসক ও প্রতিনিধি এদেশে আসেন, তাঁরাও কতকটা এই সামাজিক মানবতাবোধে উদ্‌বুদ্ধ হয়েছিলেন। আমাদের দেশে প্রত্যক্ষভাবে দাসত্বপ্রথা-বিরোধী কোন আন্দোলন হয়নি বটে, কিন্তু রামমোহন রায়ের সতীদাহ প্রথাবিরোধী আন্দোলনের মধ্যে এই নতুন মনোভাবই পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। সতীদাহপ্রথার শাস্ত্রীয় নাম 'দাসত্বপ্রথা' না হলেও, তাকে দাসত্বপ্রথারই সামাজিক 'প্রকরণ' ছাড়া কিছু বলা যায় না।

উইলবারফোর্সের দাসত্ববিরোধী আন্দোলন ইংলণ্ডের সমাজ-জীবনে যে সব

নতুন শক্তি সঞ্চারিত করেছিল, যেসব যুগধর্মী বৈশিষ্ট্যের বিকাশে সাহায্য করেছিল, রামমোহনের সতীদাহবিরোধী আন্দোলনও বাংলার সমাজে তাই করেছিল। অন্তত তার সূচনা করেছিল বলা যায়। পরে বিদ্যাসাগরের মানবধর্মী আন্দোলন তাকে সমগ্রতা দান করেছিল।

ইংলণ্ডের সমাজ-জীবনে উইলবারফোর্সের আন্দোলনের ফলাফল সম্বন্ধে বিখ্যাত ঐতিহাসিক ট্রেভেলিয়ান বলেছেন :[১]

> Wilberforce and the anti-slavery men had introduced into English life and politics new methods of agitating and educating public opinion...Public discussion and public agitation of every kind of question became the habit of the English people...Voluntary association for every conceivable sort of purpose or cause became an integral part of English social life in the Nineteenth Century...

উইলবারফোর্সের আন্দোলনের ফলে ইংলণ্ডের সমাজ-জীবনে যে আলোড়নের সৃষ্টি হল তা যুগান্তকারী। জনমতকে সংগঠিত, পরিচালিত ও আন্দোলিত করার সামাজিক পদ্ধতিই বদলে গেল। আগেকার যুগে এই সামাজিক আন্দোলন সম্ভব ছিল না। যে কোন সমস্যা নিয়ে যত্রতত্র আলোচনা করা, তর্কবিতর্ক করা, আন্দোলন গড়ে তোলা যেন ইংরেজদের জাতীয় অভ্যাসে পরিণত হতে লাগল। সবরকমের উদ্দেশ্য ও আদর্শ নিয়ে স্বাধীন সভা-সমিতিরও বিকাশ হতে লাগল চারিদিকে।

পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে, সতীদাহের বিরুদ্ধে, ধর্মের নামে চিরাচরিত কুসংস্কারের বিরুদ্ধে, রামমোহন রায়ের আন্দোলনের ফলেও, উইলবারফোর্সের সমসাময়িককালে, বাংলার সমাজ-জীবনে নবযুগের এই ঐতিহাসিক বৈশিষ্ট্যগুলি ফুটে উঠতে আরম্ভ হয়েছিল। ইয়ং বেঙ্গল দলের প্রচণ্ড আলোড়ন সৃষ্টির ফলে আরও দ্রুত নবযুগের এই লক্ষণগুলি চারিদিকে প্রকট হয়ে ওঠে। পত্র-পত্রিকা ও সভা-সমিতিতে সমস্ত বিষয় সকলের আলোচ্য ও বিচার্য হয়। ১৮৪৩ সালে আমাদের দেশে আইন পাশ করে যখন দাসত্বপ্রথা রহিত করা হয়, তখন

ইয়ং বেঙ্গল দলের মুখপত্র 'বেঙ্গল স্পেক্টেটর' অভিনন্দন জানিয়ে যা লেখেন তার মর্ম এই :[২]

> আমরা জেনে আনন্দিত হলাম যে, এ বছরের পঞ্চম আইন অনুসারে এদেশে দাসত্বপ্রথা বেআইনী প্রথা বলে ঘোষণা করা হয়েছে। ভারতের দাসত্ব-পীড়িত অসংখ্য সাধারণ মানুষের জীবনে এই আইন নূতন আশীর্বাদ বহন করে আনবে। যদিও আমরা জানি যে আমাদের দেশের (বাংলাদেশের) বিভিন্ন অঞ্চলে যে-ধরনের দাসত্বপ্রথা প্রচলিত আছে, তা পশ্চিমভারতে প্রচলিত নিষ্ঠুর ও বর্বর প্রথার তুলনায় অনেক বেশি কোমল, তা হলেও এরকম অভিশপ্ত অমানুষিক প্রথার ফলাফল সমাজ-জীবনে অকল্যাণকর হতে বাধ্য বলে, আমরা তার অবলুপ্তি কামনা করি। কোমলতা বা কঠোরতা দিয়ে এ প্রথার বিচার করা যায় না, কারণ মানুষের ন্যায্য জন্মগত মানুষিক অধিকার থেকে দাসত্বপ্রথা মানুষকে বঞ্চিত করে এবং মানুষকে অমানুষ করে তোলে। কোমল বা কঠোর যাই হোক, আমাদের হিন্দু ও মুসলমান শাসকরা দাসত্বপ্রথা বর্জন করেননি। ইংরেজদের শাসনকালে এই বর্বর প্রথা রহিত হল যখন, তখন ইতিহাসে তাঁরা স্মরণীয়ও হয়ে রইলেন। এই উপলক্ষে আমরা তাঁদেরও আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি যাঁরা ইংলণ্ডের জনমতকে দাসত্বপ্রথার বিরুদ্ধে জাগিয়ে তুলে, সেই জনমতকে সংগঠিত করে আইনপ্রণেতাদের দৃষ্টি এবিষয়ে আকর্ষণ করেছিলেন।

মানুষ যে কেবল জীবনধারণের জন্য নিজের মানবিক সত্তাকে চিরকালের জন্য বন্ধক দিয়ে, দাসত্বের নিষ্ঠুর বন্ধন সহ্য করতে পারে, ছেলেবেলা থেকে বিদ্যাসাগর সে করুণ সামাজিক দৃশ্য তাঁর চারিদিকে দেখেছিলেন। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলা থেকে বৃদ্ধ পিতামাতারা তাঁদের সন্তানদের পণ্যের মত বিক্রী করবার জন্য কলকাতা শহরে নিয়ে আসতেন। উনিশ শতকের গোড়ার দিকের সংবাদপত্রে এরকম সংবাদ প্রায়ই প্রকাশিত হত। সভ্যসমাজে, মাত্র দেড়শ-দু'শ বছর আগেও যে সাধারণ মানুষের সঙ্গে পশুর মর্যাদার কোন পার্থক্য ছিল না, একথা মনে করে বিদ্যাসাগর নিশ্চয় ঘৃণায় শিউরে উঠতেন।

সামাজিক প্রথা দীর্ঘকাল স্থায়ী হলে, কেবল বাইরে থেকে আইন পাশ করে সহজে তাকে রহিত করা সম্ভব হয় না। প্রথা প্রায় জন্মগত সংস্কারে পরিণত হয়, এবং রাষ্ট্রীয় আইনের জোরে তাকে রাতারাতি নির্মূল করা যায় না। দাসত্বপ্রথা বেআইনী ঘোষিত হবার পরেও কিছুকাল টিঁকে ছিল, কিন্তু তা থাকলেও, সমাজে মানুষের মর্যাদা যে স্বীকৃত হল, কেবল দারিদ্র্যের অপরাধের জন্য মানুষকে যে পশুর মতন গোলামি করতে বাধ্য করা হল না, অন্তত একটা আইনের অবলম্বন যে সে পেল, যার উপর খঞ্জের যষ্টির মতন ভর দিয়ে মানবসমাজে সে সোজা হয়ে চলবার চেষ্টা করতে পারে, ইতিহাসে এইটুকুই একটা যুগান্তকারী ঘটনা।

ঘটনাটি 'আইনতঃ' ঘটলেও, যুগান্তকারী ঘটনা। আইনের অক্ষর থেকে মানুষের জীবনের স্তরে পৌঁছানো সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। যখন তা পৌঁছয় তখন অক্ষরবদ্ধ আইন জীবনের সত্য ও সামাজিক সত্য হয়ে ওঠে। একথা বিদ্যাসাগরও জানতেন। আরও কিছুদিন পরে, তিনি নিজে সমাজকল্যাণের আদর্শে উদ্‌বুদ্ধ হয়ে, যে-সব আইন পাশ করিয়েছিলেন, সে-সব আইন একশ বছরেও সামাজিক সত্যে পরিণত হয়নি। না হলেও, তার স্বীকৃতিটাই বড় কথা। আইন হল সেই প্রাথমিক স্বীকৃতি। রাষ্ট্রের কর্ণধাররা 'স্বেচ্ছায়' হঠাৎ কোন আইন পাশ করেন না, বিশেষ করে সামাজিক আইন। যুগোপযোগী সামাজিক চেতনার প্রাথমিক স্বীকৃতি হল আইন। গণতান্ত্রিক যুগের প্রতীক 'আইন'। দাসত্বপ্রথা-নিষেধ আইনের মধ্যেও বিদ্যাসাগর সেই প্রাথমিক স্বীকৃতিরই পরিচয় পেয়েছিলেন। মানুষের মানবিক মর্যাদার ও অধিকারের ঐতিহাসিক স্বীকৃতি।

১৮৪৩ সালে যখন এই আইন পাশ হল, ইয়ং বেঙ্গলের মুখপত্রে তার সামাজিক গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা হতে লাগল, তখন ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে বিদ্যাসাগরের মাত্র বছর দেড়েক চাকরি হয়েছে। বয়স তাঁর তেইশ বছর। তেইশ বছরের যুবক গোলদীঘি থেকে বাংলার সমাজের মেঘাবৃত আকাশের দিগন্ত পর্যন্ত চেয়ে দেখলেন। দাসত্বপ্রথা রহিত হলেও, গোলাম কেনাবেচা আইনত দণ্ডনীয় হলেও, দাসত্বের নানারকমের বন্ধন থেকে সমাজের সর্বস্তরের ও সর্বশ্রেণীর মানুষের মুক্তির এখনও অনেক দেরি। সংগ্রাম সবেমাত্র

শুরু হয়েছে। সতীদাহ-নিবারণ আইন, দাসত্বপ্রথা-নিরোধ আইন, তার প্রথম পর্বের ফলাফল মাত্র। সংগ্রামের অনেক পর্ব এখনও বাকি আছে। অনেক অগ্রগতি ও পশ্চাদপসরণের ভিতর দিয়ে, সংগ্রামে এগিয়ে যেতে হবে। সংগ্রামের সেই চেতনাও জেগেছে বাইরের সমাজে। সেই সমাজ-চেতনার মধ্যে বিদ্যাসাগর তাঁর নিজের চেতনাকে নিমজ্জিত করে দিলেন।

এই সমাজ-চেতনার পুরোগামী মুখপাত্র ছিলেন ইয়ং বেঙ্গল দল। ধর্মসংস্কার আন্দোলনের চোরাগলিতে তাঁদের নবীন উদ্যমের অনেকটা অপচয় হলেও, সমাজসংস্কার আন্দোলনের আবশ্যকতাও তীব্রভাবে তাঁরা অনুভব করেছিলেন। কেবল তাঁদের মুখপত্রে নয়, বিভিন্ন সভাসমিতির আলোচনার মধ্য দিয়েও তাঁদের এই অনুভূতির ও বোধশক্তির প্রকাশ হচ্ছিল বাইরে। ধর্মের ক্ষেত্রে তার প্রকাশ খানিকটা উচ্ছৃঙ্খল হলেও, সমাজ-জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে তার যুগোপযোগী প্রকাশই হয়েছিল। ইয়ং বেঙ্গলের সমস্ত উচ্ছৃঙ্খলতা ও অসংযমের কথা স্বীকার করেও তাঁদের এই যুগোপযোগী মনোভাবকে অস্বীকার করা যায় না। একদিকে তাঁরা যেমন ভেঙেছিলেন, তেমনি অন্য দিকে নতুন করে গড়ে তোলার মতন ভিত রচনা করতেও চেষ্টার ত্রুটি করেননি। তাঁদের এই মনোভাবটাই ছিল ঐতিহাসিক। অন্যায়ের বিরুদ্ধে, যুক্তি ও বুদ্ধির অগম্যের বিরুদ্ধে, বিদ্রোহ ও প্রতিরোধের মনোভাব। সেই মনোভাবকে বাইরে সাহস করে লোকসমাজে প্রকাশ করবার মতন চারিত্রিক দৃঢ়তাও ইয়ং বেঙ্গলের ছিল। বিদ্যাসাগরের মন এই বিদ্রোহ, প্রতিরোধ ও বলিষ্ঠতার পরিবেশের মধ্যেই গড়ে উঠেছিল। তাঁর কর্মজীবনের গোড়াতে, যৌবনের প্রারম্ভে, তিনি ইয়ং বেঙ্গলের এই মানসিক বলিষ্ঠতা থেকে নিজের মনেও বলসঞ্চয় করেছিলেন।

ধর্মের ক্ষেত্র ছাড়াও, ইয়ং বেঙ্গলের এই বিদ্রোহী মনোভাব কি ভাবে অন্যান্য ক্ষেত্রেও পরিস্ফুট হয়ে উঠছিল, একই সময়ে, তার অনেক দৃষ্টান্ত আছে। ১৮৪৩ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে, মধুসূদন যখন হিন্দু কলেজ থেকে পালিয়ে খ্রীস্টধর্মে দীক্ষা নিতে গিয়েছিলেন, তখন 'দূর শ্বেতদ্বীপ তরে' যে ব্যাকুল বেদনা তাঁর মনে জেগেছিল, অতলান্তিকের 'অপার জলধি' লঙ্ঘন

করে যশলাভের যে তীব্র আকাঙ্ক্ষায় তিনি বিচলিত হয়েছিলেন, তার পিছনে ছিল ঐ যুগমানসের প্রেরণা। সুখস্বাচ্ছন্দ্যের প্রাচুর্যের মধ্যেও তাই পারিবারিক জীবনের গতানুগতিকতা ও সঙ্কীর্ণতা তাঁকে বেঁধে রাখতে পারেনি। তার বিরুদ্ধে তাঁর নবজাগ্রত মানবসত্তা বিদ্রোহ করেছিল। সেই বিদ্রোহের সাময়িক 'প্রকাশ' ভুল হলেও, বিদ্রোহটা ভুল নয়, কালোত্তীর্ণ যুগসত্য। বিদ্যাসাগর এই যুগসত্যের দু'রকমের বহিঃপ্রকাশই দেখেছিলেন। মধুসূদনের ধর্মান্তরের মধ্যে তিনি দেখেছিলেন তার 'সাময়িক' উদ্দাম প্রকাশ, কিন্তু তার অন্তরালে দেখেছিলেন, তাঁর বিদ্রোহী আত্মসচেতন মনোভাবের মধ্যে কালোত্তীর্ণ সত্যের প্রকাশ। কয়েকমাস পরে দেবেন্দ্রনাথের ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষাগ্রহণের মধ্যেও তিনি ঐ একই সত্যের 'সাময়িক' প্রকাশ ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাননি। কিন্তু খ্রীস্টধর্মী ও ব্রাহ্মধর্মী, ইয়ং বেঙ্গলের উভয় দলের মধ্যেই তিনি যুগসত্যের কালোত্তীর্ণ রূপটিও দেখতে পেয়েছিলেন। নবযুগের জীবনমন্ত্রটি উচ্চারিত হতে শুনেছিলেন তাঁদের মুখে।

এই জীবনমন্ত্র হল, মানবমর্যাদাবোধ, অন্যায় অযুক্তি কুযুক্তি ও বুদ্ধিহীন মোহাচ্ছন্নতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও প্রতিরোধের মনোভাব। ১৮৪৩ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে মধুসূদন যখন খ্রীস্টধর্মে দীক্ষা নিয়েছিলেন, তখন একই সময়ে, ঐ ফেব্রুয়ারী মাসেই, সভা-সমিতির প্রকাশ্য অধিবেশনে ইয়ং বেঙ্গলের এই মনোভাব আরও তীব্রভাবে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছিল। একই সময়ের একটি স্মরণীয় ঘটনা উল্লেখ করছি।

১৮৪৩ সালের ফেব্রুয়ারী মাসেই 'সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা'র (Society for the Acquisition of General Knowledge) একটি অধিবেশন হচ্ছিল সংস্কৃত কলেজের (হিন্দু কলেজ) হলঘরে। সভায় সভাপতিত্ব করছিলেন তারাচাঁদ চক্রবর্তী। ক্যাপটেন রিচার্ডসন ও আর একজন ইংরেজ দর্শক সভায় উপস্থিত ছিলেন। প্রধান বক্তা ছিলেন দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়। তাঁর বক্তব্য বিষয় ছিল 'Present State of the East India Company's Criminal Judicature, and Police, under the Bengal Presidency.' বক্তৃতা প্রসঙ্গে দক্ষিণারঞ্জন কোম্পানীর কর্ম-

চারীদের ক্ষমতার অপব্যবহার, পুলিসের অসাধুতা এবং ব্রিটিশের শাসনপদ্ধতি ও শোষণের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কঠোর ভাষায় মন্তব্য করেন। মন্তব্য শুনে রিচার্ডসন সাহেব বক্তৃতার মাঝখানে বাধা দিয়ে বলেন :

> To stand up in a hall which the Government had erected and in the heart of a city which was the focus of enlightenment, and there to denounce, as oppressors and robbers, the men who governed the country, did in his opinion, amount to treason...He could not permit it, therefore, to be converted into a den of treason and must close the doors against all such meetings.
>
> যে হলঘর গবর্ণমেণ্ট তৈরি করেছেন, কলকাতা শহরের মতন বিদ্যা-কেন্দ্রের মধ্যস্থলে, সেই হলঘরে দাঁড়িয়ে, সেই গবর্ণমেণ্টকে অত্যাচারী লুণ্ঠনকারী বলে কটুভাষায় আক্রমণ করা, আমি দেশদ্রোহিতা বলে মনে করি। এই বিদ্যামন্দিরকে আমি তাই দেশদ্রোহীদের গোপন আড্ডাখানায় পরিণত হতে দিতে পারি না এবং ভবিষ্যতে আর কোন সভার অধিবেশনও এখানে হতে পারবে না।

সভায় কোন বক্তার বক্তৃতার মাঝখানে এইভাবে বাধা দিয়ে কিছু বলা, শিষ্টতা ও শালীনতা-বিরোধী আচরণ। রিচার্ডসন ক্রোধের বশে সেই জ্ঞানটুকুও হারিয়ে ফেলেছিলেন। সভাপতি তারাচাঁদ চক্রবর্তী তাঁর এই অশোভন ব্যবহারের তীব্র প্রতিবাদ করে, সঙ্গে সঙ্গে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলেন :[৩]

> Captain Richardson, with due respect I beg to say, that I cannot allow you to proceed any longer in this course of conduct towards our Society, and on behalf of my friend Baboo Dukhin, I must say that your remarks are anything but becoming. I am bound also to add that I consider your conduct as an insult to

the Society and that if you do not retract what you have said and make due apology, we shall represent the matter to the Committee of the Hindu College, and if necessary to the Government itself.

ক্যাপটেন রিচার্ডসন, সবিনয়ে এই কথা আপনাকে বলতে চাই যে এই সভায় আপনি যে আচরণ করেছেন এবং আমার বন্ধু দক্ষিণাবাবুকে লক্ষ্য করে যে মন্তব্য করেছেন, তা শিষ্টাচার নয়। আমি একথাও বলতে চাই যে, আপনি আমাদের সোসাইটিকে অপমান করেছেন এবং তার জন্য আপনি যদি সকলের কাছে ক্ষমা না চান, তাহলে বিষয়টি আমি হিন্দু কলেজের কমিটিতে, এমন কি প্রয়োজন হলে, গবর্ণমেণ্টের কাছেও বিচারের জন্য পেশ করতে বাধ্য হব।

গোলদীঘির বিদ্যালয়ের হলঘরে অনুষ্ঠিত একটি সভার ঘটনা। সাধারণত ইতিহাসের পৃষ্ঠায় বড় অক্ষরে লেখা থাকবার মতন ঘটনা নয়। কিন্তু ইতিহাসের যে রূপটিকে আমরা এখানে ফুটিয়ে তোলবার চেষ্টা করছি, তার মধ্যে এই ক্ষুদ্র ঘটনাটির স্থান অনেক বড়। মধুসূদনের ধর্মান্তর এবং জ্ঞানোপার্জিকা সভার এই ঘটনা, একই সময়ের প্রায় যুগপৎ ঘটে। এই যুগপত্তা আকস্মিক নয়, ঐতিহাসিক। যে বিদ্রোহী মনোভাব মধুসূদনের ধর্মান্তরের মধ্যে ফুটে উঠেছিল, সেই বিদ্রোহী মনোভাব তখন বাইরের সমাজ-জীবনে সচেতন ও সজাগ একটি জনস্তরের মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছে। পাশ্চাত্ত্য ভাবধারায় উজ্জীবিত, নব্যশিক্ষিত বাঙালী মধ্যবিত্তশ্রেণী হল সেই জনস্তর। জ্ঞানোপার্জিকা সভায় তারাচাঁদের দৃপ্ত উত্তর এবং সভার অধিকাংশ সভ্যের সেই প্রতিবাদ সমর্থন, তারই ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত। বিদ্যাসাগর এই সঞ্চরমাণ বিদ্রোহী সমাজচেতনার সঙ্গে আত্মচেতনার সংযোগ ঘটিয়ে, কর্মজীবনের গোড়াতে, নিজের ব্যক্তিসত্তাকে গড়ে তোলবার সুযোগ পেয়েছিলেন।

ইংলণ্ডের সমাজসংস্কার আন্দোলনের অন্যতম মুখপাত্র জর্জ টমসন (George Thomson) ঠিক এই সময়ে, ১৮৪৩ সালের গোড়ার দিকে দ্বারকানাথ ঠাকুরের

সঙ্গে ইংলণ্ড থেকে এদেশে আসেন। ভারতবর্ষে নবযুগের প্রধান জাগৃতিকেন্দ্র তখন কলকাতা শহর। টমসন কলকাতায় আসেন। কলকাতার সভা-সমিতির মধ্যে 'সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা'ই তখন নব্য-শিক্ষিতদের প্রতিনিধিসভা ছিল। সভার পক্ষ থেকে রামগোপাল ঘোষ, টমসনকে অভিনন্দন জানাবার জন্য, একটি অধিবেশনে তাঁকে আমন্ত্রণ জানান। ১১ জানুয়ারী (১৮৪৩) হিন্দু কলেজে অধিবেশন হয় (পূর্বোক্ত ঘটনা ঘটবার মাসখানেক আগে), তারাচাঁদ চক্রবর্তীই সভাপতি হন। টমসন তাঁর অভ্যর্থনার উত্তরে যে ভাষণ দেন, তার উপসংহারে বলেন :[৪]

> The only reward I seek for my efforts in your cause, is to see you qualifying yourselves to be hereafter the enlightened vindicators of the claims of your countrymen to the sympathy and support of all the lovers of moral and political justice in England.

টমসন তাঁর ভাষণে যা বলেছিলেন, তার মর্ম এই : 'আমি এসেছি, এদেশের মানুষ ও সমাজকে চিনতে। ভারতবর্ষের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখতে আমি আসিনি। আপনাদের এই সভার মতন ইংলণ্ডেও অনেক সভা-সমিতি গড়ে উঠেছে এবং তার অনেকগুলির সঙ্গে আমি সংশ্লিষ্ট ছিলাম। আপনাদের সভার উদ্দেশ্য যে 'জ্ঞানোপার্জন', আমারও এদেশে আসার উদ্দেশ্য তাই। ইংলণ্ডের মানুষের কাছে আপনাদের দেশের কথা অনেক বলেছি আমি, অনেক কথা লিখে প্রচার করেছি। স্বপ্ন দেখেছি আমি ভারতবর্ষের! কিন্তু স্বপ্ন দেখে, কথা বলে বা লিখে আমার সাধ মেটেনি। স্বচক্ষে একদিন ভারতবর্ষের মানুষ ও সমাজকে দেখব, এই আমার বাসনা ছিল। আজ সেই বাসনা আমার চরিতার্থ হল। আমি আপনাদের সঙ্গে, বন্ধুর মতন, আপনাদের একজনের মতন মিশতে চাই। আপনাদের অবস্থা কি, দুঃখবেদনা কি, ইচ্ছা আকাঙ্ক্ষা কি, সব জানতে চাই, বুঝতে চাই। সেই আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করতে, সেই বেদনা দূর করতে, আমি সাধ্য মতন আপনাদের সাহায্য করতে চাই। তার জন্য আমি কোন পুরস্কার চাই না। আমি যদি দেখি যে আপনারা নিজেরাই দেশের দশজনের দাবিদাওয়ার

মুখপাত্র হয়ে উঠেছেন, তাহলেই আমি নিজেকে ধন্য মনে করব এবং ইংলণ্ডের উদার মতাবলম্বী জনসাধারণের সহানুভূতি ও সমর্থনও আপনারা লাভ করবেন।'

একটি সভা, অথবা একটি বক্তৃতা নয়। সভার পর সভা হতে লাগল শহরের চারিদিকে এবং টমসন সাহেব প্রায় প্রত্যেক সভায় বক্তৃতা দিয়ে বেড়াতে লাগলেন। প্রথম সভার পরেই রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহনের গৃহে সকলে নিমন্ত্রিত হলেন। সেখানেও সভা হল, আলোচনা হল। তারপর চন্দ্রশেখর দেবের বাড়ীতে সভা বসল। শ্রীকৃষ্ণ সিংহের বাগানবাড়ীতে সভা নিয়মিত আরম্ভ হল। সাপ্তাহিক সভায় টমসন বক্তৃতা দিতে লাগলেন। মেকানিক্স ইনস্টিটিউটেও বক্তৃতা দিলেন। সভা-সমিতির ও আলাপ-আলোচনার বন্যা এল যেন কলকাতার শিক্ষিত মধ্যবিত্তসমাজে। 'বেঙ্গল বৃটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি'ও স্থাপিত হল ১৮৪৩ সালে, টমসনের প্রেরণায়।

যে আত্মচেতনা শিক্ষিত বাঙালী মধ্যবিত্তসমাজে ধীরে ধীরে আগে থেকেই জাগছিল এবং ক্রমে সমাজচেতনায় পরিব্যাপ্ত হয়ে পড়ছিল, জর্জ টমসন সেই চেতনাকেই আরও খানিকটা সজাগ করে তুলতে সাহায্য করেছিলেন। তার বেশি কিছু তিনি করেননি। তিনি এদেশের মুক্তিদাতা বা মুক্তিকামীদের অগ্রদূত হয়ে আসেননি। যে ব্রিটিশ মধ্যবিত্তশ্রেণীর মুখপাত্র হয়ে এদেশের মধ্যবিত্তসমাজের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করতে তিনি এসেছিলেন, সেই ব্রিটিশ মধ্যবিত্তের প্রতিনিধিরাই তখন এদেশের শাসক হয়ে আসছিলেন। ইংরেজ-বিরোধী বা ইংরেজ শাসনবিরোধী কোন মনোভাব জাগিয়ে তোলার জন্য টমসনের শুভাগমন হয়নি। একথা পরিষ্কারভাবে 'বেঙ্গল বৃটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি'র প্রতিষ্ঠাকালেই তিনি সকলের সঙ্গে আলোচনা-প্রসঙ্গে বলেছিলেন। একটি সভাতে তিনি তাঁর এদেশে আসার উদ্দেশ্য ব্যাখ্যান প্রসঙ্গে পরিষ্কার ভাষায় বলেন :[৫]

> **It was to rouse the intelligent natives themselves, to a sense of the necessity of becoming the narrators of their own grievances, as far as they suffered under any, that were removable by legislation. He had no wish to**

inflame the minds of the multitude, or to spread a spirit of disaffection through their ranks. He should sincerely deplore the dissolution (were it practicable) of the present connection between this country and Great Britain...

এদেশের বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা নিজেদের অভাব অভিযোগ যাতে নিজেরাই শাসকদের কাছে প্রকাশ করতে পারেন এবং সেই সব অভিযোগ সত্য হলে, আইন প্রণয়ন করে যাতে সেগুলি দূর করতে পারেন, তার জন্য তাঁদের মধ্যে দায়িত্ববোধ জাগিয়ে তোলাই তাঁর উদ্দেশ্য। তিনি সাধারণ দেশবাসীর মনে ব্রিটিশ শাসকদের বিরুদ্ধে কোন বিদ্বেষ বা বিদ্রোহের ভাব একেবারেই জাগিয়ে তুলতে চান না। ব্রিটিশের সঙ্গে ভারতবাসীর যে শাসক-শাসিতের সম্পর্ক তা কোন কারণে ছিন্ন হলে (বা হওয়া সম্ভব হলে) তিনি খুবই দুঃখিত হবেন।

বিদেশ থেকে টমসনের দৌত্যে এদেশে দেশপ্রেম আমদানি হয়নি। দেশপ্রেম দেশের মাটিতেই অঙ্কুরিত হয়ে ওঠে। সমস্ত বিষয় নিয়ে স্বাধীন আলাপ-আলোচনার এবং প্রকাশ্যে সভা করার অধিকারকে টমসন অবশ্য অনেকখানি প্রতিষ্ঠিত করতে সাহায্য করেছিলেন। ১৮৪৩ সালে এইটুকু করাই যে অনেকখানি করা, তা স্বীকার করতে বাধা নেই।

সভা-সমিতি, আলাপ-আলোচনা ও বক্তৃতার এই বন্যাস্রোতের মধ্যে বিদ্যাসাগর কি করছিলেন? তরঙ্গস্পর্শ থেকে আত্মরক্ষার জন্য তিনি কি দূরে তীরে দাঁড়িয়েছিলেন, এবং ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে কেবল পণ্ডিতের চাকরি করছিলেন? সভা-সমিতির অধিবেশনে তিনি যোগদান করতেন কি না, টমসনের বক্তৃতা শুনতে যেতেন কি না, তার কোন লিখিত প্রমাণ বা দলিল কোথাও নেই। নেই বলেই তাঁকে সমাজের প্রাণচাঞ্চল্যের এই বন্যাস্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন করে লালদীঘির কলেজে বা পঞ্চাননতলার বাসাবাড়ীতে নির্বাসনদণ্ডে দণ্ডিত করলে, তাঁর প্রতি সুবিচার করা হবে না। তা যদি না হয়, তাহলে তাঁকেও এই স্রোতের মধ্যেই দাঁড় করিয়ে দেখতে হয় এবং তা না দেখা কোনদিক থেকেই সঙ্গত নয়। কিন্তু তার প্রামাণ্য দলিল কোথায়?

দলিল নেই। থাকবার কথাও নয়। বিদ্যাসাগর তখন মাত্র তেইশ

বছরের নবীন যুবক, সংস্কৃত কলেজের ছাত্রজীবন সবেমাত্র শেষ করে, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে অধ্যাপনার কাজে নিযুক্ত হয়েছেন। কে তাঁকে চেনে? সংস্কৃত কলেজের পণ্ডিতরা চেনেন, তাঁর সহপাঠীরা চেনেন, নতুন কলেজের সিবিলিয়ান সাহেব ছাত্র দু'-চার জন চেনেন, আর চেনেন পাড়াপ্রতিবেশী কেউ কেউ। তাও যাঁরা চিনতেন, তাঁরা কেউ তাঁকে ভবিষ্যতের 'বিদ্যাসাগর' বলে চিনতেন না। তখনও তাঁরা তাঁকে বীরসিংহ গ্রামের দরিদ্র ব্রাহ্মণের সন্তান বলে চিনতেন এবং বিদ্বান ও বুদ্ধিমান বলে জানতেন। বাইরের সমাজে কোন পরিচয়ই তাঁর ছিল না। তার উপর সেই সমাজ ছিল অজ্ঞাতকুলশীলের নতুন নাগরিক সমাজ। তারাচাঁদ চক্রবর্তী ছিলেন রামমোহনের সহযোগী, বয়সে বিদ্যাসাগরের চেয়ে অনেক বড়, সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত। ইংরেজী শিক্ষিত বাঙালী সমাজে 'এজুরাজ' রামগোপাল ঘোষ ছিলেন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি, তাঁর অগ্রজতুল্য। রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন তো বিদ্যাসাগরের ছাত্রজীবনের প্রারম্ভেই কলকাতার শিক্ষিত যুবসমাজের মুখপাত্র হয়ে উঠেছিলেন এবং গোঁড়া হিন্দু-সমাজের ভিত পর্যন্ত নড়িয়ে দেবার চেষ্টা করেছিলেন। বয়সে ও প্রতিষ্ঠায় তিনিও অনেক বড়। ইয়ং বেঙ্গল দলের নেতৃস্থানীয়দের মধ্যে আরও যাঁরা ছিলেন, তাঁদের মধ্যে অনেকেই প্রতিষ্ঠা-প্রতিপত্তির দিক থেকে তাঁর অগ্রজতুল্য ছিলেন। বয়স ও প্রতিষ্ঠা ছাড়াও আরও একটি কারণ ছিল, যার জন্য এই প্রতিষ্ঠিতদের কলরবমুখর প্রাঙ্গণের একটি কোণেও বিদ্যাসাগর তখনও কোন স্থান পাননি। সেই কারণটি হল, তাঁর দারিদ্র্য। ইয়ং বেঙ্গল দলের কর্ণধারদের মধ্যে সকলেই অভিজাত ও ধনিকবংশের সন্তান। সামান্য আয়াসে শহরে সমাজে তাঁরা প্রতিষ্ঠা ও খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তাঁদের প্রতিভা, কেবল আর্থিক প্রতিপত্তির জোরে, শতগুণ বেশি ফুলে-ফেঁপে বাইরের সমাজে প্রকাশিত হয়েছে। নবযুগের অর্থপ্রধান সমাজে, কেবল 'বিদ্যাসাগর' উপাধির জোরে প্রতিষ্ঠা অর্জন করা সহজ নয়। কলকাতা শহরের নতুন অভিজাত-বংশের সন্তান হলে, তেইশ বছরের ঐটুকু কৃতিত্ব সম্বল করে যতখানি প্রতিপত্তি অর্জন করা বিদ্যাসাগরের পক্ষে সম্ভব হত, অপরিচিত দরিদ্র পরিবারের সন্তান বলে তার শতাংশের একাংশ অর্জন করাও তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। তাই তিনি যদি সভা-সমিতির জনসমাবেশের মধ্যে একজন সাধারণ মানুষের মতন

ঘুরে বেড়িয়ে থাকেন, সকলের অলক্ষ্যে ও অগোচরে, তাহলে বিস্মিত হবার কিছু নেই। সমসাময়িক পত্রিকায় তাঁর উপস্থিতির কোন সংবাদ না থাকা, এবং সভার কার্যবিবরণীতে তাঁর নামোল্লেখ না করা, খুবই স্বাভাবিক। সামাজিক প্রতিষ্ঠার নিম্নতম ধাপটিতে তখনও তিনি চলে-ফিরে বেড়াচ্ছেন, কেবল বিদ্যাটুকু সম্বল করে, তা-ও আবার সেকালের সংস্কৃতবিদ্যা। শুধু যে বিদ্যার পুঁজিটুকু, তা-ও সেকালের, একালের হিন্দু কলেজের নয়। বিত্ত তাঁর একেবারেই ছিল না। সুতরাং সামাজিক প্রতিষ্ঠার কোন সম্ভাবনা পর্যন্ত তখনও তাঁর ছিল না। সংস্কৃতজ্ঞ তরুণ পণ্ডিত বিদ্যাসাগর নতুন নামগোত্রহীন শহুরে সমাজে অজ্ঞাতকুলশীলের মতনই বাস করতেন। তাই সভাসমিতির বন্যাস্রোতের মধ্যে দাঁড়িয়ে তিনি সমাজের নতুন প্রাণশক্তি অনুভব করেছিলেন কিনা, তার কোন লিখিত প্রমাণ নেই, এবং প্রমাণ না থাকলেও, সেইজন্য তাঁকে সেই গতিস্রোত বা সমাজের ঘটনাস্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখবারও কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই।

সমাজের এই সব সচল ও সক্রিয় শক্তির ঘাতপ্রতিঘাত বিদ্যাসাগর প্রত্যক্ষ-ভাবে অনুভব করেছিলেন। যে-কোন বিচার্য ও বিবেচ্য বিষয় নিয়ে প্রকাশ্য সভা-সমিতিতে আলোচনার অধিকার যখন স্বীকৃত ও প্রসারিত হল, তখন সামাজিক সমস্যাগুলিকেও ইয়ং বেঙ্গল দল তাঁদের পত্রপত্রিকা ও সভাসমিতির আলোচনার ভিতর দিয়ে লোকচক্ষুর সামনে তুলে ধরবার চেষ্টা করলেন। এই সময় থেকেই, সমাজসংস্কারের আদর্শে তাঁরা জনমত সংগঠন করার কাজে অগ্রসর হলেন। শিক্ষার নানাদিক নিয়ে, বাল্যবিবাহ বহুবিবাহ বিধবাবিবাহ প্রভৃতি সমাজসংস্কারের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে, তাঁরা নির্ভয়ে প্রকাশ্যে বিচারবিতর্কে অবতীর্ণ হলেন। ১৮৪২ সালেই (বিদ্যাসাগর তখন সবেমাত্র ছাত্রজীবন ছেড়ে চাকুরিজীবনে প্রবেশ করেছেন) ইয়ং বেঙ্গল দলের মুখপত্র 'বেঙ্গল স্পেক্টেটর' বিধবার পুনর্ব্বিবাহ সমস্যা সম্বন্ধে রীতিমত আলোচনা আরম্ভ করেছিলেন।*

'যে সকল বিষয়ের সাধারণের সর্ব্বদা আন্দোলন হয় তন্মধ্যে হিন্দু জাতীয় বিধবার পুনর্ব্বিবাহেরও বাদানুবাদ হইয়া থাকে' এবং 'এতদ্বিষয়ে প্রস্তাব

* বিস্তারিত বিবরণ এই গ্রন্থের 'তৃতীয় খণ্ডে' দ্রষ্টব্য।

বহু বৎসরাবধি হইতেছে'—উক্ত পত্রিকায় জনৈক পত্রলেখকের এই উক্তি বিশেষভাবে লক্ষণীয়।[৮] সংস্কারচেতনা যে ধীরে ধীরে স্বাধীন আলাপ-আলোচনার ভিতর দিয়ে জেগে উঠছিল এবং চতুর্থ দশকে অনেক বেশি প্রবল হয়ে উঠেছিল, তা পত্রলেখকের উক্তি থেকেই পরিষ্কার বোঝা যায়। কেবল বিধবাবিবাহ নয়, প্রত্যেকটি সামাজিক প্রথা এই সময় আলোচ্য বিষয় হয়ে উঠেছিল। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় যোগ দেবার আগে অক্ষয়কুমার যখন 'বিদ্যাদর্শন' পত্রিকা পরিচালনা করতেন, তখন তার ভিতর দিয়েও তিনি নানা সমস্যার আলোচনার সুযোগ দিতেন সকলকে। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতেও এই সব সমস্যা নিয়ে আলোচনা হত। প্রগতিশীল প্রত্যেক পত্রিকার রচনার ভিতর দিয়ে, সভা-সমিতির আলোচনার ভিতর দিয়ে, নব্যশিক্ষিত মধ্যবিত্ত জনস্তরের সমাজসংস্কার চেতনা প্রকাশ পেতে থাকে। উনিশ শতকের চল্লিশের প্রায় একমাত্র ধ্বনি হয়ে ওঠে, সমাজসংস্কার, শিক্ষাসংস্কার।

এই সংস্কারোন্মুখ সামাজিক পরিবেশের মধ্যে বিদ্যাসাগর তাঁর মানসিক প্রস্তুতির সুযোগ পেয়েছিলেন। সমাজের নতুন প্রাণশক্তির বন্যাস্রোতের মধ্যে তিনি তাঁর কর্মজীবনের লক্ষ্য স্থির করেছিলেন। শহরের নতুন অভিজাতশ্রেণী ও মধ্যবিত্ত 'বাবুদের' বুলবুলির লড়াই, মেড়ার লড়াই আর ঘোড়দৌড় দেখে, বাইজীবিলাস দেখে, তিনি হতাশ হননি এবং তাকেই সামাজিক সত্যের সবটুকু বলে গ্রহণ করেননি। মধুসূদনের ধর্মান্তর, দেবেন্দ্রনাথের ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ, নব্যশিক্ষিত বাঙালীদের খ্রীস্টধর্মপ্রীতি ও ব্রাহ্মধর্মানুরাগ, প্রধানত ধর্মকেন্দ্রিক বিদ্রোহ ও সংস্কারচেতনার প্রকাশ হলেও, তা দেখে বিদ্যাসাগর বিচলিত অথবা বিভ্রান্ত হননি। সমাজসংস্কারের যে চেতনা ক্রমেই শিক্ষিত মধ্যবিত্ত জনস্তরে প্রবল হয়ে উঠছিল, যুগোপযোগী শিক্ষার জন্য যে ব্যাকুলতা তাঁদের মধ্যে প্রকাশ পাচ্ছিল, নতুন সামাজিক প্রাণশক্তির যে প্রাচুর্য বিদ্রোহ ও অন্যায়ের প্রতিরোধ-স্পৃহার মধ্যে, বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা ও সভা-সমিতির স্বাধীন আলোচনার মধ্যে ধ্বনিত হয়ে উঠছিল, বিদ্যাসাগর তার ভিতর থেকেই তাঁর চলার শক্তি সঞ্চয় করেছিলেন এবং লক্ষ্যও স্থির করেছিলেন। যা বর্জনীয় তা বর্জন করেছিলেন এবং যা গ্রহণযোগ্য তা গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর স্বাতন্ত্র্যের

জন্যই তিনি বন্যাস্রোতে তৃণখণ্ডের মতন ভেসে যাননি এবং তাঁর সমাজচেতনার জন্য তিনি সেই স্রোতের তরঙ্গাঘাতও এড়িয়ে চলেননি। স্রোতের খরতা বাড়িয়ে সমাজ-জীবনের ঐতিহাসিক খাতে তাকে পরিচালিত করেছিলেন।

বিদ্যাসাগরের জীবনের 'নিষ্ক্রিয়' পর্ব এখানেই শেষ হয়ে গেল। এই নিষ্ক্রিয়তা অবশ্য জড়তা বা অচলতা নয়। মানুষ ও সমাজ কোন কালেই জড় বা অচল হয়ে থাকে না। প্রতি মুহূর্তে, প্রতি দিনে, তার বিকাশ প্রকাশ ও প্রসার হতে থাকে। সর্বদাই জীবন ও সমাজ পরিবর্তনের তরঙ্গে ওঠানামা করে এবং ব্যক্তির বাল্যজীবন থেকে যৌবনের গোড়া পর্যন্ত, অর্থাৎ কর্ম-জীবনের সূচনা পর্যন্ত, প্রধানত সেই তরঙ্গের আঘাত লেগেই কেটে যায়। আঘাতে আঘাতে জীবন এগিয়ে চলে, চরিত্র গড়ে ওঠে। প্রতিঘাতের প্রস্তুতি চলে। জীবনের এই পর্বে বিদ্যাসাগরও এইভাবে এগিয়ে চলেছেন, সমাজ-জীবনের তরঙ্গাঘাতে নিজের কর্মাদর্শ গড়ে তুলেছেন, প্রতিঘাতের জন্য প্রস্তুত হয়েছেন। এই পর্বে, অন্যান্য সকল মানুষের মতন সমাজের সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের প্রতিক্রিয়ার ক্ষেত্র খুবই সীমাবদ্ধ ছিল। প্রধানত প্রবহমান সমাজই তাঁর চরিত্র রূপায়িত করেছে। পরবর্তী পর্বে সমাজের সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ ঘাত-প্রতিঘাত শুরু হয়েছে এবং তার ফলে তিনি সমাজের পরিবর্তন ও তাঁর নিজেরও পরিবর্তন সাধন করেছেন। এতদিন যেন তিনি তীরে দাঁড়িয়ে সমাজ-জীবনের তরঙ্গায়িত ধারার দিকে চেয়ে ছিলেন। এইবার সেই তরঙ্গের গতি নিয়ন্ত্রণের জন্য তিনি স্রোতের মধ্যে গিয়ে দাঁড়ালেন এবং আঘাতের সঙ্গে প্রতিঘাত করে এগিয়ে চললেন।

নির্দেশিকা

পূর্বরঙ্গ

১। "On 23rd June, 1757, the Middle Ages of India ended and her Modern Age began"—History of Bengal, vol. II, 497.

২। প্রবাসী, ভাদ্র ১৩২৯।

৩। Diary and Consultation Book of the United Trade Council at Fort William in Bengal (Dec. 1706-Dec. 1707).

৪। William Hodges : Travels in India (London 1794) : 42.

৫। Diary and Consultation Book (Dec. 1706-Dec. [illegible]) : ৩রা ও ৭ই এপ্রিল, ১৭০৭।

৬। Jadunath Sarkar : A Short History of Aurangzib (1930 ed.) : 384. "Save one" কথার অর্থ "আকবর বাদশাহ ছাড়া।"

৭। Yule and Burnell : Hobson-Jobson : A Glossary of Colloquial Anglo-Indian Words & Phrases : NABOB.

৮। The Memoirs of William Hickey : Vol. I, 111.

৯। লোকনাথ ঘোষের "The Modern History of the Indian Chiefs, Rajas, Zamindars etc" গ্রন্থের (Calcutta, 1881) দ্বিতীয় ভাগে, প্রাচীন কলকাতার পারিবারিক ইতিহাস সঙ্কলিত হয়েছে। সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য বিবরণ না হলেও, অনেকটা নির্ভরযোগ্য। শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন পররাষ্ট্র বিভাগের কাগজপত্র থেকে (১৮৩৯ সালের) সেকালের কলকাতার সম্ভ্রান্ত ও ধনী বাঙালীদের নাম ও বংশপরিচয় "ভারতবর্ষ" পত্রিকার ১৩৪৭ সনের শ্রাবণ সংখ্যায় প্রকাশ করেছেন।

১০। মেয়রস কোর্ট ও সুপ্রীম কোর্টের নথিপত্র থেকে সেকালের বাঙালী বেনিয়ানদের চমৎকার একটি বিবরণ শ্রীনরেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহ 'Bengal Past and Present' পত্রিকায় প্রকাশ করেছেন (Vol. 69, Serial No. 132, 1950)।

২ | পূর্বপুরুষ

১। স্বরচিত জীবনচরিত।

২। দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য : বাঙ্গালীর সারস্বত অবদান : প্রথম খণ্ড, ১০৮-১১১।

৩। মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি : সন্দর্ভ-সংগ্রহ (১৮৯৭) : "খানাকুল-কৃষ্ণনগর সমাজ" প্রবন্ধ।

৪। রবীন্দ্রনাথ : বিদ্যাসাগরচরিত।

৫। শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন : বিদ্যাসাগর জীবনচরিত : "উপক্রমণিকা"।

৬। জন্মভূমি, জ্যৈষ্ঠ ১৩০২ : শ্রীহারাধন দত্ত ভক্তিনিধির "গড় মান্দারণ ও জাহানাবাদের ইতিবৃত্ত" প্রবন্ধ।

৭। বিদ্যাসাগরের সহোদর শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন এই কাহিনীটির উল্লেখ করেছেন : বিদ্যাসাগর জীবনচরিত : "উপক্রমণিকা"।

৮। প্রবাসী : আশ্বিন ১৩৫৩ : দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্যের "হটী-বিদ্যালঙ্কার" প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।
ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় : সংবাদপত্রে সেকালের কথা : ১ম খণ্ড, সম্পাদকীয়।

৯। সম্বাদ ভাস্কর, ১৯শে এপ্রিল ১৮৫১ : সংবাদপত্রে সেকালের কথা, ১ম খণ্ডে উদ্‌ধৃত ৪১৩-৪।

৮। কলকাতা শহরে ঠাকুরদাস

১। পুরাতন প্রসঙ্গ : ১ম ভাগ : ২১৮।

২। National Magazine, Vol. 31, 1919 : "Life of Peary Chand Mitra" প্রবন্ধ।
১৩২৬ সনের ফাল্গুন-চৈত্র মাসের "নারায়ণ" পত্রিকায় (৬ষ্ঠ বর্ষ) প্রিয়নাথ কর লিখিত "রামগোপাল ঘোষ" প্রবন্ধ। লেখক প্রিয়নাথ করের জননীর মাতুল ছিলেন রামগোপাল ঘোষ এবং বাল্যকালে তিনি তাঁর সান্নিধ্যে এসেছিলেন।

৩। কিশোরীচাঁদ মিত্র : Dwarakanath Tagore : 1-16.

৪। নবকৃষ্ণ ঘোষ : প্যারীচরণ সরকার (জীবনবৃত্ত) : কলিকাতা ১৩০৯ : ১ম পরিচ্ছেদ।

৫। Alfred Von Martin : Sociology of The Renaissance (1945) : 27-46.

৬। স্থানীয় প্রাচীন অধিবাসীদের কাছ থেকে লেখক কর্তৃক প্রত্যক্ষ অনুসন্ধানলব্ধ। ঘাটাল-আরামবাগ অঞ্চলেও এর প্রমাণ পাওয়া যায়।

৭। District Handbook—Midnapur : W. B. Census 1951 : ভূমিকা ও "ক্ষীরপাই" দ্রষ্টব্য।

৮। William Hodges : Travels in India : London 1794 : 13-16.

৯। The Calcutta Monthly Journal : May 1800." ক্যালকাটা মান্থলি জার্ণাল" ১৮৮নং লালবাজারস্থ হরকরা প্রেস থেকে প্রকাশিত হত।

১০। Memoirs of William Hickey : Vol IV (1790-1809) : London, 5th Ed : 236-237.

১১। C. G. Nicholls : Field Book of Survey of a Part of Calcutta : 1809-10-11. (M. S)

১২। National Magazine : June 1919 : পাট্টাটির আসল কপি অক্রূর দত্তের অধস্তন

পঞ্চম পুরুষ চারুচন্দ্র দত্তের (প্রাণনাথ পণ্ডিত ষ্ট্রীট নিবাসী) কাছে ছিল। তাঁর কাছ থেকে নিয়ে 'ন্যাশনাল ম্যাগাজিনে' প্রকাশ করা হয়।

১৩। Memoirs of William Hickey : চতুর্থ খণ্ডে নিমাইচরণ মল্লিক, হিদারাম ব্যানার্জি ও রঘুনাথ ব্যানার্জি সম্বন্ধে কৌতূহলোদ্দীপক আলোচনা আছে। ১৫ ও ১৮ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

১৪। হিকি সাহেব লিখেছেন : "...... I considered both Hydeeram Bonnagee and his brother Rogonaut Bonnagee to be as errant knaves and scoundrels as ever existed, who had united their crafty abilities to cheat and plunder me in every way they could devise......" (ঐ, ৩১৫)

১৫। The Calcutta Monthly Journal : Sep. 1800.

১৬। The Bengal and Agra Annual Guide & Gazetteer for [illegible], Vol I. Part III : 258. ১৮৪০-৪১ সালের ভাড়ার হার হলেও, উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে প্রায় এই রকমই ভাড়া ছিল, বেশি ছাড়া কম ছিল না।

১৭। H. G. Rainey : The Historical & Topographical Sketch of Calcutta (Reprinted from The Englishman's "Saturday Evening Journal") : Cal. 1876 : 125.

১৮। H. J. Rainey : ঐ, ১২৬।

১৯। The Morning Post, The Calcutta Monthly Journal, Calcutta Chronicle প্রভৃতি ইংরেজী পত্রিকায়, অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ থেকে উনবিংশ শতাব্দীর গোড়া পর্যন্ত, এই সব আমোদ-উৎসবের অনেক কৌতূহলোদ্দীপক বিবরণ আছে।

২০। Calcutta Chronicle : Sept. 11, 1792 : ৮নং লালবাজার থেকে আপ্‌জন সাহেব 'ক্যালকাটা ক্রণিকেল্‌' পত্রিকা প্রকাশ করতেন। এ রকম আরও অনেক সংবাদ প্রাচীন পত্রিকা থেকে সংকলন করে দেওয়া যায়।

৪ | জন্ম ও বাল্যকাল

১। "..the first iron ship was built in 1787, and the first iron steamship in 1821." Lewis Mumford : Technics and Civilisation ; 164.

২। "It is customary to date the movement for free trade from 1820, the year in which the merchants of London presented a Petition for Free Trade ; and it is true that after that year free trade doctrine made headway in the country." C. R. Fay : Great Britain, From Adam Smith to the Present Day : London 1947 : 44.

৩। …"it was not until the 1820's that professional machine-making firms began to appear in any number either in London or in Lancashire." Maurice Dobb : Studies in the Development of Capitalism : London 1947 ; 295.

৪। হরিশচন্দ্র কবিরত্ন : সেকালের সংস্কৃত কলেজ : প্রবাসী, ভাদ্র ও আশ্বিন ১৩৩২।

৫। Nagendra Nath Gupta : Noble Lives (Hind Kitabs, 1950) : 25-27. নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মেট্রোপলিটন স্কুলের যখন ছাত্র ছিলেন, তখন এই ঘটনাটি ঘটে। তিনি তাঁর "Noble Lives" নামক ইংরেজী গ্রন্থে বিদ্যাসাগরপ্রসঙ্গে এই কাহিনীটির উল্লেখ করেছেন।

৬। বিখ্যাত সমাজবিজ্ঞানী সরোকিন শহরের এই বৈষম্য সম্বন্ধে বলেছেন : "It (শহর) is a real *coincidentia oppositorum*, or the place of coexistence of the greatest contrasts and contact of people of most opposite social status, standards, capacities, occupations, religions, mores, manners and what not." Sorokin and Zimmerman : Principles of Rural-Urban Sociology : N. Y. 1929 : 48.

শহুরে সমাজের উচ্চ-নিম্নস্তরের উত্থান-পতন প্রসঙ্গে Sorokin : Social Mobility : Chaps 8, 9 দ্রষ্টব্য।

৫ | বাল্যকালের সমাজ

১। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্বরচিত জীবনচরিত : শ্রীপ্রিয়নাথ শাস্ত্রী প্রকাশিত : (কলিকাতা ১২৯৮) : পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

রামমোহন রায় যে "ব্রাদার" বলে সম্বোধন করতেন, তা ইংরেজী কথা নয়। ফার্সী "বিরাদর" কথা, অর্থ হল 'ভাই'। ইংরেজী "ব্রাদার" ও ফার্সী "বিরাদর" কথার ধ্বনি ও অর্থ একরকম।

২। নকুড়চন্দ্র বিশ্বাস : অক্ষয়-চরিত (১২৯৪ সন)।

৩। হরিশচন্দ্র ভট্টাচার্য কবিরত্ন : গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্নের জীবনচরিত (১৯০৯ সাল)। জীবন-চরিতের "বাল্যজীবন" অংশ বিদ্যারত্ন মহাশয়ের স্বরচিত।

৪। হিন্দু কলেজে ডিরোজিওর নিয়োগ-তারিখ, তাঁর চরিতকার টমাস এডওয়ার্ডস ১৮২৮ সাল বলে উল্লেখ করেছেন। কেউ কেউ ১৮২৭ সালও বলেন। কিন্তু ১৩ মে, ১৮২৬ সালের "সমাচার-দর্পণ" পত্রিকায় এই সংবাদটি প্রকাশিত হয় : "ইংরাজী পাঠশালায় ডিয়রম্যান নামক একজন গোরা আর ডি রোজী সাহেব এই দুই জন নূতন শিক্ষক নিযুক্ত হইয়াছেন…"।

এই প্রসঙ্গে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের "সংবাদপত্রে সেকালের কথা" (১ম খণ্ড) গ্রন্থের "ডিরোজিও" সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত সম্পাদকীয় মন্তব্য দ্রষ্টব্য।

৫। Proceedings of the Lottery Committee, Calcutta (unpublished M. S.) 1817-1821.

৬। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় : কলিকাতা কমলালয়।

৭। Alfred Von Martin : Sociology of the Renaissance (London 1945) : 5—9.

৮। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় : নববাবুবিলাস : রঞ্জন পাবলিশিং হাউস কর্তৃক "দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থমালা"য় পুনর্মুদ্রিত।

৯। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সঙ্কলিত ও সম্পাদিত : সংবাদপত্রে সেকালের কথা, ১ম খণ্ড থেকে গৃহীত।

১০। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় : ঐ।

১১। Fanny Parkes : Wanderings of a Pilgrim in search of the picturesque etc : 2 Vols (London 1850) Vol. 1, Ch. 4.

১২। Fanny Parkes : op. cit, Ch. 3.

১৩। Address from Rammohan Roy to the Governor-General protesting against the establishment of the Calcutta Sanscrit College (Dec. 11, 1823) ; Raja Rammohan Roy and Progressive Movement in India (A selection from records) : ed. J. K. Majumdar : 250-252.

১৪। Lushington : The History, Design and Present state of the Religious, Benevolent and Charitable Institution, founded by the British in Calcutta. (Calcutta, Hindostanee Press, 1824) : 185-91, 192-207.

১৫। The Calcutta Journal : March 11. 1822.

১৬। গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার : স্ত্রী শিক্ষাবিধায়ক। ১৮২৪ সালের তৃতীয় সংস্করণ থেকে রঞ্জন পাবলিশিং হাউস কর্তৃক পুনর্মুদ্রিত (দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থমালা)।

৬ মহানগর অভিমুখে

১। দেওয়ান কার্তিকেয়চন্দ্র রায় : আত্মজীবনচরিত : ৮।

২। Ram Comul Sen : Dictionary in English and Bengali (From the Serampore press) 1834 : 16-17.

৩। আত্মজীবনচরিত : ৮।

৪। S. D. Collet : Life and Letters of Raja Rammohan Roy (Calcutta 1913) : 8. রামমোহনের ইংরেজী শিক্ষা সম্বন্ধে কোলেট লিখেছেন : "...he only began to learn English in 1796, and had not obtained much proficiency in it by 1801."

৫। আত্মজীবনচরিত : ৩৪।

৬। Researches of Asiatic Society (1784-1883) গ্রন্থে রাজেন্দ্রলাল মিত্রের লেখা "এসিয়াটিক সোসাইটির" ইতিহাস দ্রষ্টব্য।

৭। Rev. W. Ward : A View of the History, Literature and Mythology of the Hindoos (3rd ed. 1820), Vol IV.

৮। গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্নের জীবনচরিত (কলিকাতা ১৯০৯) : ৬।

৯। The Calcutta Monthly Journal : January 27, 1817, Vol 30, No 267.

১০। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় : নববাবুবিলাস (পুনর্মুদ্রিত সংস্করণ) ১২-১৭।

১১। "সমাচারদর্পণ" পত্রিকার সংবাদগুলি ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সংকলিত "সংবাদপত্রে সেকালের কথা" দুই খণ্ড থেকে গৃহীত। বিহারীলাল সরকার তাঁর "বিদ্যাসাগর" জীবনচরিতে লিখেছেন : "তখন জলপথ বড় সুগম ছিল না। উলুবেড়ের নূতন খালও তখন কাটা হয় নাই" (৩য় সংস্করণ, ৩৭)। এ উক্তি ভুল। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর যখন কলকাতা যাত্রা করেন, তখন উলুবেড়িয়ার খাল সবেমাত্র কাটা হয়েছে।

বড়বাজারে ঈশ্বরচন্দ্র

১। K. Blechynden : Calcutta, Past and Present (London 1905) : IX.
H. Beverley : Report on the Census of the Town of Calcutta, 1876, Part 1, Sec. 3.
Proceedings of the Lottery Committee, Calcutta (1817 to 1821), unpublished M. S.

২। Fanny Parkes : Wanderings of a Pilgrim etc., Vol. 1 (London 1850), VI, 57.

৩। নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় সংকলিত বিদ্যাসাগর-চরিত (স্বরচিত) : (কলিকাতা ১৮৯১) : ৩৯-৪০।

৪। Fanny Parkes : op. cit, 26.

৫। The Bengal Hurkaru and Chronicle, February 11, 1829.

৬। দেওয়ান কার্তিকেয়চন্দ্র রায় : আত্মজীবনচরিত : ১ম সংস্করণ, ৫৫-৫৬।

৭। বিদ্যাসাগর-চরিত (স্বরচিত) : ৪৫-৪৬।

৮। শম্ভুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় : বিদ্যাসাগর-জীবনচরিত, ২২-২৩।

৮ | গোলদীঘির সংস্কৃত কলেজ

১। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের "শ্লোকমঞ্জরী" গ্রন্থের 'বিজ্ঞাপন'।

২। J. Kerr : A Review of Public Instruction in the Bengal Presidency, Part II (Calcutta 1853), 11, 48.

৩। J. Kerr : op. cit, 49.

৪। শ্লোকমঞ্জরী, 'বিজ্ঞাপন'।

৫। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় : ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (সাহিত্য-সাধক চরিতমালা) : ১১-১২।

৯ | গুরু-শিষ্য সংবাদ

১। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর : শ্লোকমঞ্জরী, বিজ্ঞাপন।

২। হরিশচন্দ্র ভট্টাচার্য কবিরত্ন : গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্নের জীবনচরিত (কলিকাতা, ইং ১৯০৯), ৯-১২।

৩। গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্নের জীবনচরিত : ঐ।

৪। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় : ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (সাহিত্য-সাধক চরিতমালা, ১৮ নং) : ১৭।

৪ক। জয়গোপাল তর্কালঙ্কার : বিল্বমঙ্গলকৃত কৃষ্ণবিষয়কশ্লোকাঃ (ইং ১৮১৭) ১।

৫। কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য : পুরাতন প্রসঙ্গ, প্রথম পর্যায়, ২২৩-২২৫।

৬। কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য : পুরাতন প্রসঙ্গ, ঐ।

৭। শ্লোকগুলির বাংলা পদ্যানুবাদ "প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশের জীবনচরিত ও কবিতাবলী" (রামাক্ষয় চট্টোপাধ্যায় প্রণীত, পঞ্চম সংস্করণ) থেকে গৃহীত।
'বঙ্গবাণী' পত্রিকায় পূর্ণচন্দ্র দে, উদ্ভটসাগর কর্তৃক লিখিত (১৩২৯, শ্রাবণ ও আশ্বিন) 'সংস্কৃত কলেজের ইতিহাস' রচনা দ্রষ্টব্য।

৮। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর : সংস্কৃত রচনা (১২৯৬ বঙ্গাব্দ সংস্করণ)।

৯। রামাক্ষয় চট্টোপাধ্যায় : প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশের জীবনচরিত ও কবিতাবলী : পঞ্চম সংস্করণ, তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

১০। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর : সংস্কৃত রচনা (১৮৮৯)।

১১। সম্পূর্ণ শ্লোকটি তাঁর 'সংস্কৃত রচনা' গ্রন্থে মুদ্রিত হয়েছে।

১২। ঘটনাটি রামাক্ষয় চট্টোপাধ্যায় প্রেমচন্দ্রের উল্লিখিত জীবন-চরিতে বর্ণনা করেছেন।

১৩। হরিশ্চন্দ্র কবিরত্ন : সেকালের সংস্কৃত-কলেজ (প্রবাসী, ভাদ্র-আশ্বিন ১৩৩২)।

১৪। আচার্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য : পুরাতন-প্রসঙ্গ, ১ম খণ্ড, ২২৫-২২৬।

১৫। কাহিনীটি হরিশ্চন্দ্র কবিরত্ন তাঁর পূর্বোক্ত রচনায় উল্লেখ করেছেন।

১৬। জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চাননের মৃত্যুর পরে, ১৮৭২ সালের ২৬ নবেম্বর তারিখের 'সুলভ-সমাচার' পত্রিকায় তাঁর যে জীবনবৃত্তান্ত প্রকাশিত হয়, তার মধ্যে এই কাহিনীগুলি উল্লেখ করা হয়েছে।

১০ | ছাত্রজীবনের সমাজচিত্র ১৮২৯-১৮৪১

১। ১৮৮ পৃষ্ঠা, ছত্র ১৪ : Letter dated 28 June 1837 from Ramcomul Sen, Secretary Sanscrit College, to the General Committee of Public Instruction.

২। কুমারদেব মুখোপাধ্যায় : ভূদেব-চরিত, ১ম খণ্ড, ৫ম অধ্যায়।

৩। Calcutta Monthly Journal : January 1830.

৪। সমাচার দর্পণ, ১৭ এপ্রিল ১৮৩০ (সংবাদপত্রে সেকালের কথা, ২য় খণ্ড)।

৫। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় : রামরাম বসু।

৬। Alexander Duff : India and India Missions (Edin, 1840), 634-635.

৭। A. Duff : op. cit, ibid.

৮। Proceedings of the Hindu College : 1831-33 (Manuscript) : dated April 23, 1831.

১১ কর্মজীবনের সূচনা

১। Sketches of Calcutta, or Notes of a Late Sojourn in the City of Palaces : By A. Griffin (Glasgow, 1843), 36-40.

২। Revd. W. H. Hutton : Lord Wellesley : (Rulers of Indian Series) : I.

৩। Memoirs of William Hickey, Vol. IV, 1790-1809 : Ch. 14.

৪। Hutton : Lord Wellesley : 201.

৫। Wellesley Despatches, Vol. II, 325 Sqq.

৬। Memoirs of W. Hickey : Vol. IV, Ch. XIV.

৭। Fisher Papers, 170 (1014).

৮। Calcutta Review, Vol. V, No IX, 1846 : 86-123.

১২ | সমাজ-জীবনের খরস্রোত ১৮৪১-৫০

১। Sorokin and Zimmerman; Principles of Rural-Urban Sociology (N. Y. 1929), 44-51.

২। রাজনারায়ণ বসুর আত্মচরিত (কলিকাতা ১৩১৫), ৪২-৪৩।

৩। পুরাতন প্রসঙ্গ, প্রথম পর্যায় (১৩২০) : ৪।

৪। বিদ্যাদর্শন, ১ম খণ্ড, ৬ষ্ঠ সংখ্যা (অগ্রহায়ণ ১৭৬৪ শকাব্দ)।

৫। সম্বাদ ভাস্কর, ১৮৪৪ সাল, ২৭২ সংখ্যা।

৬। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা : ৩য় ভাগ, ২৬ সংখ্যা, ১ আশ্বিন ১৭৬৭ শকাব্দ।

৭। সমাচার চন্দ্রিকা : ২১০৭ সংখ্যা, ২৭ নবেম্বর, ১৮৪৫ সাল।

৮। সমাচার চন্দ্রিকা : ৪ জানুয়ারী, ১৮৪৪ সাল।

৯। The Bengal Spectator (দ্বিভাষিক পত্রিকা), Vol. 1, No 7, September 1, 1842.

১০। দুর্জ্জনদমন মহানবমী, ৬ সংখ্যা, ২২ জুন, ১৮৪৭।

১১। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, চতুর্থ ভাগ, ৮৪ সংখ্যা, শ্রাবণ ১৭৭২ শক। 'পল্লীগ্রামস্থ প্রজাদিগের দুরবস্থা' এই শিরোনামে একটি ধারাবাহিক রচনা এই সময় পত্রিকার কয়েকটি সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

১৩ 'নূতন ঊষার স্বর্ণদ্বার'

১। শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনী : সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী সম্পাদিত (৩য় সংস্করণ, ১৯২৭), নবম পরিচ্ছেদ, ৮৪-৮৬।

২। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ৩য় ভাগ, ১ জ্যৈষ্ঠ ১৭৬৭ শক। দেবেন্দ্রনাথের 'আত্মজীবনী'র ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

৩। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা : ১৭৬৭ শক, ১ পৌষ।

৪। নকুড়চন্দ্র বিশ্বাস : অক্ষয়-চরিত (১২৯৪ সন) : ১৬।

৫। অক্ষয়-চরিত : ঐ।

৬। আত্মজীবনী : সপ্তম পরিচ্ছেদ, ৭৫-৭৬।

৭। স্বর্গীয় আনন্দকৃষ্ণ বসু মহাশয়ের সংক্ষিপ্ত জীবনী : তদীয় পৌত্র জ্ঞানেন্দ্রকৃষ্ণ বসু রচিত (১৩৪৬ সন)।

৮। অক্ষয়-চরিত : ২১।

৯। অক্ষয়-চরিত : ২২-২৪।

১০। রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ (৩য় সংস্করণ); ১৯৯-২০০।

১১। 'আত্মজীবনী'র পরিশিষ্ট (২০ নং), 'তত্ত্ববোধিনী সভা ও ব্রাহ্মসমাজ', ৩৫৭।

১২। 'আত্মজীবনী'র পরিশিষ্ট (৫৫ নং), ৪৫৭।

১৪ নবজাগরণ

১। G. M. Trevelyan : English Social History (London, 1948) : 495-497.

২। The Bengal Spectator, Vol. II, No 13, May 1, 1843.

৩। Bengal Hurkaru, February 13, 1843.

৪। The Bengal Spectator, Vol. II, Nos : 4 and 5, February-March 1843.

৫। G. Thomson : Addresses etc. (Calcutta 1843), 8.

৬। The Bengal Spectator, Vol. I, No 5, July 1842.